পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

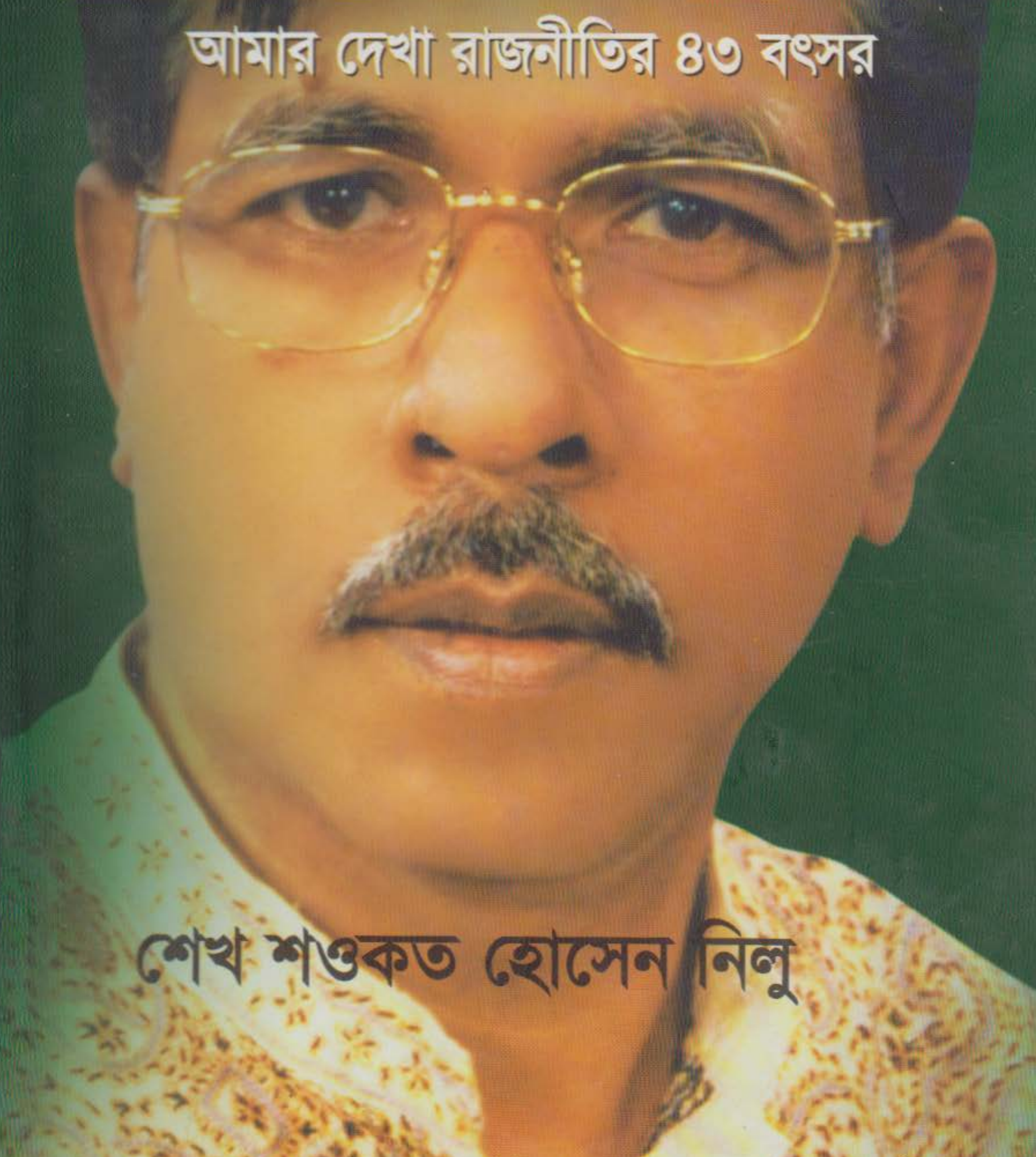

আমার দেখা রাজনীতির ৪৩ বৎসর

শেখ শওকত হোসেন নিলু

পাকিস্তান
থেকে
বাংলাদেশ

আমার দেখা রাজনীতির ৪৩ বছর

শেখ শওকত হোসেন নিলু

নিউ-লাইট
বুক সোসাইটি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি

১৯৫২ সালের ৩ এপ্রিল গোপালগঞ্জ শহরে নানাবাড়িতে আমার জন্ম। জেলার গিমাডাঙা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব শেখ শাহাদাত হোসেন আমার পিতা আর মাতা - মিসেস হামিদা বেগম।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলে এক মাসের মধ্যে মীর জাফর আলী খান বাংলা-বিহার-উরিষ্যার নবাবী গ্রহণ করেন। লর্ডক্লাইভকে সঙ্গে নিয়ে নবারের মসনদে আসীন হওয়ার অভিষেক অনুষ্ঠানেই তিনি সুবেহ বাংলার সেনাবাহিনী থেকে ৮০ হাজার সেনাসদস্যকে চাকরিচ্যুত করেন। এর মধ্য দিয়েই প্রকারান্তরে তিনি যে পুতুল নবাব তা প্রকট হয়ে উঠে। মীর জাফর আলী খানের জামাতা তেজোদীপ্ত মীর কাশেম আলী এই অবমাননাকর আদেশ মেনে নিতে পারেননি। তিনিই চাকরিচ্যুত সেনা সদস্যদের সংগঠিত করে দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে প্রথম যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৭৫৯ সালে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে এক বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে মীর কাশেম আলী পরাজিত ও নিহত হন। তার সেনা সদস্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং ব্রিটিশ ও পুতুল নবাব বাহিনীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। সে সময় গোপালগঞ্জ ছিল বৃহত্তর যশোর জেলার অন্তর্গত এবং মুর্শিদাবাদ থেকে বেশ দূরের এক বিচ্ছিন্ন জনপদ।

www.pathagar.com

২৬. ইউরোপীয় ইউনিয়নের আমন্ত্রণ ও বেলজিয়াম সফর // ২৪১-২৪৮
২৭. হাসিনা-লারমা সংবিধানবিরোধী কালোচুক্তি খালেদা-নিজামিরা গ্রহণ করেছেন কি? // ২৪৯-২৫৪
২৮. স্বাধীনতা দিবসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট // ২৫৫-২৬৪
২৯. আধিপত্যবাদীদের ষড়যন্ত্র কি আজও আগের মতোই চলছে? // ২৬৫-২৭০
৩০. তসলিমা নাসরিন বিরোধী আন্দোলন // ২৭১-২৭২
৩১. সামরিক শাসন অবৈধ নয় প্রসঙ্গ : সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী // ২৭৩-২৭৮
৩২. আমাদের শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ // ২৭৯-২৮৬
৩৩. পাকিস্তানসহ উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভূমিকম্প ও আমার পাকিস্তান সফরের অভিজ্ঞতা // ২৮৭-২৯২
৩৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্লিপ্ততা দেশকে বন্ধুহীন রাষ্ট্রে পরিণত করবে // ২৯৩-৩০০
৩৫. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন প্রসঙ্গ // ৩০১-৩০৪
৩৬. জাতীয় নির্বাচন ২০০৭ : সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের আন্দোলন // ৩০৫-৩০৮
৩৭. দাতা ও প্রভাবশালী বন্ধু দেশগুলোর ভূমিকা // ৩০৯-৩১২
৩৮. মেধাশূন্য জাতীয় সংসদ // ৩১৩-৩১৮
৩৯. নির্বাচন কমিশনের ভোটার লিস্ট প্রণয়ন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা // ৩১৯-৩২৪
৪০. ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ হলো কেন? // ৩২৫-৩২৮
৪১. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ // ৩২৯-৩৩০
৪২. প্রসঙ্গঃ বোমা হামলা ও আমাদের করণীয় // ৩৩১-৩৩৬
৪৩. ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টি গঠন // ৩৩৭-৩৪৬
৪৪. ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ : পিলখানায় সেনা অফিসারদের নির্মম হত্যাকান্ড // ৩৪৭-৩৫৪
৪৫. স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে দু'জন বুদ্ধিজীবীর মূল্যায়ন ও আমার বিশ্লেষণ // ৩৫৫-৩৫৮
৪৬. ইয়াজউদ্দিন-ফখরুদ্দিন-মইনউদ্দিন সরকারের নিরপেক্ষতা // ৩৫৯-৩৬৮
৪৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন ও '৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন // ৩৬৯-৩৭৬
৪৮. আগামীদিনের মুসলিম বিশ্ব // ৩৭৭-৩৯৪
৪৯. বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ও আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা // ৩৯৫-৪১৪
৫০. আমার বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর // ৪১৫-৪২৬
৫১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ বিরোধী নিরব বিপ্লব // ৪২৭-৪৩৩
৫২. পরিশিষ্ট // ৪৩৪-৪৪০

www.pathagar.com

সূচিপত্র

০১. জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি // ১১-১৬

০২. ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও উত্থান-পতন // ১৭-২২

০৩. ভারতীয় জাতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী // ২৩-৩০

০৪. পাকিস্তানের জাতির জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ // ৩১-৩৮

০৫. পাকিস্তানের জটিল রাজনীতি // ৩৯-৫২

০৬. রাজনীতি ও সেবা // ৫৩-৬৪

০৭. ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ // ৬৫-৭০

০৮. বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের কিছু ঘটনা // ৭১-৭৬

০৯. ১৬ মে ১৯৭৬ : মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা অভিমুখে ঐতিহাসিক লং মার্চ // ৭৭-৮৪

১০. আমাদের দেশ ও জাতীয় সম্পদের উৎস // ৮৫-৯২

১১. বাকশাল প্রতিষ্ঠার দিনগুলো // ৯৩-৯৮

১২. বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ড ও রহস্যের বেড়াজালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব // ৯৯-১০৪

১৩. আমার দেখা মওলানা ভাসানী // ১০৫-১১২

১৪. আমার দেখা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান // ১১৩-১২০

১৫. আমার পারিবারিক জীবন // ১২১-১৩০

১৬. ৩০ মে কালোরাতে শহীদ হলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান // ১৩১-১৩৬

১৭. নতুন করে ফারাক্কা সংগ্রাম পরিষদ গঠন // ১৩৭-১৪৮

১৮. বেগম খালেদা জিয়ার কাছে খোলা চিঠি // ১৪৯-১৫০

১৯. পলাশী দিবস ও আজকের প্রেক্ষাপট // ১৫১-১৫৪

২০. ১৯৪৭-এ উপমহাদেশ বিভক্তি ও বিপুল জনগোষ্ঠী উগ্রসাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার শিকার // ১৫৫-১৭৮

২১. বঙ্গভঙ্গের ১০৩ বছরের পটভূমি // ১৭৯-১৮৪

২২. একুশ আমাদের উজ্জীবিত আকাঙ্ক্ষা ও চেতনার উৎস // ১৮৫-১৮৮

২৩. ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট // ১৮৯-১৯২

২৪. আমার পাকিস্তান, চীন ও উত্তর কোরিয়া সফর // ২১৭-২২৮

২৫. জাতীয় পার্টিতে যোগদান // ২২৯-২৪০

www.pathagar.com

আছেন বইটি কবে নাগাদ বাজারে আসবে। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই নির্মম। লেখক বইয়ের কাজ শেষ করে দেশের বাইরে যাবেন এ লক্ষে দ্রুত কাজ চলতে থাকে। পাসপোর্টে ভিসা এমনকি বিমানের টিকেট পর্যন্ত ওকে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস লেখকের মা হঠাৎ করেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ভর্তি করানো হলো রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে। ১৫-২০ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জালড়ে শেষপর্যন্ত ৮ জুলাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

এর ফলে লেখকের বিদেশগমন বন্ধ ও বইটি প্রকাশনার কাজ কিছুদিনের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। আমরা শোকার্ত মন নিয়েই বইটি প্রকাশের কাজে আবার হাত দেই। প্রোফ দেখতে দেয়া হলো প্রাবন্ধিক শাহ্ লোকমান হাকিমকে। তিনি আগ্রহের সঙ্গেই কাজটি হাতে নিলেন। কিন্তু এখানেও আকস্মিকভাবে আবার বিপত্তির সম্মুখিন হই। লোকমান হাকিমের শ্বশুড়কে ভীষণ অসুস্থাবস্থায় ঢাকা কিডনি ইন্সটিটিউট হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু না আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি ৩ আগস্ট মৃত্যুর কুলে ঢলেপড়েন। এই দু'টি মৃত্যু বইটির প্রকাশকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত ও বিলম্বিত করে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদসহ সমস্ত বৈদেশিক লুণ্ঠন-আগ্রাসন ও আধিপত্যের কবলমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জাতীয় মহাঐক্য ও সংহতির। আরেকটি বিষয় হলো আমাদের সম্মানিত জাতীয় নেতৃবর্গ যে যতটুকু মূল্যায়ণ পাওয়ার অধিকারী দলমত নির্বিশেষে তাঁকে তার প্রাপ্যসম্মানটুকু প্রদর্শন করা আমাদের প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। এ বিষয়টিও জাতীয় ঐক্যগড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাই এ বিষয়ে আমাদের সব সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে উদারনৈতিকতার পরিচয় দেয়া এখন অত্যন্ত জরুরি।

এ বইটিতে গ্রন্থকার ধর্ম-বর্ণ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি খেয়াল রেখে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নেতৃবর্গের প্রত্যেককেই যথোপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে তাঁদের প্রকৃত মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে মত-পথের ভিন্নতা ও চিরবৈরি মনোভাব দূর করতে প্রশংসনীয় অবদান রাখবে বলে বিশ্বাস করা যায়। বিভাজনের রাজনীতির দুষ্টচক্রের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করার এক ঐকান্তিক প্রেরণার বশবর্তী হয়েই জাতির বর্তমান এ দুঃসময়ে মূল্যবান এ বইটির বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন একযোগে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জাতীয় ও মানবিক স্বার্থবিজড়িত আমাদের এই প্রত্যাশার কিঞ্চিৎ বাস্তবায়ন হলেও 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ - আমার দেখা রাজনীতির ৪৩ বছর' বইটির প্রকাশনা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

অনেক জটিলতা পাড়ি দিয়ে শেষপর্যন্ত বইটির বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন একই সময়ে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারায় সত্যিই আমরা আনন্দিত।

প্রকাশক

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে যারা লেখালেখি করেন তারা সচরাচর লেখক, কলামিস্ট ও সাংবাদিক। এ অবস্থায় পেশাভিত্তিক গতানুগতিক প্রাতিষ্ঠানিকতার বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারাটা তাদের জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমস্যাসঙ্কুল এই দেশে গতানুগতিকতার বৃত্ত ভেঙ্গে সব পেশার প্রাগ্রসর মানুষের বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন সমস্যা ও এগুলোর সমাধানে তথ্য-উপাত্ত নির্ভর সুচিন্তিত দিকনির্দেশনামূলক লেখা জাতির জন্য একান্ত অপরিহার্য। তবে এ ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক ব্যাপার হচ্ছে যে এখন জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ অনেক পেশার বিদগ্ধ ব্যক্তিরাই লেখালেখিতে এগিয়ে আসছেন। অথচ আমাদের দেশের জাতীয় পরিসরে সুপ্রতিষ্ঠিত অনেক প্রাজ্ঞ নেতৃবর্গও এ কাজটি করে যাননি। ফলে জাতীয় রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা নিরসনে তাদের মনীষাদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি, প্রস্ফুটিত চেতনা ও অভিজ্ঞতাকে সঠিকভাবে এখন উপলব্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বারংবার বিপথগামীতার বেড়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় কলুসমুক্ত নির্ভেজাল রাজনীতি চর্চার পথ অনেকাংশেই অবরুদ্ধ।

এক্ষেত্রে দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শেখ শওকত হোসেন নিলু অনেকটাই ব্যতিক্রম। তিনি লেখালেখির সঙ্গে খুববেশি সম্পৃক্ত না থাকলেও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, অনুকূল-প্রতিকূল বিষয়গুলোসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক অজানা রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ - আমার দেখা রাজনীতির ৪৩ বছর' বইটিতে আলোচনা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

বইটির মোট ৫১টি নিবন্ধে লেখক বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অভিঘাত এবং আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের অনেক মৌলিক সমস্যা বিভিন্ন আঙ্গিকে সহজভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তথ্য বিশ্লেষণে আন্তরিক ছিলেন তিনি।

অনেক দেশভ্রমণের সুবাদে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি এ দেশের জনগণের সমস্যা ও সঙ্কট উত্তরণে দিকনির্দেশনা অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। অভিজ্ঞতালব্ধ প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলি আর উপস্থাপনার গতিময়তা সমৃদ্ধ এ গ্রন্থের প্রতিটি নিবন্ধ মনোযোগ সহকারে অধ্যয়নের দাবি রাখে।

ইচ্ছার কোনো ঘাটতি না থাকলেও বইটি প্রকাশে আমাদের অনেক বিলম্ব হয়েছে। ইতিমধ্যে যারা জেনেছেন বইটি প্রকাশের কাজ চলছে তাদের অনেকেই উদগ্রীব হয়ে

www.pathagar.com

ও রাজনীতি', সম্পর্কে আমার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হয়। চীনের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই-এর লেখা গ্রন্থগুলো আমাকে বাংলাদেশের সমান্তরাল পরিস্থিতি বুঝতে সহায়তা করেছে। বিশেষকরে 'হাউ টু বি এ গুড কমিউনিস্ট' গ্রন্থটি আমার যুবমানসে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

উল্লেখ না করলেই নয় আমার এ গ্রন্থটি লেখায় নিরলসভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার সহধর্মিণী খায়রুন নাহার খানম। তিনি সবসময় বলছেন, 'লেখনি শক্তি রাজনৈতিক বিশ্বাসকে মহিমান্বিত করে। তাই রাজনৈতিক বিশ্বাসকে ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্যে পরিণত করা উচিত।"

আমার রাজনীতির দীর্ঘদিনের অন্যতম সহকর্মি বাহারুল আলম বাহার উৎসাহ ও শ্রম দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্য উপাত্তগুলো একত্রিত করেছেন। গত এক বছর ধরে তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক মেহেদী হাসান পলাশ এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলো প্রবন্ধ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশ করেছিলেন এবং প্রবন্ধগুলোকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য আমার ওপর নিরবচ্ছিন্ন চাপ সৃষ্টি করেছেন। তার তাগাদার পর অলসতাদুষ্টে আক্রান্ত হয়েও আমি রচনাগুলো প্রস্তুত করতে একরকম বাধ্য হই।

দীর্ঘদিনের সংগৃহিত তথ্য ও লেখাগুলোর হেফাজত করেছে আমার দু'কন্যা রাজবিন শওকত ও মেহেরিন শওকত। প্রবন্ধগুলোর খুঁটিনাটি সংশোধন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে রাজনীতিক ও কলামিস্ট মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ভুইয়া। আর পুরো গ্রন্থটির ইংরেজী ভার্সন তৈরিতে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন সাংবাদিক এম এ আলম। এতে আরো সহযোগিতা করেছেন প্রখ্যাত রাজনীতিক খালেকুজ্জামান খান দুদু ও সাংবাদিক, কলামিস্ট স্টালিন সরকার। এছাড়া বইটির প্রোফ দেখে সাধ্যানুযায়ী ক্রটিবিচ্যুতি পরিমার্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন প্রাজ্ঞ প্রাবন্ধিক শাহ লোকমান হাকিম। আমি তাদের সকলের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটিতে আমি ৫১টি অধ্যায়ে আমার রচনাগুলো সাজানোর চেষ্টা করেছি। এর আগে ১৯৮২ সালে 'দেশ জনগণ জিয়াউর রহমান' নামক আমার একটি বই বের হয়েছিল। 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আমার দেখা রাজনীতির ৪৩ বছর' আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ। শেষপর্যন্ত 'নিউ-লাইট বুক সোসাইটি'র কর্ণধার স্নেহাস্পদ আশরাফ হোসাইন বুলবুল বইটি প্রকাশনায় দায়িত্ববোধের প্রমাণ রেখেছে। এ জন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রকাশিত বইটিতে অসাবধানতা ও অনভিজ্ঞতার ছাপ পরিদৃশ্য হতেই পারে। তবে তথ্যগত কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনে আমি অবশ্যই সচেষ্ট হব। এ ব্যাপারে সুহৃদ পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

শেখ শওকত হোসেন নিলু

www.pathagar.com

লেখকের কথা

আমার মরহুম বাবা শেখ শাহাদাৎ হোসেন সবসময় বলতেন - 'মানুষের সেবা করার জন্য রাজনীতিই হচ্ছে - সর্বোত্তম পথ। তিনি বিশ্বাস করতেন রাজনৈতিক ইতিহাস সাহিত্যাকারে সঠিকভাবে তুলে ধরাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট শৈল্পিক সৃষ্টি।' আমার মরহুম বাবার প্রেরণায় আমি একজন রাজনৈতিক কর্মি পরিচয়ে নিজেকে গর্বিত মনে করি। রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্টি করে জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশনা প্রদান পন্ডিত, বিদগ্ধ, গুণি ও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের কাজ। সে মহান দায়িত্ব পালনের জন্য যে শিক্ষা, যোগ্যতা ও মননশীলতার প্রয়োজন আমার তা আছে বলে মনে করি না। তবে তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি থেকেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দীর্ঘ রাজনীতির পরিমন্ডল অনুধাবণের প্রচেষ্টা চালিয়েছি নিরবচ্ছিন্নভাবে। যোগ্যতার যথেষ্ট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ - আমার রাজনীতির তেতাল্লিশ বছর' রাজনৈতিক এই গ্রন্থটি লেখার কাজে হাত দিয়ে একটি দুঃসাহসী অভিযাত্রা শুরু করেছি বলেই আমার নিকট প্রতিভাত হয়েছে। ইতিহাসখ্যাত পন্ডিত জওহরলাল নেহরু, এডলফ হিটলার, জনএফ কেনেডি, ন্যালসন মেন্ডেলা, জুলফিকার আলী ভুট্টো, বেনজীর ভুট্টো, বারাক হোসাইন ওবামা, আবুল মনসুর আহমেদ, আতাউর রহমান খান, মিজানুর রহমান চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, জননেতা অলি আহাদ, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ও খালেকুজ্জামান খান দুদু'র লেখা গ্রন্থগুলো থেকে আমি ইতিহাস ঐতিহ্য, চলমান রাজনীতি আর সমাজসচেতনতার বিচিত্র উপলব্ধি ও প্রেরণা লাভ করি। এর ফলে সমকালিন সময়ের অজানা অনেক তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে জানার সুযোগ হয় আমার। চলমান সামাজিক চালচিত্র ও জীবনধারার বিশ্লেষণে এসব তথ্য উপাত্ত বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এ জন্য অবশ্যই আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

পন্ডিত জওহরলাল নেহরুকে মূল্যায়ণের ক্ষমতা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণধর্মী লেখা থেকে শুধুমাত্র সমকালিন রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি বুঝার জন্যই নয়, ধারাবাহিকভাবে বিশ্বমানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ বুঝার ক্ষেত্রেও অসাধারণ জ্ঞানভান্ডার হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রয়াত বেনজির ভুট্টোর লেখা 'রেনসিলেশন ইসলাম, গণতন্ত্র এবং পশ্চিমা বিশ্ব' ন্যালসন মেন্ডেলার 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' এবং বারাক হোসাইন ওবামার 'দ্যা অডাসিটি অব হোপ' আমাকে আজকের বিশ্বরাজনীতি ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে প্রভূত সহায়তা করেছে।

প্রখ্যাত লেখক খন্দকার ইলিয়াস এর - 'ষাটের দশকে ভাসানী যখন ইউরোপে' এবং *শীর্ষস্থানীয় ইসলামি চিন্তাবিদ আবুল আলা মাওদুদীর জ্ঞানগর্ভ বইগুলো থেকে 'ইসলাম*

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা
মরহুম শেখ শাহাদাৎ হোসেন
বড়খালা মিসেস হাসিনা আলম
ও
মহিয়সী মা মরহুমা মিসেস হামিদা বেগম-কে

www.pathagar.com

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ
আমার দেখা রাজনীতির ৪৩ বছর
শেখ শওকত হোসেন নিলু

প্রকাশক
আশরাফ হোসাইন সরকার বুলবুল
নিউ-লাইট বুক সোসাইটি
৩১/জি তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৭১৫-১১৮৬০৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০৯

ডিজাইন অ্যান্ড বর্ণবিন্যাস
রেনেসাঁটেক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
বাহারুল আলম বাহার

পরিমার্জন
শাহ লোকমান হাকিম

অঙ্গসজ্জা
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা ভূইয়া

সহযোগিতায়
মোহাম্মদ শাহ আলম

ISBN : 978-984-33-0688-3

মূল্য
৪০০ টাকা মাত্র

Bangla Verson
Pakistan Theka Bangladesh
Amar Deakha Rajnitir 43 Bashor

English Verson
Pakistan to Bangladesh
My Political Observation of 43 Years
Sheikh Sakayot Hossain Nilu
E-mail : sakyothossin@yahoo.com

Publisher
AHS Bulbul
Neo-Lite Book Society
31/G Topkhana Road
Dhaka-1000, Bangladesh
Ph.01715-118608
E-mail: neolitesociety@yahoo.com

Price
Tk. 400.00
US $ 16.00
£ 10.00

www.pathagar.com

কিংবদন্তি আছে যে, সে সময় শেখ বোরহানউদ্দিনের সঙ্গে কিছু অনুসারী বা নিকটাত্মীয় প্রথমে বর্তমান নড়াইল জেলার সন্নিকটবর্তী মধুমতি অববাহিকায় অবস্থিত গোপালগঞ্জের ফুকরা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে শেখ বোরহানউদ্দিন ও শেখ রোকনউদ্দিন গোপালগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গিমাডাঙা মৌজায় স্থায়ি বসতি স্থাপন করেন। তাদের সঙ্গে আগত অন্য তিনজন বর্তমান কোটালিপাড়া থানার টুপুরিয়ায় থেকে যান। অন্য দু'জন পিরোজপুর জেলার মাটিভাঙ্গায় বসবাস শুরু করেন। এ সময়ের প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বেগম মতিয়া চৌধুরী ও মোস্তফা জামাল হায়দার তাঁদেরই উত্তরসূরী।

শেখ বোরহানউদ্দিন গিমাডাঙা মৌজার আলোকিত জনপদ টুঙ্গিপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। মধুমতি নদীর অবিরাম ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রজন্ম পুরুষেরা বহুবার স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। আমার বাবা শেখ শাহাদাৎ হোসেন, সাবেক মন্ত্রী শেখ শহিদুল ইসলামের বাবা শেখ মোঃ মুসা মিয়া ও শেখ ফজলুল হক মনির বাবা শেখ ইনতু মিয়ার আলাপচারিতায় আমি জেনেছি তারা শেখ বোরহানউদ্দিন ও শেখ রুকনউদ্দিনের ১১তম প্রজন্ম।

গিমাডাঙা গ্রাম তথা পাটগাতী ইউনিয়ন গোপালগঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত। সম্ভ্রান্ত ও মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম গিমাডাঙা। শ্রীরামকান্দি, বরনী, কুশলি, রামচন্দ্রপুরসহ এ অঞ্চলে মুসলমানগণ ছিলেন সামাজিকভাবে অত্যন্ত সুখ্যাতি সম্পন্ন। তারা ছিল গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর ও বাগেরহাট সংলগ্ন অন্যান্য অঞ্চলের অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার রক্ষাকবচ।

১৩-১৪ শ' খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের দূরদুরান্তের অঞ্চলগুলোতে মুসলিম সুফিরাই ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। তাঁদের কারণেই বাংলা-বিহার-আসামে বিপুলসংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বিশেষকরে সিলেট, চট্টগ্রাম ও বাগেরহাট অঞ্চলের বহু মানুষ পীর-আউলিয়াদের সংস্পর্শে আসে। মুসলিম শাসকদের আগমনের আগেই এই অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়। তারই অংশ হিসেবে গিমাডাঙাসহ আশপাশের অনেক প্রতিপত্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার গড়ে উঠে। গিমাডাঙার বিশ্বাস মোল্লা শেখ, শ্রীরামকান্দির শেখ, কুশলির মোল্লারা আগে থেকেই প্রাগ্রসর ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার হিসেবে এই অঞ্চলে সুখ্যাতি অর্জন করে।

www.pathagar.com

গিমাডাঙা গ্রাম ১৮টি পাড়া নিয়ে গঠিত। এই গ্রামে ৮৪ জন মাতাব্বর নিয়ে সমাজ পরিচালিত হয়। আমার দাদার নাম শেখ মোঃ বচন। বচন শেখ হিসেবে তিনি বহুল পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ৮৪ জন মাতাব্বর-এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে আমার বাবা প্রথম সন্তান। বাবা অত্যন্ত মেধাবি ছাত্র ছিলেন। আমার দাদা-দাদি তাঁকে গোপালগঞ্জের সবচেয়ে ভাল স্কুল, গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন গোপালগঞ্জ ছিল মহকুমা শহর। মাত্র ৮/১০টি মুসলিম পরিবার গোপালগঞ্জ শহরে বসবাস করতো। বর্তমান বিএনপি নেতা এডভোকেট খন্দকার মাহাবুবউদ্দিন আহমেদের বাবা ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী এবং তিনিই গোপালগঞ্জের প্রথম এমএনএ। পাকিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী জনাব ওহিদুজ্জামানের বাবা ছিলেন গোপালগঞ্জ বারের মোক্তার। তাঁদের গ্রামের বাড়ি ছিল গোপিনাথপুর। তিনি মোক্তার হিসেবে গোপালগঞ্জ বারে আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাবা ছিলেন নাজির হিসেবে চাকরিরত। আমার নানা সাদিমালী কাজী ছিলেন পেশকার হিসেবে সরকারি চাকরিজীবী। সাবেক মন্ত্রী কাজী ফিরোজ রশিদের বাবাও মোক্তার হিসেবে আইন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সাবেক মন্ত্রী মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরীদের গোপালগঞ্জ শহরে অনেক জায়গা-জমি ছিল। কিন্তু তাঁর বাবা সেই সম্পত্তি সরকারের কোর্টকাচারী করার জন্য দান করে দিয়েছিলেন। মোটামুটি এই নিয়েই তখনকার দিনের গোপালগঞ্জের মুসলিম সমাজ।

আমার বাবা গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গবন্ধুর বাবা মাদারীপুর থেকে গোপালগঞ্জে বদলি হয়ে আসেন। বঙ্গবন্ধু ও আমার বাবা মিশন স্কুলে একইসঙ্গে ক্লাস সেভেনের ছাত্র ছিলেন এবং এই দু'জনই সে সময়কার ক্লাস সেভেনের মুসলিম ছাত্র। এডভোকেট খন্দকার মাহবুবউদ্দিন আহমেদ তখন মিশন স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র।

১৯৩৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বঙ্গবন্ধুর বাবা ও শ্বশুড় ছিলেন পরস্পর আপন চাচাতো ভাই। বঙ্গবন্ধুর শ্বশুড়ের নাম ছিল শেখ নূরুদ্দিন। তিনি সরকারের অডিট বিভাগে চাকরিরত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে গ্রীষ্মকালে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বঙ্গবন্ধুর মাতা ছিলেন অত্যন্ত হৃদয়বান মানুষ। তিনি শেখ নূরুদ্দিন সাহেবের দুই কন্যার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং বড় মেয়েকে শেখ মোহাম্মদ মুসা

www.pathagar.com

মিয়ার সঙ্গে বিবাহ দেন ও ছোট মেয়েকে নিজপুত্র শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে বেগম মুজিবের বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর। সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে আমার বাবা ছাড়া অন্যকোন বাইরের লোক উপস্থিত ছিলেন না।

১৯৪১ সালে আমার বাবা ও বঙ্গবন্ধু মেট্রিক পাস করেন। আমার বাবা আই এ পড়ার জন্য ভর্তি হন বরিশাল বিএম কলেজে। বঙ্গবন্ধু চলে যান কলকাতায়। সেখানে তার বড় বোনের স্বামী শেখ ইনতু মিয়া চাকরি করতেন খাদ্য বিভাগে। এখানে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। স্কুল ছাত্র হিসেবেই ১৯৩৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমান-এর সঙ্গে পরিচয় হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর। ম্যাট্রিক পাস করার পর মুজিব কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হলে সেই পরিচয়ের সূত্রেই কলকাতেও তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতেন। এভাবে সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে এসেই শেখ মুজিব নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন।

কিছুদিন পর তিনি পুনরায় গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং আমার দাদা দাদিকে বলেন, আমার বাবাকে বরিশাল বি এম কলেজ থেকে ফিরিয়ে এনে কলকাতায় পড়ালেখার ব্যবস্থা করার জন্য। দাদা-দাদি মুজিবের কথায় সম্মত হলে ১৯৪১ সালে আমার বাবা শেখ শাহাদাৎ হোসেন ও মোল্লা আবদুস সালামকে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতায় ফিরে যান এবং সকলেই ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। শেখ মুজিব ইসলামিয়া কলেজে মুসলিম ছাত্রলীগের সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ সংগঠিত করেন। এভাবেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিবের গভীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে।

গোপালগঞ্জে মুসলিম লীগের মূল নেতা ছিলেন খন্দকার মাহাবুবউদ্দিনের বাবা। তিনি ছিলেন ফরিদপুরের মোহন মিয়ার একান্তই ঘনিষ্ঠজন ও নাজিমুদ্দিন সাহেবের পক্ষের লোক। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তরুণ ছাত্র শেখ মুজিবের মাধ্যমেই তাঁর গ্রুপ সংগঠিত করেন। গোপালগঞ্জের সামাজিক অবস্থানে শেখ সাহেবের বাবা নাজির সাহেব ও আমার নানা পেশকার সাহেবের মধ্যে গভীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। আমার নানা সাদেম আলী কাজী ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও কুসংস্কারমুক্ত মানুষ। তিনি তাঁর মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। আমার বড় খালাকে তিনি কলকাতার লেডি ব্রাক্ষ্মণ কলেজে রেখে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সেখান থেকে বিএসসি পাস করেছিলেন

www.pathagar.com

বোর্ডের গোল্ডমেডেল প্রাপ্ত হয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি পাস করে গোপালগঞ্জ কলেজের শিক্ষা সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৪৫ সালে আমার বাবা কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। বঙ্গবন্ধু তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে বাকি পরীক্ষাগুলো আর দিতে পারেননি। তিনি ১৯৪৬ সালে আবার বিএ পরীক্ষা দিয়ে পাস করেন। এ সময় আমার বাবা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এপিএস হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করেন। শেখ ইনতু মিয়াও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আমার বাবাকে এই বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এপিএস অস্থায়ী চাকরি, তুমি সরকারি চাকরিতে যোগদান কর। আমার বাবা পরবর্তী পর্যায়ে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একজন ইন্সপেক্টর হিসেবে তাঁর প্রথম কর্মস্থল হয় বাংলা ও বিহারের সীমান্ত শহর বীরভূমে। তিনি সপ্তাহে ৫ দিন থাকতেন বীরভূমে ও ২ দিন থাকতেন কলকাতায়। বঙ্গবন্ধু ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলের ২২ নম্বর কক্ষে থাকলেও সেই সময় তিনি কলকাতার বউবাজারে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।

১৯৪৬ সালে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের আন্দোলনে তুমুল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কলকাতা, পাটনা ও লাহোরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চরম হিংস্র রূপ ধারণ করে। সে সময়কার নিয়মানুযায়ী এক কলেজের ছাত্রকে অন্য কলেজে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হতো। কিন্তু ইসলামিয়া কলেজের একজন হিন্দু শিক্ষক ছুরিকাঘাতে আহত হলে, হিন্দু-মুসলিম ছাত্র শিক্ষকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখন কলকাতা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন মি. আইআই চন্দ্র নামক এক ভদ্রলোক। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁকে অনুরোধ করে এ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছিলাম গোপালগঞ্জের নাজির সাহেব ও পেশকার সাহেবের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আমার দাদি বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ নাজির সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর ছেলেকে একটা সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের মেয়ের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করার। সে সূত্রেই ১৯৪৭ সালের ১ জুলাই আমার বাবা শেখ শাহাদাৎ হোসেন ও মা মিসেস হামিদা বেগম বিবাহ

www.pathagar.com

বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ সময় মাত্র ৫ দিনের ছুটি নিয়ে বাবা, শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম মুজিবুর রহমান কলকাতা থেকে গোপালগঞ্জে এসেছিলেন। পরে গোপালগঞ্জে এসে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন আব্দুল জালাল মোল্লা ও ফরিদপুরের এডভোকেট আবদুল হামিদ চৌধুরী। তিনি পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগের ১ম কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৫০ সালে আমার বড় ভাই শেখ দেলোয়ার হোসেন জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ৩ এপ্রিল গোপালগঞ্জে নানার বাড়িতে আমার জন্ম। ৫ ভাই ও ৪ বোন নিয়ে আমাদের পরিবার। আর ভাইবোনদের মধ্যে আমি দ্বিতীয়।

বংশীয় ঐতিহ্যের ধারাকে সমুজ্জল রেখে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে একজন রাজনৈতিক কর্মি হিসেবে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালনে চেষ্টা করে যাচ্ছি। #

www.pathagar.com

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও উত্থান-পতন

খ্রীস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে বিশ্ববীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি খাইবার গিরিপথ দিয়ে তক্ষশিলা হয়ে এই উপমহাদেশে আগমনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিন্ধুনদের উপত্যকা পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পেরেছিলেন বলে ইতিহাসবিদদের একাংশের বিশ্বাস। তিনি কখনো ভারতীয় ভূ-খন্ডে প্রবেশ করতে পারেননি। মাত্র ২০ বছর বয়সে তিনি তার পিতার হাতে গড়া সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা শুরু করেছিলেন। ৩২৬ খ্রীস্টপূর্ব সময়ের আগের কোনো ইতিহাস সেই অর্থে লিপিবদ্ধ হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই এর পূর্বের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে অভিযান পরিচালনা করেন, তখন ভারতবর্ষে নন্দ বংশের এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল, যার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা)। এ থেকেই বোঝা যায় ভারতবর্ষে সে সময়ে মানবসভ্যতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল।

www.pathagar.com

আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ অভিযানে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছিল তার নিজের সেনাবাহিনীই। কারণ সুদীর্ঘ যুদ্ধযাত্রার ফলে সৈন্যরা পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অবশেষে খ্রীস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ব্যাবিলন শহরে ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর তার বিজিত সাম্রাজ্যটি সেনাপতিরাই ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছিলেন এবং নিজেদের পৃথক রাজবংশ ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আলেকজান্ডারের সেনাপতিদের মধ্যে টলেমি ও স্যালুকাস ছিলেন অন্যতম। টলেমির ভাগে পড়েছিল মিসর। তিনি আলেকজান্ডারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার রাজ্যের রাজধানীর নামকরণ করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া। আর স্যালুকাসের ভাগে পড়েছিল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশ। সে সময় তিনি মূল ভারতীয় ভূখন্ড জয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তার সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কারণ চন্দ্রগুপ্ত নামক একজন যুবক গ্রীক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি একটি সেনাবাহিনীও গঠন করেছিলেন। পরে স্যালুকাসের মেয়ের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং নিজের নামের সঙ্গে মৌর্য উপাধি ধারণ করে উত্তর ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তার প্রধান উপদেষ্টার নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত। কিন্তু সকলের কাছে তিনি চানক্য নামে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে চানক্য রচিত অর্থশাস্ত্রটি অন্যতম। আর ভারতবর্ষে অর্থশাস্ত্রে সম্ভবত এটাই প্রথম লিখিত গ্রন্থ। পালি ভাষায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। এককথায় এই গ্রন্থকে শাসনতন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করা চলে। অনেকের মতে চানক্য রচিত অর্থশাস্ত্রই পৃথিবীর মা শাসনতন্ত্র (Mother Constitution)।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কোন্ ধর্মে বিশ্বাস করতেন তার কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তবে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। অশোকের সময়েই কাবুল থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তার পর উত্তর ভারতে আর্যসভ্যতার বিস্তার ঘটে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে কৃষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই রাজবংশের মধ্যে কলিংগণ নামে একজন প্রচন্ড প্রভাবশালী রাজার উত্থান হয়েছিল। তিনি ভারতীয় ইতিহাসে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত।

www.pathagar.com

এরপর ৩০৮ খ্রীস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক রাজার শাসনকাল শুরু হয়। তিনি হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত এবং ইতিহাস খ্যাত হিন্দু রাজা বিক্রমাদিত্য তারই দৌহিত্র। অনেকেই ভুলবশত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও চন্দ্রগুপ্তকে একই ব্যক্তি ভাবতে পারেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ৫৩৪-৩৫ বছর পর চন্দ্রগুপ্ত ভারতে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে সুখ্যাতির সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা ও নিজে রাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। ইতিহাসে বিক্রমাদিত্যের বহু প্রসিদ্ধ কার্যকলাপের বর্ণনা আছে। তার রাজসভার নবরত্নের কথা প্রায় সকলেই জানেন। মহান সাহিত্যিক কবি কালিদাস পন্ডিত সেই নবরত্নদের অন্যতম ছিলেন।

এখানে উল্লেখ না করলেই নয়, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রায় ২৪শ' বছরের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রগুপ্তই ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে সময় সমস্ত বাংলা ও বিহার জুড়ে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধ ধর্মশালার নাম বিহার। সমগ্র বিহারই হয়ে উঠেছিল বৌদ্ধ ধর্মশালা এবং পরে এই অঞ্চল বিহার নামে খ্যাত হয়।

চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজ পরিবার প্রায় দুশ' বছরকাল কেন্দ্রীয় ভারত শাসন করেছিলেন। এ সময় বৌদ্ধদের উপর সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম অত্যাচার। হাজার হাজার বৌদ্ধ ধর্মশালা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল বিহার ও বাংলা অঞ্চলে। এ অবস্থায় ভেতর থেকে ভারতীয় শাসনকাঠামো দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছিল। যার ফলে বহির্দেশ থেকে আক্রমন আসার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ শাসনকাঠামো ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয় শান্তি আর সাম্যের বাণী নিয়ে। এর ফলে তৎকালীন ভারতেই নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগ্রহ জেগে উঠে। পাশাপাশি আরব, পারস্য ও আফগান অঞ্চলের শাসকরাও ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে নবচেতনায় জাগ্রত হয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা হিসেবে আগমন করেন। এভাবেই ভারতে মুসলিম শক্তির উত্থান ঘটে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সমগ্র ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি আকবর। তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত নমনীয়। তিনি শিখধর্ম প্রচারের জন্য গুরুনানককে সহযোগিতা করেছিলেন এবং পাঞ্জাবের অমৃতসরে শিখধর্মাবলম্বীদের বিশাল

www.pathagar.com

ধর্মশালা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারি জায়গা বরাদ্দ দিয়েছিলেন এবং সেখানেই শিখদের প্রধান ধর্মশালা স্বর্ণমন্দির গড়ে উঠে।

সম্রাট আকবরের সহযোগিতার ফলেই ভারতবর্ষে শিখধর্ম একটি অন্যতম ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় তিনি সকল ধর্মের ভালো দিকগুলোকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় লালন করেন এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় এ বিষয়গুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। আকবরের শাসন আমল ছিল ১৫৫৬-১৬০৫ সাল পর্যন্ত।

আকবরের শাসনামলেই গ্রীক, ফরাসি ও ইংরেজরা ভারতের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে আনাগোনা শুরু করে। ঔপনিবেশিক এই শক্তিগুলো ছিল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বি। সে সময় থেকে ক্রমেই গ্রীকদের প্রভাব কমে যেতে শুরু করে। মূল প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠে ইংরেজ ও ফরাসি শক্তি। ১৬১৫ সালে মোগল সম্রাটের নিকট থেকে ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে বাণিজ্য করার সনদপত্র লাভ করে। এভাবে মোগল আমলেই ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় রাজশক্তির সংস্পর্শে আসে এবং প্রাসাদ রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

১৬৫৯ সালে আওরঙ্গজেব তার পিতা শাহজাহানকে বন্দি করে মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ৪৮ বছর প্রচন্ড প্রতাপের সঙ্গে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনামলেই দক্ষিণ ভারতে শিবাজির নেতৃত্বে মারাঠা তথা হিন্দুশক্তির উত্থান ঘটে। সম্রাট আকবরের সময় উত্তর ভারতের কাশিতে তুলসি দাস নামক একজন কবি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। রামায়ণ রচনা করে তিনি উত্তর ভারতের সাধারণ নর-নারীর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তুলসি দাসের রামায়ণ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে উত্তর ভারতে আওরঙ্গজেবের সময় কৃষাণ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল এবং দক্ষিণ ভারতে শিবাজির নেতৃত্বে হিন্দু শক্তির উত্থান ঘটেছিল। শিবাজির নেতৃত্বাধীন তখনকার মারাঠাদেরকে বাংলা অঞ্চলে বর্গী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। সে সময় থেকেই শিশুদের ঘুমপাড়ানোর জন্য মায়েদের মুখে মুখে

www.pathagar.com

শোনা যেত বহুল প্রচলিত গান "ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে"। আর এ থেকেই বর্গীদের হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাস স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে।

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেব ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করলে মূলত ভারতে মোগল সাম্রাজ্য শক্তিহীন সাম্রাজ্যে পরিণত হতে শুরু হয়। স্থানীয় রাজশক্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে এবং এরই মধ্যে ১৭৩৯ সালে পারস্য অধিপতি নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এ উপমহাদেশের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে। তিনি সম্রাট শাহজাহান নির্মিত ময়ূর সিংহাসনও লুট করে নিয়ে যান। এভাবেই মোগল সাম্রাজ্যের রাজশক্তি এক হীনবল শক্তি হিসেবে পরিণত হয়। অন্যদিকে ইংরেজ ও ফরাসিরা দেশীয় রাজশক্তির ক্ষমতার লড়াইয়ে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। তারা ভাড়াটে সৈন্য ও উন্নতমানের অস্ত্র দিয়ে এখানকার যুদ্ধগুলোতে অংশ নিতে থাকে।

সমুদ্রে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকার কারণে এবং উন্নত অস্ত্র থাকার ফলে তারা আগের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এরইমধ্যে হায়দার আলী মহিশুরে একজন নরপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তারই পুত্র ইতিহাসে গ্রেট টিপু সুলতান নামে খ্যাত। তিনি ব্রিটিশ আধিপত্যকে প্রতিহত করার জন্য বীরোচিত ভূমিকা পালন করেছিলেন যা ভারতের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ ও ফরাসিরা ছিল শাসকদের সহযোগি শক্তি। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে তারা হয়ে উঠে রাষ্ট্রক্ষমতার মূলশক্তি। পলাশীর আম্রকাননে যুদ্ধের প্রহসন শেষ হয় অতি দ্রুততার সঙ্গে। কিন্তু নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় অনিবার্য করে তুলেছিল ঐতিহাসিক ২৩ জুনের পলাশী ট্র্যাজেডির বহু আগেই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এই ষড়যন্ত্রের অংশিদার ছিল নবাবের বড় খালা ঘঁষেটি বেগম। মীর জাফর আলী খান রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লোভে, রায়দুর্লভ ও জগতশেঠরা মুসলিম শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আর ক্লাইভরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের সম্পদ লুট করার স্বার্থে সেই ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়ে যেতে

www.pathagar.com

থাকে। আমরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব ভিন্ন ভিন্ন কারণ থাকলেও সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নবাবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। তারা জয়লাভও করেছিল। কিন্তু সকল ষড়যন্ত্রকারীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। তবে পলাশী ট্র্যাজেডির পথ ধরে মূলত চূড়ান্ত জয় অর্জিত হয়েছিল ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির।

এভাবেই ভারতীয় দুর্বল সামন্ত রাজশাসনের অবসান ঘটিয়ে সূচিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের। অবশেষে ১৮৫৭ সালে ব্যর্থ সিপাহী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের পতন হয়। এ অবস্থায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত হয়। আর এভাবেই ভারতবর্ষ ব্রিটিশের প্রধান ঔপনিবেশ হিসেবে পরিণত হয়। #

www.pathagar.com

ভারতীয় জাতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর গুজরাট রাজ্যের কাথিয়াওয়াড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাবা গান্ধী কাথিয়াওয়াড়ের দেওয়ান ছিলেন। তাঁর পরিবার ছিল গোড়া গুজরাটি হিন্দু। তিনি তাঁর পিতা-মাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তার ছাত্রজীবন শুরু করেন রাজকোটে ৭ বছর বয়সে। ১৮৮৭ সালে তিনি মেট্রিক পাস করে আহমেদাবাদের শ্যামল দাস কলেজে ভর্তি হন। গান্ধী পরিবারের একজন শুভ্যানুধ্যায়ী মারজী দাবেরের পরামর্শ অনুসারে তাঁর পরিবার তাঁকে বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৪ সেপ্টেম্বর বোম্বে থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তিনি। ১৮৯১ সালের ১০ জুন ব্যারিস্টারী পাস করেন তিনি। আমি করমচাঁদ গান্ধীর উপর লিখতে গিয়ে তাঁর জন্ম, বাল্যবিবাহ, শিক্ষা, দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মজীবন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তার রাজনৈতিক জীবন নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে চাই। স্কুল ছাত্র থাকাবস্থায় তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। করমচাঁদ গান্ধীর বয়স যখন ১৩ বছর তখন তিনি ১২ বছরের কস্তুরীবাইয়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৮৯১ সালে তিনি বিলাত থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং রাজকোট ও বোম্বাইয়ে আইনব্যবসা শুরু করেন। তিনি প্রথমে বোম্বের প্রখ্যাত আইনজীবী ও কংগ্রেস নেতা জনাব ফিরোজ মেহতার সান্নিধ্যে আসেন। সে সময় দক্ষিণ

www.pathagar.com

আফ্রিকায় অনেক বড় বড় ভারতীয় ব্যবসায়ী ছিলেন। এদের মধ্যে একজন বড় ব্যবসায়ী তাঁর নাম আব্দুল করিম শেঠ। তিনি করমচাঁদ গান্ধীকে তাদের কোম্পানির আইনজীবী হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে যান। মাসিক বেতন, থাকা খাওয়া বাদে ১৪৫ পাউন্ড। এভাবেই তিনি ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মজীবন শুরু করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মজীবন শুরুর করার ৩ বছর পর তিনি ১৮৯৬ সালে স্ত্রীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আফ্রিকাতে নিয়ে যান। তিনি আফ্রিকাতে দীর্ঘ ২১ বছর কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। এখানে উল্লেখ করতে হয় অন্যান্য রাজনীতিবিদের সঙ্গে করমচাঁদ গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের পার্থক্য হলো, তিনি দলীয় রাজনীতি আরম্ভ করার পূর্বে কমিউনিটির পক্ষে রাজনীতি বা সেবামূলক কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি একটি কোম্পানির চাকরি নিয়ে আফ্রিকাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানরত ভারতীয়দের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করে তোলেন। তিনি লক্ষ্য করেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত নাগরিকরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রশাসনের হাতে সীমাহীন নিপীড়নের সম্মুখিন হচ্ছে। তিনি এর শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করেন। তিনি ভারতীয়দের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর দর্শন ছিল রাজানুগত্য ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

করমচাঁদ গান্ধী ১৯০১ সালে কিছু দিনের জন্য ভারতে আসেন। একই বছর কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলকাতাতে। সেই অধিবেশনে যোগদান করে তিনি আফ্রিকাতে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের সংগ্রামের পক্ষে একটি প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন করেন। সেই প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহিত হয়। তিনি এই স্বল্পসময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করেন।

তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়দের মুখপত্র হিসেবে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রবাসে দেশীয় মানুষের পক্ষে আন্দোলন পরিচালনা করার সুবাদে স্বদেশে প্রত্যার্বনের আগেই ভারতীয় নাগরিকদের কাছে তিনি মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৯১৫ সালে তিনি স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। সে সময় প্রথম মহাযুদ্ধ চলছিল। তিনি ব্রিটিশ রাজের পক্ষে যুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন রাজভক্তি ধর্মের অংশ। সে কারণে যতটুকু পারা যায় রাজশক্তিকে সহায়তা করা দরকার।

www.pathagar.com

১৯১৭ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃত অর্থে এই অধিবেশনের মাধ্যমেই তিনি কংগ্রসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে তার সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। তিনি ব্রিটিশ ও ভারত শাসন আইন সংস্কারকেও অভিনন্দন জানান। আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল স্বরাজপ্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণের দাবি জানান। বিপিন চন্দ্র পালের বাড়ি ছিল নোয়াখালী জেলায়। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যার নাম "স্বদেশী ও স্বরাজ"। তাঁর এই লেখনির মধ্য দিয়েই স্বরাজ আন্দোলন সমগ্র ভারতে দানাবেধে উঠেছিল। এই অধিবেশন থেকেই বাংলা কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে গান্ধীজীর মনোমালিন্য শুরু হয় এবং কোনোদিনও তার আর অবসান হয়নি।

১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী। স্বাভাবিকভাবে কলকাতাতেই রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রধান চালিকা শক্তির বিকাশ ঘটে। সর্বোপরি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সম্প্রদায়ের এক অবিসংবাদিত মহান নেতা। কংগ্রেসের রাজনীতিতে উদিত সূর্য করমচাঁদ গান্ধী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের এই বিশাল প্রভাবকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। এভাবেই তিনি ভারতীয় কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন।

১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল সমগ্র ভারতে হরতাল পালিত হয়। এটাই ছিল ভারতের রাজনীতিতে প্রতিবাদের জন্য প্রথম গুণগত পরিবর্তন। এই হরতালের আহ্বান করেছিলেন করমচাঁদ গান্ধী। কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলন এই হরতাল কর্মসূচিকে সমর্থন করেছিল। সমগ্র ভারতে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত হরতাল কর্মসূচি সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল। দিল্লীতে ভুলবশত হরতাল হয়েছিল ৩১ মার্চ। ব্রিটিশ প্রশাসন এই হরতালের পক্ষে সাধারণ জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ এই প্রথম সাধারণ মানুষ কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, শ্রমিক, ছাত্র, কৃষক, মজুর এক কাতারে শামিল হয়ে ভারতের জাতীয় স্বার্থে আন্দোলনের ধারায় শামিল হলো।

ভীতি থেকে সৃষ্টি হয় উগ্রতার। আর এরই রেশ ধরে- ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল রোববার পাঞ্জাবের জালিয়ানওলাবাগে ইতিহাসের এক নির্মমতম হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল। সেদিনকার জনসভায় উপস্থিত একজনকেও বাঁচিয়ে রাখা হয়নি। শুধুমাত্র ময়লাস্তূপের মধ্যে একটি চার বছরের শিশু বেঁচে ছিল। ব্রিটিশ

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই জঘন্যতম আচরণ মানবসভ্যতার ইতিহাসের চরম নৃশংসতম অধ্যায়। সভ্যতার দাবিদার ব্রিটিশ জাতির মুখে এই নারকীয় হত্যাকান্ড কলংকের কালিমা লেপে দিয়েছিল।

প্রকৃত অর্থেই এটা ছিল একটি পরিকল্পিত নির্মম গণহত্যা। সমগ্র ভারতে এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে আন্দোলনের ঝড় উঠলো। এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ ব্রিটিশ খেতাবপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তিরা ঘৃণাভরে ব্রিটিশের খেতাব বর্জন করেছিল। এভাবে সত্যগ্রহ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষে। গান্ধীজীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাজা, মহারাজা, জমিদার, অভিজাত শ্রেণীর হাত থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠনে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি গয়া-কাশি, আজমীর শরীফসহ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি করেছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের সঙ্গে চুক্তি এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর মুক্তির আন্দোলন করে তিনি মুসলমান সমাজের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

১৯২২ সালে যুক্তপ্রদেশে একটি থানা লুট ও অগ্নিসংযোগ করে সহিংস আন্দোলন শুরু করলে, গান্ধীজী নিজের ভুল স্বীকার করে রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ভারতের হিন্দুসমাজের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে জাতিভেদ প্রথা। তারই নগ্নপ্রকাশ নিম্নজাতিগুলোর সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্তদের সামাজিক বৈষম্য। অর্থাৎ তফসিলি জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সামাজিক সংঘাতের প্রেক্ষাপটে সামাজিক বৈষম্যও জাতিভেদ প্রথা সারা ভারত জুড়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। একসময় ব্রিটিশ সরকার তফসিলিদের আলাদা জাতি হিসেবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা করেছিল। এই নিম্ন ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর নেতা ছিলেন ডা. আহম্মেদ কর। পরবর্তি পর্যায়ে শ্রী জগজীবন রামও নিজের শ্রেণী সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে অত্যন্ত বরেণ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। বর্তমানে যুক্তপ্রদেশের মায়াবতী, বিহারের লালু প্রসাদ যাদব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তফসিলী সম্প্রদায়ের মধ্যমণি হিসাবে পরিগণিত হচ্ছেন।

গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে আমরণ অনশন ধর্মঘট করেন এবং ব্রিটিশের সেই সিদ্ধান্ত বাতিলে বাধ্য করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সেই নীতি কার্যকর হলে ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, তফসিলি জাতি, খ্রিস্টান, পার্শিয়ান (অগ্নিউপাসক), বৌদ্ধসহ নানা ধর্ম ও জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করতো। কিন্তু হিন্দুধর্মের সংখ্যা অধিক রাখার স্বার্থে গান্ধীজী জীবনমরণ পণ করে এই লড়াই করেছেন। যার কারণে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, কায়স্ত ও তফসিলি

www.pathagar.com

জাতিগুলোকে হিন্দুধর্মাবলম্বী বলে গণ্য করা হয়। ফলে আজ পর্যন্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতিভেদের কুসংস্কার রয়েই গেছে।

১৯৮০ সালে জগজীবন রাম জনতা দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে এবং ভিপি সিং মন্ডল কমিশন গঠন করলে এই কুসংস্কার ও জাতিভেদের অভিব্যক্তি ঘটেছিল।

গান্ধীজীর জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যমন্ডিত আন্দোলন হলো লবণআইন অমান্য আন্দোলন। ব্রিটিশরা যখন ভারতের পণ্য নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে তখন তারা আইন করে ভারতে কতগুলো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। ইতিহাস খ্যাত ঢাকাই মসলিন শাড়ি তার অন্যতম। মসলিন শাড়ি উৎপাদনই শুধু বন্ধ করেনি, মসলিন শাড়ি উৎপাদনে নিয়োজিত কারিগরদের হাতও কেটে দেয়া হয়েছিল। কারণ ঢাকার মসলিন শাড়ি ছিল পৃথিবী বিখ্যাত সবচেয়ে উন্নতমানের কাপড়। ঠিক তেমনিভাবে লবণ উৎপাদন হতো সমুদ্রতীরের জোয়ারের পানিতে প্রাকৃতিক নিয়মে। কিন্তু ভারতীয়রা সেই লবণ আহরণ এমনকি ব্যবহারও করতে পারবে না- এই ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইন। আর এটা আইনের নামে নিবর্তন ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

গান্ধীজী সমুদ্র সৈকতে পড়ে থাকা লবণ আহরণ ও ব্যবহারের অনুমতি চাইলে- ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক শোষণের আঁতে ঘা লাগলো। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। অন্যদিকে গান্ধীও নাছোরবান্দা। তিনি বললেন, লবণ উৎপাদন করতে না দিলে বিনা পয়সায় লবণ দিতে হবে। কিন্তু ৫০ কোটি মানুষকে তো আর বিনা পয়সায় লবণ দেয়া যায় না। তাই শেষপর্যন্ত এই লবণ উৎপাদনবিরোধী বে-আইনি আইন অমান্য করার কর্মসূচি গ্রহণ করলেন গান্ধীজী। গুজরাটের সমুদ্র সৈকতে ২শ' মাইল ব্যাপী এই আন্দোলনের পথপরিক্রমা ঘোষণা করা হলো ১৯৩০ সালে। ব্রিটিশের বড়লাট তার মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন। বড়লাট সকলের দিকে দৃষ্টি দিয়ে প্রশ্ন করলেন, what is this naketman want to active by this kind of movement.

The law adviser replied this naketman want to change the authority of British empire- আর এ প্রেক্ষাপটে তার নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে লবণ আইন'অমান্য শুরু হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আবুল কালাম আজাদ, পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু, বল্লববাই পেটেলদের মতো দেশবরেণ্য নেতারাও দেশীয় লবণ বিক্রয় করতে থাকলো। এভাবে গান্ধীজীর আন্দোলন দলীয় আন্দোলনের পরিবর্তে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। গান্ধীজী এই প্রথম অনুধাবণ

www.pathagar.com

করলেন, দল পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। তিনি দলের অর্থসংগ্রহের জন্য সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন। বাংলার ভাগে পড়েছিল সে সময়কার সাত লক্ষ টাকা। বাংলার প্রতি জমিদার পরিবারের মেয়েরা তাদের সকল গহণা কংগ্রেসের তহবিলে দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও সাত লক্ষের কোটা পূর্ণ হয়নি। শেষে কলকাতাতে একজন মহিলা এক লক্ষ টাকা দিয়ে সাতলক্ষের কোটা পূর্ণ করেছিলেন।

বাস্তব এই পটভূমিতে বিড়লাকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছিল এবং গান্ধীজী নিজেই দল পরিচালনার জন্য এই অর্থ বরাদ্দ দিতেন। এ সময়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিরা গান্ধীজীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করতেন। সেসময় সীমান্ত গান্ধী, আব্দুল গাফ্ফার খান, লালা রাজপথ রায়, গোবিন্দ বল্লব পান্থ, বাবু জগজীবন রাম, অতুল্য ঘোষ, রাজা গোপালচারি, মোরারজী দেশাই, শরজেনু নাইডু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন প্রদেশ পর্যায়ের বড় নেতা ও গান্ধীজীর আদর্শের অনুসারী। আচার্য কৃপালনী ও জয়প্রকাশ নারায়ণও ছিল গান্ধীজীর অনুসারী। কিন্তু এরা যুক্ত হয়েছিলেন, কৃষক ও শ্রমিক রাজনীতির সঙ্গে। আচার্য কৃপালনী নীলকর বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। আর জয়প্রকাশ নারায়ণ ভারতীয় রেলশ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। গান্ধীজী দলীয় রাজনীতির সঙ্গে খুববেশি দিন যুক্ত ছিলেন না।

১৯৩৪ সালের পর তিনি মূলত দলের চারআনা চাঁদাদানকারী প্রাথমিক সদস্যও ছিলেন না। কিন্তু কংগ্রেস পরিচালিত হতো তার ইচ্ছা অনুসারে। ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ নিয়ে কাউন্সিলরদের মধ্যে ভোটাভুটি হয়েছিলো। দু'জন প্রার্থী ছিলেন সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বি। এদের একজন নেতাজী সুভাস বসু আর অন্যজন শ্রী সিতারামিয়া। কাউন্সিলরদের ভোটে নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু জয় লাভ করেন। পরাজিত হন শ্রী সীতারামিয়া। নির্বাচনের পর গান্ধীজী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে বললেন, সীতারামিয়ার পরাজয়ের অর্থ আমার পরাজয়।

নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর মাথার উপর কোন ছায়া ছিলো না। কারণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ১৯২৫ সালে অকালমৃত্যু হয়। কাউন্সিলের ভোটে জয়লাভ করেও নেতাজী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে ব্যর্থ হন। কারণ প্রদেশের সভাপতিরা নেতাজীর ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। যুক্তপ্রদেশের গোবিন্দ বল্লব পান্থ, বিহারের জগজীবন রাম, এমনকি বাংলা প্রদেশের অতুল্য ঘোষও নেতাজীর ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগদানে বিরত রইলেন।

www.pathagar.com

সম্ভবত ১৯১৭ সালে অসৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে গান্ধীজীর যে মতপার্থক্য হয়েছিল বহুদিন পরও তিনি তার ক্ষত ভুলতে পারেননি। দ্বিতীয়ত গান্ধীজীর রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিলো- রাজানুগত্য। কিন্তু নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর বিশ্বাস ছিল ব্রিটিশই ভারতের জাতীয় শত্রু। ১৯১৭ সালে পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর সমর্থন ছিল গান্ধীজীর পক্ষে। ১৯৩৮-৩৯ সালেও পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সমর্থন ছিল গান্ধীজীর পক্ষে। পাশাপাশি নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর বিপক্ষে তার অবস্থান ছিল অনড়।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব গৃহিত হয়। যার ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন হতে থাকে দ্রুততার সঙ্গে। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ, জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, আকালী দল ও তফসিলি জাতি ফেডারেশনসহ ২২টি রাজনৈতিক দল ব্রিটিশ সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দল হিসেবে বিবেচিত হয়। গান্ধীজীর মূল বক্তব্য ছিল অখন্ড ভারতের স্বাধীনতা। আর জিন্নাহর মূল বক্তব্য হলো মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। তাদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই মুসলিম লীগের লক্ষ্য।

১৯৪০ সালের পরই ভারতব্যাপী হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। মূলত বিহার ও পাঞ্জাবের লাহোরে দাঙ্গার ভয়াবহতা তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতাতেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই দাঙ্গা বন্ধের জন্য গান্ধীজী প্রথমেই এসেছিলেন নোয়াখালীতে। তিনি শান্তি স্থাপন ও ঐক্যবদ্ধ ভারত বজায় রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এমনকি তিনি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে আজীবন ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। কিন্তু নেহেরু, প্যাটেলরা গান্ধীজীর এই প্রস্তাব সমর্থন করেননি।

শেষপর্যন্ত ১৯৪৭-এর ১৪ ও ১৫ আগস্ট ভারত দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। গান্ধীজীও কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মত ব্যক্তিরা হিন্দুস্থানের প্রথম বড়লাট বা গভর্ণর জেনারেল হতে পারতেন। কিন্তু গান্ধীজী সেই পথ পরিহার করে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকেই স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর হওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি স্বাধীন ভারতের দাঙ্গাপীড়িত ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে অঙ্গিকার অনুসারে অর্থ ও সম্পদের ভাগ দেয়ার দাবি করেন। এতে উগ্রহিন্দুরা ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। এসময় তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মি ও ভাবশিষ্য বল্লববাই পেটেলও গান্ধীজীর সঙ্গে দূর্ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ

www.pathagar.com

করেননি। সে সময়েই নাথুরাম নামে একজন হিন্দু উগ্রবাদী গান্ধীজীকে গুলি করে হত্যা করে।

এই হত্যাকান্ডের পর ভারতব্যাপী প্রপ্রাগান্ডা চালানো হয়েছিল যে মুসলমানরাই গান্ধীজীকে হত্যা করেছে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় একজন উগ্রহিন্দু একটি সুদূর প্রসারী চক্রান্তের অংশ হিসেবে গান্ধীজীকে হত্যা করেছিলো। অনেকে মনে করেন এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে প্রশাসনের অনেক উপরতলার কর্মকর্তারাও জড়িত থাকতে পারে। সে সময় বল্লবভাই প্যাটেল ছিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সম্ভবত গান্ধীজীর নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

তবে মত ও পথের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলতে হবে করমচাঁদ গান্ধী ইতিহাসের এক মহান নেতা। দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন মেন্ডেলা, আমেরিকার কিং মার্টিন লুথার ও বাংলাদেশের মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের উত্তসূরী। #

www.pathagar.com

পাকিস্তানের জাতির জনক
কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্

১৮৫৭ সালে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের (সিপাহী বিপ্লব) ফলশ্রুতিতে জোড়াতালির ভিত্তিতে ভারতে ইংরেজদের পরোক্ষ শাসনব্যবস্থার অবসান হয়। এর ফলে ভারতীয় ঔপনিবেশের ওপর ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্-এর নেতৃত্বেই ব্রিটিশবিরোধী সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল সে কারণে ব্রিটিশের মূল আক্রোশ ও আক্রমণ পরিচালিত হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে। মুসলমান অভিজাত সমাজকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শত্রু মনে করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সমাজে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ঔপনিবেশিক আধিপত্য নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। যার ফলে একশ্রেণীর ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী ভারতের জনগণের মধ্যে নিজেদের পক্ষের শক্তি গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করে। সে কারণেই ভারতের হিন্দু অভিজাতশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রিটিশ রাজকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যেই ১৮৮৫ সালে একজন ব্রিটিশ নাগরিককে সভাপতি করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। যার মূল নেতৃত্বের নেপথ্যে ছিল ভারতীয় (রাজা-সামন্ত-জমিদারসহ হিন্দু নেতৃত্ব) হিন্দু অভিজাতশ্রেণী ।

www.pathagar.com

১৯০৫ সালে বঙ্গ প্রেসিডেন্সি ভাগ করে বঙ্গ-আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়। ঢাকাকে বঙ্গ-আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয়। যার ফলে পূর্ববাংলার নিপীড়িত দরিদ্র মুসলমানরা রাষ্ট্রীয়ভাবে লাভবান হয়। আর কলকাতা ভিত্তিক হিন্দু সামন্ত জমিদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে কলকাতাভিত্তিক হিন্দু সামন্ত জমিদার ও অভিজাতশ্রেণী বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার আন্দোলন শুরু করে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাশিমবাজারের মহারাজা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। মুসলমান সমাজের কোনো রাজনৈতিক সংগঠন না থাকার কারণে তারা অসহায়ত্ববোধ করতে থাকে। এর প্রতিকারের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, প্রিন্স আগাখান ও শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'।

অখন্ড ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এই পরিসরে উত্থাপন করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। তবে বাংলাদেশে সংঘটিত ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বর্তমান পটভূমি সঠিকভাবে অনুধাবণ করতে হলে ১৯৪৭ পূর্ব অখন্ড ভারতের নেতৃত্বদানকারী দু'জন প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব- করমচাঁদ গান্ধী ও কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্'র রাজনৈতিক দর্শন ও বিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য।

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ করাচি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম জিন্নাভাই পুঞ্জ। তিনি ছিলেন গুজরাটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ১৮৮২ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মাদ্রাসায় শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৮৯১ সালে তিনি করাচির খ্রিস্টান মিশনারী সোসাইটি হাই স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯২ সালের ৩০ জুন তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনে চলে যান। তাঁর পিতা ছিলেন করাচির স্বনামধন্য একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ি এবং লন্ডনেও তাঁর ব্যবসা ও ব্যবসায়িক সহযোগি পার্টনার ছিল। ছাত্রাবস্থাতে লন্ডনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, দাদাভাই নওরোজীর সঙ্গে পরিচিত হন। জিন্নাহ্ অল্পদিনেই লন্ডনে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। দাদাভাই নওরোজী তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য। দাদাভাই নওরোজী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্'র

www.pathagar.com

তীক্ষ্মমেধা ও উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে রাজনীতি শুরু করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। দাদাভাই নওরোজীর হাতেই জিন্নাহ্‌র রাজনীতিতে হাতেখড়ি।

১৮৯৫ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ব্যারিস্টারী পাস করেন এবং ১৮৯৬ সালে আইন ব্যবসা শুরু করেন বোম্বেতে। আইন ব্যবসা করার সময়ই তিনি ভারতের অন্যতম প্রথম সারির কংগ্রেস নেতা গোখলের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসেছিলেন। দাদাভাই নওরোজী ও গোখলেই ছিলেন তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মূল নেতা। তারা উভয়েই লিবারেল পার্লামেন্টারীর রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তার ফলেই তরুণ ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নীতিগতভাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন।

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ঠিক একই বছর ২৬ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কংগ্রেস সভাপতি দাদাভাই নওরোজীর একান্তসচিব হিসেবে রাজনীতি শুরু করেন। তিনি মুসলিম লীগের প্রাথমিক সদস্য হন ১৯১৩ সালের ১০ অক্টোবর। সে সময় একই ব্যক্তি দুটি রাজনৈতিক দলের সদস্য এমনকি কর্মকর্তাও থাকতে পারতেন। যেমন শ্রী মদন মোহন মালব্য হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের নেতা ছিলেন।

১৯০৯ সালে মনি-মিন্টু ভারত শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয়। যার বিধানমতে সুপ্রিম কাউন্সিলের আরও ৬০ জন সদস্য থাকবেন। যার ২৭ জন হবেন নির্বাচিত, রাজকর্মচারীদের মধ্যে থেকে হবে ২৮জন ও ৫জন হবেন বড়লাট কর্তৃক মনোনীত। ভারত শাসন সংস্কার আইন অনুসারেই ১৯১০ সালের ২৫ জানুয়ারি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বোম্বে থেকে মুসলমান সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বড়লাটের কাউন্সিলর সদস্য হিসেবে আসন গ্রহণ করেন। এভাবেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতা থাকা অবস্থাতেই তিনি মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে সমগ্র ভারতের জনগণের কাছে একজন শ্রদ্ধেয় পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯২০ সালে নাগপুরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পরই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের রাজনীতিতে অধিক সক্রিয় হয়ে উঠেন।

১৯২৮ সালে মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে তিনি ১৪ দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন এবং মুসলিম লীগ এই ১৪ দফা কর্মসূচিকে দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ১৪ দফা রাজনৈতিক কর্মসূচি

০১. মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারসমূহ রক্ষা করা। একান্তভাবে ধর্মীয় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জমায়েত-উল-উলেমা-ই-হিন্দ এবং মুজাহিদদের অভিমতের উপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হবে।

০২. যাবতীয় দমনমূলক আইন প্রত্যাহারের জন্য সবধরণের চেষ্টা করা হবে

০৩. যেসব বিধি-বিধান ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতিকূল, জনসাধারণের মৌলিক স্বাধীনতার পরিপন্থি এবং যার পরিণামে দেশের আর্থিক শোষণ হতে পারে তার বিরোধিতা করা হবে

০৪. প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের উচ্চব্যয় হ্রাস করে জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা

০৫. ভারতীয় সেনাবাহিনীর জাতীয়করণ করা ও সামরিক ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করা

০৬. কুটিরশিল্পসহ যাবতীয় শিল্পের পৃষ্টপোষকতা

০৭. দেশের আর্থিক বিকাশের স্বার্থে মুদ্রাব্যবস্থার বিনিময়ের হার ও মূল্যনির্ধারণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ

০৮. গ্রামীণ জনসাধারণের সামাজিক শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন

০৯. কৃষকের ঋণের বোঝা হ্রাস করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ

১০. প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা

১১. উর্দুভাষা ও বর্ণলিপি সংরক্ষণ এবং প্রসারে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ

১২. মুসলমানদের সাধারণ জীবনব্যবস্থার উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবন

১৩. বর্তমান অধিক হারের কর-ভার হ্রাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ

১৪. দেশের সর্বত্র সুস্থ জনমত এবং রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলা

এই হলো মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক ১৪ দফা কর্মসূচি।

১৯২৯-৩৫ সাল পর্যন্ত এই কর্মসূচি নিয়ে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সারা ভারতবর্ষ সফর করেন এবং মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালের নির্বাচনে মুসলিম আসনগুলিতেও মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এমনকি সিন্ধু প্রদেশেও মুসলিম লীগ কোনো আসন পায়নি। এর

www.pathagar.com

মূলত দু'টি কারণ ছিল। প্রথমত: মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানগণ মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত না হওয়া। দ্বিতীয়ত: মুসলিম লীগের কোনো কেন্দ্রীয় তহবিল না থাকা।

১৯২৯ সালে জিন্নাহ্'র স্ত্রী মারা গেলে তিনি একাকী হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ্ ও তাঁর মেয়ে সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর সঙ্গে থাকতেন।

১৯৩৫ সালের পর কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কিছুদিনের জন্য লন্ডনে চলে যান এবং তিনি লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাসের চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। কিন্তু ভারতীয় মুসলিম নেতারা তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে এনে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ জানান।

ইতিমধ্যে ইউরোপে নতুন করে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে থাকে। জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে ও ইটালিতে মুসলিনীর নেতৃত্বে নাৎসিরা ক্ষমতা দখল করে নেয়। ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীরা তখন বুঝতে পারেন অল্পসময়ের মধ্যেই আরেকটি মহাযুদ্ধ অত্যাসন্ন এবং যুদ্ধ জয় করতে হলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান-শিখসহ সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসু ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ বিদ্বেষী সে কারণেই মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কৌশলে ব্রিটিশের পক্ষে রাখার জন্য মুসলিম লীগকে সংগঠিত করতে তারা অধিকতর আগ্রহবোধ করতে থাকে। ব্রিটিশ রাজশক্তি এটাও ভাবতে থাকে যে সমগ্র ভারতের মুসলমানদের সবচেয়ে আস্থাভাজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেন কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। তাঁকে কেন্দ্র করেই উপমহাদেশের মুসলমানাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

১৯৩৬ সালে প্রিন্স করিম আগাখান, নবাব লিয়াকত আলী খান, ইস্পাহানি যুক্তপ্রদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি নবাব খালেকুজ্জামান ও হায়দরাবাদের নবাবের একজন প্রতিনিধি এক সঙ্গে লন্ডনে যান। তারা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্কে ভারতে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেন। জিন্নাহ্ তাঁদের অনুরোধে শেষপর্যন্ত দেশে ফিরে আসেন এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। তখন জিন্নাহ্কে মুসলিম লীগের সভাপতি, নবাব লিয়াকত আলী খানকে সেক্রেটারী জেনারেল ও ইস্পাহানীকে কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ নতুন উদ্যোগে ও নতুন আঙ্গিকে মুসলিম লীগকে সুসংগঠিত করেন।

www.pathagar.com

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ব্রিটিশ সরকার সহযোগিতা চান। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতার প্রস্তাবে সাড়া দেয়। যার মধ্যে মূল শর্ত ছিলো ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা। ব্রিটিশ সরকার এ মূলদাবি নীতিগতভাবে মেনে নেয়। তবে কখন এবং কীভাবে এই দাবি বাস্তবায়িত করা হবে তা নিয়ে ছিল বিস্তর বিভ্রান্তি ও মতান্তর।

১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৪৩ জনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মধ্যে মাত্র ৬ জন মুসলমান সদস্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে গাফ্ফার খানসহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ৩ জন, অন্য ৩ জন হলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ব্যারিস্টার আশ্রাফ আলী ও বাংলা প্রদেশ থেকে হুমায়ুন কবির। এ থেকে প্রমাণিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মূলত হিন্দুস্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একটি রাজনৈতিক সংগঠন। যদিও গান্ধী-নেহেরু ধর্মনিরপেক্ষতার ভান করতেন। তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার মানে হচ্ছে হিন্দুস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েই ধর্মনিরপেক্ষতার খোলস ধারণ।

১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরেবাংলা একে ফজলুল হক। তাঁতে কোথাও পাকিস্তান প্রস্তাবের উল্লেখ ছিলনা। উল্লেখ ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হবে। লাহোর প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা প্রস্তাবকে ক, খ, গ, এই তিন অঞ্চলে বিভক্ত করে সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভারও সিদ্ধান্ত ছিল অনুরূপ। যে প্রদেশে পার্লামেন্টে ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা সেই প্রদেশকে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত ফেডারেশনে যোগদান কিংবা স্বতন্ত্রভাবে শাসন করার এখতিয়ার লাভ করবে। এতে দেখা যাচ্ছে লাহোর প্রস্তাবে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্পূরকভাবে গৃহিত হয়েছিল।

লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত অঞ্চলগুলো হচ্ছে

(ক) অঞ্চল : সিন্ধু প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও কাশ্মীর উপত্যকার সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চলসমূহ (খ) অঞ্চল : বাংলা

www.pathagar.com

ও আসাম প্রদেশ এবং (গ) অঞ্চল : যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, তামিলনারুসহ অন্যান্য অঞ্চলসমূহ।

কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে এবং হিন্দুপ্রধান অঞ্চল নিয়ে হিন্দুস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তীব্র করে তোলে। তারা সহিংসভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান শিখা ছড়িয়ে দেয়। বিহারে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে এক নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উদ্ভুত এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের দিল্লি অধিবেশনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুসলিম স্টেটস্ এর পরিবর্তে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশগুলোকে নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি গৃহিত হয়। তবে এই নীতির বাস্তবায়ন হলে সম্পূর্ণ পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এর তুমুল বিরোধিতা করে।

উল্লেখ্য যে, গান্ধীজী কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্কে ইউনাইটেড ভারতবর্ষে এককভাবে আজীবন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সেই প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ৪৯২টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছিল ৪২৫টি আসন। এ থেকেই কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্'র সারা ভারতে বিশাল জনপ্রিয়তার বিষয়টি অনুধাবণ করা যায়।

বঙ্গপ্রদেশের ১১৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছিল- ১১৭টি। পাঞ্জাবে ৮৬টি আসনের মধ্যে- ৭৩টি, সিন্ধু প্রদেশে ৩৪ আসনের মধ্যে- ২৭টি, যুক্তপ্রদেশের ৬৬টি আসনের মধ্যে- ৫৪টি আসন। বিহার প্রদেশে ৪০টি আসনের মধ্যে- ৩৪টি, উড়িষ্যায় ৪টি আসনের সবক'টি, মাদ্রাজে ২৯টির মধ্যে সবক'টি, বোম্বাইয়ে ৩০টির মধ্যে সবক'টি, আসামে ৩৪টির মধ্যে ৩১টি, শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ৩৮টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পেয়েছিল ১৭টি, ২১টি পায় ওলামায়ে হিন্দ ও সীমান্ত গান্ধীর সমর্থকরা।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ও শরৎ বসু - যুক্তবাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছিলেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভার শ্রী শ্যামা প্রসাদ ও কংগ্রেসের গান্ধী, নেহেরু ও পেটেলরা এই যুক্তবাংলার তীব্র বিরোধিতা করেন।

www.pathagar.com

যার ফলে বাংলাকে বিভক্ত করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সরকার। যুক্তবাংলার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বাংলা বিভাগের পক্ষেই জনমত সংগঠিত করেন। এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলা বিভাগকে সমর্থন করেন। যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে বঙ্গ-আসাম প্রদেশ গঠিত হলে বলেছিলেন, বঙ্গমায়ের অঙ্গ ছেদন তার সন্তানেরা মানবে না। এভাবেই পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭ সালের ৭ আগস্ট কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রস্তাবিত পাকিস্তানের বড়লাট হয়ে দিল্লি থেকে করাচিতে উপস্থিত হন। ১৪ আগস্ট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন করাচিতে জিন্নাহ'র হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও নতুনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিষেক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। রেডক্লিফ ও কৃষ্ণ মেনন কলমের আঁচড়ে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা ভাগ করেন। ভারতের মধ্যে ৮৪টি জায়গায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা লিয়াকত আলী খান উত্থাপন করলে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন - According to your statement pocket is biger than the shirt- কাজেই এই প্রস্তাব কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

এভাবেই হিন্দু-মুসলিম বিভাজনের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রীয় কাঠামো। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিহার ও যুক্তবাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়। পূর্ববাংলার হিন্দু জমিদারসহ অভিজাত শ্রেণী আর পশ্চিমবাংলার অভিজাত মুসলমান ও বিহারের মুসলমানরা কূটিল এই ব্যবস্থার ফলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন। #

www.pathagar.com

পাকিস্তানের জটিল রাজনীতি

১৯৫২ সালের ৩ এপ্রিল আমার জন্ম। সে কারণে ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে আমার অতীতের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়। ১৯৪২ সালে আমার পিতা শেখ শাহাদাৎ হোসেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমার পিতা শেখ শাহাদাৎ হোসেন একই ইউনিয়নের বাসিন্দা ও একই কলেজের ছাত্র ছিলেন। সে সুবাদে ইসলামিয়া কলেজের বেকার হোস্টেলের ২২নং কক্ষে তারা দু'জন একাধারে ৪ বছর একসঙ্গে থেকেছেন।

আমার পিতার কাছেই উপমহাদেশের বিভক্তি ও ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতির কথা আমি শুনেছি। আমার পিতা শেখ শাহাদাৎ হোসেন মুসলিম লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম। আমার বড় ভাই শেখ দেলোয়ার হোসেন এবং ছোট মামা কাজী আক্তারুজ্জামান পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সক্রিয় কর্মি ছিলেন। তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল- "এ আজাদী ঝুটা হ্যায় লাখো ইনসান ভূখা হ্যায়, ফের আদাজী লড়কে লেঙ্গে।"

স্বাভাবিক কারণেই আমি দ্বৈত চরিত্রের মানুষ। আমার জীবনে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদের সুকোমল ধ্যান-ধারণা পুরোপুরি বিশ্বাসে রূপ লাভ করেছে।

www.pathagar.com

তারই পাশাপাশি পাকিস্তানের জটিল রাজনীতি সম্পর্কে মূলত আমার বাবা শেখ শাহাদাৎ হোসেন সাহেবের কাছ থেকে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য জানার সুযোগ হয়। ১৯৪৫ সালে ভারতব্যাপী যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে একমাত্র বাংলা প্রদেশেই হয়েছিল মুসলিম লীগের জয়-জয়াকার এবং যুক্তবাংলায় এর মূল সংগঠক ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৭টি আসনে জয় লাভ করে মুসলিম লীগ। খাজা নাজিমউদ্দিন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন পটুয়াখালী অঞ্চল থেকে। তার বিপরীতে কৃষক শ্রমিক পার্টির প্রার্থী হন শেরেবাংলা একে ফজলুল হক। সে সময়ে মুসলিম লীগের জয়-জয়াকার। আর পটুয়াখালীর এই অঞ্চলটুকু ছিল নবাব খাজা নাজিমউদ্দিনদের জমিদারির অংশ। নির্বাচনে ফজলুল হক সাহেবের বেহাল দশা। এই অবস্থায় একদিন হক সাহেব প্রচার কাজে নেমে দেখলেন আজিজ হাওলাদার নামক তার একজন একনিষ্ঠ সমর্থক বেশ কিছু দিন আগেই মারা গেছে। তিনি একটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর ছেলেমেয়েসহ গোটা পরিবার মুসলিম লীগ ও নাজিমউদ্দিন সাহেবের পক্ষে জোরেশোরে নির্বাচন করছে। শেরেবাংলা একে ফজলুল হক আজিজ হাওলাদারের কবরের পাশে দাঁড়ালেন এবং কবর জিয়ারত শুরু করলেন।

ইতিমধ্যেই গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল হক সাহেব এসেছেন। ছাত্র, শিক্ষক গ্রামবাসী সকলেই ছুটে আসতে থাকলেন। তারা দেখতে পেলেন হক সাহেব হাওলাদার সাহেবের কবর জিয়ারত করছেন। তাঁর দুই চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরছে। আর তিনি বলছেন, আজ যদি আজিজ হাওলাদার বেঁচে থাকতেন তা হলে আমার এই অবস্থা হতো না। ধীরে ধীরে কবরের আশপাশ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। হাওলাদার সাহেবের পরিবারের লোকজন ছুটে আসলো। তাঁরা হক সাহেবকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু হক সাহেব কিছুতেই বাড়িতে যেতে চাইলেন না। তিনি বললেন, আমার আজিজ নাই আর তার বাড়িতে গিয়ে কি লাভ?

গ্রামের সকল মানুষ দৌড়াদৌড়ি শুরু করছে। ছাত্ররা শ্লোগান তুলল হক সাহেব - জিন্দাবাদ। আজিজ হাওলাদার সাহেবের ছেলেরা গরু জবাই করে হক সাহেবসহ দলীয় নেতা-কর্মিদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ধীরে ধীরে নির্বাচনী হাওয়া পাল্টে যেতে লাগল। খাজা নাজিমউদ্দিন সাহেব নির্বাচনে পরাজিত হলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব দু'টি আসনেই জয় লাভ করেছিলেন। তিনি একটিতে থাকলেন। নিজের আসনটি ছেড়ে দিয়ে উপনির্বাচনে পদপ্রার্থী করলেন খাজা নাজিমউদ্দিন সাহেবকে। উপনির্বাচনে নাজিমউদ্দিন

www.pathagar.com

জয়লাভ করে বেঙ্গল এসেম্বলির সদস্য হয়েছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর করুণার ফলেই।

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র পরই প্রথম সারির যোগ্য নেতা ছিলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। লিয়াকত আলী খান, নবাব খালেকুজ্জামান, আই আই চুন্দ্রিগড়সহ আরও অনেকেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এই যোগ্যতাকে ঈর্ষার চোখে দেখতেন (যেমন- যোগ্যতাই হচ্ছে অযোগ্যতার মাপকাঠি)। ঠিক তেমনি তাঁরা বেঙ্গল এসেম্বলিতে, পার্লামেন্টারী পার্টিতে সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে খাজা নাজিমউদ্দিন সাহেবকে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বোস, যুক্তবাংলার স্বাধীনতার রূপরেখা প্রণয়ন করলেন। আর খাজা নাজিমউদ্দিন সাহেবরা ঢাকায় এলেন যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকু নিয়েই খুশি এই মানসিকতা নিয়ে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে হিন্দু-মুসলিম ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেব থেকে গেলেন ভারতের পাঁচ কোটি মুসলমানের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। তিনি অহিংস নেতা ভারতের স্থপতি করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে শান্তি আন্দোলনে শামিল হলেন।

এদিকে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় ও পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করেছে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব কিছুদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তখন মারা গেছেন। খাজা নাজিমউদ্দিন তখন পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল এবং লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী। পূর্বপাকিস্তানের বিরোধী দল হাঁটি হাঁটি পা পা করে যাত্রা শুরু করছে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তার ভক্ত ও অনুগতরা তাঁর পাশে জমা হলেন। তারা সোহরাওয়ার্দীর কাছে বিরোধী দলকে সংগঠিত করার জন্য সহযোগিতা চাইলেন। সোহরাওয়ার্দী তখন দু'জন ব্যক্তির সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন। তাঁদের একজন হলেন চট্টগ্রামের এক বড় ব্যবসায়ি ও অন্যজন টাঙ্গাইলের দানবীর মহান সমাজসেবী আরপি সাহা। চট্টগ্রামের ভদ্রলোকের নামও আমরা সকলেই জানি কিন্তু ইচ্ছা করেই তাঁর নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত রইলাম।

এ সময়ে ফজলুল কাদের চৌধুরী চট্টগ্রাম পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তাঁর একটি ব্যক্তিগত মামলা পরিচালনা করার জন্য হোসেন শহীদ

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন এবং উক্ত বড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিকেলে চায়ের দাওয়াত ছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী তখন আরপি সাহা ও চট্টগ্রামের সেই বড় ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছ থেকে অনেক আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।

এরই মধ্যে লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করলেন, ভারত তার পোষা কুকুর ছেড়ে দিয়েছে। তিনি তাঁদের "ছের কুচিয়ে দেয়ার হুশিয়ারী দিলেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে পাকিস্তানে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলেন।" হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন উক্ত ব্যবসায়ির বাড়ির গেইটে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে রিসিপ করার জন্য কাউকে পাওয়া গেল না। দারোয়ান এসে সংবাদ দিল- সাহেব বাসায় নেই। তেজোদীপ্ত তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর নেতার এই অপমান সহ্য করতে পারলেন না। তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন বললেন - "মুজিব তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, এখন আমি আর যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী নই" একজন সাধারণ রিফুজি মাত্র। তারা ফিরে আসলেন ঢাকায় এবং ভারতে ফিরে যাওয়ার জন্য সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রস্তুতি নিলেন।

কি নির্মম ইতিহাস! পাকিস্তানের প্রকৃত এই প্রতিষ্ঠাতা যিনি নিজের আসন ছেড়ে দিয়ে খাজা নাজিমউদ্দিনকে বেঙ্গল এসেম্বলির সদস্য করেছিলেন আর সেই নাজিমউদ্দিনের শাসন আমলেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হল।

আরপি সাহাকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব নতুন রাজনৈতিক দলকে আর্থিকভাবে কিছু সহযোগিতা করার জন্য পত্র দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই পত্র নিয়ে টাঙ্গাইলে আরপি সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আরপি সাহা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন এবং দল পরিচালনার জন্য তৎকালীন সময়ে দশ হাজার টাকা দিয়ে সহযোগিতা করলেন। এই হলো আরপি সাহার বদান্যতার ইতিহাস। ১৯৭১ সালে দেশপ্রেমিক এই দানবীর মহান আরপি সাহাকে পাক হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব কলকাতায় ফিরে গেলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমারে গোয়ালন্দ ও সেখান থেকে ট্রেনে করে কলকাতা গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, এডভোকেট আব্দুল হামিদ চৌধুরীসহ আমার বাবাও সেই স্টিমারে ছিলেন।

www.pathagar.com

স্টিমার ছেড়ে দিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুর মতো কেঁদেছিলেন। তাঁর কান্নায় সমস্ত স্টিমারে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। গোয়ালন্দ স্টেশনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে রেলে উঠিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর কান্না থেমেছিল। তিনি চোখ মুছে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "লিয়াকত আলী খান Must not go unchalanged"- এই উচ্ছিষ্ট রাজনীতিবিদদের কারণেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে ষড়যন্ত্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মূখ্য হাতিয়ারে পরিণত হয়। আর সেই ষড়যন্ত্রের পথ ধরেই ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন চেপে বসে। আর সেই সুবাদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন আইয়ুব খান।

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের সময় প্রথম আমি ছাত্র রাজনীতির ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করি। সঠিক দিনক্ষণ মনে নেই। ১৯৬৪ সালের শেষ দিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়। কনভেনশন মুসলিম লীগ মনোনীতি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হলেন আইয়ুব খান। সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বোন মিসেস ফাতেমা জিন্নাহ। পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের তখন সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। পূর্বপাকিস্তানের গর্ভনর আব্দুল মোনায়েম খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, আব্দুস সবুর খান ও অহিদুজ্জামানসহ আরও অনেক ব্যক্তিত্বই তখন মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন।

নির্বাচনকে সামনে রেখে সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন বিডি মেম্বারদের ভোটে আইয়ুব খানই জয়লাভ করবে। কনভেনশন মুসলিম লীগের মধ্যে লড়াই শুরু হলো আধিপত্যের। জুলফিকার আলী ভুট্টো লাড়কানার নবাব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তপ্রভুদের নেতা। তিনি আইয়ুব খানকে আশ্বস্ত করলেন পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচনী খরচ তিনি প্রদান করবেন। আর পূর্বপাকিস্তানের সকল নির্বাচনী ব্যয়ভার গ্রহণ করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী জনাব অহিদুজ্জামান। এই ঘোষণায় ক্ষুব্ধ হলেন পূর্বপাকিস্তানের গর্ভনর আবদুল মোনায়েম খান। তিনি মনে করলেন জনাব অহিদুজ্জামান তার নেতৃত্ব ও প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

জনাব অহিদুজ্জামান বৃহত্তম ফরিদপুরের নেতা। প্রথমেই মোনায়েম খান হাত দিলেন ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ অঞ্চলে। তিনি প্রথমেই আমার পিতাকে ডাকলেন গভর্ণর হাউসে। সৌভাগ্যক্রমে আমার বাবার সঙ্গে সেদিন আমিও গর্ভনর হাউসে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি আমার বাবাকে নাম ধরে ডাকতেন। বললেন -

www.pathagar.com

শাহাদাৎ তুমি গোপালগঞ্জ জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি। তোমার জেলার অবস্থা কি? সাংগঠনিক কাজকর্ম কিভাবে চলছে? বাবা বললেন - ভাইজান অহিদুজ্জামান পূর্বপাকিস্তান ইজারা নিয়েছে আর গোপালগঞ্জের ইজারা দেয়া হয়েছে তার ছোটভাই ফাইকুজ্জামানকে। গর্ভনর বাহাদুর গোপালগঞ্জে দল চলছে কিভাবে তার খোঁজ-খবর নিলেন। বাবা বললেন - কষ্ট করে নিজেরাই চালাচ্ছি। গভর্ণর বাহাদুর বললেন - আমার কাছে তো পার্টির কোনো ফান্ড নেই। কিন্তু তুমি আমার নিজের লোক, যা কিছু আমি যোগাড় করতে পেরেছি তা থেকে তোমাকে কিছু দিতে চাই। বাবা চুপ করে রইলেন। গভর্ণর ২৫ হাজার টাকা এবং একটি সাদা কাগজ এনে আমার বাবার সামনে ধরলেন। বাবা সাদা কাগজ দেখে গভর্ণর বাহাদুরের মুখের দিকে তাকালে তিনি বললেন - লিখে দাও। গোপালগঞ্জ জেলার নির্বাচনী খরচের জন্য আমার কাছ থেকে তুমি ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করেছ।

আমার বাবা গভর্ণর বাহাদুরের কথামত ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি লিখে দিলেন। গভর্ণর বাহাদুর বললেন, নূরুদ্দিন মাস্টার, শেখ মুজিবুর রহমান (লালমিয়া), ভবানী শঙ্কর বিশ্বাস, এডভোকেট শরাফত হোসেন চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে এ টাকা দিয়ে সাংগঠনিক কাজ করতে থাক। নির্বাচনের আগে আবার আমার সঙ্গে দেখা করবে। এই গরিবের সাধ্যে যা কুলায় পাকিস্তানের স্বার্থে, আইয়ুব খানের স্বার্থে আমি তা করব। তিনি আরো বললেন - ফরিদপুর হয়ে গোপালগঞ্জে যাও। আব্দুর রহমান বাকাউলকে দু'একদিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে যেও।

আমরা গভর্ণর ভবন থেকে বিদায় নিয়ে এডভোকেট শরাফত হোসেন চৌধুরীর বাড়ি (সূত্রাপুরের) দিকে রওয়ানা দিলাম। এই প্রথম ৫৬নং প্যারিদাস রোডে শর্ষিনার পীর সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তার নিকটাত্মীয় জনাব দাউদ হোসেন চৌধুরী এবং এডভোকেট শরাফত হোসেন চৌধুরী পীর সাহেবের বাসাতেই ছিলেন। শুরু হলো কনভেনশন মুসলিম লীগের মধ্যে নেতৃত্বের লড়াই।

আমার বয়স তখন ১২ কিংবা ১৩ বছর। তাই দিনক্ষণ সঠিকভাবে আমি উল্লেখ করতে পারছি না। নির্বাচনে আইয়ুব খান বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন। কিন্তু গোপালগঞ্জে আইয়ুব খান বিডি মেম্বারদের ৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হলেন। মোনায়েম খান উপস্থিত হলেন সেই ২৫ হাজার টাকার স্লিপসহ অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে। নির্বাচনের দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ তুললেন খান-এ সবুর ও অহিদুজ্জামানের বিরুদ্ধে। নতুন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়লেন জনাব অহিদুজ্জামান। শুরু হলো পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কলহ। বেজে উঠল ষড়যন্ত্রের শানাই।

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো মূলত পশ্চিম ফ্রন্টে। যুদ্ধের ৩ দিনের মাথায় চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ঘোষণা করলেন, পূর্বপাকিস্তান আক্রান্ত হলে চীনের কৌশলগত নিরাপত্তা হুমকির মুখে পতিত হবে। সেক্ষেত্রে চীন নিরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে না। পশ্চিমফ্রন্টের যুদ্ধে লাহোর দখল করে সকালে নাস্তা খাওয়ার ভারতীয় সমরমন্ত্রীর প্রত্যাশা ব্যর্থ করে দিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। কচ্ছেরান এলাকায় এক বিশাল ভূখন্ড হাতছাড়া হয়ে গেল ভারতের। ১৭দিন যুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হলো পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। তাসখন্দে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের মধ্যস্ততায় আইয়ুব খান ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতিতে তখন শুরু হলো নতুন মেরুকরণ। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল জুলফিকার আলী ভুট্টো হয়ে উঠলেন একজন বিপ্লবী। তিনি তাসখন্দ শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে। আর ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। যার অন্যতম একটি দফা ছিল ভারতের পাশে পূর্বপাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতার কথা।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে চীন ইন্দোনেশিয়াসহ অনেক দেশই কূটনৈতিক সমর্থন দিয়েছিল পাকিস্তানকে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী নতুন শক্তির উত্থান সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে উঠলেন বিশ্বমোড়ল গোষ্ঠী। সর্বোপরি ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারকে ভারতের পক্ষ নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ক্ষুব্ধ হলো পশ্চিমা শক্তি। সময়মতো আইয়ুব বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটালেন তারা। সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন ১০০ বছর ঘাস খেয়ে থাকতে হলেও পাকিস্তান আণবিক বোমা তৈরি করবে। আর পূর্বপাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা ও বঞ্চনার কথা তুলে ৬ দফা আন্দোলন শুরু করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই আন্দোলন বাঞ্চাল করতে সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। পূর্বপাকিস্তানের জনগণ মনে করল - বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থামিয়ে দিতে সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের উপর রাজনৈতিক জুলুমের পথ বেছে নিয়েছে।

www.pathagar.com

পূর্বপাকিস্তানের রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলশক্তি ছিল ছাত্রসমাজ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৫টি ছাত্র সংগঠনই মূলত দৃশ্যমান ছিল। (১) ছাত্র ফেডারেশন (এনএসএফ) (২) ছাত্রলীগ (আওয়ামী লীগের সমর্থক) (৩) ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়াগ্রুপ) (৪) ছাত্র ইউনিয়ন (মেননগ্রুপ) (৫) ছাত্র সংঘ (রূপান্তরিত নাম ছাত্র শিবির)। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হলো। একপর্যায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের দাবিতে সকল রাজনৈতিক দল একমত হলো। কিন্তু আইয়ুব সরকারকে ক্ষমতায় রেখে কোনো বিরোধী দলই নির্বাচনে যেতে রাজি হলো না।

পরিশেষে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো আবারও সেনাবাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হলেন। জেনারেল হামিদসহ কোর কমান্ডারদের নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন ইসলামাবাদের প্রেসিডেন্ট ভবনে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধানের উদ্দেশ্যে বললেন দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কথা। সেনাপ্রধান বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, বর্তমান প্রশাসনকে রেখে দেশের আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন সম্ভব না।

অভিজ্ঞ জেনারেল আইয়ুব খান সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলেন, তোমার সঙ্গে আমার কোন দ্বিমত নেই। শুধুমাত্র একটি অনুরোধ যা নিয়ে আমি রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই। তোমরা মুসলিম লীগের নেতাকর্মিদের উপরে অন্যায়ভাবে কোনো অত্যাচার করবে না। ইয়াহিয়া খান তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, মুসলিম লীগের নেতা-কর্মিদের উপর কোনো জুলুম করা হবে না।

আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করলেন এবং রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। পাকিস্তানের রাজনীতির দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন সামরিক সরকারের প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও পাকিস্তান পিপল্স পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো।

পশ্চিম পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না এবং পূর্বপাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপল্স পার্টিরও উল্লেখযোগ কোনো সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল না। তবে পাকিস্তানের উভয় অংশেই কোনোরকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম ছিল সেনাবাহিনী ও মুসলিম লীগ।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ আবার একাধিক অংশে বিভক্ত ছিল। ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে কনভেনশন মুসলিম লীগ, খান আবদুল কাইয়ুম খান ও খান-এ সবুর খানের নেতৃত্বে কাইয়ুম মুসলিম লীগ, মমতাজ দৌলাতআনা ও খাজা খায়ের উদ্দিনের নেতৃত্বে কাউন্সিল মুসলিম লীগ এবং জনাব নূরুল আমিন ও মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পিডিপি যা মুসলিম লীগেরই রূপান্তরিত অংশ। এর মধ্যে ফজলুল কাদের চৌধুরীর কনভেশন মুসলিম লীগের প্রতি আইয়ুব খান ও মোনায়েম খানের নৈতিক সমর্থন ছিলো।

এ কথাগুলো বলার মূল উদ্দেশ্য হলো নিজের বাস্তব জীবনের সামান্য অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ অবতারনা করা। তখন বড় বড় নেতাদের বক্তৃতা শোনা আমার অনেকটা নেশায় পরিণত হয়েছিল। যেমন - মুসলিম লীগের সবুর খান, আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমেদ, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও জোসেফ মন্ডলের বক্তৃতা শোনা রীতিমতো আমার নেশায় পরিণত হয়েছিল।

সে সময় কাজী আব্দুল কাদের সাহেব ঢাকাতে একটি হোটেল করেছিলেন, যার নাম ছিল 'হোটেল ইলিশিয়াম'। ১৯৭০ সালে কাইয়ুম মুসলিম লীগের পূর্বপাকিস্তানের সম্মেলনে ভাষণে খান-এ সবুর খান একপর্যায়ে বলেছিলেন - 'মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট হয়তোবা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তার বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গেচূরে খান খান হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখন তার করার কিছুই ছিল না।' এই বক্তব্য শুনে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল খান-এ সবুর কি তাহলে ১৯৭০ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন নির্বাচনে তারা পরাজিত হচ্ছেন এবং পাকিস্তান দ্বি-খন্ডিত হচ্ছে।

হয়তো আইয়ুব খানও তাঁর নিজের উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন জাতীয় জীবনে মহাপ্রলয়ের সংকেত। তাই তিনি সকল মুসলিম লীগ নেতাদের এক হয়ে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্য থেকে নির্বাচন করার অনুরোধ করেছিলেন। ব্যারিস্টার আক্তার উদ্দিন ও সিরাজগঞ্জের আলামিন-সহ কনভেনশন মুসলিম লীগের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রায় ৭০-৭৫ জন নেতা আইয়ুব খানের সেই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন ফজলুল কাদের চৌধুরীর চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে। আমার বাবা শেখ শাহাদাৎ হোসেন ও এডভোকেট শরাফত হোসেন চৌধুরীও ছিলেন তাদের অন্যতম।

আমি বায়না ধরেছিলাম আমাকেও চট্টগ্রামে নিয়ে যেতে হবে। বাবা আমার বায়নাটি রক্ষা করেছিলেন। সকালের দিকে ঢাকা থেকে বিমানে চট্টগ্রামে পৌঁছে

www.pathagar.com

সরাসরি ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের বাসভবনে উপস্থিত হলাম। সারাদেশ থেকে কনভেনশন মুসলিম লীগের মধ্যম সারির নেতারা সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। দুপুরের পূর্বেই নেতৃবৃন্দ দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক ও মুসলিম লীগের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। সে আলোচনায় সর্বশেষ বক্তব্য উপস্থাপন করলেন বরিশালের ব্যারিস্টার আক্তারুদ্দিন। তিনি সহজ-সরলভাবে বললেন, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগের ভোট ভাগাভাগি রোধ না করতে পারলে নির্বাচনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সে কারণেই প্রবীণ নেতা নূরুল আমিন সাহেবের পিডিপিসহ তিন মুসলিম লীগের এক হওয়া তখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়।'

ফজলুল কাদের চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা সভাপতি করতে চাও কাকে?' সিরাজগঞ্জের আলামিন সাহেব উত্তর দিলেন, 'পূর্বপাকিস্তান থেকে নূরুল আমিন এবং পশ্চিমপাকিস্তান থেকে কাইয়ুম খানকে সাধারণ সম্পাদক করা হলে পুনরায় মুসলিম লীগের প্রতি জনতার আস্থা ফিরে আসতে পারে।' নীতিগতভাবে ফজলুল কাদের চৌধুরী ঐক্যপ্রক্রিয়ার প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন।

ঠিক সে মুহূর্তে ঘটেগেল এক অভাবনীয় নাটকীয় ঘটনা। শেখ মুজিবুর রহমান গাড়িবহর নিয়ে যাচ্ছেন কক্সবাজারের দিকে জনসভা করতে। ফজলুল কাদের চৌধুরীর বাড়ির পাশ দিয়ে কক্সবাজারে যাওয়ার রাস্তা। গাড়িবহর ছুটল কক্সবাজারের দিকে। শুধু শেখ সাহেবের গাড়িখানা উঠে এলো ফজলুল কাদের চৌধুরীর বাড়িতে। ফজলুল কাদের চৌধুরীসহ অনেকেই বের হয়ে এলো ড্রইং রুম থেকে শেখ সাহেবকে অভিনন্দন জানাতে। দুইনেতা কোলাকুলি করে কুশল বিনিময়ের পরে শেখ সাহেব বললেন, *'ভাইজান দেশ পরিচালনায় আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আমি রাজপথ ও জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। আপনাকে নির্বাচনের পর আমাদের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে।'*

শুধুমাত্র এই একটি কথায় পাঁচ মিনিট আগে গৃহীত সিদ্ধান্ত ফজলুল কাদের চৌধুরী সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেললেন। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করলেন - '১৯৫৪ সালেও নূরুল আমিন সাহেবরা তাকে মুসলিম লীগের নমিনেশন দেয়নি। স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে জয়লাভ করে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। তিনি এককভাবে কনভেনশন মুসলিম লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেন।' যার ফলে ঐক্যপ্রক্রিয়ার পথ ওখানেই রুদ্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু আমার জানামতে জনাব অহিদুজ্জামান ও মোনায়েম খানের ব্যক্তিআধিপত্য অহংকার এবং নূরুল আমিন ও ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বের লড়াই মুসলিম লীগের মতো জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংগঠনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকে রাজনৈতিক নেতাকর্মিদের শিক্ষা গ্রহণের অনেকছুিই থাকতে পারে। অতি সংক্ষেপে পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের নির্বাচন সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন শেষ করে আমি অন্য অধ্যায়ে মনোনিবেশ করতে চাই।

নির্বাচনকে সামনে রেখে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, এলএফও জারি করলেন। ভাসানী ন্যাপসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল এলএফও অধ্যাদেশ মেনে নির্বাচনে অংশ নিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং পরিশেষে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়।

প্রথমে তারা ভোটের আগে ভাত চাই, এই বলে প্রকারান্তরে সামরিক শাসনকে প্রলম্বিত করতে চেয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় ভাসানী ন্যাপ ভেঙ্গে বহু উপদলে পরিণত হয়েছিল। এর ফলে লাভবান হয়ে উঠলো আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ আইয়ুব বিরোধী শিবিরে জনতার কাছে প্রধান নেতা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ ও মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাপ।

মওলানা ভাসানীর সংগঠন ভেঙ্গে খন্ড খন্ড হয়ে গেলে একমাত্র শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে থাকে আওয়ামী লীগ। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগ বিরোধী জনগণ আওয়ামী লীগের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি মুসলিম লীগ বিভক্ত হয় চার খন্ডে। জামায়াতে ইসলামী ও নেজামি ইসলামীসহ বহু ছোট ছোট রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে নির্বাচনকে সামনে রেখে।

অন্যদিকে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের ন্যাপ আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রস্তাব দিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাইনবোর্ড বিলুপ্ত করে আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানান। নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের সব হিসাব-নিকাশের অবসান ঘটিয়ে জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ১৬২ আসনের ১৬০টি আসন এককভাবে পেয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগ। সেই নির্বাচনে একমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নূরুল আমিন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ত্রিদিব রায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ এককভাবেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ক্ষমতা লাভ করলো শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিগত ২৫ বছর ধরে একনাগারে ক্ষমতা ভোগের প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের এই ফলাফলে তারা দারুণ হতাশ হয়ে পড়ে। শুরু হলো জাতীয় পরিষদ গঠন না করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ষড়যন্ত্র। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের মধ্যে জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ, সিরাজুল আলম খান ও আব্দুর রাজ্জাকের উপদল ৬ দফার পরিবর্তে ১ দফা আন্দোলন জোরদার করতে শুরু করলো। অর্থাৎ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষা করা বা না করার প্রশ্নে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ মূল ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়।

একমাত্র পাকিস্তান পিপল্স পার্টি ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলই শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানালো। শুধুমাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টো জাতীয় সংসদ অধিবেশনের পূর্বেই শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের দাবি জানালেন। সেই লক্ষ্যে ১৯৭১ সলের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৪০ সদস্যের একটি বিশাল প্রতিনিধি দল নিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন। হোটেল শেরাটনে তৎকালীন ইন্টারকন্টিনেন্টালে তিনি অবস্থান করেন। দফায় দফায় বৈঠক চলছিল আওয়ামী লীগ ও পিপিপি'র শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে।

জুলফিকার আলী ভুট্টো একসময় পাকিস্তান মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। আমার বাবার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেইসূত্রে আমার বাবা তার সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করলেন। সাক্ষাৎ করার জন্য আমি বাবার সঙ্গে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের লবিতে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু ব্যস্ততার কথা বলে জুলফিকার আলী ভুট্টো দেখা করতে অপারগতা প্রকাশ করে তার সফরসঙ্গি মোফাচ্ছের খায়েরের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য অনুরোধ করলেন।

মোফাচ্ছের খায়ের পাঞ্জাব প্রদেশের একজন তরুণ নেতা। পরবর্তীতে তিনি পাঞ্জাবের চীফ মিনিস্টার হয়েছিলেন। আমার বাবার তুলনায় অনেক বয়োকনিষ্ঠ। বাবা জুলফিকার আলী ভুট্টোর এই আচরণে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু নিজেকে শান্ত রেখে মোফাচ্ছের খায়েরকে বললেন, I expect that you will convey my massage to your leader. বাবা আরও বললেন, শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলোকে জাতীয় সংসদের মধ্যে আলোচনা করে সমাধান করলে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত থাকবে। অন্যথায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে। এ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের শত্রুরা এ সুযোগ গ্রহণ করে দেশকে বিপদগ্রস্ত করে তুলবে এমনকি খন্ড বিখন্ড করে ফেলবে।

www.pathagar.com

মোফাচ্ছের খায়ের সকল কথা শুনে শুধু বললেন – We are fighting for democracy against a common enemy.

আলোচনা শেষে ফেরার পথে বাবাকে ভীষণ হতাশ মনে হলো। তিনি বললেন - ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনিবার্যভাবে দেশকে অস্থিতিশীলতার দিকে নিক্ষেপ করছে।

এরই মধ্যে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ পাকিস্তানের প্রায় সকল নেতাই এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানালেন। শুধুমাত্র বাধ সাধলেন পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি বললেন, পূর্বপাকিস্তানে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডেকে ইয়াহিয়া খান মারাত্মক অন্যায় করেছেন। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের সংসদ সদস্যদের জীবনের কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের সংসদ সদস্যরা ১ মার্চের অধিবেশনে যোগদান করতে পারবেন না। তিনি হুমকি দিয়ে বললেন, "যারা পূর্বপাকিস্তানে যাবে তাদেরকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হবে।" সর্বোপরি তিনি সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় তুলেন- ৬ ও ১১ দফার বিরুদ্ধে।

তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে পুনরায় সরকারের নিকট পরিষদের বাইরে শাসনতান্ত্রিক জটিল সমস্যাগুলো সমাধানের দাবি করলেন। তিনি জেনারেল হামিদ খান ও টিক্কা খানকে নিয়ে পাখি শিকারের নামে বৈঠক করলেন লাড়কানায় তার নিজ বাড়িতে এবং প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করলেন সংসদ অধিবেশন স্থগিত করার জন্য। সর্বোপরি বাধ্য করলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের মাধ্যমে বহু আকাঙ্ক্ষিত ১ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করতে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ জনতা প্রচন্ড বিস্ফোরণে জ্বলে উঠলো। পাকিস্তানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হলো।

৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) আ স ম আবদুর রব পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলেন।

৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনসভা আহ্বান করে যে ভাষণ দিলেন- এর বাইরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তার অন্যকিছু

www.pathagar.com

বলার সুযোগ ছিল না। যদিও তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন জয়-বাংলা, জয়-পাকিস্তান বলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ভাষণে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, "আমি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টির নেতা, ... তিনি আমার কথা রাখলনে না, তিনি রাখলেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর কথা। ....

এই বক্তব্যের মধ্যেই প্রমাণিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলোচনার দ্বার কখনো বন্ধ করেননি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের সেই বক্তব্যকে পর্যবেক্ষক মহল ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা গঠনমূলক বক্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন।

পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য ঢাকায় ছুটে আসলেন। তিনি বৃহত্তর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের আলোচনায় যুক্ত করতে চাইলেন। আবার এর পাশাপশি গোপনে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও দমননীতির প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।

ইতিমধ্যে দু'টি নতুন উপাদান যুক্ত হলো পাকিস্তানের রাজনীতিতে। প্রথমত জুলফিকার আলী ভুট্টোর দাবি পাকিস্তানের দুই অংশের দুইজন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার হাতে দুই অংশের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। দ্বিতীয়ত কাশ্মীরি মোজাহিদ নাম ধারণ করে দুই ব্যক্তি ভারতের একটি প্যাসেঞ্জার বিমান হাইজ্যাক করে নিয়ে আসলেন লাহোরে। জুলফিকার আলী ভুট্টো এই হাইজাকারদেরকে মোজাহিদ বলে আখ্যায়িত করলেন এবং উত্তেজনার একপর্যায়ে ভুট্টো বিমানটিকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দেয়ার ঘোষণা দিলেন।

ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভারতের আকাশ পথ বন্ধ করে দেয়ার। ভারত পাকিস্তানের জন্য সে দেশের আকাশসীমা ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিলো। পরিশেষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পূর্ববাংলার ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের কফিনে শেষপেড়েক ঢুকিয়ে বিদায় নিলেন। আর এ অবস্থায় শুরু হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। #

www.pathagar.com

রাজনীতি ও সেবা

আমার বাবাই প্রথম আমাকে অনুপ্রাণিত করেন এই বলে যে, রাজনীতি ও সেবা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে একজন নিবেদিত রাজনৈতিক কর্মি হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর রাজনীতির সূচনা পর্বেই উপমহাদেশ জুড়ে সহিংস সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানত কুটিল ব্রাহ্মণ্য-চানক্য রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি হয় অগণিত নিরীহ মানুষ। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির দৌরাত্মের মুখে উপমহাদেশের সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে মুসলমানদের জীবনে দেখা দেয় চরম অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা। বিহার, কলকাতাসহ উপমহাদেশ জুড়ে উগ্রসাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে শেষপর্যন্ত মুসলমানরা নিতান্তই টিকে থাকার তাগিদে পাকিস্তান আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হয়। তা সত্ত্বেও করমচাঁদ গান্ধী প্রদর্শিত রাজনীতি ও সেবা ছিল তার মনের মনিকোঠায়।

তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের ন্যায় শিক্ষা কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ পথে তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। ভারতবর্ষের প্রতাপশালী প্রধান জমিদাররা যা করতে পারেন, একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ শত চেষ্টা করেও তা করতে পারেন না। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তিনি নিজের সম্পত্তির উপর স্কুল, কলেজ ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এগুলোর কোনো কোনোটা ভালোভাবে চললেও বেশ কিছু শিক্ষা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান শেষপর্যন্ত চালু রাখাই সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

তবে উদার মানবিক মনোবৃত্তির বশবর্তি হয়ে ইংরেজি শিক্ষা সম্প্রসারণ করে নিজের গ্রাম ও এলাকার মধ্যে সমৃদ্ধি আনার জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন এটাও সত্য। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি শিক্ষা বিস্তার ও সমাজসেবার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি সবসময় বলতেন সেবার মনোবৃত্তি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলে তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা জেগে উঠতে পারে। তখন রাজনীতিবিদগণ হিংস্র পশুতে পরিণত হতে পারে।

বাবা ১৯৬৮ সালে ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনার বিস্তীর্ণ অবহেলিত জনপদে আমাকে নিয়ে ঘুরেছেন, বিশেষকরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোতে। তিনি সবসময়ই বলতেন, ইংরেজি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আমার কিশোর মনের মধ্যে তখনই রাজনীতিক ও সেবক হওয়ার যে আগ্রহ জেগে ওঠেছিল তা আমার বাবার অনুপ্রেরণারই ফলশ্রুতি।

১৯৭২ সালে সেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। নতুন রাষ্ট্র যাত্রা শুরু করল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষায় মনোনিবেশ করলাম। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। আমাদের বিভাগের প্রধান ড. ওদুদুর রহমান পূর্বপাকিস্তানের সাবেক চীফ মিনিস্টার জনাব আতাউর রহমান খানের ছোট ভাই (চিরকুমার)। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী। এক কথায় তাঁকে আলোকিত মানুষ বলা চলে। এমন উদারপ্রাণ মানুষ আর কে আছে, যিনি কখনো শিক্ষক, কখনো বন্ধু, কখনো বা বড়ভাই। তাঁর কাছে পৌছুতে পারলে সকল আবদারই করা যেতো।

আমার বিভাগের একজন সিনিয়র শিক্ষক ছিলেন ড. আব্দুল মোমিন চৌধুরী। তিনি ইতিহাস বিভাগে আসার আগেই আমরা তটস্থ হয়ে যেতাম। তিনি কোনো দিন আমাদের কিছুই বলতেন না। কিন্তু তাঁকে দেখলেই নার্ভাস হয়ে যেতো ইতিহাস বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীগণ। কিছুদিন আগে বঙ্গভবনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। কিন্তু তারপর আর কিছুই বলতে পারলাম

www.pathagar.com

না। তিনি স্বস্নেহের সুরে বললেন, তুমি তো এখন আর প্রথম বর্ষের ছাত্র না, বড় নেতা হয়েছো, তোমাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি। আমি আবার সালাম দিয়ে দ্রুত স্থান পরিবর্তন করলাম। এই ছিল আমাদের সময়ে ছাত্রশিক্ষকের সম্পর্ক।

১৯৭২ সালে সম্ভবত জুলাই মাসে ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. ওদুদুর রহমান সাহেব আমাকে তাঁর রুমে ডাকলেন। তিনি বললেন, একটি আন্তর্জাতিক সেবাসংস্থা দুর্গত মানুষের মধ্যে কাজ করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কয়েকজন সেচ্ছাসেবক চেয়েছে। ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব আমার বিভাগ থেকে একটি টিম গঠনের কথা বলেছেন। আমি তোমাকে স্বেচ্ছাসেক হিসাবে পাঠাব বলে চিন্তা করেছি। তিনি আরো বললেন, আগামীকাল সকাল ১১ টায় ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের অফিসে তাদের লোক আসবে আমিও থাকবো তুমি এসো। পরবর্তী পর্যায়ে করণীয় ঠিক করা যাবে। বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি করব। তবে শিক্ষকের অনুরোধকে আদেশ হিসেবেই গ্রহণ করলাম।

পরদিন সকাল ১১ টায় ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের অফিসের সামনে গেলাম। ড. ওদুদুর রহমানও ঠিক সময়েই এসেছিলেন। একটি সাহায্য সংস্থার গাড়িতে করে একজন বাংলাদেশী ও একজন ইউরোপীয়ান বৃদ্ধ মহিলা এলেন। ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলেন তাঁরা। ইউরোপীয়ান মহিলা নিজেই আমাদের সঙ্গে পরিচয় করে নিলেন। তাঁর নাম ইভা ডিন হাটক। তিনি বাংলাদেশস্থ সালভেশন আর্মির প্রধান। তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশী ভদ্রলোকের নাম জোসেফ। তাঁর বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার কলাবাড়ি ইউনিয়নে। আমি যখন বললাম আমার বাড়ি গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া থানায়। তখন মি. জোসেফ আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

সালভেশন আর্মির প্রধান ইভা ডিন হাটক, ভাইস চ্যান্সেলর ড. আব্দুল মতিন চৌধুরীকে যে প্রস্তাব দিলেন তা শুনে আমরা সকলেই হতবাক হয়ে গেলাম। তিনি বললেন - তাঁর সংগঠন দুঃস্থ বিহারিদের মধ্যে সেবামূলক কাজ করতে চায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ২৫/৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক চায় এক মাসের জন্য। আমি ছাড়া আরেকজন ছাত্র এসেছে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে। তার গ্রামের বাড়ি সন্দ্বীপ। নাম আবুল কাশেম। আমরা চুপ করে রইলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী সাহেব ইভা ডিন হাটককে বললেন - বিহারিরা সমষ্টিগতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

বিদ্বেষমূলক মনোভাব রয়েছে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিহারি কমিউনিটির সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক গোছানো খুবই কঠিন কাজ।

ইভা ডিন হাটক বললেন, যুদ্ধ শেষ, আমরা কে পক্ষে, কে বিপক্ষে ছিলো সেদিকে তাকাতে চাই না। আমাদের লক্ষ্য এই মুহূর্তে যে বা যারা দুঃস্থ পারলে তাদেরকে মানবিক সেবাদান করা। আমরা শুনেছি রাজবাড়ি, সৈয়দপুর ও খালিশপুরে হাজার হাজার বিহারি শিশু আহত অবস্থায় মৃত্যুরকোলে ঢলে পড়ছে। এই শিশুরা যুদ্ধে কোনো পক্ষের নয়।

পরিশেষে ১৫ সদস্যের একটি স্বেচ্ছাসেবক টিম দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সাহের সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আমার উপর ১০ জন এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র জনাব আবুল কাশেমের উপর ৫জনের দায়িত্ব অর্পিত হলো। আমাকে ও আবুল কাশেমকে ইভা ডিন হাটক তাদের অফিসে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। অফিস ছিল ধানমন্ডির ২৭ নম্বর রোডের ১১ নম্বর বাড়িতে।

ড. ওদুদুর রহমান আমার ব্যবহারে অত্যন্ত খুশি হলেন। সেদিন বিকেল ৪টায় সালভেশন আর্মির অফিসে আমি ও আবুল কাশেম সাহেব একসঙ্গে গেলাম। প্রথমেই ইভা ডিন হাটক সম্পর্কে বলতে হচ্ছে। তিনি একজন ফরাসি পিতার কন্যা। তাঁর একটি ছোট বোন আছে, বোনটি থাকেন ইংল্যান্ডের কার্ডিফে। ১৯১৪ সালে জার্মানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে ফরাসি পদাতিক সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে তাঁর বাবা যুদ্ধে অংশ নেয় এবং ১৯১৭ সালে তিনি নিহত হন। ইভা ডিন হাটকের মা তাঁকে ও তার ৪ বছরের ছোট বোনকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে একজন যুবককে বিয়ে করেছিলেন। এই অনাথ আশ্রমে থেকেই তিনি ও তাঁর বোন বড় হয়ে উঠেন। তার বোনের অবশ্য স্বামী সন্তান রয়েছে। কিন্তু তিনি থেকে যান চিরকুমারী। একমাত্র ছোটবোন ছাড়া রক্তের সম্পর্কের কোনো আত্মীয়স্বজন পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। তবে সারাবিশ্বের আক্রান্ত দুঃস্থ মানুষকে তিনি ভালোবাসেন ও শিশুদের সন্তানের মতো মনে করেন।

ধীরে ধীরে আমার প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ জন্মেছিল। ১৯৭৪ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইংল্যান্ডের কার্ডিফে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯৮২ সালে লন্ডন গিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং তিনি কার্ডিফের মেয়রকে দিয়ে আমার সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলতেন - অত্যাচারীর কোনো ধর্ম নেই। সে কোথাও

www.pathagar.com

খ্রীস্টান, কোথাও মুসলমান, কোথাও হিন্দু বা ইহুদি। তেমনি করে ঠিক নিপীড়িত ব্যক্তিরও কোনো ধর্ম নেই। তার একমাত্র পরিচয় সে দুঃস্থ, পীড়িত। তাকে যতটুকু পারা যায় সাহায্য ও সেবা করাই আমার ধর্ম।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবক জোগাড় করে ফেলেছিলাম। ইতিমধ্যে সালভেশন আর্মি রেডক্রসের মাধ্যমে জেলা প্রশাসককে আমাদের আসার সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছে। জেলা প্রশাসক আমাদের নিরাপত্তা ও থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রথমে আমরা রাজবাড়ি, দৌলতপুর ও খালিসপুর অঞ্চলে সেবা কর্মসূচি পরিচালনা করি। সালভেশন আর্মিতে ইভা ডিন হাটক ছাড়াও দু'জন মার্কিন নাগরিক ছিলেন। তাঁরা মধ্য বয়সি স্থানীয় অফিস কর্মকর্তা। প্রায় সকলেই খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের লোক। একটি ৬ সদস্যের মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা সকলেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করা ডাক্তার। এর মধ্যে একজন ছিলেন আমিন বিশ্বাস। তিনিই মূলত আমাদের সকলের টিম লীডার। তিনটি মাইক্রোবাস, একটি ছোট ট্রাক ও একটি জীপে করে আমরা প্রথমে রাজবাড়ি সদরে যাই। জীপে আমি, ডা. আমিন বিশ্বাস ও ইভা ডিন হাটক উঠেছিলাম। প্রচুর ওষুধ, বিস্কিট, গুড়া দুধ ও কম্বল সঙ্গে করে নিয়েছিলাম।

রাজবাড়ির গোয়ালন্দ ঘাটেই একদল রেডক্রস কর্মি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ইভা ডিন হাটকের বয়স ৬৬/৬৭ হলেও তিনি ছিলেন ডাক্তারের চেয়ে ভাল ডাক্তার, নার্সের চেয়ে ভাল নার্স। তিনি আহত শিশু বাচ্চাদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতেন। সমস্ত হৃদয় জুড়েই ছিল তাঁর আহত ও দুঃস্থ মানুষের প্রতি ভালবাসা। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সাম্রাজ্যবাদী দেশের এজন নাগরিকের দুঃস্থ মানুষের প্রতি এতো ভালোবাসা কি সত্যিই থাকতে পারে? তিনি দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার জন্য ব্যস্ত হতেন না। দু'টি রিলিফের বিস্কিট ও একটি টমেটো হলেই তাঁর দুপুরের খাওয়া চলতো। সাথে চা হলে ভাল হতো না পেলেও কোনো আপত্তি ছিল না।

তাঁর সঙ্গে প্রায় একমাস ছিলাম। ইতিমধ্যেই আমাদের অনেকেই অস্থির হয়ে চলে এসেছিলো ঢাকায়। ধীরে ধীরে তাঁর উপর আমার আধিপত্য বেড়ে গেল। আমি অনেক ব্যাপারেই তাঁকে শাসন করতে আরম্ভ করলাম। আমি শাসন করে তাঁকে এক গ্লাস দুধ দিলে তিনি বলতেন কি দরকার? কি দরকার? পরে যখন আমি রাগ করতাম তিনি শিশু বাচ্চার মতো খেয়ে নিতেন।

www.pathagar.com

পৃথিবীর সকল মানুষই স্নেহ চায়, ভালোবাসা চায়। যে পায়না, সে না পাওয়াকে আড়াল করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। কখনো গাম্ভীর্যের মধ্যে তা আড়াল করার চেষ্টা করে। এভাবে রাজবাড়ি, দৌলতপুর ও খালিসপুরে সেবামূলক কাজ করে জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

বিহারি পরিবারগুলোর প্রায় সব সক্ষম পুরুষই বাঙালিদের চক্ষুশূল হয়ে পড়েছিল। এর ফলে বিহারি নারীদের দিকে দুঃশ্চরিত্র লম্পট শ্রেণীর লোকজনের লুলুপ দৃষ্টি সবসময়ই থাকতো। এদের বিহারি পল্লীতে আনাগোনা ছিল অহরহ। তাদের দিনে একচেহারা আবার রাতে অন্য চেহারায় দেখা যেতো। সালভেশন আর্মির কার্যকলাপে এলাকায় গুজব রটে যায় যে মার্কিন সেনারা বিহারি পল্লীতে রাতের বেলায় পাহারার ব্যবস্থা করেছে। এতে লম্পটদের আনাগোনাও অনেকাংশে কমে যায়। ফলে কিছুটা হলেও সেবা ও নিরাপত্তা পায় দুঃস্থ বিহারী পরিবারগুলো।

কারা এই বিহারি নামে খ্যাত। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বসবাসরত এই বিহারিরা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান ভাগাভাগি হয়ে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র হলে মূলত নির্যাতিত হয়ে নিজস্ব সহায়সম্বল, এমনকি পৈত্রিক ভিটেমাটি ফেলে এসেছিল নিরাপত্তার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য। তৎকালীন পাকিস্তানে পৈত্রিক ভিটেমাটি ছেড়ে আসা এই জনগোষ্ঠীর অন্য কোথাও যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সে কারণেই তাদের এই দুরাবস্থা।

ইভা ডিন হাটকের সঙ্গে কাজ করার ফলে এনজিও লেভেলে আমার পরিচিতি বেড়ে গিয়েছিল। আমি আমার ছোট ভাই শেখ বেলায়েত হোসেনকে ইভা ডিন হাটক ও সালভেশন আর্মির অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম।

ইভা ডিন হাটক মুখ ফুটে কখনোই বলেননি। কিন্তু তাঁর আচার-ব্যবহারে আমি বুঝেছিলাম, তিনি আমাকে মনের অজান্তে দত্তক পুত্র হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৭ এপ্রিল তিনি কর্মজীবনের অবসান ঘটিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান। যাওয়ার এক মাস আগ থেকেই আমাকে নিয়ে তিনি যে চিন্তা ও উৎকণ্ঠা করেছিলেন তা আমি কখনোই ভুলত পারব না। সারাক্ষণই তিনি আমাকে তাঁর কাছে থাকতে বলতেন। বলতেন – 'পৃথিবীতে আপন বলে কিছু নেই। তুমি যাকে আপন ভাববে সে-ই তোমার আপন জন।'

তিনি আমাকে ও আমাদের পরিবারকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য সহযোগিতা করেছিলেন। ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার সময় আমি তাঁকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রথমে থাকতাম ইকবাল হলে। পরবর্তী সময়ে সার্জন জহিরুল হক হলের ১৪৮ নং কক্ষে অবস্থান করি। ইভা ডিন হাটক লন্ডনে যাওয়ার পর সালভেশন আর্মির হেডঅফিসের একজন কর্মির ফোন ও ঠিকানা দিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে আমি লন্ডন গিয়ে তাঁর সঙ্গে কার্ডিফে দেখা করেছিলাম। তাঁর ছোট বোনের সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছিল। তাঁর বোন আমাকে বলেছিল প্রায়ই ইভা ডিন হাটক তোমার কথা বলতো। আর ঢাকাতে কোনো গন্ডগোল হলে তোমার সংবাদ জানার জন্য সে পাগল হয়ে যেতো । যিনি সারা জীবন বিশ্বের সব দুঃস্থ ও পীড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন সেই মহিয়সী নারী ইভা ডিন হাটক ১৯৮৩ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৯৭৬ সালে মাদারিপুরের মাতুব্বর চরে ঘুর্ণিঝড়

১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে মাদারীপুর জেলার মাতুব্বরের চর ইউনিয়নে এক ভয়াবহ টর্নেডো আঘাত হানে। আমরা বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রিলিফ টিম গঠন করে আব্দুল জালাল মোল্লা, কে এম ওবায়দুর রহমান, চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ প্রমূখের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা রিলিফ সামগ্রি সংগ্রহের পরামর্শ দেন। আমরা সালভেশন আর্মি, ওয়াল্ড ভিশন, রামকৃষ্ণ মিশনসহ বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে রিলিফ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

কামাল ইবনে ইউসুফের ছোট ভাই ফুয়াদ ইবনে ইউসুফ রিলিফ সামগ্রি নেয়ার জন্য একটি লঞ্চের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পদ্মার পাড়ে মাতুব্বরের চর ইউনিয়ন। মূলত এই ইউনিয়নটির দু'পাশের অন্য কয়েকটি ইউনিয়নেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। মাতুব্বরের চরের এই ঘুর্ণিঝরের মতো বীভৎস ও ভয়াবহ ঝড় আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখিনি। তাল গাছকে গামছা চিপানোর মতো চিপিয়ে গুড়িগুড়ি করে ফেলেছিল।

আমরা ৮ হাজার শাড়ি ও চিড়া মুড়ি নিয়ে এই রিলিফ কার্যক্রম চালিয়েছিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনে আমি গিয়েছিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের গুরু অত্যন্ত ভালমানুষ ও দয়ালু। মোল্লা জালাল আহম্মেদ একটি চিঠি দিয়ে আমাদেরকে তার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি আমাদের তিন হাজার পিস শাড়ি ও দশ বস্তা চিড়া দিয়েছিলেন। আমরা শুধুমাত্র আমাদের লঞ্চের ঠিকানা তাকে দিয়েছিলাম। তিনি নিজের লোক দিয়ে লঞ্চে শাড়ি ও চিড়া পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

www.pathagar.com

সদরঘাট থেকে রাত ৮ টার দিকে আমরা মাদারীপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমিসহ ফুয়াদ ইবনে ইউসুফ, কে এম ওবায়দুর রহমানের ভাই এডভোকেট লাবলু, সালাউদ্দিন, হিটু, মাদারিপুরের আনিসসহ ঠিক এ মুহূর্তে নাম মনে না পড়া আরো প্রায় ৩০ জন সেই রিলিফ কাজে অংশ নিয়েছিল। এটি আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। ঝড়ের তান্ডবে একটি ইউনিয়নের কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। পাশের তিনটি ইউনিয়নে আংশিক ক্ষতি হয়েছিল। আমরা পরিবার প্রতি এক কেজি চিড়া, রান্নার জন্য হাড়ি ও একখানা শাড়ি বিতরণ করেছিলাম। এই রিলিফ কাজের মধ্যেও গ্রামাঞ্চলে নানা ধরণের হিংসা-বিদ্বেষ ও কোন্দল সক্রিয় ছিল। এটাও আমার জীবনে একটি নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

১৯৭৭ সালে গোপালগঞ্জে ঘুর্ণিঝড়

১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে গোপালগঞ্জ জেলা শহরের দক্ষিণাংশ এক ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড়ের কবলে পতিত হয়েছিল। আমার ছোট বোনের বাসাও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। বিকেল ৪টায় আকাশের এককোণে পুঞ্জিভূত কালো মেঘ থেকে শুরু হওয়া সেই ঝড় মুহূর্তের মধ্যে ঘুণিঝড়ে রূপ নিয়ে ১০ মিনিটের মধ্যে গোপালগঞ্জ মিয়া পাড়াকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল।

সন্ধ্যার মধ্যেই এ ঝড়ের খবর পেলাম। মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। কি করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করছিলাম। এরই মধ্যে লাভলু, সালাউদ্দিন, হিটু, ফারুক ও অশিতকে নিয়ে পরামর্শ করলাম। সিদ্ধান্ত হলো একদিনের মধ্যে যা জোগাড় করতে পারি তা নিয়েই রওনা হবো। আমাদের এক বড়ভাই জুট কর্পোরেশনে চাকরি করতেন তাঁকে আমরা পান্না ভাই বলেই ডাকতাম। তিনি কিছু ওষুধ, চিড়া, বিস্কুট ও কাপড়-চোপড় জোগাড় করে দিলেন। আমরা তা নিয়েই রওয়ানা হলাম আলী আহম্মদ ভাইয়ের ব্যবস্থা করা ট্রাক নিয়ে।

টেকেরহাট দিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। রাস্তাটি একেবারেই বিধ্বস্ত তার উপর ঝড়ে উড়ে এসে গাছপালা পড়ে চলার অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। শেষপর্যন্ত বোয়ালমারি হয়ে বহুকষ্টে আমরা গোপালগঞ্জে পৌঁছাই পরের দিন সকাল ১০ টায়।

প্রথমেই ছুটলাম ছোটবোন মিনুর বাসার দিকে। রাস্তা-ঘর মাটি একসঙ্গে মিশে গেছে। তারা আশ্রয় নিয়েছে একটি স্কুলে। মিনু বাচ্চাদের নিয়ে ঝড়ো-সড়ো হয়ে

www.pathagar.com

বসে আছে। আমাকে কাছে পেয়ে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো। বলল 'নিলু ভাইজান আমাকে আর আমার জাহিদকে উড়িয়ে নিয়ে একটা পুকুরের মাঝে ফেলে দিয়েছিল।' আমার বুক কেঁপে উঠল। এই ঝড়ে তো আমার বোন ও তার ছেলে মারাও যেতে পারতো। আল্লাহর কাছে দোয়া চাইলাম তিনি যেন সকলের উপর রহমত করেন।

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরের ভয়াবহ সিডর আক্রান্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১টার সময় সিডোর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে আঘাত হানে। বিগত দিনে যতগুলো ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে তার মধ্যে সিডোরের আঘাতই সবচেয়ে ভয়াবহ। সিডরে জীববৈচিত্র্য, মানুষ, গাছপালা ও অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন। সিডোরের গতিপথে সুন্দরবন পড়েছিল বলে সুন্দরবনের সবেচেয় বেশি ক্ষতি হয়েছে। এর আঘাতে বাগেরহাট, খুলনার একাংশ, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুণা, পটুয়াখালী, বরিশাল ও ভোলার একাংশ মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত হয়।

বাবা তখনো বেঁচে ছিলেন। সর্বপ্রথম ১৭ মার্চ যা কিছু জোগাড় করতে পেরেছি, তাই নিয়ে ছুটলাম গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গীপাড়ার দিকে। ১৭ তারিখেই টুঙ্গীপাড়া ঘুরে এসে রাত যাপন করলাম গোপালগঞ্জে বাবা-মার সঙ্গে। আমার সহযাত্রি ছিলেন, জনাব হারুন অর রশিদ, এস এম আবুল বাশার ও জিয়াউর রহমান হিরা। ১৭ তারিখ রাতেই সিদ্ধান্ত নিলাম, ১৮ তারিখ সকালে মোল্লাহাট ও ফকিরহাট ঘুরে বিকেল ৩টার মধ্যে মোড়লগঞ্জ, হারুন সাহেবদের ডন ইউনিয়নে খিচুড়ি বিতরণ করব। হারুন সাহেবের ছোট ভাই প্রায় ৩ হাজার লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। রাত ৯টায় প্রোগ্রাম দেয়া হয় চিলমারীর প্রয়াত কালিদাস বড়াল ও অশোক বড়ালদের বাড়িতে।

নিরু সকল ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। কিন্তু কোথাও সময় রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তার প্রথম কারণ হলো বিভিন্ন জায়গাতে রাস্তার উপর এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা গাছ। দ্বিতীয় কারণ মানুষের করুণ আহাজারি। ফকিরহাট থেকে মোড়লগঞ্জ ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পেরেছিলাম। কিন্তু মোড়লগঞ্জ থেকে চিতলমারী আসার সময় মহাবিপদ ঘটল। রাস্তার পাশে কোথাও নিহত মানুষদের উদ্ধার করা

www.pathagar.com

হয়েছে। কোথাও কোথাও গণকবর দেয়া হয়েছে। কিন্তু মরা পাখি ও জীবজন্তুগুলোকে তো আর মাটি চাপা দেয়া হয়নি। রাস্তার দু'ধারে শুধু মরা জীবজন্তুর দুর্গন্ধ। ড্রাইভার আলামিন গাড়িতে পেট্রোল পূর্ণকরে রেখেছিল। কিন্তু হিরা বার বার গাড়িতে বমি করার কারণে গাড়ি চালাতে অসুবিধা হচ্ছিল।

মোড়লগঞ্জ থেকে রওয়ানা হলাম রাত ৮টার দিকে। পাঙ্গুটি ফেরিঘাটে দেখলাম বহুলোক জমা হয়েছে। তারা আমাকে একনজর দেখতে চান। নভেম্বর মাস শীতকাল। একজন বৃদ্ধলোক আমার গলায় তার গলার মাফলারটি পড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, 'সাহায্য দেয়ার প্রয়োজন নেই। এই মহাবিপদের সময় আপনারা আমাদের দেখতে এসেছেন এ জন্যই আমরা খুশি।'

রাত ১১টার দিকে পৌঁছলাম চিতলমারিতে। শত শত মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিরুর বাবা-মা আমাদের খাওয়ানোর অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমরা বললাম এই বিপদের সময় এই ঝামেলা করার প্রয়োজন নেই।

রাত ১২ টার দিকে রওয়ানা হলাম ঝালকাঠি অভিমুখে। হারুন সাহেবের এক বন্ধুর বাসায় আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ধলেশ্বর নদী পার হয়ে ঝালকাঠি যেতে হবে। চরমালী ফেরিঘাটে এসে দেখলাম কোনো ফেরি নেই। কিন্তু ঘাটে দু'টি খাওয়ার হোটেল খোলা আছে। কিছু দূরে অবস্থিত একটি মসিজদ। মসজিদের ইমাম সাহেব আমাকে চিনতে পারলেন। বললেন, 'আপনি নিলু ভাই না'। তসলিমা নাসরিন বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে সমাবেশে এসেছিলেন।

হারুন সাহেব ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। তিনি হোটেলের মালিককে ম্যানেজ করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে রাত ২টা বেজে গেছে। মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদের পাশে একটি রুমে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল সিডোরের মতো আরেকটি জলোচ্ছ্বাস ধেয়ে আসছে, যার নামকরণ করা হয়েছিল নার্গিস। গ্রামের লোকজন বাড়ি ছেড়ে রাস্তার উপর আশ্রয় নিতে লাগলো। পূর্ণিমার জোয়ারের কারণে নদীতেও পানি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

যা হোক আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম পিরোজপুরে গিয়ে থাকব। রাত ৩টার দিকে পিরোজপুর শহরে এসে পৌঁছি। কোথাও থাকার জায়গা নেই। হোটেল, রেস্টহাউজ সবজায়গাই লোকে পরিপূর্ণ। ঢাকা থেকে আসা সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন এনজিও কর্মি দলে দলে ওঠেছে এসব রেস্টহাউস ও আশ্রয়

www.pathagar.com

কেন্দ্রে। অবশেষে আমরা একটি ছোট্ট হোটেলের একটি ছোট্ট কক্ষে বসে রাত কাটালাম। ড্রাইভার রাস্তার উপরে গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল বেলা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সাহেব সংবাদ পেলে লোক পাঠালেন তার ওখানে নাস্তা করার জন্য। পিরোজপুর শহরের মধ্যে তিনি একটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটি চিকিৎসালয় গড়ে তুলেছেন। সাঈদী সাহেবের ওখানে গোসল ও নাস্তা সেরে ঝালকাঠির উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

ফেরিঘাটে অনেক ভিড়। কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যরা আমাকে সাহায্য করে গাড়িটি আগে পাড় করিয়ে দিলেন। ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলায় আমাদের দলীয় ও পরিচিত লোকজনদের দেখাশুনা করে দুপুর ১টার দিকে ঝালকাঠি সদরে পৌঁছলাম। আমরা উঠলাম আলী আশরাফ খান চুন্নু সাহেবের বাসায়। সিডোরে ঝালকাঠি অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে দেখা করে ১৯ তারিখ ৩টার দিকে রওয়ানা দিলাম পটুয়াখালীর উদ্দেশ্যে। ১৯ তারিখ সন্ধ্যা ৭ টার সময় পটুয়াখালীতে সেলিম তালুকদারের বাড়িতে উঠলাম। পথিমধ্যে জিয়াউর রহমান হিরা ধুমকিতে তার বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। রাতে আমরা সকলে একসঙ্গে বসে কথাবার্তা বলেই সময় কাটালাম।

২০ তারিখে পটুয়াখালীর বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে ফিরে দেখলাম। এনজিওগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ সাহায্য সামগ্রি নিয়ে গিয়েছিলো। সেনাবাহিনীর সদস্যরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের উদ্ধার ও ত্রাণতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। এভাবেই ঘুরে ঘুরে আমতলীতে এসে পৌঁছলাম সন্ধা ৭ টার দিকে। আমতলী হয়ে রওয়ানা দিলাম বরগুণার দিকে। রাত ৯টায় পায়রা নদী যখন ফেরিতে পাড় হচ্ছিলাম তখন জোয়ারের সময়। পায়রা একটি বিশাল নদী। এ সময় বিকট আকার ধারণ করেছিল যা দেখে রীতিমতো ভয় পেতে হয়।

রাত ১০ টার দিকে বরগুণায় পৌঁছলাম। বরগুণা একটি প্রধান সড়কের শহর। সেই সড়কের উপরও দুই হাত পানি ওঠেছিল। সমস্ত শহর কাঁদায় সয়লাব হয়ে গেছে। এখানে এসে জনাব ইউনুস সোহাগ সাহেবের বাড়িতে উঠলাম। বরগুণার সাবেক জেলা উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব জাফরুল হাসান ফরহাদ দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন।

www.pathagar.com

পরদিন সকাল বেলায় তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন একেবারে সমুদ্রের পাড়ের ইউনিয়ন গর্জনগুণিয়ায়। যেখানে শত শত মানুষকে গণকবর দেয়া হয়েছে। সেখানে তিনি পাবনা ও বগুড়া থেকে আসা দু'টি রিলিফ টিমের ত্রাণসামগ্রী আমাকে দিয়ে দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ভাবেই দু'দিন বরগুণা জেলার বিভিন্ন দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করলাম। আমাদের দেশের দক্ষিণাংশে সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উঁচু করে বেড়িবাঁধ দেয়া হয়েছে। বেড়িবাঁধের অপর পাড়েও সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় বহু দরিদ্র মানুষ ঘর-বাড়ি করে থাকতো। তাদের কোনো সঠিক পরিসংখ্যান কারো কাছেই নেই। এ সিডোরে তাদের কতজন মানুষ সমুদ্রে ভেসে গেছে তার কোনো সঠিক হিসাবও কারো কাছে নেই। তাই প্রকৃত নিহতের সংখ্যা বলা একেবারেই দুরূহ কাজ।

২২ নভেম্বর বরিশালে ফিরে এলে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরল প্রকৃত পরিস্থিতি জানার জন্য। আমরা যা দেখেছি তাই বর্ণনা করলাম সাংবাদিকদের কাছে। আর এভাবেই সিডোর আক্রান্ত দক্ষিণ বাংলায় দুর্গত মানুষের পাশে কিছুসময় অবস্থান করে দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি। #

www.pathagar.com

৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান আর ভারত এ দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। বৃহত্তর বাংলার ২৮টি জেলার মধ্যে ১৭টিকে পূর্বপাকিস্তানে ও ১১টিকে ভারতভূক্ত করা হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুক্তবাংলা ও বিহারের বিরাট জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে (রিফুজিতে)। হায়দরাবাদ-কাশ্মীর-জুনাগড়ের স্বাধীন অস্তিত্ব থাকলেও লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও কমান্ডার ইন চীফের মর্যাদা লাভ করার কারণে সম্পদ ভাগবাটোয়ারার ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

সর্বোপরি পূর্বপাকিস্তান ভারত থেকে আগত এক বিরাট উদ্বাস্তু মানুষের বোঝা মাথায় নিয়েই যাত্রা শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে থাকে।

www.pathagar.com

তৎকালিন পূর্বপাকিস্তানের আঞ্চলিক নেতৃত্বকে সাধারণ মানুষের পক্ষে দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করা হয়। এর ফলে ব্যাপক জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পাকিস্তান সৃষ্টির অল্পদিনের মধ্যেই হাওয়ায় মিশে যায়। যার কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ফেডারেল কাঠামোর প্রতি এই অঞ্চলের মানুষের মনে কোনো ধরণের মোহ-ই আর থাকল না।

এ অবস্থায় ক্রমাগত ইসলামাবাদের বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণের বিরুদ্ধে পূর্বপাকিস্তানে গণঅসন্তোষ দানা বাধতে থাকে। তখন পূর্বপাকিস্তানের তরুণ ছাত্রসমাজের একটি বিরাট অংশ স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে সোচ্চার হয়। একসময় এই ছাত্র আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নিলে পূর্বপাকিস্তানের মানুষ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা করতে থাকে।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর বিক্ষিপ্ত এই ভাবনাকে সাংগঠনিক রূপ দিতে শুরু করে সিরাজুল আলম খান ও আব্দুর রাজ্জাক। আমি সঠিকভাবে বলতে পারবনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই চিন্তার সঙ্গে কতটুকু যুক্ত ছিলেন। তবে ১৯৭০ সালের আগ পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রধান নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই জনগণ মনে করতে থাকে। তাঁকে কেন্দ্র করেই স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ আহুত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ ঘোষণা করা হলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন ও পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের লক্ষ্যে পরিচালিত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা প্রচন্ড হোচট খায়। এমতাবস্থায় পূর্ণস্বাধীনতার পক্ষে বক্তব্য প্রণেতারাই মুখ্য হয়ে উঠে। এরই মধ্যে ৩ মার্চ পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন ছাত্রনেতা আসম আবদুর রব।

অন্যদিকে পাকিস্তান পিপল্স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কট্টরপন্থি জেনারেল টিক্কা খান শক্তি দিয়ে জনগণের দাবি থামিয়ে দিতে উদ্যত হয়। এই উত্তেজনার পটভূমিতে আলাপ-আলোচনার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তানের জনগণের কষ্টার্জিত টাকায় কেনা অস্ত্র যা কিনা

www.pathagar.com

পাকিস্তানের জনগণের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহারের কথা, অথচ সেই অস্ত্রই পূর্বপাকিস্তানের নিরস্ত্র মানুষ হত্যার কাজে ব্যবহার করে পাকিস্তানের অদক্ষ ক্ষমতালিপ্সু সেনাবাহিনী।

২৫ মার্চ রাত ১২টার পর সামরিক জান্তা পূর্ববাংলার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে হত্যা আর ধ্বংসের তান্ডবলীলা শুরু করে। জনগণের নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে প্রথমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও পরে পশ্চিমপাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন কিনা দেশবাসী তার কোন প্রমাণ পায়নি। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ একজন মেজর পদবীর সেনাকর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদান করেন। আমার স্মৃতিশক্তি অনুসারে তৎকালীন মেজর জিয়া বলেন- On behalf of Bangabandu Sheikh Mojibur Rahman, I Major Zia Proclaimed Independent of Bangladesh এবং তিনি বিশ্বের বন্ধুরাষ্ট্র ও জনগণের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান ও সাহায্য করার আহ্বান জানান। শুরু হয় ৯ (নয়) মাসের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ।

২৬ মার্চ ভোর বেলা থেকেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কলকাতা থেকে মুক্তিকামী বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে সংবাদ প্রচার শুরু হয়। সংবাদ বুলেটিনের পাশাপাশি পূর্ববাংলার মানুষকে উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে বাজতে থাকে দেশাত্ববোধক গান।

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা যে প্রত্যাশা নিয়ে গভীর রাতে পূর্ববাংলার ঘুমন্ত নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে রক্তের হুলিখেলায় মেতে উঠেছিল তাতে প্রথম দু'দিন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকায় সামরিক জান্তার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছিল। কিন্তু যখনই বাংলাদেশের একজন উর্ধ্বতন সেনা অফিসার বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধের ঘোষণা দিল, তখনই দেশবাসীর ঘোর কেটে গেল।

যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ঢাকা ত্যাগ করতে শুরু করল রাজনৈতিক দলের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মি। প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল জেলা, মহকুমা, থানা, গ্রামগঞ্জসহ সারাদেশে। বিনাপ্রতিরোধে পাকবাহিনী আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে

www.pathagar.com

পারছে না। পাক সামরিক জান্তা শুরু করলো গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ। নিরাপত্তাহীনতার কারণে জনগণের এক বিরাট অংশ যাত্রা শুরু করল ভারত অভিমুখে। এপ্রিলের ১০ তারিখের মধ্যেই আওয়ামী লীগসহ রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক বিরাট অংশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করল। ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি, ভাসানী ন্যাপ, কাজী জাফর আহম্মেদ ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট সমন্বয় কমিটির সদস্যরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহম্মেদ দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা নিয়ে সরকার গঠন করলেন। ১৭ এপ্রিল অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার সনদ পাঠ করে পাকিস্তানের জেলে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহম্মেদকে প্রধানমন্ত্রী ও খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করে প্রথম বাংলাদেশ সরকারের কাঠমো ঘোষণা করলেন।

জেনারেল ওসমানিকে সেনাবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব প্রদানের পাশাপাশি ভারতের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহম্মেদের নেতৃত্বে মুজিব বাহিনী গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হল। অবশ্য অনেকেই মনে করে, এই আওয়ামী তরুণ নেতারা পূর্ব থেকেই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল। এই বিশেষবাহিনী বাংলাদেশ সরকারও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের অধীনে দায়িত্ব পালন করেনি। সে যা হোক, ক্রমাগত পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভারত জড়িত হয়ে পড়ে। কারণ ১ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হওয়ায় ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতাগ্রহণে বাঁধা দেয়ায় পাক সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ভারতের সরকার সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে।

যদিও ভারতের মূল উদ্দেশ্য ছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি পাকিস্তানকে খন্ডিত করে তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর ভুটান এবং ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে। সে সঙ্গে ভারত বাংলাদেশ যৌথকমান্ড গঠিত হয়।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথকমান্ডের দায়িত্ব প্রদান করা হয় ভারতের পূর্বাঞ্চলের সেক্টর কমান্ডার জগজিত সিং অরোরাকে। মাত্র ১০ দিনের যুদ্ধের মুখে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর এর মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতারও পরিবর্তন হয়। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের পরিবর্তে জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতার মসনদ গ্রহণ করে এবং কারারুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন-দিল্লি হয়ে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবতরণ করেন। ঢাকায় আগমনের আগে দিল্লি বিমানবন্দরে তিনি ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ভারতের সকল রাজনৈতিক দলের নেতারা বঙ্গবন্ধুকে বিমানবন্দরে অভিবাদন জানান। একমাত্র লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের বিদায়ের মূহূর্তে ভারতীয় নেতৃত্ব যেভাবে জাঁকজমক বিদায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিবাদন জানানো হয়েছিল। প্রথমে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিবি-গিরি, দ্বিতীয় অবস্থানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং তৃতীয় স্থানে সর্বোদয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ দন্ডায়মান থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিবাদন জানিয়েছিল।

ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে করমর্দন করে শেখ সাহেব হাত মিলালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। কোনপ্রকার কুশল বিনিময়ের আগেই শেখ সাহেব ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'When you are going to withdraw your army from Bangladesh' ভারতের প্রধানমন্ত্রী অকস্মাৎ এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, When you desire ভারতের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেক শাহসহ সেনাকর্মকর্তারা বঙ্গবন্ধুর এই

www.pathagar.com

আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন। তাদের প্রশ্ন হলো এক কোটি মানুষকে আমরা ৯ মাস আশ্রয় দিয়েছি, খাদ্য দিয়েছি, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র দিয়েছি, ট্রেনিং দিয়েছি, সর্বোপরি ভারতের সেনাবাহিনীর ১৪৩৪৭ জন সেনা এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এর জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কখন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন।

বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীন ও দৃঢ়চেতা মনোবৃত্তির মুখে তৎকালিন ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব পুরোপুরি হতচকিত হয়ে পড়ে। আর এই দৃঢ়মনোবৃত্তির ফলেই মাত্র তিন মাসের মাথায় ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছিল তৎকালিন ভারত সরকার। #

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু হত্যার নেপথ্যের কিছু ঘটনা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একাংশের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একদলীয় বাকশাল শাসনের পতন ঘটে। এর ফলে আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা শেখ মুজিব সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহম্মদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক সামরিক শাসনের সূত্রপাত হয়।

আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করতে চাই। প্রথমত ব্রিটিশবিরোধী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, দ্বিতীয়ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে জনগণের পক্ষে আন্দোলন, তৃতীয়ত ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত হওয়ার শোকাবহ কালোরাতের শেষঅধ্যায়।

এ কথা নতুন করে বলার কোন প্রয়োজন নেই। তবে ইতিহাসের যোগসূত্র ও ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষার তাগিদেই অতিগুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এখানে উপস্থাপন করছি। সবারই জানা আছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জে টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলার একজন সরকারি কর্মকর্তা। সে সুবাদেই তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র। ১৯৩৯ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শনে এলে টিনসেড স্কুলের যে জায়গায় ছিদ্র দিয়ে বৃষ্টির সময় শ্রেণীকক্ষে পানি পড়ত শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে তা অবহিত করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করেই চলে

www.pathagar.com

যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন- স্যার, এই সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার ঘোষণা করে তবেই আপনাকে যেতে হবে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দৃষ্টি পড়ে তখন শেখ মুজিবের প্রতি। সেই থেকেই তিনি এই তরুণ নির্ভীক ছেলেটির প্রতি গভীর স্নেহ ও আন্তরিকতা দেখাতে শুরু করেন।

মুসলিম লীগের রাজনীতি সম্পর্কে যারা অবহিত, তাদের কাছে এটা অজানা নয় যে তৎকালীন বাংলা প্রদেশের মুসলিম লীগ ছিল দু'ভাগে-বিভক্ত। এর এক অংশের নেতা ছিলেন - হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আর অন্য অংশের নেতা ছিলেন - খাজা নাজিমউদ্দিন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও লিয়াকত আলী খাঁনদের মৌন সমর্থন ছিল নাজিম উদ্দিন সাহেবের প্রতি। কিন্তু প্রদেশ মুসলিম লীগের তরুণ নেতৃত্ব মূলত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ঘিরেই কর্মতৎপরতা চালাতে থাকে।

শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পান কলকাতাতেই। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে তিনি সরাসরি রাজনৈতিক দীক্ষালাভ করেন। আসাম থেকে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আসেন পূর্বপাকিস্তানে। যদিও তার নিজের বাড়ি সিরাজগঞ্জ আর শ্বশুড়বাড়ি জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে। কিন্তু তিনি নিজে বাড়ি করেন টাঙ্গাইলের সন্তোষে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর শেখ মুজিবুর রহমান কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকে। কিন্তু গামছা দিয়ে যেমন আগুন চাপা দিয়ে রাখা যায় না, তেমনি শেখ মুজিবকেও বেঁধে রাখা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। পূর্বপাকিস্তানের তৎকালীন নতুন শাসকগোষ্ঠীও তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর পূর্বপাকিস্তানে রাজনীতি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। শ্রী মনোরঞ্জন ধর পরিচালনা করতেন কংগ্রেস। আর মনি সিং, সুকেন্দ্র দস্তিদার ও অজয় মুখার্জিরা করতেন কমিউনিস্ট পার্টি। নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানীদের কাছে তাদের কোনো রাজনৈতিক আবেদনই ছিল না। কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ছিল তখন প্রবল।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি। তাঁকে কেন্দ্র করেই প্রথমে একটি বিরোধী দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের শেষদিকে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খাঁন, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ, তোফাজ্জল

www.pathagar.com

হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ শুরু করেন নতুন উদ্যোগ। এই প্রক্রিয়াকে বাস্তবে রূপ দিতেই গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। এ সংগঠনের প্রথম সভাপতি হন - মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী, আর সাধারণ সম্পাদক হন - শামসুল হক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন যথাক্রমে - শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ। এভাবেই শুরু হয় পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিরোধী দলের শুভ যাত্রা।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। একদিন পর ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিচক্ষণ করম চাঁদ গান্ধী, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকেই স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। স্বাভাবিক কারণেই লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতের স্বার্থকে সুরক্ষা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানকে মূলত কোনো ন্যায়সঙ্গত সম্পদ প্রদান করা হয়নি। অন্যদিকে পূর্বপাকিস্তান ছিল একেবারেই বঞ্চিত। পূর্বপাকিস্তানে যারা সরকার পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তারা ছিল প্রশাসন পরিচালনায় অনভিজ্ঞ। জনগণের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না বললেই চলে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই অল্পসময়ের মধ্যে তারা গণবিবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এরই মধ্যে আবার বাংলাভাষা নিয়ে নানারকম ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ফলে বাংলা ভাষাকে অবমুল্যায়নের প্রতিবাদে পুর্ববাংলাব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। মূলত ভাষা-আন্দোলনের সূত্রধরেই পূর্বপাকিস্তানে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট এর নিকট ৭ বছরের মধ্যেই পরাভূত হয় মুসলিম লীগ সরকার। কিন্তু কেন্দ্রের আমলা-সামরিক-জান্তার যৌথ ষড়যন্ত্রের কারণে যুক্তফ্রন্ট বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। বার বার যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বের পরিবর্তন ও সংঘাত রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে।

অবশেষে ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার আলী মির্জা ও আইয়ুব খানের সামরিক শাসন পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করে। শেরেবাংলা একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর

www.pathagar.com

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানই পূর্বপাকিস্তানের জনগণের প্রধান নেতা হিসেবে পরিগণিত হন।

১৯৬৬ সালে প্রণীত শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৬ দফা কর্মসূচিকে পূর্বপাকিস্তানের জনগণের একটি বিরাট অংশ মুক্তির সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। সর্বোপরি আইয়ুব-মোনায়েম খানদের শেখ মুজিবকে ফাঁসানোর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে পূর্বপাকিস্তানের জনগণ সহজভাবে গ্রহণ করেনি। বিশেষকরে জাগ্রত ছাত্র সমাজ উপলব্ধি করতে শুরু করে পূর্বপাকিস্তান, পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কর্তৃক উপেক্ষিত হচ্ছে। এমনকি পূর্বপাকিস্তানের ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল মূলত অবাঙালি ব্যবসায়িদের নিয়ন্ত্রণে। এটাও পূর্বপাকিস্তানের জনগণ বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করে। এ পটভূমিতে ছাত্র-জনতার ৬ ও ১১ দফা কর্মসূচি পূর্বপাকিস্তানের ব্যাপক জনগণ তাদের নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলে গ্রহণ করে।

কারারুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে তারা গ্রহণ করে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মূর্তপ্রতীক হিসেবে। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। সরকার বিনাশর্তে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সব মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পূর্বপাকিস্তানের মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী গোল টেবিল বৈঠক বর্জন করে। এ প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে আইয়ুব খানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন ইয়াহিয়া খান। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে তিনি অঙ্গিকার করেন অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করার।

সেভাবেই ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পাকিস্তানের ৩০০টি আসনের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানের ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। এর ফলে এককভাবেই সরকার গঠনের মত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয় আওয়ামী লীগ। কিন্তু পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর পূর্ণস্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠাই ছিল আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে এর বাইরে অন্য ধারাটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। মূলত সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক এই অংশের নেতৃত্বে ছিলেন।

১৯৭০ সালে বহু আলোচনা পর্যালোচনার পরও জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত

www.pathagar.com

ঘোষণা করলে পূর্বপাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ দফা দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।

২৫ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সামরিক জান্তা ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রদানে ব্যর্থ হয়ে সামরিক জান্তা ২৫ মার্চ রাতে ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে তারা হাজার হাজার ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ইপিআর-কে হত্যা করে। মৃত পাকিস্তানের কফিনের ওপর শেষপেড়েক ঢুকিয়ে দিয়ে তারা আলোচনার দ্বার চিরতরে বন্ধ করে দেন। আর এ প্রেক্ষাপটেই শুরু হয় সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ। সেসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন পাকিস্তানের সামরিক জান্তার হাতে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন, দিল্লি হয়ে ঢাকায় আসেন ১০ জানুয়ারি। নিজেই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ নেতৃত্বদানকারী তাজউদ্দিন আহম্মেদকে ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন করে ফেলেন এবং মুজিববাহিনী ও ছাত্রলীগ বিভক্তির দিকে পা বাড়ায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র ৫০ দিনের মাথায় অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১ মার্চ মুজিববাহিনী ও ছাত্রলীগ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে শেখ ফজলুল হক মনি ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগ-এর নূরে আলম ছিদ্দিকী-মাখন গ্রুপ। অন্যদিকে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে রব-শাহজাহান সিরাজ গ্রুপ। এই রব-শাহজাহান সিরাজ গ্রুপ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ভূমিকা পালন করেছিল এ দলটি।

একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। আর তা হচ্ছে - ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর মাত্র ২ মাসের মধ্যে কি এমন প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যে, নবগঠিত সরকারের বিরুদ্ধে একটি মারমুখি বিরোধী দল গড়ে তুলতে হবে? এমন একটি বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে ২ মাস কিংবা ২ বছর কোনো যথেষ্ট সময় নয়। দ্বিতীয়ত - যে নতুন দলটির জন্ম দেয়া হল তাদের বেশির ভাগ কর্মিই বের করে আনা হলো শেখ

www.pathagar.com

মুজিবের দল থেকে। এই উদ্যোগ কার স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল, ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়নের জন্যই তা নির্ধারণ করা অতিগুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্ব-পরিবারে নিহত হলে যারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন তারা প্রায় সকলেই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহকর্মি। কিন্তু তাদের বক্তব্য একটু ভিন্নধরণের। যারা ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির পর বঙ্গবন্ধুকে ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেছিলেন তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মূলত ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে নিখিল চন্দ্র সেনের লেখা বই "ইন্দিরা দুরদর্শন"-এ বিধৃত একটি চাঞ্চল্যকর তথ্যের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। উক্ত বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠায় ইন্দিরা গান্ধীর একটি মন্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে উল্লেখ্য করা হয় –

"কংগ্রেসের মধ্যে শ্রী চন্দ্র শেখরের নেতৃত্বে একটি উপদল সংগঠিত হয়, তারা নিজেদের তরুণ তুর্কি বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। আর মুরারজী দেশাইরা দক্ষিণপন্থি অবস্থানে থেকে আমাকে আক্রমণ করতেন। কিন্তু আমাকে আক্রমনের সময় উভয়গোষ্ঠীর ভূমিকাই ছিল অভিন্ন 'শুধুমাত্র ভাষা' ছিল দুই ধরনের"।

আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতাকারী কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের ভূমিকাও এক এবং অভিন্ন। ১৯৭৫ সালের পর ৩১ বছর অতিবাহিত হয়েছে এই পটপরিবর্তনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের অনেকেই আবার ফিরে এসেছেন- বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন দল আওয়ামী লীগে। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ, তাহেরউদ্দিন ঠাকুরসহ জনাকয়েক ব্যক্তি।

এরই মধ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের উপর কোনো প্রকার বিচার বিভাগীয় তদন্তগ্রহণ করা হয়নি বরং খন্দকার মোস্তাক সরকারের উপরাষ্ট্রপতি জনাব মোহাম্মদ উল্যাকে ফুলের মালা দিয়ে আওয়ামী লীগে ফিরিয়ে নিয়েছেন শেখ হাসিনা। এখন আবার বন্ধবন্ধু হত্যার বিচারের শ্লোগান তোলা হচ্ছে। আমি প্রশ্ন রাখতে চাই বঙ্গবন্ধু হত্যা বিচারের এই দাবি কার কাছে?

আমার বিনীত প্রশ্ন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় আপনারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করেননি কেন? এর রহস্য উন্মোচন হওয়া এখন অতীব জরুরি। #

www.pathagar.com

১৬ মে ১৯৭৬
মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা অভিমূখে ঐতিহাসিক লং-মার্চ

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুনরাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম হয়। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে অনাদিকাল থেকে মানব সভ্যতার গোড়া পত্তন হয়। সভ্যতার বিকাশে পানির গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। ভারতবর্ষের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর আর উত্তরে হিমালয়। এ দু'য়ের মহিমায় জলবায়ু প্রবাহের মধ্যে সৃষ্ট বৃষ্টি আর পানির প্রাকৃতিক প্রবাহ। এই অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা ও সভ্যতায় নৌ-পথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা আর নদীকেন্দ্রিক যোগাযোগের পথ ধরে এ অঞ্চলে মানব সভ্যতার উত্থান ঘটেছে। এই অঞ্চলের জীবন প্রবাহে পানি ও নদী প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানির উৎস বা উৎপত্তি হিমালয়ের পাদদেশে। পানির বিশাল প্রবাহ চীন, নেপাল, ভারত হয়ে বাংলাদেশের বুক চিরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই অঞ্চলের মিঠা পানির প্রধান উৎস হচ্ছে গঙ্গা-পদ্মা প্রবাহ। এই গঙ্গা-পদ্মার পানি প্রবাহের উপর নির্ভর করেই নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের অর্থনীতি, কৃষিনীতি, মৎস্য উৎপাদন এবং নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সর্বোপরি প্রাকৃতিক ভারসাম্যও গড়ে উঠেছে এই পানি প্রবাহের উপর নির্ভর করে ।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট ভারত বিভক্তির মধ্য দিয়ে নদীপ্রবাহও বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পটভূমিতে অরুণাচল অঞ্চল ভারতের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কৌশলগতভাবে আসাম-ত্রিপুরার নিরাপত্তা হুমকির মুখে পতিত হয়। এ অবস্থায় ভারতের ভৌগোলিক নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টারা উপলব্ধি করেন গঙ্গার উপর দিয়ে দ্রুত যুদ্ধসরঞ্জাম পূর্বাঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে পানিপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই পরিকল্পনার আলোকেই ১৯৬৪ সালে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মিত হয়। মূলত পানির নিয়ন্ত্রণ ও যুদ্ধকালীন সময়ে পানিপথে সংযোগ ব্যবস্থা চালু রাখতে গড়ে তোলা হয় ফারাক্কা বাঁধপ্রকল্প। পাকিস্তান ভারতের এই পানি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গণে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ১৯৭২ সালে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়। এরই মধ্যে রক্তক্ষয়ি স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭৪ সালে ভারত পরীক্ষামূলকভাবে ফাঁরাক্কা বাঁধ চালু করার কথা বলে বাংলাদেশের সমর্থন আদায় করে বাঁধ চালু করলেও অদ্যাবধি তা আর বন্ধ করা হয়নি।

ফারাক্কা বাঁধ চালু, মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে একটি নদী একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে ভাটির দেশের অনুমতি না নিয়ে উজানের দেশ নদীর পানি প্রবাহে কোনোক্রমেই বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে না। এই আইন অমান্যকারী দেশ ভাটির দেশকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির মাধ্যমে ফারাক্কা বাঁধ চালু হয়। এই সময় বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রী ছিলেন খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ আর ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রী ছিলেন বাবু জগজীবন রাম। উভয়েই স্ব-স্ব দেশের মন্ত্রী পরিষদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। সেই সময় পানিউন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন বি এম আব্বাছ। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত পরিচিত ও আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা হন তিনি।

১৯৭৪ সালে ফারাক্কা বাঁধ চালুর প্রসঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হতে থাকে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সেই সময়ে অত্যন্ত মধুর ছিল বলে সকল রাজনৈতিক মহল বিশ্বাস করতো। কিন্তু পানি বন্টনের প্রশ্নে ভারতীয় পক্ষের আচরণ ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা খরা মৌসুমে বাংলাদেশকে মাত্র ৩৪ হাজার কিউসেক

www.pathagar.com

পানি প্রদানের প্রস্তাব করে এবং কোনো প্রকার গ্যারান্টি ক্লোজ রাখতে রাজি হয় নি। খন্দকার মোস্তাক আহমেদ এই অসম চুক্তি সম্পাদন করতে রাজি হতে বার বার অপারগতা প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বলেন, '১৯৭১ সালে দুই দেশের জনগণ একসঙ্গে রক্ত দিয়ে শান্তিতে বসবাসের জন্য বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছেন। আজ পানি প্রত্যাহার করে ভারত সরকার বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করবে তিনি তা বিশ্বাস করতে চান না।'

ফলে ভারতীয়দের চাপে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদকে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট বোনের স্বামী আব্দুর রব সেরনিয়াবাতকে বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী করা হয়। আর এভাবে মুজিব-ইন্দিরা অসম পানিচুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশ ভারতের পানি লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত প্রতিবাদের সকল পথ পরিহার করে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহার নীতিকে সমর্থন দেয়। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির মধ্য দিয়ে তার আইনগত বৈধতা প্রদান করা হয়।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের পটপরিবর্তন ও বৈরি পানিনীতি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হলে-বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ দিনের রাজনেতিক সহকর্মি খন্দকার মোস্তাক আহাম্মেদ, আবু সাইদ চৌধুরী, শ্রী মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে গঠিত হয় মুজিব পরবর্তী বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে সামরিক সরকার (Civil Marshal Law)।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ খন্দকার মোশ্তাক আহম্মেদ সরকারকে অপসারিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। সে সময় অত্যন্ত বিশৃংখল পরিস্থিতি চলতে থাকে দেশব্যাপী। সেনাবাহিনীর চেইন অফ কমান্ড ভেঙ্গে যায়। সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করা হয়। এরই মধ্যে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বে সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্ত হন এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ক্ষমতার পটপরিবর্তন ঘটে।

www.pathagar.com

দৃশ্যপটে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। মুজিবভক্ত বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে সীমান্তে শুরু হয় বিভিন্ন ধরণের গোলযোগ। অন্যদিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের প্রাপ্য পানিটুকুও দেয়া থেকে বিরত থাকে।

এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের প্রতিবাদে ফারাক্কা লং-মার্চের ঘোষণা প্রদান করেন। দিনক্ষণ নির্ধারিত হয় ১৬ মে। ১৫ মে সকাল ১০টায় রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে জনসমাবেশ এবং ফারাক্কা অভিমুখে পায়ে হেঁটে গণমিছিলের কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়।

এই গণমিছিল পরিচালনার জন্য মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে আহ্বায়ক করে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। জনাব মশিউর রহমান যাদু মিয়া, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম, মাওলানা আব্দুল মতিন, আনোয়ার জাহিদ, কাজী জাফর আহম্মেদ, সিরাজুল হোসেন খান, গাজী শহিদউল্লাহ, এনায়েত উল্লাহ্ খান এবং আমাকেও এই কেন্দ্রীয় লং-মার্চ পরিচালনা কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে মওলানা ভাসানীর চিঠি

মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী কেন এই লং মার্চের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। কি তার উদ্দেশ্য তা অবহিত করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে এক ঐতিহাসিক পত্র প্রদান করেন। জনাব এনায়েত উল্যা খান, সিরাজুল হোসেন খান ও আনোয়ার জাহিদ এই পত্র প্রণয়নে সহযোগিতা করেছিলেন। মজলুম জননেতা মওলান ভাসানী তাঁর পত্রে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লিখেন- তাঁর পিতা পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের সংগ্রামী জীবনে তার নিজের ঘনিষ্ঠতা ছিল। একইসঙ্গে ভারতবর্ষের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নিজের অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করেন চিঠিতে। এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী শ্রদ্ধেয় জননেতা মওলানা ভাসানীর পত্রের উত্তর দিলেন। কিন্তু কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেলেন পানিসমস্যা সমাধানের কথা।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে মজলুম জননেতা আমাদের বললেন, ইন্দিরা গান্ধী কিংবা জ্যোতি বসুর হৃদয়ে বাংলাদেশের জন্য কি পরিমাণ ভালবাসা আছে তাতে কিছুই আসে যায় না। কারণ রাষ্ট্রের কোন বন্ধু নেই। রাষ্ট্রের আছে শুধুমাত্র স্বার্থ Country has no friend. It has only interest. তিনি আরও বললেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যেমন সত্য, তেমনি ভারতও এই অঞ্চলে একটি আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে সেটাও আজ ঐতিহাসিক বাস্তবতা। তৃতীয় বিশ্বের মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া জনগণের অন্য কোন বিকল্প নেই। পরিশেষে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে হাজার হাজার প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মি রওয়ানা হলো ১৩ ও ১৪ মে'র মধ্যে রাজশাহী পৌঁছার অভিযাত্রায়।

ফারাক্কা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে আহ্বায়ক ও মোহাম্মদ কামাল ইবনে ইউসুফ, আব্দুর রাজ্জাক সরকার, শামছুল হক, ডাঃ গোলাম হোসেন, সালে ইমাম চৌধুরী, মজনু খান এবং জামাল শরীফ হিরুর নেতৃত্বে গঠন করা হয় ফারাক্কা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ লং-মার্চ পরিচালনা কমিটি। দেশব্যাপী কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতি, ছাত্র জনতার মধ্যে ব্যাপক জাগরণের সৃষ্টি হয়। সর্বস্তরের রাজনৈতিক কর্মিরা সংগঠিত হতে থাকে। রাজশাহী থেকে ফারাক্কা অভিমুখে লং মার্চে অংশগ্রহণের জন্য সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক লেখালেখি শুরু হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হতে থাকে। অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করা হয় ৫৬, মতিঝিলে আবু নাসের খান ভাসানী সাহেবের অফিসে। এভাবে চলতে থাকে ফারাক্কা লং মার্চের প্রস্তুতি।

ফারাক্কা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে আমার ভালো যোগাযোগ ছিল এবং সমন্বয় সাধন করে আমরা কাজ করে যাচ্ছিলাম। রাজশাহীর সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন জননেতা এমরান আলী সরকার। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আব্দুর রাজ্জাক সরকার। ১০ মে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দ ঢাকা ত্যাগ করেন লং-মার্চ উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করার জন্য। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করাই আমাদের লক্ষ্য। আমি দু'টি বাস বোঝাই করে রাজনৈতিক সহকর্মিদের নিয়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হই ১৩

www.pathagar.com

মে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও আব্দুর রাজ্জাক সরকার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গেইটেই অভ্যর্থনা জানান। রাতে আমরা আর শহরের দিকে গেলাম না। সকলে মিলেমিশে আমরা এখানেই রাত যাপন করলাম। রাতে আমাদের হল ক্যান্টিনে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পরের দিন সকাল ১০টার দিকে আমিসহ গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী, রাজ্জাক সরকার ও সালে ইমাম চৌধুরী একত্রে গেলাম এমরান আলী সরকারের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন রাজশাহী পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। আমাদের মত আরও অনেকে সারা দেশ থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। খুলনা থেকে গাজী শহিদউল্লাহ, যশোর থেকে তরিকুল ইসলাম ও খালেদুর রহমান টিটুর এবং রবিশাল থেকে বাবু সুনীল গুপ্তের নেতৃত্বে বিশাল কর্মিবাহিনী ইতোমধ্যে রাজশাহীতে উপস্থিত হয়। এভাবে ১৪ মে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত সারা দেশের প্রগতিশীল নেতা কর্মিরা রাজশাহীতে উপস্থিত হতে থাকে। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় রাজশাহী এসে উপস্থিত হলেন। পরদিন ১৫ মে সকাল ১০টায় ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দানে গণজমায়েত। তার পর চাঁপাইনবাবগঞ্জ হয়ে সোনা মসজিদ অভিমুখে লং-মার্চ শুরুর প্রস্তুতি চলছিল পুরোদস্তর। সকাল ১০ টার মধ্যেই মাদ্রাসা ময়দান কানায় কানায় ভরে গেল। ব্যারিস্টার সলিমুল্যা হক খান মিলকী, আবু নাসের খান ভাসানী ও গাজী শহিদুল্লাহকে সঙ্গে নিয়ে ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে সভামঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ঐতিহাসিক দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ

১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর শতাব্দির গণমানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের সিংহপুরুষ মওলানা ভাসানী ইন্তেকাল করেন। ১৯৭৬ সালের ১৫ মে রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানেই সম্ভবত তার শেষ ঐতিহাসিক ভাষণ। এর পর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঘরোয়া বৈঠক ছাড়া কোনো বড় জনসভায় বক্তব্য রাখেননি। সব মহান নেতারই জাতির উদ্দেশে একটি দিক নির্দেশনামুলক বক্তব্য থাকে। ভারতের স্থপতি করমচাঁদ গান্ধী গুলিবিদ্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে বলেছিলেন, হে রাম তুমি ভারতের হিন্দু, মুসলমানসহ সকল সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

মানুষকে রক্ষা কর। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ বলে গণ্য করা হয়। ঠিক তেমনি ১৯৭৬ সালের ১৫ মে'র ভাষণটিও মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর জাতির উদ্দেশ্যে তার দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ হিসাবে দেশবাসী গণ্য করেছে।

সকাল সাড়ে ১০টায় বক্তব্য প্রদানের জন্য মওলানা ভাসানী উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ মানুষের কোলাহলমুখর মাদ্রাসা ময়দানে মুহূর্তের মধ্যেই পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো। মওলানা ভাসানী তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। স্মৃতিচারণ করলেন খেলাফত আন্দোলনে মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা। স্মৃতিচারণ করলেন করমচাঁদ গান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র কথা। শ্রদ্ধা জানালেন ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতির প্রতি।

অশীতিপর বৃদ্ধ জননেতা মওলানা ভাসানী যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল রাজশাহীর মাটি যেন থর থর করে কাঁপছে। মাঠের আশেপাশে তিলধারণের ঠাঁই ছিলনা। জনতার মধ্য থেকে হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল- লও -লও-লও সালাম - মওলানা ভাসানী। আর মওলানা ভাসানীর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল সিকিম নয়, ভূটান নয়, এদেশ মোদের বাংলাদেশ। মওলানা ভাসানী অনেক কথাই বললেন, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল - আধিপত্যবাদীরা বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ পানি, গ্যাস, লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতে চায়। তারা বাংলাদেশে নতুন করে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির গোড়াপত্তন করতে চায়। তারা সিকিম ভূটানের মত বাংলাদেশকে মর্যাদাহীন সার্বভৌমত্বহীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। এমনকি তারা বাংলার মানুষকে প্রতারিত করার জন্য নব্য মীর জাফর আলী খান ও লেন্দুপ দর্জি সৃষ্টি করতে চায়।

তিনি দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আধিপত্যবাদী শক্তির এ সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে হলে জনতার গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। তিনি তরুণ ছাত্র জনতাকে সার্বভৌমত্ব নিরাপদ রাখার জন্য মীরজাফর আলী খান, লেন্দুপ দর্জি ও ঘসেটি বেগমদের সম্পর্কে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। ১১.১০ মিনিটে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে শুরু হয় ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিল। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী একটি খোলা জীপে করে জনতার গণমিছিলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। রাজশাহী থেকে চাপাইনবাগঞ্জ ৩২ মাইল পথ। লক্ষ লক্ষ মানুষ পায়ে হেঁটে চলছে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা অভিমুখে। রাস্তার দু'ধারে বৃদ্ধ

www.pathagar.com

নারী শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষ এসেছে পানি, মুড়ি, চিড়া আর কাঁচা আম নিয়ে মিছিলকারীদের সহানুভূতি জানাতে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। দূর থেকে এই আন্তরিক জনজাগরণ বোঝা যায় না। মওলানা ভাসানী সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এসে উপস্থিত হলেন। সন্ধ্যা ৭টায় ফারাক্কা লং-মার্চে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে বের হলো ঐতিহাসিক মশাল মিছিল। সকল ছাত্র সংগঠনের নেতারাই সেই মিছিলে অংশ নিয়েছিল। মশাল মিছিলের শ্লোগান ছিল - "ফারাক্কা তোড় দেংগা, নেতিজা জোবি হোগা"। পরদিন সকাল ৮টার দিকে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা অভিমুখে মিছিল শুরু হল। নদীর উপরে নৌকা দিয়ে সেতু তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ফারাক্কা পাদদেশ সোনা মসজিদ পর্যন্ত ১৫ মাইল পথে কানসাট উপজেলায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আসরের নামাজ আদায় করলেন ঐতিহাসিক সোনা মসজিদে। নামাজের পর তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

এর প্রতিক্রিয়াতে নতুন করে আস্থার সৃষ্টি হলো। দেশবাসীর মধ্যে সেই থেকে গড়ে উঠতে শুরু করলো জাতীয়তাবাদী শক্তির মহান ঐক্য। #

www.pathagar.com

আমাদের দেশ ও জাতীয় সম্পদের উৎস

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ বাটোয়ারার ভিত্তিতে যে অংশটি পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে চিহ্নিত হয়, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সেই ভূ-খন্ডটি নিয়েই আজকের বাংলাদেশ। ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি রেডক্লিফ ও নেপথ্য থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি শ্রীকৃষ্ণ মেনন বাংলা প্রদেশকে এমনভাবে বিভক্ত করেন, যার ফলে একই পরিবারের বসতঘরটি পড়ে পাকিস্তানের মধ্যে আর রান্নাঘরটি পড়ে ভারতের মধ্যে। এই বাস্তবতা নিয়েই আজকের বাংলাদেশ।

জাতি হিসেবে একটি দেশের উন্নয়ন ও টিকে থাকার জন্য তার নেতৃত্বকে প্রথমই ঠিক করতে হবে। সে সঙ্গে দেশের জাতীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও জনগণের

www.pathagar.com

জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আমাদের দেশের সরকারগুলো এসব ব্যাপার নিয়ে কখনও মাথা ঘামিয়েছে বলে মনে হয় না। তাদের কর্মকান্ডে এর কোনই প্রতিফলন ঘটেনি। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে আসার পর প্রকৃত অর্থে একটি কার্যকরি সরকার গঠিত হয়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা স্থিতিশীল সরকার গঠনের জন্য উপযোগি হবে। কিন্তু বাস্তবে হলো তার উল্টোটা। যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থা তো ছিলই, পাশাপাশি দলীয় দুর্নীতি, দলীয় ভাঙ্গন ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির ফলে বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক শাসন টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হন। প্রতিষ্ঠা করা হলো একদলীয় শাসনব্যবস্থা এবং এর ফলে ষড়যন্ত্র বাসা বাঁধলো ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতেই। সেই থেকে আজ পর্যন্ত কোনো নেতৃত্বই এই সঙ্কট নিরসনে কার্যকর কোন উদ্যোগ নিতে পারেননি।

আমাদের জাতীয় সম্পদ ও পরিকাঠামোর নিরিখে ভূমি পানি ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার আর উন্নয়নের কৌশলপত্র তৈরি করতে হবে অতি দক্ষতার সঙ্গে।

ভূমি

৫৬ হাজার বর্গমাইল জায়গা নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ। আমরা প্রায়ই বলে থাকি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। আবেগের ক্ষেত্রে এর একটি গুরুত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয়ে আমাদের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আমরা যদি দেশটির উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম হিসেবে বিন্যস্ত করি তাহলে আমাদের বলতে হবে তেঁতুলিয়া থেকে কুয়াকাটা ও টেকনাফ থেকে তালপট্টি। এই হচ্ছে আমাদের মাটি বা ভূমির ভৌগোলিক পরিসর। অর্থাৎ তেঁতুলিয়াতে আমাদের ভূখন্ডের ব্যাস খুবই সামান্য। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কুয়াকাটা থেকে টেকনাফ পর্যন্ত দক্ষিণে আমাদের ভূখন্ডের ব্যাস প্রায় ছ'শ কিলোমিটার। এ থেকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আমরা সমুদ্রের মধ্যে দু'শ

www.pathagar.com

কিলোমিটারের উপরের সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী। অর্থাৎ কুয়াকাটা ও টেকনাফ থেকে দু'শত কিলোমিটার দক্ষিণে সমুদ্রের মধ্যে আমাদের ভৌগোলিক এলাকার ব্যাস হবে এক হাজার কিলোমিটার।

এখন আমাদের দায়িত্ব মূল ভূখন্ড ও সমুদ্রসীমা চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে আমাদের সম্পদ নির্ণয় করা। আমরা হিসাব করলে দেখতে পাব আমাদের মূল ভূখন্ডের প্রায় দ্বিগুণ আয়তন হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত ভৌগোলিক এলাকা। যেখানে আমাদের পূর্ণ-সার্বভৌমত্ব আছে। আমরা সকলেই জানি বাংলাদেশ একটি গ্রীষ্মপ্রধান নদীমাতৃক দেশ।

পানিসম্পদ

একটি দেশের জন্য পানিসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য জীববৈচিত্র্য এমনকি কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে পানির কোনো বিকল্প নেই। অর্থাৎ ফসল উৎপাদন, মৎস্য উৎপাদন, মানুষ ও প্রাণীকুলের বেঁচে থাকা সর্বোপরি শিল্পোৎপাদনের জন্য পানিসম্পদ অপরিহার্য। আমাদের দেশের জন্য পানির উৎস ও চাহিদা হচ্ছে দু'প্রকার। প্রথমত ঃ মিঠাপানি, দ্বিতীয়ত ঃ সমুদ্রের লোনা পানি। মিঠাপানির উৎস আবার দু'প্রকার। প্রথমত ঃ- নদীবাহিত পানি যা আমাদের জাতীয় চাহিদার ৮০ ভাগ ও বৃষ্টির পানি যা আমাদের জাতীয় চাহিদার ২০ ভাগ পূরণ করে থাকে।

মানবসম্পদ

বাংলাদেশের লোক সংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। এই ১৫ কোটি মানুষকে এক জাতি ও সম্পদে পরিণত করতে হলে এর সুশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছরই প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ কর্মজীবী হিসেবে বের হয়ে আসছে। এই নতুন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মধ্যেই জাতি টিকে থাকতে পারে। ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায় আছে। কিন্তু সকলের জন্য

www.pathagar.com

যেটা প্রয়োজন তা হলো কর্মের সংস্থান। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব, তা নির্ধারণ করতে হবে জাতীয় নেতৃবৃন্দকেই।

প্রথমত- এক জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে প্রাথমিক স্তরে একই ধরণের শিক্ষা ও মননশীলতা সৃষ্টির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তাতে মানসিকভাবে জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। ভারতীয় উপ-মহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ইউরোপ আমেরিকাতে বর্ণবাদ সমার্থক। মুখে আমরা যাই বলি না কেন, সমাজের এই বাস্তবতা ও বিভাজনের ইতিহাস সামনে রেখেই জাতীয় ঐক্য ও একটি জাতি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ নির্মাণ আমাদের মূল লক্ষ্য। মূলত বাংলাদেশ হচ্ছে বাঙালি মুসলমান অধ্যুষিত জনপদ তারপর হিন্দু সম্প্রদায়ও এখানে একটি বিশাল সম্প্রদায়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে যে বিভাজন হয়েছিল তার ফলেই বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হিসাবে গণ্য হয়েছে। তথাপি বাংলাদেশে সব সম্প্রদায়ের মানুষই নমনীয় বা পরস্পরের প্রতি সহনশীল। সাম্প্রদায়িক সংঘাত এই অঞ্চলে কোন সময়ই ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেনি। ঈদ-পুজা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও এর মধ্যে সার্বজনীন সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়।

সব সমাজেই সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে অর্থনীতি সর্ম্পকিত বিষয়াদি। আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশ আমেরিকাতেও ১৯৫৫ সালের আগে সাদা-কালোরা বাসে পাশাপাশি বসতে পারতো না। এর গোড়ায় রয়েছে প্রথমত অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরে এ বৈষম্য রূপান্তরিত হয়েছে সামাজিক স্তরে। প্রায় সাতশ' বছর ভারতীয় উপ-মহাদেশে মুসলিম শাসকরা রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করেছেন এর মধ্যে আওরঙ্গজেবের মত কট্টর শাসকের কারণে সাম্প্রদায়িকতা সমাজ জীবনের সর্বস্তরে বাসা বাঁধে। আওরঙ্গজেবের কট্টর সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে- 'হিন্দুসমাজের উপর জিজিরা করারোপসহ নানাধরণের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক আচরণ।

১৭৫৭ সালে পলাশি ট্র্যাজেডির পর ব্রিটিশ শক্তি ১৯০ বছর হিন্দুদের উপর নির্ভর করেই মুসলিম শক্তি ও তাদের আভিজাত্যকে ধুলাই মিশিয়ে দিয়েছিল। এরই পরিণতিতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-হিন্দুস্তানের সৃষ্টি। এই পাকিস্তান আন্দোলনে

www.pathagar.com

সবচাইতে বেশি ভূমিকা পালন করে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও শেরবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ। কায়েদে আজম, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক দক্ষতার ফলেই ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৭টি আসনেই জয়লাভ করেছিল মুসলিম লীগ। যার কৃতিত্ব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী-পন্ডিত আবুল হাশিমদেরই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাতে গড়া রাজনৈতিক সংগঠনের উত্তরাধিকারী। ১৯৭১ সালে তিনি এ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির জনক হন। এই আর্থসামাজিক অবস্থা নিয়েই আমাদের নতুন রাষ্ট্রের সার্বিক ঐক্য ও উন্নয়নের পথপ্রর্দশন করতে হবে।

অতীতের হিন্দু মুসলমানদের তিক্ততার মূলস্থান হচ্ছে জমিদারী শোষণ। হিন্দু জমিদাররাই ছিল শোষক। আর মুসলমানরা ছিল শোষিত প্রজা। জমিদারের নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে বাঁচার রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলেই কৃষক-প্রজাস্বত্ত্ব আইনপ্রতিষ্ঠা লাভ করে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক চড়াই-উৎরাই পার হয়েই আমাদের আজকের এই অবস্থানে আসতে হয়েছে। সমাজে কোনো উন্নয়ন হয়নি এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি কোনোক্রমেই একমত পোষণ করি না। জাতি উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাটা সম্পূর্ণভাবে এখনো বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

একটি জাতির উন্নয়নের জন্য দু'টি মৌলিক ব্যবস্থা প্রধান উপাদান। প্রথমত-শিক্ষাব্যবস্থা, দ্বিতীয়ত-যোগাযোগ ব্যবস্থা। এখন পর্যন্ত আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একমুখী কারিকুলামের মধ্যে আনতে পারিনি। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রশ্নে সততার সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এক যুগান্তকারি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রশ্নকে বাদ দিলে তার অবদান যোগাযোগ ব্যবস্থায় অবিস্মণীয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রকৃত অর্থে শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের কি দরকার? এক জাতীয় মননশীলতা সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন করে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়েই করতে

www.pathagar.com

হবে বাধ্যতামূলক। মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইসলাম শিক্ষা, হিন্দু ছাত্রদের জন্য হিন্দুধর্মীয় শিক্ষা। অন্য কারিকুলামগুলো থাকবে সকল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তাহলেই এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন প্রজন্ম বড় হয়ে উঠবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নির্ভুল বস্তুনিষ্ঠ তথ্য আমাদের ইতিহাস কারিকুলামের মধ্যে যুক্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি এবং তা হতে হবে দলীয় স্বার্থ ও আবেগ মুক্তভাবে।

শ্রমবাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। প্রায় ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে বর্তমানে ৮০ লক্ষ্য মানুষ বিদেশি শ্রমবাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাপান পর্যন্ত আমাদের শ্রমবাজার বিস্তৃত। পাঁচজন অদক্ষ শ্রমিকের সমান একজন দক্ষ শ্রমিকের আয়। তাই অদক্ষ শ্রমিকের পরিবর্তে দক্ষশ্রমিক গড়ে তোলাই হবে আগামী দিনের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, নার্স গাড়ির ড্রাইভিংসহ অন্যান্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে সহজতর করে তুলতে হবে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য খামার প্রতিষ্ঠা, কুটিরশিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে সর্বস্তরে। তাহলেই বেকার সৃষ্টির শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে কর্মমুখি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এর ফলে মানবসম্পদ পরিণত হবে জাতীয় সম্পদে।

সমুদ্রসম্পদ

আমাদের ভূখন্ডের তুলনায় সমুদ্রের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ। প্রথমেই বিবেচনায় নিতে হবে জাতীয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। এর ব্যবহারকে বহুমুখী করে তুলতে পারলে আমাদের অর্থনীতির মান অবশ্যই উন্নততর হবে।

প্রথমত ঃ সমুদ্রের উপরিভাগের মৎস্যসম্পদ ও লবণ সম্পদ আমাদের জন্য খুবই জরুরি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত ঃ আমাদের সকলেরই জানা থাকার কথা বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক গ্যাস সমৃদ্ধ দেশ। আমাদের সমুদ্রসীমার মধ্যে গ্যাসের পাশাপাশি পেট্রোল প্রাপ্তির রয়েছে সুবর্ণ সম্ভাবনা। সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক খণিজসম্পদ রক্ষাও ব্যবহারের জন্য জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা করা খুবই জরুরি।

তৃতীয়ত ঃ সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম ও মঙ্গলাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমুদ্রবন্দর হিসাবে গড়ে তুলতে পারলে জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশই আসতে পারে এই উৎস থেকে।

বিগত ৩৮ বছরে আমাদের সমুদ্রসম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণে কোনো জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য সুষ্ঠুব্যবস্থা নিরূপণ করা ও আহরিত মৎস্য সম্পদের সঠিক সংরক্ষণ ও বিপননের ব্যবস্থা করতে পারলে বাংলাদেশের মিঠা পানির মৎস সম্পদের তুলনায় তিনগুণ বেশি সমুদ্রমৎস্য থেকে আহরণ করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে ইঞ্জিন চালিত বুটগুলোকে আরো বেশি আধুনিকায়ন ও নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সমুদ্রপাড়ের জেলাগুলোতে আহরিত মৎস্য সংরক্ষণের জন্য কোল্ডস্টোরেজ প্রতিষ্ঠা করা খুবই জুরুরি। এখন পর্যন্ত চট্টগ্রাম ছাড়া সমুদ্রপাড়ের অন্যকোনো জেলাতেই মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য কোনো কোল্ডস্টোরেজ স্থাপন করা হয়নি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যে পরিমাণ মৎস্য আহরণ সম্ভব তার চাইতে ভোলা থেকে কূয়াকাটা পর্যন্ত অন্তত চারগুণ বেশি মৎস্য আহারণ করা সম্ভব। তাই জাতীয়ভাবে প্রোটিনের ঘাটতি মেটানো ও সমুদ্রে আহরণকারী জেলেদের ন্যায্যমূল আর নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইউরেনিয়াম একটি অত্যন্ত দামি ও উন্নতমানের ক্ষনিজ সম্পদ যা বাংলাদেশের সমুদ্রতীরে প্রচুরপরিমাণে মওজুদ আছে বলে আমাদের খনি-বিশেষজ্ঞদের ধারণা। জাতীয় নেতৃবৃন্দকে ইউরেনিয়াম সম্পর্কে আরো অধিক গুরুত্ব দিয়ে আহরণের ব্যবস্থা করলে বাংলাদেশ আণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশে পরিণত হতে পারে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

আমাদের দেশের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে, সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সরকার বিজ্ঞান ও গবেষণার জন্য জাতীয় বাজেটে সরকারের পক্ষ থেকে যে অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন, পরবর্তী সরকারগুলো আর সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। আগামীতে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের জন্য ধারাবাহিকভাবে একটি মহাপরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশকে এগুতে হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে একটি জাতির উন্নয়নের মাপকাঠি তার প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার নিরিখে নির্ণয় করা হয়। আমাদের কৃষি ও গবাদি পশুর মানোন্নয়নের জন্য কৃষিবিজ্ঞানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য আজকের চাহিদার আলোকে নির্ধারণ করলে চলবে না। আমাদের নির্ধারণ করতে হবে আগামী ৫০ বছরের নিরিখে। উল্লেখিত বিষয়গুলোর চুলচেড়া বিশ্লেষণ ও সত্যিকার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই নতুন প্রজন্মের জন্য একটি স্থিতিশীল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। #

www.pathagar.com

বাকশাল প্রতিষ্ঠার দিনগুলো

পটভূমি:

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে লন্ডন ও ভারত হয়ে স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রেসকোর্স ময়দানে। তখনও তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। একপর্যায়ে তিনি প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে দেশের প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মেদকে করা হয় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী। দেশে ফেরার পর সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের বিষয়টি। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়টিও তৎকালীন সরকারের সামনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে উপরোল্লেখিত কাজগুলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমাধা করতে পারতেন। কিন্তু জাতির পিতা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তিনি দলের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনীতি সম্পর্কেও অসহিষ্ণু মনোভাব দেখাতে শুরু করেছিলেন। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয়কর্মি। ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী

www.pathagar.com

ছিলেন বর্তমান বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন জনাব মাহাবুবুজ্জামান। রেকর্ড সংখ্যক ভোট পেয়ে ছাত্র ইউনিয়ন প্যানেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে। এই নির্বাচন থেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ দুটি প্যানেলে বিভক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। একটি সিরাজুল আলম খান ও আসম আব্দুর রব সমর্থিত। অন্যটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমর্থিত। ছাত্রলীগ তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়নি। কিন্তু বিভক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আ ফ ম মাহবুবুল হক (তিনি সম্ভবত তখন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক) শ্লোগান দিলেন – "মুজিববাদের অপর নাম – ৮০ টাকা চালের দাম"। পাকিস্তানের শেষসময়ে এক মণ ভাল চালের দাম ছিল ২০ টাকা। ১৯৭১ সালের পর দ্রুত চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।

সে সময়ে ছাত্রলীগের দু'টি ধারা ছিল– একটি মুজিববাদপন্থি অন্যটি সমাজতন্ত্রপন্থি। প্রখ্যাত লেখক খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস মুজিববাদ সম্পর্কে একটি বই লিখেন। এর আগে তিনি মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে নিয়েও অন্য একটি বই লিখেছিলেন (ভাসানী তখন ইউরোপে অবস্থান করছিলেন)।

আমরা যারা ছাত্র ইউনিয়নের কর্মি ছিলাম আমাদের কাছে বোধগম্য ছিলনা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র জিনিসটা কি? সে সময় প্রখ্যাত সাংবাদিক আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি হিটলার-মুসোলিনির নাৎসি আদর্শের সঙ্গে এর সাদৃশ্য উপস্থাপন করেছিলেন। পরে অবশ্য আমরা বুঝতে পেরেছি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি বিশেষ মহল এই রাজনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র এই রাজনীতির শিকার হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের পর এই রাজনীতির ধারা ধীরে ধীরে সংকোচিত হয়ে আসে।

১৯৭২ সালের পর প্রথমদিকে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপ (মোজাফফর) দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি ভিয়েতনাম সংহতি দিবসে ছাত্র ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ গুলি চালিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণে প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সংঘটিত করে।

www.pathagar.com

এতে শাহাদাত বরণ করেন ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা মতিউল ইসলাম ও কাদের। মতিউল ইসলাম ইকবাল হলের ১৪৮ নং রুমে থাকত। আমিও ১৪৮ নং রুমে থাকতাম। ইকবাল হলের ১৪৮নং রুমে আমরা ৪ জন থাকতাম। মতিউল ইসলাম, রনজু ইসলাম, লুৎফর রহমান (লুথু ভাই) ও আমি। এই রাজনৈতিক হত্যাকান্ড আমার মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্র-জনতা ১ জানুয়ারির হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে এবং সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ২ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ বাতিল করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় রাত থেকেই শুরু হলো ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের ওপর পুলিশের পাশাপাশি সন্ত্রাসী মাস্তানদের যৌথ হামলা। এভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা কর্মিদের ওপর শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের সন্ত্রাস নেমে আসে। অবশ্য পরে অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মেদ ও কমরেড ফরহাদ সংগ্রামের পথ পরিহার করে আপস ও দালালির পথ বেছে নেন। এর ফলে বিকশিত সংগঠন ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি ক্রমান্বয়ে জনবিচ্ছিন্ন হতে আরম্ভ করে।

অন্যদিকে,মেজর এম এ জলিল ও আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সরকারবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করার কারণে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। চীনপন্থি দলের নেতৃবৃন্দ বিশেষকরে আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ, মশিউর রহমান যাদু মিয়া, কাজী জাফর আহমেদসহ মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে বিরোধী রাজনীতি তখন চাঙ্গা হতে থাকে।

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুসহ ১৭ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেন। এ সব নেতার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কোনো প্রার্থীই পাওয়া যায়নি কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়া হয়নি। নির্বাচনে আতাউর রহমান খান, ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম মোঃ সালাউদ্দিন, সুরঞ্জিত সেন গুপ্তসহ ৯ জন বিরোধী দলীয় সদস্য জয়লাভ করে। এই নির্বাচনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয় একদলীয় সামন্ত শাসন ব্যবস্থা। এখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শাসনকালকে সামন্ত স্বৈরশাসন হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। স্বৈরশাসন-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিটি ঘটনা ও পদক্ষেপের সঠিক নির্ভুল তথ্য ও বিশ্লেষণ। আর সামন্ত শাসনের বৈশিষ্ট্য হলো কোনো কিছুই সঠিক তথ্যভিত্তিক নয়, মনের খেয়াল-খুশিমত যা ইচ্ছা তাই করা।

www.pathagar.com

মূল কথায় ফিরে আসি। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পরই সরকারের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি অসহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সৃষ্ট রক্ষীবাহিনী বিরোধী দলের নেতা-কর্মিদের ওপর পেটোয়াবাহিনী হিসেবে চরম অত্যাচার করেছিল। কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর এবং মাদারীপুরের চঞ্চল সেনের পরিবারের ওপর এই বাহিনী মধ্যযুগীয় কায়দায় অত্যাচার করেছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগের একজন নেতার নির্দেশে। শান্তি সেন ও চঞ্চল সেন বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের নেতা ছিলেন। তাদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়ে রক্ষীবাহিনী আওয়ামী লীগের একজন নেতার নির্দেশে চঞ্চল সেনের মা ও স্ত্রীকে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে পাশবিক অত্যাচার চালায়। কিন্তু ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতারা বলতে থাকেন চীন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তাদের দর্শনে বিশ্বাসী লোকজন দিয়ে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। আমি এ সব দলের এই আচরণকে সহজভাবে মেনে নিতে পারিনি।

ইতিমধ্যে ন্যাপ মুজাফ্ফর ও কমিউনিস্ট পার্টি নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে নির্লজ্জ দালালির পথ বেছে নেয়। আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশ আছে বলে তারা বিভাজন করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু সরকারের লুটতরাজ সম্পর্কে না দেখার নীতি গ্রহণ করে।

পাশাপাশি জাসদ সরকারবিরোধী কঠোর কর্মসূচি দিতে শুরু করলে দলটি জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। দলটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কারো সঙ্গেই ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ না হওয়া। ১৯৭৪ সালে এই দলটির পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করার কর্মসূচি দিলে শেখ মুজিবুর রহমান-এর সরকার কঠোর দমননীতি গ্রহণ করে। রক্ষীবাহিনী দিয়ে মেজর এম এ জলিল ও আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল মিছিলকে বেপরোয়াভাবে গুলি ও লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। এ ঘটনায় জাসদের শত শত নেতা-কর্মি হতাহত হয়। মেজর এম এ জলিল ও আ স ম আব্দুর রবসহ অনেক কেন্দ্রীয় নেতাকে সেসময় গ্রেফতার করা হয়। আর এ পেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে রক্ষীবাহিনীর মোকাবিলায় গণবাহিনী।

আমি ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্মত বিরোধী দল গঠনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সে সময় বরিশালের মহিউদ্দিন কুষ্টিয়ার সৈয়দ আলতাফ হোসেন, শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, দেওয়ান মোঃ ইদ্রিস্-সহ বহু নেতা-কর্মি এই ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মেদ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার কথা বলতে থাকেন। আমি এর বিরোধিতা করার কারণে একদিন অজয় রায় আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালামের কাছে নিয়ে গেলেন। আব্দুস সালামের প্রকৃত নাম ছিল বারীন দত্ত। তিনি আত্মগোপন থাকাকালীন অবস্থায় পবিত্র কোরআন শরীফ ভালভাবে পড়া শিখেছিলেন।

অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু আমার প্রতিবাদী মনকে তিনি শান্ত করতে পারেননি। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের একটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে 'ন্যাপ' দেশের স্বার্থে গঠনমূলক বিরোধী দলীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। অথচ সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব তৎকালীন নেতৃত্ব পালন করেনি। সে সুযোগে সন্ত্রাসী রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ধীরে ধীরে গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় বাকশাল গঠনের দিকে এগিয়ে যায়।

১৯৭৪ সালের শেষ দিক থেকেই কথা উঠতে থাকে সব রাজনৈতিক দল বন্ধ করে দিয়ে একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে একটি জতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন করার জন্য সে সময় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। কাজী জাফর আহমেদ, ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, মিসেস আমেনা বেগম, ইকবাল আনসারী খান, সিরাজুল হোসেন খান, হাজি মুহম্মদ দানেশসহ তৎকালীন বিরোধী শিবিরের নেতারা এই লক্ষ্যে কাজ করছিলেন। কিন্তু নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও সুবিধাভোগী কায়েমী মনোবৃত্তির কারণে সেই কনভেনশন শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা সববিরোধী দল এক হয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে কাজ করলে বাকশাল গঠন করা শেখ মুজিবের পক্ষে সম্ভব হতো না।

১৯৭৪ সালের ঢাকসু নির্বাচন রাজনীতিতে একটি এসিডটেস্ট। সে সময় ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ (মুজিববাদী) এক যৌথনির্বাচনের কৌশল গ্রহণ করে। ছাত্র ইউনিয়নের নূহুল আলম লেনিন সহ-সভাপতি এবং ছাত্রলীগ (মুজিববাদী গ্রুপের) ইছমত কাদের গামা সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হয়ে প্যানেল দেয়। কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা এই প্যানেল বর্জন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রদের সমর্থনে জাসদপন্থি ছাত্রলীগ যখন জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে পরিকল্পিতভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করে ব্যালট লুট করে এক প্রহসনের নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে ভোটজালিয়াতির ফলাফল

www.pathagar.com

ঘোষণা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সুধীসমাজ শাসকদলের এই নির্লজ্জ আচরণে গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমানও উপলব্ধি করেন, ছাত্র-জনতার প্রতিবাদী চেতনা সম্পূর্ণভাবে সরকার বিরোধী হয়ে উঠেছে। সম্ভবত ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর দেশের সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ড স্থগিত ঘোষণা করা হয়। একমাত্র আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি এই তিন দলীয় ঐক্যজোট ছাড়া সকল রাজনীতি বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি চলতে থাকে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড। সে সময় সরকারবিরোধী অবস্থানের কারণে কমরেড সিরাজ সিকদারের হত্যাকান্ডে দেশব্যাপি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মিদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় আমার শুভ্যানুধ্যায়িরা আমাকে নিয়েও গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে পড়েন। তারা আমাকে আত্মগোপন করে থাকার জন্য উপদেশ দেন। ন্যাপ-ভাসানীর সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম সালাউদ্দিন আমাকে নিয়ে যান সাভারে। সেখানে বেশভূষা পরিবর্তন ও পরিচয় গোপন করে আমি ইট ভাঙ্গার শ্রমিকের কাজ আরম্ভ করি।

সাবেক সংসদ সদস্য দেওয়ান ইদ্রিসের পরিবারের সদস্যরা আমাকে আগে থেকেই চিনতেন। দেওয়ান ইদ্রিস সাহেব ন্যাপের (মোজাফফর) জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তার স্ত্রী আমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করতেন। সে সময়কার রাজনৈতিক পরিমন্ডলই ছিল এরকম। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি মাত্র ৫ মিনিটের ভাষণে সারাজীবন ধরে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই-সংগ্রামের সিংহপুরুষ হিসেবে খ্যাত শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের গণতন্ত্র হত্যা করে একদলীয় বাকশাল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

এর পর ১৬ জুন ১৯৭৫ তারিখ থেকে ৪টি মাত্র সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ছাড়া সব সংবাদপত্র বন্ধ করে দিলেন। দুঃখজনক হলেও সত্য অনেক প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিককে মুদির দোকানের কর্মচারি হতে বাধ্য করা হয়। সরকারি কর্মচারিদের বাধ্যতামূলকভাবে বাকশালের সদস্য হতে হয়। দেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কবর রচনা করে একদলীয় সামন্ত স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মম পটপরিবর্তনের মাধ্যমে একদলীয় শাসনের অবসান হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মি আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমেদ। #

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ড ও রহস্যের বেড়াজালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব

৩৪ বছর আগে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হন সেনাবাহিনীর একদল বিদ্রোহী সৈনিকের হাতে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে মর্মান্তিক রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটে সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার ইচ্ছা আমার নেই। ১৯৭৫ সালের মত বিশাল রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা প্রবন্ধ লেখার যোগ্যতা আমার আছে বলেও মনে করি না। কিন্তু ৩০ বছর পর ২০০৬ সালে মাসব্যাপী শোকের মাস পালন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের একজন অতিগুরুত্বপূর্ণ নেতার একটি মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড ও তৎকালীন রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সম্পর্কে দেশবাসীকে সঠিক তথ্য তুলে ধরতে উদ্বুদ্ধ করে। তারই সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

১৯৭৫ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে অর্থাৎ বাকশাল রাজনীতির প্রতি আমার প্রকাশ্য বিরোধিতার পটভূমিতে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে থাকতে পারিনি। আমার মত শত শত ছাত্র রাজনৈতিক কর্মিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ত্যাগ করে আত্মগোপন করে জীবন বাঁচাতে হয়েছিল। অনেকেই নিহত হয়েছে, এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক মহলে

www.pathagar.com

বিশ্বাস ছিল জেলে গেলেও জীবনের নিরাপত্তা পাওয়া যাবে না। পাবনায় জেল থেকে বের করে ৮ জনকে হত্যার পর থেকে এ আশঙ্কা ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

একজন গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ নেতা একটি আলোচনা সভায় বলেছেন, ১৯৭৫ সালের হত্যাকান্ডের সঙ্গে বিএনপি-জামায়াত জড়িত। একথা শুনে মনে হতে পারে দেশের একশ্রেণীর নেতানেত্রী যখন যা মনে আসে তাই বলেন। তারা বুঝতে চান না তাদের এসব অসত্য মন্তব্য ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রবাহকে ব্যাহত করে মূল ঘটনাকে ধীরে ধীরে আড়াল করে ফেলে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে এই দেশে কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই ছিল না। বাকশাল ছাড়া আর কোনো দলই ছিলনা। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মণি, আব্দুর রব সেরনিয়াবাতসহ অন্যান্যদের হত্যা করে সেনাবাহিনীর একটি অত্যন্ত ছোট ইউনিট। সেনাবাহিনীর অন্য সব ইউনিট, রক্ষীবাহিনী ও পুলিশবাহিনী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ না করলেও পুরোপুরি নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রীয় এসব বাহিনী ১৫ আগস্টের নৃশংস ঘটনা প্রতিরোধে কোনোই গুরুত্ব অনুভব করেনি। আর এটাই ছিল তখনকার বাস্তবতা।

শেখ মুজিবের এই বিপদের মুখে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একজন সেনা কর্মকর্তা ছাড়া আর কেউ এগিয়ে আসেনি। এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বার বার ফোন করলেও আজকের আওয়ামী লীগ নেতা ও তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করতে কোনো ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। মাত্র ১৫টি ট্যাঙ্ক ও ২শ' সেনাসদস্য বঙ্গবন্ধু সরকার পরিবর্তন ও হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ করে। রাত ২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত এই অভিযান চলে। আজ ৩৪ বছর পর প্রশ্ন জাগে এত সুবিশাল সংগঠন থাকা সত্ত্বেও কেন আওয়ামী লীগের কোনো নেতা কর্মি-ই এই হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামলেন না? কারণ নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর যারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন তাদের নামের তালিকা থেকেই এর নিগূঢ় রহস্য কিছুটা আঁচ করা যায়। আজ শেখ মুজিবের জন্য, শিশু রাসেলের জন্য যাদের চোখের পানি ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে, সেদিন তাদের ভূমিকা কি ছিল? নতুন প্রজন্মের কাছে সত্য ইতিহাস তুলে ধরার জন্য প্রথমে আমি বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর গঠিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নামের তালিকা ও সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

www.pathagar.com

১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পরগঠিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ হচ্ছেন : (১) রাষ্ট্রপতি - খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ (২) উপ-রাষ্ট্রপতি - জনাব মহাম্মদ উল্ল্যা (মৃত্যুর আগে তাকে শেখ হাসিনা মালা দিয়ে আওয়ামী লীগে বরণ করে নেন) (৩) রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী (পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ'সহ ৬ দলীয় প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী) মন্ত্রী পরিষদ : (৪) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী- পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তার পুত্র শেখ হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হন) (৫) অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী- পরিকল্পনা মন্ত্রী, (৬) শ্রী ফনিভূষণ মজুমদার - স্থানীয় সরকার পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী (৭) এডভোকেট সোহরাব হোসেন - পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী (৮) আব্দুল মান্নান - স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী (পরবর্তীতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দলের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ছিলেন) (৯) শ্রী মনোরঞ্জন ধর - আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী (১০) আব্দুল মোমিন - কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী (১১) আসাদুজ্জামান খান - বন্দর জাহাজ ও অভ্যন্তরীণ জলযান মন্ত্রী (পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৮-১৯৮২ সালে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা) (১২) ড. আজিজুর রহমান মল্লিক - অর্থমন্ত্রী (১৩) ড. মোজাফ্ফর আহম্মেদ চৌধুরী - শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক কারিগরি গবেষণা ও আণবিক শক্তি মন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী : (১৪) দেওয়ান ফরিদ গাজী - বাণিজ্য প্রেট্রোলিয়াম খণিজ প্রতিমন্ত্রী (বর্তমানেও আওয়ামী লীগ নেতা ও সংসদ সদস্য) (১৫) মমিন উদ্দিন আহম্মেদ- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানিসম্পদ ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী (১৬) প্রফেসর নূরুল ইসলাম চৌধুরী (১৭) শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন - বিমান, পর্যটন, ভূমিপ্রশাসন ও সংস্কার প্রতিমন্ত্রী (১৮) তাহের উদ্দিন ঠাকুর- তথ্য, শ্রম, সমাজকল্যাণ, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী (১৯) মোসলেম উদ্দিন খান- পাট প্রতিমন্ত্রী (২০) নূরুল ইসলাম মঞ্জু - যোগাযোগ ও রেলওয়ে প্রতিমন্ত্রী (২১) কে এম ওবায়দুর রহমান - ডাক, তার ও টেলিফোন প্রতিমন্ত্রী (২২) শ্রী ক্ষিতিস চন্দ্র মন্ডল - সাহায্য ও পুনর্বাসন প্রতিমন্ত্রী (২৩) রিয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ (ভোলা মিয়া) - বন, মৎস্য ও পশুসম্পদ প্রতিমন্ত্রী (২৪) সৈয়দ আলতাফ হোসেন- সড়ক, জনপথ ও রোড ট্রান্সপোর্ট প্রতিমন্ত্রী।

একমাত্র সৈয়দ আলতাফ হোসেন ছাড়া উপরোল্লেখিত সকলেই আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। সে কারণেই বিশাল কর্মিবাহিনী ও সংগঠন থাকা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রক্ষার জন্য একজন আওয়ামী লীগ নেতাও দীর্ঘ ৪ ঘন্টা সময় পাওয়ার পরও রাস্তায় বের হয়নি। এমনকি কোনো প্রকার প্রতিবাদও

www.pathagar.com

করেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের প্রতি তার অতিভক্তরা একটি ইটের টুকরাও নিক্ষেপ করেনি। আজ 'উদোরপিন্ডি বুদোর পিঠে' চাপিয়ে জনগণের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য রাজনৈতিক বাণিজ্যে অবতীর্ণ হয়েছে সেই চিহ্নিত মহলটিই। আমি আওয়ামী লীগের সেসব বন্ধুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের চেহারাটা একবার দেখে নেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করবো।

এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই - '৭৫ পরবর্তী সরকারে অংশগ্রহণকারী সবাই বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল আমি তা মনে করি না। কিন্তু তারা ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং সুযোগ গ্রহণ করে স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে অনেকেই রাজনেতিক ফায়দা লুটা ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের প্রতি সামান্যতম আন্তরিকতা প্রদর্শন করেনি। আজ তারাই নিজেদের দায়-ভার এড়ানোর জন্য ইতিহাস বিকৃত করার কৌশল গ্রহণ করছে।

অনেকেই জানেন, আমি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার মানুষ। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধুর মাতা-পিতা খুবই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মারা যান। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মাতা ও পিতার চেহলাম হয়। সেই চেহলাম পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ। আমার পিতা শেখ শাহাদাৎ হোসেন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রজীবনে প্রথমে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে এবং পরবর্তীতে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে একই সঙ্গে লেখাপড়া করতেন। ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র হোস্টেলের নাম ছিল বেকার হোস্টেল। এই হোটেলের ২২নং কক্ষে আমার পিতা শাহাদাৎ হোসেন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থাকতেন। সেই সূত্রে শেখ মুজিব পরিবারের অনেকের সঙ্গেই বিশেষকরে বঙ্গবন্ধুর মাতা-পিতা, শেখ ফজলুল হক মনির পিতা শেখ ইন্তু মিয়া ও আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের সঙ্গে আমার পিতার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত হৃদতাপূর্ণ।

আমার পিতার কাছে শুনেছি তৎকালীন সময়ে শেখ ইন্তু মিয়াই আমাদের অঞ্চলে প্রবীণ শিক্ষাবিদ। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আমার পিতাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি। আমিও ছোটকালে তাকে দেখেছি, তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও ভাল মানুষ ছিলেন। আমার পিতা তাকে দুলাভাই বলে ডাকতেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বঙ্গবন্ধুর মাতা-পিতার চেহলামের দিন এদের অনেকেই হয়তোবা ভেবেছিলেন, আমার পিতাকেও এই দিনে ডাকা দরকার। বিশেষকরে আব্দুর রব সেরনিয়াবাত উদ্যোগী হয়ে আমার পিতাকে শেখ সাহেবের বাড়িতে ডেকে নেন।

www.pathagar.com

১৯৩৭ সালের আগে শেখ সাহেবের বাবা মাদারীপুরে চাকরিরত ছিলেন। সে সময় শেখ সাহেবের মা ছাত্র সেরনিয়াবাতকে দেখেন এবং ছেলেটিকে তার পছন্দ হয়। শেখ সাহেবের ছোট বোনের সঙ্গে যখন বিয়ের কথা হয় তখন আমার বাবাই প্রথম সেরনিয়াবাতদের গ্রামের বাড়ি গৌরনদীতে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মা-বাবার পক্ষ থেকে। সে কারণেই আব্দুর রব সেরনিয়াবাত আমার বাবাকে আজীবন শ্রদ্ধা করেছেন।

সেদিন বঙ্গবন্ধু তার সহকর্মিদের নিয়ে তাদের উঠানে বসে আলাপ-আলোচনায় মত্ত ছিলেন। তখন তাঁর পাশে বসা ছিলেন খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও তোফায়েল আহম্মেদসহ অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। এমন সময় আমার পিতা সেখানে উপস্থিত হয়ে সকলকে সালাম দেন। আক্ষেপ করে বঙ্গবন্ধু স্বভাব সূলভ আচরণেই বললেন - শাহাদাৎ এতক্ষণে তোমার আসার সময় হল? এ কথা বলেই তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে বসালেন।

বাল্যজীবনের স্মৃতিচারণ করতে করতে শেখ সাহেব সেদিন তার বিজয় গৌরবের কথাও উল্লেখ করলেন। আমার পিতা শেখ সাহেবকে 'মিয়া ভাই' বলে ডাকতেন। তিনি শেখ সাহেবের কথা শুনে বলেন, তোমার সব কথাইতো আমি শুনলাম। কিন্তু চীনের চিয়াং কাই শেখের পালানোর জন্য ফরমুজা নামে একটি দ্বীপ ছিল, আমি তো তোমার পালানোর কোনো জায়গাই দেখতে পাচ্ছি না মিয়া ভাই। পাশে বসা খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ উত্তেজিত হয়ে রাগান্বিত স্বরে বললেন, এই লোক বদ্ধপাগল। তাকে পাবনার মানসিক হাসপাতালে পাঠানো দরকার।

অবশ্য শেখ ফজলুল হক মণি খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন - ষড়যন্ত্র হচ্ছে। শেখ মুজিবের পাশে অতি উৎসাহী চাটুকাররা দুঃসময়ে থাকবে না, জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে তার রক্তের বন্ধনের লোকজনকেই। আমি সে বিষয়গুলো নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটিতে যাব না। সেই খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়া পর তার লাশ সিঁড়ির উপর ফেলে রেখে রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের এই নির্মম অংশের রাজসাক্ষী আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহম্মেদ ও পাটগাতি ইউনয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোস্তাইন বিল্লাহ টুকু বিশ্বাস।

www.pathagar.com

আমি তাদের উদ্দেশ্যে দু'টি প্রশ্ন রাখতে চাই- প্রথমত: রাষ্ট্রপতি নিহত হলে শাসনতন্ত্র মোতাবেক ক্ষমতা গ্রহণ করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি । সেক্ষেত্রে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর তৎকালীন প্রধান মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ-সহ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যগণ, ক্ষমতাধর নেতৃবৃন্দ, নৌ- ও বিমানবাহিনী প্রধানগণ উপ-রাষ্ট্রপতিকে বাদ দিয়ে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করে জাতির সামনে আনুগত্য প্রকাশ করলেন কেন ও কোন কারণে?

দ্বিতীয়ত : ১৫টি ট্যাঙ্ক ও ২০০ জন সেনা সদস্য বিদ্রোহ করল ও ঢাকা বাদে সারাদেশেইতো আওয়ামী বাকশালীদের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ ছিল। সে ক্ষেত্রেও তারা সামান্যতম প্রতিবাদ জানাতে ব্যর্থ হলেন কেন? অবশ্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকা রেখেছিলেন। শেষপর্যন্ত আওয়ামী লীগে তারই ঠাঁই হয়নি। তিনি শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকান্ডের বিচার না করতে পারার ব্যর্থতার জন্য তীব্র প্রতিবাদ করেন।

অন্য সরকারের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের খুনিদের বিচার দাবি করছেন কোন যুক্তিতে। মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য, নাকি রাজনৈতিক ইস্যু বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করলে কারা প্রথম শেখ মুজিবের সরকারকে উৎখাতের আহ্বান জানিয়েছিল। এসব প্রমাণ করে আওয়ামী লীগ নেতারা মিথ্যাকে সত্য বানানোর কি হীনপ্রচেষ্টাই না করছে। জাতিকে বিশেষকরে নতুন প্রজন্মের সামনে ১৯৭৫ সালের নির্মম মুজিব হত্যার পটভূমি এবং উদ্ভুত ফলাফল সম্পর্কে আওয়ামী লীগ আর কতদিন সত্য চেপে রাখতে পারবে। #

www.pathagar.com

আমার দেখা মওলানা ভাসানী

১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে আমি প্রথম মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মুখোমুখি হই। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের ছাত্র এবং ছাত্র ইউনিয়নের একজন বলিষ্ঠ কর্মি। যদিও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ কাজ করত। দূর থেকে তাকে দেখা বা অনুধাবণ করার চেষ্টা করেছি বারবার।

১৯৭৩ সালের দিকে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্র ইউনিয়ন প্রধান শক্তি হিসেবে বিকশিত হয়। কিন্তু দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সরকারের দালালি ও ভারতের আধিপত্যবাদী শোষণের সহযোগী শক্তির ভূমিকা পালন করতে থাকলে তথাকথিত বাম রাজনীতির অনুসারীদের সম্পর্কে ঠিক তখন থেকেই আমার মনে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে শুরু হয় কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আমার ব্যাপক সাংগঠনিক সফর। আমাকে মূলত বরিশাল, পটুয়াখালী ও ঝালকাঠীর জেলা সম্মেলনগুলোয় পাঠানো হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের সঙ্গে সফরসঙ্গি হন বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা কমরেড নলিনী দাস। তিনি দীর্ঘদিন কারাভোগ করেন এবং আত্মগোপন করে কমিউনিস্ট পার্টিকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেন।

www.pathagar.com

তার প্রতি ছিল আমার গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। আমি মনে করতাম সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে শোষণের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই আমাদের রাজনীতির মূলমন্ত্র। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যদিয়ে সেই স্বপ্নের সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের প্রাথমিক বিজয় অর্জিত হয়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষণে এটা সুস্পষ্ট যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে আমরা স্বাধীন হয়েছি। সে কারণে পাকিস্তানী শাসকদের আর আমাদের শাসন করার কোনো সুযোগ নেই। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রগতিশীল সরকারের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে একদলীয় আওয়ামী সরকার। তবে তাদের রাজনৈতিক চরিত্র গ্রাম্য দাঙ্গাবাজদের মত এবং অর্থনৈতিক আচরণ জলদস্যুর মত। ভারতের সহায়তায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বাংলাদেশ আলাদা হওয়ার পর থেকেই দেশটির ওপর আধিপত্য বিস্তারের নতুন চক্রান্ত শুরু হয়। সবদিক থেকে বাংলাদেশকে কোণঠাসা করে রাখার ভারতীয় চক্রান্ত শুরু হয়। এ ব্যাপারে দেশপ্রেমিক সব রাজনৈতিক শক্তি শুরু থেকেই সোচ্চার ভূমিকা পালন করে আসছে। অথচ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এ ব্যাপারে একেবারেই নিরব। বরং জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে জীর্ণ-পাকিস্তান ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের কল্পকাহিনী জুড়ে দিতেই অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠে।

আমরা ঢাকা থেকে বরিশালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এই প্রথম একজন বিপ্লবী বড়মাপের নেতার সঙ্গে আমার রাজনৈতিক সফর। কিন্তু আমার আস্থা এবং প্রত্যাশার সঙ্গে তার আচরণের কোনো মিল নেই। তিনি নামে কমিউনিস্ট কিন্তু কোনো যুক্তিনির্ভর আলোচনাই গ্রহণ করতে রাজি হতেন্ন না। ভারতের শাসকশ্রেণীর অন্ধ সমর্থক, প্রচন্ডতম মুসলিম বিদ্বেষী। অবশ্য 'মুখে পাকিস্তান বিদ্বেষী, আচার-আচরণে পৌরাণিক হিন্দু উচ্চশ্রেণীর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। বিশেষকরে, কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধকে তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। আমি বললাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক মিল আছে। একটু রসিকতা করেই বললাম, উভয় যুদ্ধের নায়কই দুই শেখ সাহেব।

ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ও মার্কিন পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? এ প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন - 'ভারত গণতান্ত্রিক সুশাসনের দেশ, তাই কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ বলা যাবে না।' আমি বললাম - সোভিয়েত রাশিয়া সবচেয়ে বেশি সুশাসনের দেশ, তাহলে তো আমাদের সোভিয়েতভুক্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তিনি আমার আচরণে নাজিমউদ্দিন, নূরুল আমিনদের গন্ধ

www.pathagar.com

খুঁজতে শুরু করলেন। যা হোক আমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ও বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে খান খান হয়ে যায়। গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম। তখন ইকবাল হলের (জহুরুল হক হল) ১৪৮ নং কক্ষে থাকি। মনে মনে স্থির করলাম মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

আমার টাঙ্গাইলের বন্ধু শামসুল হককে মনের ইচ্ছার কথা জানালাম। কথামত পরিকল্পনা করে ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসের সম্ভবত প্রথম সপ্তাহেই টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। টাঙ্গাইল বাসস্ট্যান্ডে নেমে রিক্শা করে উপস্থিত হলাম সন্তোষে। তখন প্রায় দুপুর। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে পুকুরের পশ্চিম পাড়ে বিরাট দরবার হল। হলের পাশেই ছোট্ট একটি ছনের ঘরে ইতিহাসের কিংবদন্তি পুরুষ মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী থাকেন। হুজুরকে সালাম করে আমরা দু'জনই নিজেদের পরিচয় দিলাম। বললাম, ঢাকায় থাকি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এমন সময় জোহরের নামাজের আজানের ধ্বনি শোনা গেল। তিনি বললেন, 'আমি নামাজ পড়ে আসি। তোমরা দুপুর বেলায় আমার সঙ্গে ডাল-ভাত খাবে'।

নামাজ শেষে হুজুর আমাদের দু'জনকে তার সঙ্গে দুপুরের আহার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। ইতিহাসের একজন মহান নায়কের সঙ্গে পাশাপাশি বসে আহার গ্রহণ করার অসাধারণ অনুভূতি উপলব্ধি করতে লাগলাম। লাল চালের ভাত, লাউপাতা ভর্তা, আর শোলমাছ দিয়ে লাউয়ের তরকারি। এ সব সাধারণ বাঙালি খাবার দিয়ে দুপুরের আহার শেষ করলাম। আচার-আচরণ, পরিবেশনায় সাধারণ মানুষের জীবন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল সেদিনের সেই আহার পর্বে। একেই বলে গণমানুষের যোগ্য নেতা। আর এই সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলেই মওলানা ভাসানীকে কারো কাছে মাথানত করতে হয়নি। আহার শেষে তিনি বললেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমরা থাক। ঘুরে ফিরে দেখ, আমি বৃদ্ধ মানুষ একটু বিশ্রাম নেব। তার পর তোমাদের সাথে কথা বলবো।

মজলুম জননেতা একটু নিদ্রামগ্ন হলেন। আমরা দু'জনে ইসলামী বিশ্বদ্যিালয়, মওলানা ভাসানীর বাড়ি, গ্রাম ও পারিপার্শিক পরিবেশ ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। প্রথমে ঢুকলাম হুজুরের ছোট্ট একটি টিনের ঘর সম্বলিত ছোট বাড়িটিতে। বারান্দায় পাটি পেতে বসে আছেন আলেমা ভাসানী। আমরা পরিচয় দিয়ে বললাম, হুজুর বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তিনি বগুড়ার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন। তিনি জানতেন, হুজুরের সঙ্গে আমরা দুপুরের আহার সেরেছি। তারপরও ৪টা নাড়ু এনে দিলেন। নাড়ু খাচ্ছি।

www.pathagar.com

এমন সময় পাশের বাড়ির মিষ্টির কারিগর এলেন। আলেমা ভাসানীকে জিজ্ঞাসা করলেন, দাদী কারা এসেছে। তিনি বললেন, ঢাকা থেকে মেহমান এসেছে, বড় স্কুলে পড়ে। কারিগর ছুটে গিয়ে দু'টি টাটকা চমচম ও দু'টি মন্ডা নিয়ে এসে হাজির হলেন।

মওলানা ভাসানী তার বাড়ির চারপাশে মিষ্টির কারিগর, জেলে, নাপিত বসিয়েছিলেন এবং এদের সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি বসবাস করতেন। হিন্দু-মুসলমান, উঁচু-নিচুর কোনো দেয়ালই এর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি। সমাজজীবনে এই মহান দৃষ্টান্ত কল্পনাও করা যায় না।

আসরের নামাজের আজান হল। হুজুর অজু করে নামাজ পড়লেন। একটু পরেই বহু মুরিদ-ভক্ত এসে ভিড় করলেন। এসময় তিনি আমাদেরও ডাকলেন। প্রশ্ন করলেন! মন এত উচাটন কেন? আমি বললাম – হুজুর প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক বলেন, আর যাই বলেন না কেন ১৯৪৭ সাল থেকে আপনি যাদের আশ্রয় দিয়েছেন তাদের অনেককেই আমার কমিউনিস্ট নামধারী হিন্দু মহাসভার সদস্য বলে মনে হয়। তিনি বালিশের উপর হেলান দিয়ে কথা বলছিলেন। আমার কথা শুনে সোজা হয়ে বসে বললেন, তুমি জানলে কেমন করে।

আমি আমার বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী সফরের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলাম। হুজুর বললেন, তোমার কথা দেশের কোনো মানুষই বিশ্বাস করবে না। কারণ, তাদের নিখুঁত রাজনৈতিক অভিনয়ের কাছে সত্য পরাভূত। আমি প্রশ্ন করলাম- এই জটিল পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের পথ কি? তিনি পুকুরপাড় ধরে হাঁটতে থাকলেন। আমি ও শামসুল হক পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে থাকলাম।

লক্ষ্য করলাম, ৪ জন মুরিদ বল্লম হাতে দূর থেকে আমাদের অনুসরণ করছে। তাদের পরনে লুঙ্গি আর গায়ে গেঞ্জি। কিন্তু হরিণের মত তীক্ষ্ণ তাদের চোখ, সিংহের মত ক্ষিপ্ত তাদের পদচারণা। পশ্চিম পাড় হয়ে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর পাড় ধরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকলাম। রাজবাড়ির মাঝামাঝি জায়গায় একটি ছোট মাঠ। সেখানে এসে হুজুর থামলেন। চারদিকে দেয়াল ঘেরা একটি ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন - এই চার দেয়ালে ঘেরা ঘরটির মধ্যে একটি নামাজের ঘর আছে। আমার বিরুদ্ধে হিন্দু মহারাজার বাড়ি দখলের মিথ্যা অভিযোগ প্রচারিত আছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এখানে কোনো হিন্দু

www.pathagar.com

মহারাজা ছিলেন না। নবাব আমলে হিন্দুস্তানের মুসলিম রাজার নাম দিয়ে ষড়যন্ত্র করে এই জমিদারী করায়ত্ত করে। হিন্দুস্তানের মুসলমান রাজা তার মৃত্যুশয্যায় তার সম্পত্তির ৬ আনা জনগণের শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। আমি সেই অছিয়তনামা অনুসারে মানুষের শিক্ষার জন্য এই সম্পত্তি মুক্ত করি এবং সকলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যে হতাশা কেটে গেল। তিনি বললেন, রাজনীতি যদি করতে চাও তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনায় রেখে। কোনো নেতার প্রতি মোহ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠি হতে পারে না। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন- ৪টি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠী এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও সমর্থন করেছে যথা :

১. উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণ ও ব্রিটিশ আমলের হিন্দু জমিদারগোষ্ঠী; তারা মুসলিম পাকিস্তানের সমর্থক, মুসলিম বাংলাদেশ চায়নি। তারা বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে চেয়েছিল। এমনকি, তাদের ৫ জন বিশিষ্ট হিন্দু নেতা বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি প্রদানের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে স্বীকৃতিদান থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল।

২. ভারতের প্রতি তোষামোদকারী তাঁবেদারগোষ্ঠীর একান্ত ইচ্ছে বাংলাদেশকে ভারতমুখী রেখেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে।

৩. কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের জন্য শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ বিরোধী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

৪. মুক্তিযুদ্ধে অংশ ও সমর্থনদানকারী অন্য গোষ্ঠীটির স্বপ্ন হচ্ছে ধনিকশ্রেণীর স্বাধীন মর্যাদাবান বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

এই চারটি দৃষ্টিকোণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এখন আমাদের দেশের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদবিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এমনকি বাংলাদেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য যদি কোনো ধনিকশ্রেণীও দেশগড়ার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চায় তবে তাদের সঙ্গে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের সহযোগিতা যুগিয়ে যেতে হবে।

www.pathagar.com

নতুন উদ্দীপনা নিয়ে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে সালাম করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। সেই থেকেই আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

এখানে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পারিবারিক শ্রদ্ধা ও আস্থার একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেই আমার প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে ইসলামি রাষ্ট্রসংস্থার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় বাংলাদেশে দৃশ্যমান রাজনৈতিক শক্তিগুলো ছিল ভারত ও রাশিয়ার পক্ষে। বঙ্গবন্ধু'র কাছে প্রস্তাব এল 'ইসলামী রাষ্ট্রসংস্থা'র সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য। তিনিও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তিনি নিজেকে দৃশ্যত একা ভাবতে লাগলেন এবং অবশেষে সাহায্যের প্রত্যাশায় দৃষ্টিপাত করলেন তার রাজনৈতিক গুরু মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর প্রতি।

একটি ঘটনা থেকেই বিষয়টি পুরোপুরি খোলাসা হতে পারে। ভাসানী ন্যাপের একজন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম সালাউদ্দিন। তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন। বনানীর একটি বড়িতে তিনি থাকতেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের ১৪৮ নম্বর রুমে থাকি। ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম সালাউদ্দিন ভাইয়ের বনানীর বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল এবং মাঝে মধ্যেই অবস্থান করতাম।

একদিন রাতে আওয়ামী লীগ সরকারের তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী জনাব এডভোকেট সোহরাব হোসেনের টেলিফোন এলো। মন্ত্রী ব্যারিস্টার সাহেবকে জানালেন, বঙ্গবন্ধু আগামীকাল সকাল ৮ টায় তোমাকে দেখা করতে বলেছে, তুমি রেডি থাকবে, আমার গাড়ী ৭:৩০ মিনিটের মধ্যেই তোমার বাসায় পৌঁছাবে।

ব্যারিস্টার সাহেব আমাকেও তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। পরদিন সকাল সাড়ে ৭ টায় পূর্তমন্ত্রী সোহরাব হোসেনের গাড়ি এলো। আমরা দু'জন বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বব বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। গেটে আগে থেকেই বলা ছিল। আমরা পৌঁছাতেই আমাদের দু'জনকে দো'তলায় নিয়ে যাওয়া হল।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু গোসল করে অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছেন। আমাদের নিয়ে তিনি নাস্তা খেতে বসে গোপালগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় তিনি ব্যারিস্টার সাহেবকে তাঁর ডাকার উদ্দেশ্যের কথা বলতে শুরু করলেন এভাবে –

'আগামী মাসে পাকিস্তানে ইসলামি রাষ্ট্রসংস্থার সম্মেলন হচ্ছে। বাংলাদেশকে সে সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমি বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসাবে সে সম্মেলনে যেতে আগ্রহী। এ বিষয়ে তোর একটু একটি সাহায্য করতে হবে।'

ব্যারিস্টার সাহেব মনে মনে ভীষণ খুশি হলেন। কিন্তু ভনিতা করে বললেন – 'ওরা আমাদের সন্তানদের হত্যা করেছে, মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। আর সেই পাকিস্তানে যাবেন আপনি?'

বঙ্গবন্ধু বললেন – 'আমি পাকিস্তানে যাচ্ছি না। যে দেশের লক্ষ-লক্ষ মানুষ সন্তানদের নিঃস্ব করে সহায়-সম্বল বিক্রি করে মক্কায় যায় হজ্জব্রত পালন করতে। সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী পবিত্র মক্কাকে বাদ দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে পারে না।'

ব্যাস্টিার সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'আমাকে কি করতে হবে বলুন? বঙ্গবন্ধু বললেন, তুই হুজুরের কাছে যাবি, আমার সিদ্ধান্ত তাকে জানাবি এবং আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করতে বলবি। আমি যদি পাকিস্তানে ইসলামিক রাষ্ট্রসংস্থার সম্মেলনে না যাই তাহলে আমার বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিবি।

নাস্তা সেরে আমরা বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে বিদায় নিলাম। সিদ্ধান্ত হল পরদিন সকালে হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সন্তোষে যাবো। ফজলে লোহানী - কামরুল ইসলাম সালাউদ্দিন ভাইয়ের বন্ধু, বনানীতেই থাকতেন। তিনিও ভাসানী ন্যাপের একজন নেতা ছিলেন। সোজা গিয়ে উঠলাম ফজলে লোহানীর বাসায়। তিনি বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েই ছিলেন। আমাদের দেখে চা খেতে বললেন। সালাউদ্দিন ভাই তাকে আগামীকাল সকালে সন্তোষ যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি রাজি হলেন এবং সিদ্ধান্ত হল তার গাড়িতে করেই আমরা তিনজন সন্তোষে যাবো।

পরদিন সকাল ৬ টায় ঢাকা থেকে সন্তোষের উদ্দেশে রওনা হলাম। ফজলে লোহানী সাহেব নিজেই গাড়ির চালক। পাশের সিটে সালাউদ্দিন ভাই, পিছনে

www.pathagar.com

আমি। সকাল ১১ টার দিকে সন্তোষে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখা হলো রাশেদ খান মেনন ও আতিকুর রহমান সালুর সঙ্গে। কিন্তু ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম সালাউদ্দিন তাদের সামনে মুখ খুলতে চাইলেন না। শেষে দুপুরের পর একান্তে হুজুরের সঙ্গে ব্যারিস্টার সাহেব কথা বললেন। সিদ্ধান্ত হল; পল্টন ময়দানে জনসভা করবেন। সেই জনসভাকে সামনে রেখে হুজুর একটি বিবৃতি দিবেন। হুজুর তার বিবৃতিতে অনেক কথার মধ্যে একটি বিশেষ কথা উল্লেখ করবেন - 'ইসলাম জিন্দা হোতা হায়, হর কারবালাকি বাদ'।

কথামত পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হলো। জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত হলো। মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে উদ্দেশ্য করে বললেন - 'ভারত, রাশিয়ার দালালি ছাড়, ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোল, অন্যথায় গলায় গামছা দিয়ে ক্ষমতা থেকে নামানো হবে।'

শেখ সাহেব সম্মেলনে যাওয়ার আগের দিন ক্যাবিনেট মিটিং আহ্বান করে ইসলামিক রাষ্ট্রসংস্থার সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। প্রথমেই মন্ত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিবাদ করলেন রংপুরের মতিউর রহমান। তিনি বললেন, 'এই সিদ্ধান্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি, সর্বোপরি বন্ধুরাষ্ট্র ভারত অসন্তুষ্ট হবে।' শেষে উঠে দাঁড়ালেন আওয়ামী লীগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা তাজউদ্দিন আহমেদ। তিনি বললেন, এই সিদ্ধান্ত পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনবে এবং ভারতের সঙ্গে কথা না বলে তা করলে ভারত আমাদের ওপর ক্ষুব্ধ হবে। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কথা বলার অনুরোধ করলেন।

কিন্তু শেখ সাহেবের একই কথা, আমরা স্বাধীন দেশের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাই। কারো তাঁবেদার হতে চাই না। আমার কিন্তু ১৯৭৩ সালে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ১৯৭১ সালের ৪টি দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্মরণ ছিল। সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদবিরোধী কৃষক শ্রমিককে দেশের মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ধনিকশ্রেণীর সঙ্গেও ঐক্য করার প্রয়োজন হতে পারে। #

www.pathagar.com

আমার দেখা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ৩টি দিন ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যমন্ডিত হয়ে আছে। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর এবং ১৯৮১ সালের ৩০ মে'র কাল রাত।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা শুরু করলে ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম থেকে মেজর জিয়াউর রহমান এক বেতার ভাষণের মাধ্যমে দেশবাসীর প্রতি পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাভূত করার আহ্বান জানান এবং জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করার আহ্বান জানান।

১৯৭৫ সালে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যখন হুমকির মুখে পতিত হয়, তখন তিনি সিপাহী জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৮১ সালের ৩০ মে কিছু বিপথগামী কুচক্রী সেনা অফিসারের ষড়যন্ত্রে তিনি চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে শাহাদাৎ বরণ করেন।

www.pathagar.com

এই মহান রাষ্ট্রনায়ককে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখা এবং একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। ২৪তম শাহাদাৎ দিবসে কাছ থেকে দেখা জিয়াউর রহমান-এর ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত আমার স্মৃতিতে ভাস্বর কিছু ঘটনা উল্লেখ করে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে চাই।

১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর দেশে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয়। এর ১৫ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আমাকে ডিজি- এন এস আই এম আব্দুল হাকিমের মাধ্যমে তার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ জানান। আমি ১৯৭৭ সালে এম এ পাস করেছি মাত্র। তখনো ইউনিভার্সিটির হল ত্যাগ করিনি। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১৪৮নং কক্ষে আমি থাকি। এম আব্দুল হাকিম সাহেব তার একজন অফিসারকে পাঠিয়ে আমার সঙ্গে কথা বললেন এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। পরে আমি জেনেছি ব্যারিস্টার কামরুল ইসলাম সালাউদ্দিনের কাছ থেকে তিনি আমার নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করেছিলেন।

বঙ্গভবনের বিরাট হলরুম পার হয়ে দক্ষিণ পাশে ছোট্ট একটি কামরায় আমাকে বসতে দেয়া হলো। কর্ণেল অলি আহম্মেদ এম আব্দুল হাকিমের সঙ্গে কথা বলে আমাকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। প্রথম দর্শনেই প্রেডিডেন্ট জিয়াউর রহমান আমাকে বললেন-

'আমি তোমাকে তুমি বলতে চাই, যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে।'

আমি কোন উত্তর দেইনি। তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন-

'তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ বিষয়ে লেখাপড়া করছ।'

আমি বললাম - পড়ালেখার পর্ব প্রায় শেষ। আমি ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। আমি যে কিছুটা বিচলিত ছিলাম তা তিনি লক্ষ্য করেছেন। অল্পসময়ের মধ্যে তিনি মূল আলোচনা শুরু করে বললেন-

'বাকশাল ব্যবস্থার বাই প্রডাক্ট সামরিক শাসন। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে চাই। তুমিও আমার সঙ্গে কাজ করবে কিনা এ বিষয়ে তোমার মতামত জানতে চাই।'

আমি সেদিন মুখ খুলে কিছুই বলতে পারিনি। তিনি কর্ণেল অলি আহম্মেদকে আমার যোগাযোগের ঠিকানা রেখে দেয়ার কথা বললেন। আমি কর্ণেল অলি

www.pathagar.com

আহম্মেদকে আমার সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা লিখে দিয়ে এম আব্দুল হাকিম সাহেবের গাড়িতে করে বিদায় নিলাম। এর ফাঁকে এম আব্দুল হাকিমের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির কথা হয়েছে। গাড়িতে বসে হাকিম সাহেব আমাকে বললেন –

'তোমাকে রাষ্ট্রপতির ভাল লেগেছে। আগামি ৬-৭ দিনের মধ্যে তিনি চট্টগ্রাম সফরে যাবেন, তুমি তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে অথবা অগ্রবর্তী টিম হিসেবেও যেতে পার।'

৪নং ধানমন্ডিতে এম আব্দুল হাকিম সাহেব তাঁর শ্বশুড় বাড়িতে উঠেছেন। পরে জেনেছি তিনি এতো দিন দিল্লিতে ছিলেন। অল্প ক'দিন হলো তিনি দেশে এসেছেন। এখনো পর্যন্ত নিজে বাসা নিতে পারেননি। তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক ছিলেন। তাঁর বাসায় নিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী'র সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম দেখাতেই আমি তাঁকে চাচী বলে সম্বোধন করলাম। হাকিম সাহেবের বাড়িতে চা পান করে বের হলাম। বের হয়েই আমার একজন সুহৃদ ব্যক্তি- জনাব আলী আহম্মেদ সাহেবের অফিসের দিকে ছুটলাম। তিনি আমাদের বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার বাসিন্দা। প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার ও জুট ব্যবসায়ী। তার টেলিফোন নাম্বারটিই আমি কর্ণেল অলি আহম্মেদকে দিয়ে এসেছিলাম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। সেই সংবাদটি আলী আহম্মেদ সাহেবকে জানানোর জন্যই হন্যে হয়ে তার অফিসের দিকে ছুটছিলাম।

৩-দিন পর উল্লেখিত টেলিফোন নম্বরে বঙ্গভবন থেকে ফোন এল। জানানো হল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে যাচ্ছেন গণসংযোগ করার জন্য। তিনি চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী, সুধিসমাজ ও বিশিষ্টব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। কর্ণেল অলি আহম্মেদ আমাকে অগ্রবর্তী টিম নিয়ে যেতে বললেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক আরিফ আহম্মেদকে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, এই চিঠিখানা আরিফ আহম্মেদকে দিলেই তিনি তোমাদের জন্য করণীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করবেন। এম আব্দুল হাকিম সাহেবও একখানা চিঠি দিয়েছিলেন, ই এ চৌধুরী সাহেবের কাছে।

আমি, ড. গোলাম হোসেন, শামসুল হক, সালে ইমাম চৌধুরী, মজনু খান-সহ চট্টগ্রাম গেলাম এবং সকাল বেলায় প্রফেসর আরিফ আহম্মেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আগে থেকেই কর্ণেল অলি আহম্মেদের নিকট থেকে টেলিফোনে বিস্তারিত সংবাদ পেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দু'দিনের

www.pathagar.com

জন্য চট্টগ্রাম সফর আসছেন। প্রথম দিন গণসংযোগ এবং দ্বিতীয় দিন প্রথম প্রহরে সার্কিট হাউজে সুধিসমাজ, ব্যবসায়ী কমিউনিটি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং বিকেলে ক্যান্টনমেন্টে সিনিয়র আর্মি অফিসারদের সঙ্গে কাজ সেরে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করবেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সঙ্গে শিল্প উপদেষ্টা জামাল উদ্দিন আহম্মেদ সরফসঙ্গি ছিলেন। তিনিই আমাদের জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রায় ৭–৮টি বিরাট বিরাট জনসভা হয়েছিল। একটিতে আমিও বক্তৃতা করেছিলাম। তখনও কোনো দল গঠন করা হয়নি। দল গঠনের জন্য প্রক্রিয়া চলছে। উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, তথ্য উপদেষ্টা শামসুল হুদা চৌধুরী, জামাল উদ্দিন আহম্মেদ, এনায়েত উল্লাহ খান, ব্যারিস্টার মওদুদ আহম্মেদসহ সব উপদেষ্টারাই দল গঠনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। ডি এল থেকে কে এম ওবায়দুর রহমান সাহেবকে আনা হল। প্রাথমিকভাবে বিচারপতি সাত্তার সাহেবকে আহ্বায়ক করে জাগদল গঠন করা হলো। নবগঠিত এই দলের নেতৃত্বে গঠন করা হলো জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট। ফ্রন্টের অন্তর্ভূক্ত দলগুলো হচ্ছে : (১) জাগদল (২) ভাসানী ন্যাপ (৩) মুসলিম লীগ (৪) ইউপিপি (৫) বাংলাদেশ লেবার পার্টি ও (৬) বাংলাদেশ তফসিলি জাতি ফেডারেশন। ১৯৭৮ সালের ১২ জুন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘোষণা করা হল।

তখন পর্যন্ত নির্বাচন পরিচালনার বা পার্টির জন্য কোনো কেন্দ্রীয় কার্যালয় নেয়া হয়নি। শামসুল হুদা চৌধুরীর ৬নং ইস্কাটন রোডের বাড়িটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কেন্দ্রীয় অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হতো। আমি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। ব্যক্তি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে এবং তার জীবনের বিভিন্ন দিক আমার দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে তার সামান্য কিছু বর্ণনা এখানে তুলে ধরতে চাই।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টকে পার্টিতে তিনি রূপান্তর করতে চাইলে কাজী জাফর আহম্মেদ ও মওলানা আব্দুল মতিন দ্বিমত পোষণ করে ফ্রন্ট থেকে আলাদা অবস্থান গ্রহণ করেন। তখনকার বাস্তবতায় এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, পার্লামেন্ট নির্বাচন ছাড়া সামরিক শাসন থেকে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। এই জটিল পটভূমিতে প্রেসিডেন্ট জিয়া ৪ জন প্রশাসনিক সহযোগির উপরে খুব বেশি

www.pathagar.com

নির্ভরশীল ছিলেন। এঁরা হলেন - (১) শেখ আব্দুল হাকিম (২) মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী (৩) মেজর জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু ও (৪) কর্ণেল অলি আহম্মেদ।

সংগঠন পরিচালনার জন্য তিনি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, ফিরোজ নূন, খালেকুজ্জামান খান দুদু, অধ্যাপক মাজেদুল ইসলাম ও আমাকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

আমি পূর্বেই বলেছি - নতুন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য কোনো কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল না। ধানমন্ডির ২৮নং রোডের ২২ নং বাড়িতে থাকতেন ফরিদপুরের আলী আহম্মদ সাহেব। এই বাড়ির মালিক জেনারেল আতিকুর রহমানের ছোট ভাই। আমি আলী আহম্মেদকে নবগঠিত পার্টির অফিস হিসেবে এই বাড়িটি ভাড়া নেয়ার ব্যবস্থা করার অনুরোধ করি। তিনি রাজি হলেন এবং আমি এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে সে কথা অবহিত করলে তিনি বাড়িটি দেখেন এবং কর্ণেল আলাউদ্দিন সাহেবও এই বাড়িটি দেখে পছন্দ করলেন। ভাড়া নির্ধারিত হয় মাসে ১২ হাজার টাকা। এভাবেই যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - 'বিএনপি'র।

কখন কিভাবে আমি শেখ আব্দুল হাকিম ও মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরীর একেবারে কাছের মানুষে পরিণত হয়েছিলাম, আমি নিজেও তা বুঝে উঠতে পারিনি। প্রায় প্রতিদিন বিশেষকরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে আমাদেরকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাসায় যেতে হত ভোর বেলায়। দেশের প্রেসিডেন্টের সকাল বেলার নাস্তা খাওয়া বহুদিন দেখেছি। তার বর্ণনার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। এককথায় বলা চলে রুটি-ভাজি, বেশি হলে একটি ডিম, এক কাপ চা এই সাধারণ জীবন ব্যবস্থা ছিল সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮১ সালের ৩০ মে পর্যন্ত প্রায় ২০০ বার আমার ও খালেকুজ্জামান খান দুদু'র সৌভাগ্য হয়েছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সফরসঙ্গি হওয়ার। একমাত্র এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী-ই সম্ভবত আমাদের চেয়ে বেশি সফরসঙ্গি হয়েছিলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ।

তিনি খালেকুজ্জামান খান দুদুকে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং আমাকে কৃষি বিষয়ক সম্পাদক করেছিলেন। আমি মাঝে মধেই বলতাম - আমার কাজের তিনি

www.pathagar.com

সঠিক মূল্যায়ন করছেন না। একদিন এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সামনেও এই কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন - তুমিই বিএনপি'র সম্পাদক মন্ডলীর কনিষ্ঠতম সদস্য এর পর আর কোনো দিন পদ-পদবীর জন্য প্রশ্ন তুলিনি।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গী হিসেবে বিশেষ ৩টি স্মৃতির কথা আমার সারাজীবন স্মরণে থাকবে :

প্রথমত : নারায়ণগঞ্জের একজন অত্যন্ত বড় ব্যবসায়ি আমার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন। তার এই অভিপ্রায়ের কথা আমি রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করলে তিনি একদিন একান্তে সাক্ষাৎ দিতে সম্মত হলেন। তারপর একদিন আমি একান্তে তাকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করি পার্টি অফিসের চেয়ারম্যানের রুমে। আমি তাকে নিয়ে রুমে প্রবেশ করি। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর ভদ্রলোক কৌশলে আমাকে রুমে না থাকার জন্য অনুরোধ করেন। আমি রুম থেকে বের হতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে বললেন –

'আপনি একটু বসুন আমি নিলু'র সাথে অন্য একটা কাজের কথা সারি।'

ভদ্রলোক বাইরে গেলে রাষ্ট্রপতি আমাকে গালমন্দ শুরু করলেন। বললেন- 'তোমার মাধ্যমে এসেই তিনি, তোমাকে বাদ দিয়ে দিতে চায়। এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে সাবধান থাকবে।'

শেষপর্যন্ত প্রেসিডেন্ট সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আর দেখাই করলেন না।

দ্বিতীয়ত : গোপালগঞ্জের সংসদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন আহম্মেদ মারা গেলে আমি বাই ইলেকশনে পার্টি থেকে পদপ্রার্থী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। প্রেসিডেন্ট আমাকে গোপালগঞ্জ ঘুরে আসতে বললেন। কিন্তু নমিনেশন পেপার সাবমিটের দিন পর্যন্ত আমার বয়স ২৫ বছর হতে ৮দিন কম ছিল। সেই হিসাব আমার ও খেয়াল ছিল না। পার্টির মধ্যে যারা আমার নমিনেশন বিরোধী ছিল তারা আমি যাতে নমিনেশন না পাই সেই জন্য আমার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতিকে দেখিয়েছেন। পার্টির পার্লামেন্টারি বোর্ড পার্টি থেকে আমাকে মনোনয়ন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে আমি ভীষণ রেগে যাই এবং পার্টির লোকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি। প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে আমাকে আর একটি কথাও বললেন না। তারপর থেকে আমি অফিসে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি।

www.pathagar.com

একদিন বিকেলে দেখি অফিসের জীপ নিয়ে খালেকুজ্জামান খান দুদু, গোলাম কিবরিয়া টিপু, নাজমুল হাসান আমার বাসায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। দুদু ভাই বললেন অফিসে চলেন। আমরা ৪ জনে একসঙ্গে অফিসে গেলাম। আমি কিছুই জানি না। রাত ৮টার কিছু পরে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অফিসে আসলেন। আমাকে তার রুমের মধ্যে এক কোণায় বসিয়ে রাখা হল। সকল আগন্তুকের সঙ্গে কথা সেরে রাষ্ট্রপতি বাসার দিকে রওয়ানা হলেন। এমন সময় খালেকুজ্জামান খান দুদু এসে আমার হাত ধরে রাষ্ট্রপতির পিছু পিছু নিয়ে গেলেন এবং আমাকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের গাড়িতে তাঁর পাশে বসিয়ে দিলেন। আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম। তিনি আমার গায়ে হাত দিয়ে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন - 'পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য ইলেকশন করতে পারনি তাতে কি হয়েছে, তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে। এদেশের কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের জন্য সংসদ সদস্য না হয়েও অনেক কিছু করার আছে।'

আমি প্রেসিডেন্টের মুখের দিকে তাকাতে পারিনি। প্রেসিডেন্ট তাঁর বাসায় এসে গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে গেলেন এবং এডিসিকে বললেন আমাকে বাসায় পৌঁছে দিতে। সমস্ত রাগ অভিমান সব কিছুই তার পিতৃতুল্য স্নেহের আড়ালে ডাকা পড়ে গেল। শুরু করলাম নতুন উদ্দীপনায় সাংগঠনিক কর্মকান্ড।

তৃতীয়ত : ইরাক-ইরান যুদ্ধ। মুসলিম জাহানে এই যুদ্ধ বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই বিভীষিকাময় যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বার বার ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ-খোমেনির সঙ্গে দেখা করে এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে থাকেন। মূলত ইরানের শাহানশাহ রেজা পাহলবীর পতনের মধ্য দিয়ে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়। সেই আদর্শ মধ্যপ্রাচ্যের অন্য রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই ধরণের চিন্তা থেকেই ইরাক-ইরান যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। পশ্চিমা শক্তিগুলো যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইসলামি বিপ্লবের চেতনা থামিয়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে মুসলিম জাহানের তেল সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছিল।

একদিকে যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ যা ছিল পশ্চিমা শক্তির স্বার্থের পরিপন্থি। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বে ভারতসহ অন্যান্য নেতৃত্ব দানকারীরা জিয়াউর রহমানের এই শান্তিবাদী ইমেজে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তারা একটি ছোট্ট দেশের নেতাকে বিশ্বনন্দিত নেতা হিসেবে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি।

www.pathagar.com

আমাকে একদিন এন এস আই-এর ডাইরেক্টর (এক্সটারন্যাল) এস এম হুদা সাহেব তার অফিসে চা পান করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি শেখ আব্দুল হাকিমের বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে আমার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি আমাকে পশ্চিমা কূটনীতিকদের ক্ষুব্ধপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধে ধীরগতি গ্রহণের নীতি অবলম্বনের কথা বললেন। আমি তাকে কথা দিলাম প্রেসিডেন্ট সাহেবকে আমি আপনার কথা আমার করে বলবো। অবশ্য আমি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে এই কথাগুলো বলার আগেই শেখ আব্দুল হাকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনিও আমাকে বললেন তোমার মত করে তুমি প্রেসিডেন্টকে বল। দুই-তিন দিনের মধ্যেই আমি প্রেসিডেন্টকে আমার মনের কথা বললাম। আমি এও বললাম – তৃতীয় বিশ্বে ছোট দেশের দেশপ্রেমিক বড় নেতাদের অনেক বিপদ। তিনি আমার কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরে আমাকে বললেন- "আমি ভেবেছিলাম তুমি একজন ঈমানদার মুসলমান। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর জন্ম এবং মৃত্যু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন নির্ধারিত। তিনি (আল্লাহ্) যে সময় আমাকে নিয়ে যাবেন, পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই বলে যুদ্ধ নয় শান্তির পক্ষেই আমাকে কাজ করতে হবে।"

পরিশেষে ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে তৃতীয় বিশ্বের শান্তির দূত মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শাহাদাৎ বরণ করেন। #

www.pathagar.com

আমার পারিবারিক জীবন

২৫ মে ১৯৮০, আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিন আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলাম খায়রুন্নাহার খানমের সঙ্গে। বিবাহের কিছুদিন আগে আমি পকিস্তান, চীন ও উত্তর কোরিয়া সফরে গিয়েছিলাম। তার পূর্বেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। পরবর্তীতে উভয় পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ও মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল আমার বন্ধু ও জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের অন্যতম নেতা আব্দুর রাজ্জাক সরকার ও পাবনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুর রহমান। আমার স্ত্রী ও তৌফিকুর রহমান মামাত-ফুফাত ভাইবোন।

আমার স্ত্রী সে সময় ঢাকার বকশিবাজারস্থ বদরুন্নেছা মহিলা কলেজ থেকে আই এ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য এসেছিলেন। সেই সূত্রেই আমাদের পরিচয়। আমাদের বিবাহকে ইচ্ছা করলে প্রেমের বিয়ে বা অভিভাবকের পছন্দমত বিয়ে দু'ভাবেই চিন্তা করা যাবে।

www.pathagar.com

আমার শ্বশুড় রেলবিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৯৭৮ সালে মারা যান। ১৯৭৯ সালের জুন-জুলাই মাসের কোনো একসময় আব্দুর রাজ্জাক সরকার, আমি ও আমার স্ত্রীর একটি মঞ্চনাটক দেখার জন্য মহিলা সমিতিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। আমার স্ত্রী রাজ্জাক সরকারকে বলেছিল মহিলা সমিতির উল্টোদিকে একটি আম গাছ আছে সেখানে গেলেই তিনি আমাদের মহিলা সমিতিতে নিয়ে যাবেন। সেদিনই তার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ দেখা ও আলাপচারিতা। এর কয়েকদিন পরে কাকতালীয়ভাবে ফকিরাপুল বাজারের সামনে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। সে পুরানা পল্টনে তার চাচার বাসায় যাচ্ছিল। এভাবেই পরিচয়পর্ব থেকে শুরু হলো আমাদের ঘনিষ্ঠতা।

ইতিমধ্যে আমি চলে গেলাম, পাকিস্তান, চীন, উত্তর কোরিয়া সফরে। আমার বন্ধু মোহাম্মদ আলী খানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে আমাদের পরিবারের সকলের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল। তখন আমরা মিরপুর ২নং সেকশনে থাকি। আমার স্ত্রী বাংলাদেশ টেলিভিশনে নাটক করতেন। বিটিভিতে শিশুদের একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। আমার স্ত্রী আমার ছোট বোন শিমুকে সেই অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়। যার ফলে আমি বিদেশে থাকাকালেই সে আমার মা-বাবা, ভাইবোনদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠে। আমার বাবা তাকে খুবই পছন্দ করতে শুরু করেন।

ইতিমধ্যে আমি বিদেশ থেকে ফিরে আসি এবং মিরপুরের বাসা পরিবর্তন করে মগবাজারের দিলু রোডে বাসা ভাড়া করি। ১৯৮০ সালের ২৫ মে আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের বিবাহের উকিলশ্বশুড় ছিলেন সাবেক স্পীকার মরহুম শামসুল হুদা চৌধুরী। আমি যদি বলি আমার স্ত্রীকে দেখার পূর্বে আমার আর কোনো রমণীকে ভাল লাগেনি সেটা হবে একটি চরম মিথ্যা কথা। কিন্তু বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো আস্থার সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরতা। আমার স্ত্রী তার শতভাগ পূরণ করতে পেরেছে। বিবাহোত্তর জীবনে যে কোনো কাজে হাত দিয়েছি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও সে আন্তরিকতা ও সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে আস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। তা না হলে আমি হয়তো কোনোভাবেই রাজনৈতিক অঙ্গনে টিকে থাকতে পারতাম না।

১৯৮০ সালের ২৫ মে বিবাহের পর আমার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগিরা বিশেষকরে এ· বি এম শাহ আলাম, শামসুল হক, ড. গোলাম হোসেন, নাজমুল হাসান, সাগির আহম্মেদ, হাবিবুর রহমান হাবিবসহ অন্যান্যরা আমার স্ত্রীকে ছাত্র

www.pathagar.com

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেন। আমার স্ত্রী খায়রুন নাহার খানম তখন ঢাকার মহিলা বদরুন্নেছা কলেজের ছাত্রী। বিবাহের বছরই কলেজের সংসদ নির্বাচন হলো। খায়রুন নাহার খানম আগে সক্রিয়ভাবে কোনো রাজনীতি করেনি। কিন্তু রাজনীতি ও সমাজ সচেতনতায় সে ছিল অগ্রগামী ও যোগ্যতম। আমি বারণ করেছিলাম কারণ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সচরাচর সরকারি দলকে সমর্থন করে না। কিন্তু খায়রুন নাহার ভিপি পদে প্রার্থী হওয়ার কারণে বদরুন্নেছা মহিলা কলেজে ছাত্র দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। পরে সকলেই আমাকে বলেছে, খায়রুন নাহারের বাগ্মিতা ও সততার কারণেই জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের এই বিরাট বিজয় সম্ভব হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে শহীদ হলেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ বিচারপতি আব্দুস সাত্তার সরকারের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। আমরা বাড়ি পরিবর্তন করে চলে গেলাম আমার বন্ধু জামানদের মালিবাগস্থ বাড়িতে। এই বাড়িতে থাকাকালীন সময়েই আমার বড় মেয়ে রাজবিন শওকত ১৯৮২ সালের ১৩ জুন টি এ চৌধুরীর ক্লিনিকে জন্ম হয়। আমার বড় মেয়ে আমার পরিবারের প্রথম সন্তান। ৫–৬ মাস বয়সেই লক্ষ্য করা যেত যে, সে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। আমার মায়ের কোলে তাকে ছাড়া অন্যকাউকে উঠতে দিতো না। আমার ছোটভাই শেখ সালাউদ্দিনের কাছে কাউকে সে থাকতে দিতো না। এখন অবশ্য তার পরিবর্তন হয়েছে। চাচাতো-খালাতো-মামাতো ভাইবোনসহ অনেককেই এখন সে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

১৯৮৪ সালে রাজনীতি নতুন করে শুরু হলে বিএনপি ভাঙ্গনের মুখে পড়ে। আমিও পূর্ব থেকেই একটি অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। বিচারপতি সাত্তার সাহেব রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে দলের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে উঠে। আমার স্ত্রী খায়রুন নাহার খানম আমাকে দলের ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু সে কাজ আমি করতে পারিনি। আর এটাই ছিল আমার রাজনৈতিক জীবনের বড় ধরনের ব্যর্থতা।

১৯৮৫ সালে আমি যখন প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল গঠন করি তখন আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই করুন। আমার স্ত্রী তার সমস্ত অলংকার আমার বন্ধু ওমর ফারুক খসরুকে নিয়ে সোনালী ব্যাংকে বন্ধক রেখে ৪০ হাজার টাকা দিয়ে ছিলো। এ ছাড়া কোনোক্রমেই আমি প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল দাঁড় করাতে

www.pathagar.com

পারতাম না। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি সংসার খরচের অর্থ যোগাড় করতে সে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়ে শিক্ষকতার জীবন শুরু করে। তারপরও সে আমার নতুন রাজনৈতিক দল সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিল।

এরশাদ সাহেবের ৯ বছরের শাসনকালে আমি জাতীয় পার্টির ধারে-কাছেও যাইনি। তার পতন ত্বরান্বিত করতে সবধরণের কাজ করেছি। কিন্তু, ১৯৯১ সালের নির্বাচনে যখন জাতীয় পার্টি ৩৩টি আসন ও হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নিজে ৫টি আসনে জয়লাভ করলেন তখন এরশাদ ও জাতীয় পার্টির ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা নমনীয় হয়। তখন তাঁকে ও অধ্যাপক গোলাম আজমকে জেলে নেয়ার প্রতিবাদে আমি হরতালের মতো কঠিন কর্মসূচি দিয়েছিলাম। তৎকালীন বিএনপি সরকার আমাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠালো। দেশের রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে আমি এরশাদ-গোলাম আজমের মুক্তি চেয়েছিলাম ঠিক তা নয়। এ ক্ষেত্রে ছোট ভাই সাংবাদিক ফয়সালের কথাটিই সত্য, 'নিজের ও দলের প্রচার পাওয়ার জন্যই এই হরতালের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছিলাম।'

১৯৯৭ সালে ৭ দলীয় জোট গঠিত হয়। ইতিমধ্যে আমার ছোট মেয়ে মাহেরিন শওকতের জন্ম হয়। ১৯৯৮ সালের ১৩ অক্টোর ৭ দলের পক্ষ থেকে সচিবালয় অবরোধের কর্মসূচি দেয়া হয়েছিল। আমাদের দল পুলিশী ব্যারিকেড ভেঙ্গে ফেলে। পুলিশবাহিনী শুরু করলো টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও রাবার বুলেট ছুঁড়ার মত কঠিন পদক্ষেপ। আমিসহ আমাদের ৩৮ জনকে গ্রেফতার করা হলো। বেদম প্রহার করার পর আমাকে হুকুমের আসামি করা হলো। সে সময় পিএনপি'র মহাসচিব এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরীর হাত ভেঙ্গে যায়। মিসেস নাসিমা ও মাহমুদুর রহমান মুন্নিসহ ৩০ জন গুরুতরভাবে আহত হয়। আমাকেসহ গ্রেফতারকৃত ৩৮ জনকেই জেলে পাঠানো হলো। এর প্রতিবাদে ৭ দলীয় জোট পরদিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর থেকে একটানা ৭২ ঘন্টা হরতাল আহ্বান করে।

আমার স্ত্রী আট মাইল রাস্তা অর্থাৎ মিরপুরের ইব্রাহিমপুর থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেইটে পর্যন্ত পায়ে হেঁটে আমার ব্যবহার্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসতো। এই দৃশ্য দেখে ডেপুটি জেলার সকলের সামনে আমাকে বলেছিলেন নিলু ভাই আপনি ভাগ্যবান মানুষ, রাজনীতি আপনারই করা সাজে। ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের এই সময়কালটি ছিল আমার ও

www.pathagar.com

জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধানের জন্য খুবই দুর্দিন। কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি আসার পূর্বেই আমাদের দু'জনকে গ্রেফতার করতে পারলে সরকার নিরাপদ বোধ করতো। কিন্তু আমার জীবনে চরম বিপর্যয়ের সময় আসে ১৯৯৯ সালের ৭ নভম্বর। দলগতভাবে আমরা ৭ নভেম্বর গুরুত্বসহকারে পালন করি। বিএনপিও এই দিবসটি পালন করে।

১৯৯৯ সালের ৭ নভেম্বরের এক মাস পূর্বে আমরা মুক্তাঙ্গনে এক জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করি। বিএনপি পল্টন ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করে মাত্র তিনদিন পূর্বে। কোনো প্রকার সৌজন্যমূলক আলোচনা ছাড়াই বিএনপি আমাদের ঘোষিত স্থানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করে। আমরা পড়ি মহাবিপদে। দলীয় কর্মসূচির স্থান পরিবর্তনের সুযোগ আমাদের থাকে না। অন্যদিকে একই স্থানে দু'টি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি থাকলে সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। বিএনপি একটি বৃহত্তম দল তারপরও আমরা ৭ দলের মধ্যে থেকে কাজ করছি। সামান্যতম সৌজন্যবোধ বিএনপি'র তখনকার নেতৃত্ব আমাদের প্রতি দেখাতে পারেনি। প্রচন্ড উত্তেজনা ও অস্থিরতার মধ্যে আমরা আমাদের ঘোষিত কর্মসূচি ঠিক রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ এছাড়া আমাদের আর কোনো বিকল্প ছিল না।

অবশেষে একটি ট্রাকের উপর মঞ্চ করে আমরা জনসভা শুরু করলাম। কিন্তু জনসভার শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ম্যাসিভ হার্ড-এ্যাটাক্ট হলো। আমার স্ত্রী খায়রুন নাহার খানম ও এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরী কর্মসূচি চালিয়ে গেলো। মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, এস এম আবুল বাশার ও জাফর চৌধুরী যেকোনো একটি নিকট হাসপাতালে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে আছে কাকরাইল মোড় পর্যন্ত তার পরের কোনো ঘটনা আমার জানা নেই। পরে শুনেছি আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হলিফ্যামিলি হাসপাতালে। সেখানে ইমার্জেন্সিতে কর্তব্যরত ডাক্তার ইতস্ততা করতে থাকলে জাফর চৌধুরী উগ্রমুর্তি ধারণ করে এবং আমার দ্রুত চিকিৎসার দাবি জানান।

ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী এসে উপস্থিত হলে বন্ডে স্বাক্ষর দেয় সে। এর আগে জীবন রক্ষাকারী ইনজেকশন আমার দেহে পুশ করা হয়। ডাক্তার এটাও বলে দেয় যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জ্ঞান ফিরলে ভাল হবে, অন্যথায় আমাদের আর করার কিছুই

www.pathagar.com

থাকবে না। ডাক্তার আমার ছোট মামা কাজী আক্রামুজ্জামান ও আমার ছোট ভাই শেখ বেলায়েত হোসেনকে বললেন – যে জ্ঞান ফেরার সম্ভাবনা খুবই কম।

কিন্তু, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে ৪৮ ঘন্টা পরে আমার জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী, তার বড় দু'বোন মর্জিনা আপা ও লুৎফা আপা, আমার ছোট মামা কাজী আক্তারুজ্জামান, আমার খালাতো ভাই শাইনুল আলম, মাওলা চৌধুরীসহ বহু আপনজনকে। প্রথমে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে এখানে আনা হয়েছে কেন? আমার কি হয়েছে? শাইনের স্ত্রী আমার কাছে এসে বললো আপনি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। সে জন্য আপনাকে এখানে আনা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার ব্যাক্তিগত সচিব মোসাদ্দেক আলী ফালুকে পাঠিয়ে খোঁজ খবর নিলেন। জামায়েতে ইসলামির মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, আব্দুল কাদের মোল্লা, ডাক্তার আব্দুল মতিন, শামসুল হুদা চৌধুরীর মেয়ে শাহনাজ, আব্দুর রব ভাইসহ আমার সকল আপনজন এসে উপস্থিত হতে লাগলেন। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ডাক্তার আমার স্ত্রী, খালাতো ভাই শাইনুল আলমের স্ত্রী ও আমার ছোট মামাকে জানিয়ে দিলেন রোগির অবস্থা মোটেও ভাল নয়।

আমার স্ত্রী হার্টবিশেষজ্ঞ ডা. হাসিনা বানুকে আনার ব্যবস্থা করলেন। ডা. হাসিনা বানু আমার কাগজপত্র দেখে বলেছিলেন, রোগি কি এখনো বেঁচে আছে? তিনি আমাকে হার্ট ফাউন্ডেশনে ট্রান্সফার করে এনজিওগ্রাম করানোর নির্দেশ দিলেন। তিন চার দিন পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো হার্ট ফাউন্ডেশনে। সেখানে আমার এনজিওগ্রাম করানো হলো। এনজিওগ্রামে ধরা পড়ল আমার হার্টে ব্লক আছে। কিন্তু আমাকে তার কিছুই বলা হলো না। আমার যখন হার্ট এ্যাটাক্ট হয় তখন আমার ব্যাংক একাউন্টে ছিল মাত্র ৫ হাজার টাকা। কিভাবে চিকিৎসা চলেছে তার কিছুই বলতে পারবো না। আমার জন্য প্রথম দিনই ২৫ হাজার টাকা মূল্যের জরুরি লাইফসেভিং ইনজেকশন দেয়া হয়েছিল। যেদিন আমার এনজিওগ্রাম হয়েছিল সেদিন আমার প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছিল সারারাত। আমার স্ত্রী সারারাত আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জেগেছিল।

পরের দিন থেকে আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হতে থাকলাম। ডা. জাহাঙ্গীর, ডা. বদিউজ্জামান ও আমার খালাতো ভাই শাইনির স্ত্রী ডা. মুন্না অত্যন্ত যত্ন সহকারে

www.pathagar.com

ও আন্তরিকতার সাথে আমার চিকিৎসা করেছিল। ডা. মুন্না আমার আত্মীয় থাকার কারণে হার্ট ফাউন্ডেশনের সকল স্টাফ ও নার্সরাও আমার ব্যাপারে অত্যন্ত কেয়ারফুল ছিল। এক মাসের মতো আমি হার্টফাউন্ডেশনে ছিলাম।

এরমধ্যে শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতা জনাব অলি আহাদ আমাকে দেখতে ৫ বার হার্ট ফাউন্ডেশনে গিয়েছিলেন। জাপা চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার, ৭ দলের অন্যতম প্রবক্তা আনোয়ার জাহিদ, জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধানসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হার্ট ফাউন্ডেশনে এসে আমাকে দেখে যান। আমার স্ত্রীর মেঝো বোন মরজিনা বেগম থাকে মতিঝিলে। তিনি আমার জন্য প্রতিদিন বাসার খাবার নিয়ে আসতেন এবং নিজ হাতে শিশুবাচ্চাকে খাওয়ানোর মতো আমাকে খাওয়াতেন। একদিন মেঝো আপা আমাকে খাওয়াচ্ছেন। এমন সময় শ্রদ্ধেয় অলি আহাদ সাহেব আসলেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি এতোই খুশি হয়েছিলেন যা বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে না পেয়ে বলেছিলেন – 'নিলু এখনো তার পরিবারের কাছে শিশু বাচ্চাটির মতোই রয়ে গেছে'।

আমার স্ত্রী তখন একটি এনজিওতে পিডি হিসেবে কাজ করছে। কর্মক্ষেত্র মূলত পাবনায়। সেখানে সরকারের ভিজিটের কাজে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় খায়রুন নাহার আমাকে জানিয়েছিল সে পাবনা থেকে রওয়ানা দিয়েছে। সে ফিরে আসলো রাত ২টার দিকে। আমি ততক্ষণ জেগেই ছিলাম। আমার দীর্ঘদিনের বদঅভ্যাস আমার স্ত্রী কাছে না থাকলে আমি ইনসিকিরেট ফিল করি। ডিসেম্বর মাসের কুয়াশার কথা চিন্তা করে মন ছটফট করতে থাকে। সে এসেই আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল আমি তোমাকে ভাল চিকিৎসা করানোর জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল হাসপাতালে নিয়ে যাব। ইতিমধ্যে ডাক্তাররা আমার ছোট মামা ও খালাতো ভাইকে জানিয়ে দিয়েছিল আমার হার্ট অপারেশন করতে হবে। তা না হলে আমার দ্বিতীয়বার এ্যাটাক্ট হতে পারে এবং সে এ্যাটাক্ট হবে আরও ভয়াবহ।

আমরা চারজন ছিলাম একাত্মা। মরহুম শামসুল হুদা চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী নূরুল আমিন খান পাঠান, আব্দুর রউফ ও আমি। আমি এই চারজনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। দিনে অন্তত একবার আমাদের দেখা হতেই হবে। স্থান শামসুল হুদা চৌধুরীর ৬ নম্বর ইস্কাটনের বাড়ি। দুপুর বেলা পাঠান ভাই কিংবা রউফ ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করবেই আমি খেয়েছি কিনা। পাঠান ভাইয়ের বাসাও ইস্কাটনে।

www.pathagar.com

আশপাশে থাকলে তার বাসাতেই নিয়ে যেতেন খাওয়ার জন্য। আমার বাসা কাফরুল আর অফিস মগবাজার মোড়ে।

হুদা ভাই ও রউফ ভাই পশ্চিম বাংলার মানুষ। রউফ ভাইয়ের কর্মক্ষেত্র ধনিয়া এলাকায়। ১৯৪৭ সালের পর তিনি প্রপার্টি এক্সচেইঞ্জ করে ধনিয়া এলাকায় বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি নিজের জায়গায় ধনিয়া স্কুল, ধনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ধনিয়া মসজিদ, ধনিয়া পোস্ট অফিস স্থাপন করেছিলেন। প্রকৃত অর্থেই জনগণের জন্য সামাজিক উন্নয়নের জন্য এক মহান দানবীর তিনি। কিন্তু অকারণে বা অতিরিক্ত খরচ তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। হুদা ভাইয়ের ছিল ডায়াবেটিস রোগ। সন্ধ্যার সময় আমরা যখন আড্ডা দিতাম হুদা ভাই বলতেন, রউফ এক কেজি মিষ্টি আন সকলে মিলে খাই। রউফ ভাই কোনোদিন টাকা দিতো কোনোদিন দিতেন না। রউফ ভাই যেদিন টাকা দিতেন না সে দিন বলতেন টাকাও খরচ করব আর আপনার মেয়ের গালমন্দ শুনবো এটা হতে পারে না। হুদা ভাইয়ের মেয়ে থাকতো দু'তলায়। আর হুদা ভাই থাকতেন ৩য় তলায়। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে মিষ্টি এনে হুদা ভাইকে নিয়ে খেতাম। আর এ মিষ্টি আনার বাহক ছিলেন - এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরী ও আ হ ম জহির হোসেন হাকিম।

রউফ ভাইকে শামসুল হুদা চৌধুরী বলত কিপটে। ইতিমধ্যে হুদা ভাই মারা গেল, তার অল্পকিছুদিন পর নূরুল আমিন পাঠান ভাইও মারা গেলেন। রইলাম আমি আর আব্দুর রউফ। ইতিমধ্যে আমার হার্ট এ্যাটাক্ট হয়েছে। রউফ ভাই প্রতিদিন সন্ধ্যায়ই হার্ট ফাউন্ডেশনে উপস্থিত থাকেন। এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো সিঙ্গপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে আমার অপারেশন করানো হবে। এদিকে ওয়াশিংটন থেকে মিস শিলা পিটার্স যোগাযোগ করে বললেন - আমার হার্ট অপারেশনের জন্য আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থা তিনি করে দিবেন। কিন্তু, আমেরিকা অনেক বেশি দূরে হওয়ার কারণে লম্বা বিমান জার্নি আমার পক্ষে তখন সম্ভব হবে না বিধায় আমেরিকা যাওয়ার জন্য কেউ সাহস করতে পারলো না।

শেষপর্যন্ত মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে আমার হার্ট অপারেশন করা হলো। তবে আমি শুধু জানতাম সিঙ্গাপুর নিয়ে আমাকে একবার চেকাপ করানো হবে।

www.pathagar.com

তার জন্যও অনেক টাকা প্রয়োজন। আমার ছোটভাই শেখ সালাউদ্দিন টিকেট কিনেছিলেন। আমার দু'ভায়রা ভাই শহীদ ও খোকন শুধু বলতো টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করবেন না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এরমধ্যে আমাকে একদিনের জন্য বাসায় নেয়া হলো। পরের দিনই সিঙ্গাপুর যাত্রা। আমি তো জানি আমার কিছুই হয়নি। রউফ ভাইকে দেখতাম আমার স্ত্রীর সঙ্গে কি যেন গোপন কথাবার্তা বলতো।

সিঙ্গাপুর গেলাম। ওখানে গিয়ে দেখতে পেলাম আমার স্ত্রীর কাছে অনেক টাকা। কোথা থেকে সে এ টাকা পেয়েছে জানিনা। মনে মনে ভাবলাম এবার ফুর্তি করে খরচ করবো এবং সবার জন্য কিছু না কিছু কিনে নেব। আমার কোনো কথার কেউ বিরুদ্ধাচারণ করেন না। কোনোরকম ঝগড়া ঝাটিও করে না। আমার কোনো কিছুতেই কেউ বাধা দেয় না।

অবশেষে ১২ জানুয়ারি উপস্থিত হলাম মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে। সিঙ্গাপুরের হাসপাতালগুলোর নিয়ম হচ্ছে - অপারেশনের আগে রোগিকে সব কিছু অবহিত করা। আমি হাপাতালের ডাক্তারকে বললাম - ডাক্তার আমাকে একটু চেকাপ করে দিন এবং কিছু ওষুধ দিয়ে দিন। তিনি বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন - আমার স্ত্রী কিংবা অন্য কেউ বলেনি যে - আপনার হার্ট অপারেশন করতে হবে। আমি আমার স্ত্রীর দিকে তাকালাম। দেখি তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। সে ডাক্তারকে বলল - ভয় পাবে ভেবে তাকে এসব কিছুই বলা হয়নি।

ডা. জাহাঙ্গীর বলে দিয়েছিল ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে অপারেশন না করলে পুনরায় হার্ট এ্যাটাক্ট হতে পারে। ১৪ জানুয়ারি আমার অপারেশন করা হল সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে। ডা. কিস্টাফর চু বললেন আল্লার বিশেষ রহমত আপনারা ঠিক সময় এসে পৌঁছেছেন। না হলে মহাবিপদ হতে পারতো।

পরে দেশে ফিরে জেনেছি সাবেক স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী ঔ স্নেহভাজন কিপটে আব্দুর রউফ আমার চিকিৎসার জন্য আমার স্ত্রীর কাছে ৭ লাখ টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। সে কথা তিনি কাউকেই বলেননি। সে টাকা পরিশোধ করতে আমাদের ৩ বছর সময় লেগেছিল। আমার বড় খালা আমার স্ত্রীকে ১

www.pathagar.com

লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন গোপালগঞ্জে আমার অনেক জমি আছে দরকার হলে সে জমি সব বিক্রি করে টাকা নিয়ে তুমি আমার নিলুকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করবে।

১৩ ঘন্টা সময় ধরে আমার অপারেশন হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন - আপারেশন সফল ও সুন্দর হয়েছে। তারপরও আমাকে ৩০ ঘন্টা রাখা হয়েছিল ইনসেপ্টিভকেয়ারে। জ্ঞান ফিরলে দেখতে পেলাম আমার স্ত্রী আমার গায়ের উপর হাত দিয়ে বসে আছে। সেদিন মাউন্ট এলিজাবেথ হাপাতালে আমার সঙ্গে ঢাকার একজন ব্যবসায়িরও অপারেশন হয়েছিল। সে ব্যবসায়ী বাঁচেনি।

এরইমধ্যে আমার বড় মেয়ে রাজবিন শওকতের বিয়ে হয়েছে। তার এক বছর নয় মাস বয়সের এক মেয়ে নাম এনিহা জাহিদ। এনিহা এখন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কথা বলতে পারে। মা, বাবা, দাদা, নানা এসবের গন্ডি পেরিয়ে এখন দুষ্টুমি করে বলে - চশমা ভেঙ্গে দেবো, কাগজ ছিঁড়ে দেবো। তার শিশু মনের এসব কথা ও উচ্চারণ আমার মন ছুঁয়ে যায়। এ ছাড়া ৩০ সেপ্টেম্বর '০৯ তারিখে এনিহা'র ভাই ইন্দ্রাক রাহিল-এর জন্ম। মনে হয় আমার সামগ্রিক অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে পরম স্নেহের এনিহা ও রাহিল। #

www.pathagar.com

৩০ মে কালোরাতে শহীদ হলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের নাম প্রথম আমরা শুনতে পাই। দেশবাসী সেসময় চরম উত্তেজনার মধ্যে ছিল। একদিকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা, অন্যদিকে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার নির্বিচারে গণহত্যার মধ্যে দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল দিক-নির্দেশনামূলক একটি ঘোষণার। সেই ঘোষণা প্রচারিত হয় চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে। দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সেই ঘোষণাটি বজ্রনিনাদ কণ্ঠে উচ্চরিত হল একজন বাঙালি তরুণ সেনাঅফিসারের কণ্ঠে। আর তিনিই হলেন মেজর জিয়াউর রহমান।

তাঁর সেই ঘোষণায় দ্বিধান্বিত জাতি দিকনির্দেশনা পেল, সেই সঙ্গে শুরু হলো মহান সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হলেন। জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ কুষ্টিয়া হয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখলেন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে। যোগাযোগ স্থাপিত হল ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে। এভাবেই তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে তাঁর যুদ্ধকালীন গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন সরকার তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান করেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর খন্দকার মোশতাক আহমেদের সরকার জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান এবং ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের মধ্য দিয়ে বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অধিষ্ঠিত হলেও ক্ষমতার নেপথ্য নিয়ন্ত্রণকারী ছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৯৭৮ সালের ১২ জুন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জাতীয় উন্নয়নে সম্মিলিত উদ্যোগে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের পর থেকেই শহীদ জিয়ার নেতৃত্বে তা বিকশিত হতে শুরু করে।

তিনি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার জন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকেন। প্রথমেই সবার জন্য রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ঘরোয়া রাজনীতি উন্মুক্ত করে দেন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করে রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি নিজেও উপলব্ধি করেন জনগণের কল্যাণের জন্য একদলীয় বাকশালের কারণে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তার অবসানকল্পে, গণতান্ত্রিক রাজনেতিক দল প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। সেই আলোকেই তিনি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। তিনি প্রথমে পরোক্ষ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কার্যক্রম শুরু করেন।

বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয় গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)। ১৯৭৮ সালের ১২ জুনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে গঠিত হয় দুটি ফ্রন্ট। একটি জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট, অন্যটি গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট গঠিত হয়: (১) জাগদল, (২) ন্যাপ ভাসানী, (৩) মুসলিম লীগ, (৪) ইউনাইটেড পিপল্স পার্টি (৫) লেবার পর্টি ও (৬) জাতীয় তফসিলি ফেডারেশনের সমন্বয়ে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। আর গণতান্ত্রিক ঐক্যজোটের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী। নির্বাচনে ১ কোটি ১০ লাখ ভোটের ব্যবধানে জিয়াউর রহমান জেনারেল ওসমানীকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। শুরু হয় গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকারের শুভযাত্রা।

ভারতের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন

১৯৭৫ সাল থেকেই ভারতের সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বিহারের গফুর সরকারের মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। ইতোমধ্যে গুজরাট প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সব বিরোধী দল মিলে জনতা ফ্রন্ট গঠন করে কংগ্রেস ও তার সহযোগিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। নির্বাচনে কংগ্রেস-এর শোচনীয় পরাজয় ঘটলে বিরোধী শিবিরে নতুন করে উদ্দীপনার সঞ্চার হয় এবং কেন্দ্রেও ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিরোধী রাজনেতিক দলগুলো।

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে নিখিল ভারতীয় আন্দোলনে নতুন গতিবেগ লাভ করে। রাজনৈতিক অস্থিরতার মুখে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অধ্যাদেশ জারি করে ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এক কলংকজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। গণতান্ত্রিক ভারতে প্রথমবারের মতো মানুষ রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

অবশেষে ভারতে ১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হলে, গুজরাট শিক্ষার আলোকে 'জনতা ফ্রন্ট' 'জনতা পার্টিতে পরিণত হয়'। কংগ্রেসের বাবু জগজীবন রাম, হেম মতি নন্দন বহুগণা, নন্দিনী শৎপতি ও ইন্দিরা গান্ধীর ফুফু বিজয়া লক্ষ্মী পন্ডিত জনতা পার্টিতে যোগদানের ফলে কেন্দ্রে পরাজয় সুনিশ্চিত হয় ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেসের। মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় ভারতীয় কেন্দ্রীয় অকংগ্রেসী সরকার। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আঞ্চলিক সমস্যাগুলো সমাধানে সমঝোতা ও আন্তরিকতা বেড়ে উঠতে থাকে।

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী দল গঠন

১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টকে জাতীয়তাবাদী দলে রূপান্তর করেন। ফ্রন্ট থেকে বের হয়ে যান কাজী জাফর আহমেদ, এজেডএম এনায়েতউল্লাহ খান, মাওলানা মতিন এবং মুসলিম লীগের নেতারা। বাকি সকলেই সামিল হন জাতীয়তাবাদী দল গঠন প্রক্রিয়ায়। মশিয়ূর রহমান যাদু মিয়া, শাহ আজিজুর রহমান, ডাঃ বি চৌধুরী, এস এ বারি এ টি, ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী, কে এম ওবায়দুর রহমানসহ রাজনৈতিক অঙ্গণের শক্তিশালী নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন।

১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর রমনা পার্কে এক প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে নতুন দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দল গঠনের ঘোষণা প্রদান করা হয়। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসনে জয়লাভ করে এবং মুসলিম লীগের খান এ সবুর ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩টিতেই জয়লাভ করেন।

১৯৭৯ সালে মশিউর রহমান যাদু মিয়া মৃত্যুবরণ করলে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচনে তাৎক্ষণিকভাবে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমানকে জাতীয়তাবাদী দলের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত করা হয় এবং তিনি পরে প্রধানমন্ত্রীও নিযুক্ত হন। আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হন আসাদুজ্জামান খান। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর খোন্দকার মোশতাক আহমাদের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।

পররাষ্ট্রনীতি

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ছিল সব রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে সংঘাত নয়। এই মৌলিক পররাষ্ট্রনীতির ফলে তিনি স্বল্পোন্নত দেশ এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যে প্রথম সারির নেতায় পরিণত হন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের এই আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। কিন্তু

www.pathagar.com

মোরারজী দেশাই ও অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চমৎকার সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। তিনি চীন, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন রচনা করেছিলেন। আমাকেও একবার তিনি যুব প্রতিনিধিদল নিয়ে পাকিস্তান, চীন ও উত্তর কোরিয়া সফরে পাঠিয়েছিলেন।

ভারতের সঙ্গে ফারাক্কা সমস্যার সমাধানসহ আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য তিনি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, ভূটান, মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের সমন্বয়ে 'সার্ক' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সার্ক গঠনের উদ্যোগ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর পররাষ্ট্রনীতির এক ঐতিহাসিক পথনির্দেশনামূলক সিদ্ধান্ত। তিনি মুসলিম জাহানেও ছিলেন সকলের অকৃত্রিম বন্ধু। ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধে জিয়াউর রহমান-এর ভূমিকা তাকে শান্তির দূতে পরিণত করে।

খাদ্যে যুগান্তকারী বিপ্লব

বাংলাদেশ ছিল খাদ্য ঘাটতির দেশ। প্রতি বছর ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করে বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা মিটাতে হতো। ১৯৭৪ সালে খাদ্য ষড়যন্ত্রের কারণেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার সেই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে পারেনি। ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে জি কে প্রকল্পসহ রাজশাহী, কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর, যশোর অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন সংকটের মুখে পড়ে। এই জটিল পরিস্থিতিকে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি মানুষ, মাটি ও পানির সমন্বয়সাধন করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর এই কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য প্রথমেই নজর দেন পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর। তিনি বৃষ্টি ও বর্ষা মৌসুমের পানি ধরে রাখার জন্য খালখনন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। পুরো জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধভাবে খালখনন করে পানি ধরে রাখার উদ্যোগও গ্রহণ করেন তিনি। এর ফলে বাংলাদেশ দ্রুত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে পরিণত হয়। এ অবস্থায় বাংলাদেশকে খাদ্য রফতানিকারক দেশ হিসেবে পরিণত করতে সক্ষম হন তিনি। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উন্মেষও তার বৈপ্লবিক কর্মকান্ডেরই ফলশ্রুতি।

www.pathagar.com

১৯৮১ সালের ৩০ মে'র কালোরাত

১৯৮১ সালের ২৯ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিএনপির কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম যান। চট্টগ্রামে জামালউদ্দিন আহম্মদ ও ব্যারিস্টার সুলতান আহম্মেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বিএনপির মধ্যেই দু'টি প্রতিপক্ষ গ্রুপ ছিল। এই অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং কোনো মারাত্মক বিষয় ছিল না। কিন্তু কি কারণে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন আজও সে রহস্য উদঘাটিত হয়নি। ২৯ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের যাওয়ার কথা ছিল নওগাঁতে একটি কৃষক সম্মেলনে। কিন্তু সেই কর্মসূচি স্থগিত করে ২৯ মে তারিখে তিনি চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। বিচারপতি সাত্তার সাহেব ছিলেন জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহবায়ক আর আমি ছিলাম সদস্য সচিব। ২৭ মে প্রেসিডেন্টের এমএসপি জেনারেল ছাদেকুর রহমান চৌধুরী বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে নওগাঁর কৃষকসম্মেলন স্থগিত করার কথা অবহিত করেন।

সেনাবাহিনীর বদলি-পদোন্নতি সম্পর্কে সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন কখনো খুব বেশি অবহিত থাকে না। এমনকি প্রেসিডেন্টের এমএসপি ও গার্ড রেজিমেন্টেরও নিয়ন্ত্রণ থাকে সেনাসদর দফতরের হাতে। ১৯৮১ সালের ২৭ মে চট্টগ্রামের ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে ঢাকায় স্টাফ কলেজে বদলির আদেশ দেয়া হয়। ২৯ তারিখে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলে ঢাকা থেকে জেনারেল মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে রিসিপশনে না থাকার কথা জানানো হয়। এ সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে সন্দেহ-হিংসা-প্রতিহিংসার লেলিহান শিখা জ্বলে উঠে। পরিশেষে ৩০ মে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে কিছু বিপথগামী বিদ্রোহী অফিসারের আক্রমণে শাহাদত বরণ করেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠসন্তান, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। #

www.pathagar.com

নতুন করে ফারাক্কা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৭৬ সালের ১৬মে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক ফারাক্কা লংমার্চ শেষ হওয়ার পর একই বছর ১৭ নভেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইতিমধ্যে গ্যারান্টি ক্লোজসহ ভারতের সঙ্গে পানিবন্টন চুক্তি হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমান শাহাদাৎ বরণ করলে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে জাতীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিপুল ভোটের ব্যাবধানে বিচারপতি সাত্তার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের অল্পকিছুদিন পরই ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিচারপতি সাত্তার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শাসন জারি করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন।

ক্ষমতার পালাবদলের প্রেক্ষাপটে ভারতের সঙ্গে পানিচুক্তি নবায়নের প্রশ্ন দেখা দিলে বাংলাদেশের পক্ষে গ্যারান্টি ক্লোজ তুলে দেয়া হয়। এ অবস্থার মধ্যে নতুন করে ফারাক্কা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমত এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন পাকিস্তানের সাবেক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী প্রয়াত অহিদুজ্জামান এর দুই ছেলে নাজিম হাবিবুজ্জামান ও নাজিম রশিদুজ্জামান। দীর্ঘদিন বিভিন্নভাবে আলোচনা শেষে আমাকে আহ্বায়ক করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট ফারাক্কা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আমরা সারাদেশব্যাপী এর সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে থাকি।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় কমিটিতে এডভোকেট কাইয়ুম খন্দকার, সাইদুর রহমান, এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরী, আ হ ম জহির হোসেন হাকিম, আলহাজ্ব নূরুল আমিন সরকার, বাবুল হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফাসহ আরও উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন। দেশব্যাপী মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় এই সংগঠন।

১৯৮৭ সালের ১ জানুয়ারি আমরা ভারতীয় সরকারের উদ্দেশ্যে গণমিছিল করে একটি স্মারকলিপি প্রদান করি। সেই গণমিছিলে অংশ নেয় সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ। আমরা স্মারকলিপিতে পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের কি কি ক্ষতি হচ্ছে তা ভারতীয় সরকাররের কাছে তুলে ধরি। আমরা উল্লেখ করি একতরফা পানি প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি করতে পারে ভারতের কাছে।

আমাদের দেশের পানি বিশেষজ্ঞরা সার্বিক পরিস্থিতির উপর গবেষণা করে দেখতে পায় ফারাক্কা বাঁধের ফলে রাজশাহী-কুষ্টিয়াসহ উত্তর অঞ্চলে ব্যাপক মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চলে মিঠা পানির চাপ কমে যাওয়ার ফলে লবণাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করেছে। এর ফলে সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল লবণাক্ততার মধ্যে পতিত হয়েছে। অন্যদিকে নৌ-যোগাযোগ চরমভাবে ব্যহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে পরিবহন খাতে ব্যয় ৫গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি মিঠাপানির মাছ উৎপাদনও বিপুলভাবে কমে গেছে। ফলে ১০ লক্ষ জেলে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েছে। সর্বোপরি পরিবেশের জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়েছে। উজানের পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে ৮ কোটি মানুষ আর্সেনিক-এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বছরে বাংলাদেশ ১০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে।

আমাদের সংগঠন ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরির ফলে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য, প্রকৃতি ও অর্থনীতির যে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তা দেশের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তুলে ধরে। এর ফলে ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি হয়। আমরা বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের কাছেও ফারাক্কা বাধের ফলে বাংলাদশের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি অবহিত করেছি। সে সময় বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন মাইলাম। আর মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সিলর ছিলেন সিলা পিন্টাস। তিনি বাংলাদেশের পানিসমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। তিনি নিজে ফারাক্কা এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং দক্ষিণ বাংলায় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে সুন্দরবনে কি পরিমাণ জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত

www.pathagar.com

হয়েছে বা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তার ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। প্রায় প্রতিটি সমীক্ষাই ছিল আমাদের পর্যবেক্ষণের কাছাকাছি।

মিঠাপানি এভাবে সম্পূর্ণ অন্যায় ও একতরফাভাবে প্রত্যাহারের বিষয়টিকে আমি পানির জন্য দস্যুতা হিসাবে অভিযুক্ত করেছি ভারত সরকারকে। আমাদের সংগ্রাম পরিষদের উপদেষ্টা নাজিম হাবিব-উজ-জামান সরকারের পক্ষে আদেশ পাওয়ার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করেন। এই ধরণের মামলা ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট গ্রহণ করলেও বিশেষ মহলের কারসাজির ফলে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট সেই মামলাটি গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে এরশাদ সরকারের পতন হয় এবং বেগম খালেদা জিয়া সরকার গঠন করেন। আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম বেগম খালেদা জিয়ার সরকার ফারাক্কাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির প্রশ্নকে আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করে একটি কার্যকর পানিনীতি প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু বাস্তবে তা পরিলক্ষিত হলো না।

বেগম খালেদা জিয়ার সরকার অবশ্য দ্বিপাক্ষিকভাবে বাংলাদেশের পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় পক্ষ পানি দেয়ার সামান্যতম আন্তরিকতা প্রদর্শন করেনি। ভারতের পানিনীতি হচ্ছে তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী মানে তাদের নিজেদের নদী। পাশাপাশি বৃহত্তর আঞ্চলিক শক্তির অহঙ্কারও তাদের নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৯২ সালে হেগে আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনার উপর এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে-একটি নদীর পানিপ্রবাহ একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে ভাটির দেশের মতামত পরিহার বা উপেক্ষা করে উজানের দেশ কোনোক্রমেই পানির গতি রোধ করতে পারবে না। কিন্তু ভারত সেই আন্তর্জাতিক আইন ও সিদ্ধান্তের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করেনি। সর্বোপরি ভারতের পানিনীতি ও ব্যবস্থাপনার নামে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ফারাক্কার উজানে নিয়ে যাওয়ারও একটি অকল্পনীয় প্রস্তাব বাস্তবায়নের তৎপরতা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের পানি যমুনা দিয়ে প্রবাহিত করে, প্রথমে নেওয়া হবে ফারাক্কার উজানে পরে তা ভাগ করে তার কিয়দাংশ পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত হবে বাকি অংশ চলে যাবে গঙ্গা অববাহিকায়। এর ফলে লবণাক্ত পানি চলে আসবে আরিচা পর্যন্ত। যমুনায় মিঠা পানির প্রবাহ কমে যাবে। এর ফলে বাংলাদেশের হাজার বছরের জীবনব্যবস্থা, উৎপাদন, কৃষি, মৎস্য সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা বার বার ফারাক্কা সমস্যা ও পানির ন্যায হিস্যা আদায়ের জন্য সরকারকে জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার দাবি জানাচ্ছিলাম। কিন্তু সরকার আমাদের আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

www.pathagar.com

অবশেষে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে আমি ফারাক্কা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে তথ্যভিত্তিক একটি স্মারকলিপি প্রদান করি। ১৯৯৩ সালের ২৩ জুন আমি জাতিসংঘের মহাসচিবের দপ্তরে ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের প্রতিবাদে স্মারকলিপি হস্তান্তর করি।

১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপি :

মাননীয় মহাসচিব,
জাতিসংঘ
নিউইয়র্ক, ইউ এস এ

বিষয়: ভারতের একতরফা অন্যায় পানিপ্রত্যাহার বন্ধ করে বাংলাদেশকে তার জীববৈচিত্র্য, শিল্প, কৃষি, মৎস্য ও নৌ-যোগাযোগ রক্ষা করে বেঁচে থাকার জন্য কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবেদন

মাননীয় মহাসচিব,

বাংলাদেশের ১৪ কোটি জনগণের পক্ষ থেকে আপনাকে আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

আপনি এই মহান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার। দুর্বলের প্রতি ন্যায় বিচার প্রাপ্তির প্রত্যাশা ও মহান মানবিক দায়িত্ব পালনে আপনি অঙ্গিকারাবদ্ধ বলে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে। আপনার কাছে ন্যায় বিচারের প্রত্যাশা নিয়ে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমরা আপনার কাছে আমাদের সমস্যা সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করছি। এখানে উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ার একটি বৃহত্তম রাষ্ট্র ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত পানি প্রাপ্তিতে বাধা দানের ফলে অবর্ণনীয় মানবিক বিপর্যয়ের পটভূমিতে আপনাকে ও আপনার মাধ্যমে জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রকে অবহিত করার লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। যদিও বাংলাদেশ সরকার প্রত্যাশিত এই প্রতিবেদন উত্থাপন করলে অনেক বেশি লাভ হতো। অনেক বেশি সহজ হতো আপনার পক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশকে সাহায্য করা। এর ফলে বাংলাদেশী জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করাটা আরও সহজ হতো।

www.pathagar.com

মাননীয় মহাসচিব,

সেই অনুকূল পরিবেশ থেকে বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ কেন বঞ্চিত হয়েছে, আপনি নিশ্চয় সে সম্পর্কে অবহিত আছেন। সে সম্পর্কে আলোকপাত করার কোনো অভিপ্রায় আমার নেই। আমি শুধু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আপনার সমীপে ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে স্বাভাবিক পানিপ্রবাহে বাধা দেয়ার ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশের ক্ষতিসমূহ আপনার গোচরীভূত করতে চাই।

মাননীয় মহাসচিব,

আপনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত হবেন, বাংলাদেশ হচ্ছে একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মানুষের কাছে পানির অপর নাম হচ্ছে জীবন। সেই পানি অন্যায়ভাবে প্রত্যহার করে নিলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাঁকে একমাত্র গণহত্যার সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

মাননীয় মহাসচিব,

এই মহান জাতিসংঘ গণহত্যার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। একটি সদস্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সংকটের প্রশ্নে বিশ্বসংস্থা চুপচাপ বসে থাকতে পারে কিনা তার উত্তর আমি আপনার উপরই ছেড়ে দিলাম। আমি শুধু বাংলাদেশের ভয়াবহ কি ক্ষতি হচ্ছে তার একটি চিত্র তুলে ধরছি।

মাননীয় মহাসচিব,

বাংলাদেশের মিঠাপানি প্রাপ্তির ২০ ভাগ আসে বৃষ্টির পানি থেকে। আর ৮০ ভাগ আসে চীন, নেপাল ও ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বাংলাদেশের ৫৪টি নদী দিয়ে। একমাত্র গঙ্গা অববাহিকা দিয়েই আসে ৩০ ভাগ পানি। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি ও উজানের পানির ফলে বাংলাদেশের পানির চাহিদা মিটে যায়। কিন্তু খরা মৌসুমে পানির চাহিদা থাকে প্রচুর। আর ঠিক সে সময়ে ভারত আমাদের পানি অন্যায়ভাবে প্রত্যাহর করে নিয়ে যাচ্ছে।

এর ফলে সর্বগ্রাসী যে বহুমাত্রিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে –

১. ফসল হানি হচ্ছে প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর জমির

www.pathagar.com

২. নদীতে মিঠাপানির মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে ২৫ লক্ষ টন
৩. যোগাযোগ খাতে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে ৫ গুণ
৪. ১০ লক্ষ জেলে মৎস্যজীবী বেকার হয়ে পড়ছে
৫. প্রকৃতির অন্যতম মনোহর সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যে ক্ষতির হিসাব অর্থের অংকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়
৬. সার্ফেসওয়াটার না থাকার ফলে আর্সেনিক রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই পরিস্থিতিতে আপনার মাধ্যমে জাতিসংঘের কার্যকর হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে ভারতের অন্যায় ও অমানবিক আচরণকে নিবৃত্তকরণ আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

ধন্যবাদান্তে,
শেখ শওকত হোসেন নিলু
চেয়ারম্যান
ফারাক্কা সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশ

১৯৯৩ সালের ২৩ জুন এই পত্র জাতিসংঘ মহাসচিবের পক্ষে জাতিসংঘের একজন ডাইরেক্টর গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আমাকে পত্র দিয়ে আমার বক্তব্যের যথার্থতা স্বীকার করে নেয়া হয়। ১৯৯৩ সালের জুন মাসে যখন আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাই এবং জাতিসংঘে আমার স্মারকলিপি প্রদানের কথা সকলকে অবহিত করি তখন মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক কাউন্সিলর ছিলেন জন এফ কোল। তিনি আমার সবকথা শুনে বললেন –

> 'মি. হোসেন, এমন দূর্গম পথে রাষ্ট্র তথা সরকার ভূমিকা না নিলে তোমার স্মারকলিপি জাতিসংঘ ভবনের বারান্দায় পৌঁছানোও দূরূহ হয়ে উঠবে। যদিও আমাদের দৃষ্টিতে ফারাক্কা বাঁধের ফলে প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয় হচ্ছে। কিন্তু জাতিসংঘ কোনো ব্যক্তি বা দলের কথা শুনবে না। তারা শুনতে চাইবে রাষ্ট্রের কথা।

তিনি তার গভীর সহানুভূতির কথা আমাকে অবহতি করলেন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আমার বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। আমাকে ভিসাও প্রদান করা হলো। নাজিম হাবিব-উজ-জামান ও নাজিম রশিদ-উজ-জামান আমাকে

www.pathagar.com

আর্থিকভাবে সাহায্য করে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথ সুগম করেছিলেন। এভাবেই প্রথম নিউইয়র্কের পরিবর্তে সোজা ওয়াশিংটন গেলাম।

রাত ৮ টায় ওয়াশিংটন পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু প্লেইন দু'ঘন্টা লেট হওয়ার কারণে রাত ১০ টায় বিমান ওয়াশিংটন এয়ারপোর্টে অবতরণ করল। ইমিগ্রেশন পার হলে ল্যাগেজ নিয়ে আসতে ১ ঘন্টার বেশি সময় চলে গেল। অবশেষে সোয়া ১১ টায় এয়ারপোর্টের বাইরে এলাম।

ওয়াশিংটন গেলে আমি সাধারণত থাকি শেখ আব্দুল হাকিম সাহেবের মেয়ে জামাতার বাসায়। হাকিম সাহেবের ওয়াশিংটনস্থ দু'মেয়ে নিলু ও লায়লা যেকোনো একজনের বাসায়। তারা আমার কোনো রক্তসম্পর্কের আত্মীয় নন। কিন্তু তাদেরকে আমার আপন বোনের মতোই মনে হয়। তাদের ব্যবহারও বোনের মতই। লায়লার স্বামী রেজওয়ান চৌধুরী (কবির সারোয়ারের বড় ছেলে)। আমি বহুলোকের সঙ্গে মিশেছি কিন্তু এমন বিনয়ী ও দায়িত্ববান মানুষ খুব কমই দেখেছি। কোথাও কোনো প্রোগ্রাম থাকলে তিনি এক মিনিট হলেও আগেই আসতেন। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম এই বিষয়ে, সে তার উত্তরে বলেছিলো আপনি এখানে নতুন মানুষ আপনার সমস্যা হতে পারে। সেই কারণেই আমি আগে আসি।

যা হোক ইমিগ্রেশন থেকে বের হয়েই রেজওয়ান চৌধুরীকে দেখলাম। তিনি নিজে একটা ট্রলিতে করে ল্যাগেজটা তাঁর গাড়িতে তুলে নিলেন এবং তাঁর বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সে থাকে ভার্জিনিয়াতে। রাত সাড়ে ১২ টায় তাঁর বাসায় পৌঁছলাম। লায়লা হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নিতে বলল। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। দীর্ঘ বিমানযাত্রা ও সময়ের ব্যবধানের কারণে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেও জানিনা।

পরের দিন সকাল বেলায় রেজওয়ান চৌধুরী ও লায়লারা কাজে চলে গেলেন। আমাকে একটা চাবি দিয়ে গেলেন। আমি এস্টেট ডিপার্টমেন্টে ফোন করে আমার ওয়াশিংটনে উপস্থিতির সংবাদ দিলাম। পরের দিন ১১টার সময় এস্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাকে সময় দেয়া হলো। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আগেই তারা আমার ওয়াশিংটনে উপস্থিতির সংবাদ পেয়েছিলেন। তাদের সঙ্গেও দেখা করার সময় চাইলাম। রাষ্ট্রদূত সময় দিতে অপারগতামূলক আচরণ করল না। কিন্তু দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তারা অসৌজন্য প্রকাশ করলো না। বললেন- ২:৩০ মিনিট থেকে ৩টার মধ্যে আসেন। এস্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে দূতাবাস খুব দূরে নয়।

www.pathagar.com

পরদিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে রেজওয়ান চৌধুরী আমাকে এস্টেট ডিপার্টমেন্টের দপ্তরের সামনে নামিয়ে দিলেন। বিকেল ৪টায় কেনেডি সেন্টার থেকে আমাকে তুলে নেয়ার অনুরোধ করলাম। এস্টেট ডিপার্টমেন্টের রিসিপশনে আমার জন্য লোক অপেক্ষা করছিল। তিনি সব ফর্মালিটি শেষ করে বাংলাদেশ ডেস্ক অফিসে নিয়ে গেলেন। ডেস্ক অফিসে বাংলাদেশের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ছাড়াও সাউথ-ইস্ট এশিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররাও উপস্থিত ছিলেন। কুশল বিনিময় ও পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর আমি আমার ওয়াশিংটন ও নিউইর্য়ক আগমনের কারণ তাদের কাছে তুলে ধরলাম।

তারা আমার স্মারকলিপির একটি কপি দেখতে চাইলেন। আমি আগেই অনেকগুলো কপি করে নিয়েছিলাম। সব কিছু দেখে বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার আমাকে বললেন, জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে এই স্মারকলিপি পৌঁছানো অত্যন্ত দূরূহ কাজ হবে। কারণ সরকারের অনুমোদন ব্যতীত জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্মারকলিপি গ্রহণ করতে পারে না। তিনি আমার উদ্যোগকে কলাম্বাসের ন্যায় দুঃসাহসি অভিযান বলে আখ্যায়িত করে বললেন,-

> 'বাংলাদেশ সরকারকে involve করতে পারলে কিছু না হলেও জাতিসংঘের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত অনুষ্ঠিত হতো। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা পেতে পারতো।'

তিনি একটি কানাডিয়ান টিভি চ্যানেলের নিউজ এডিটরের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ অফিসের ৬ তলায় তাদের অফিস। পরিবেশের উপর কানাডিয়ান টিভি চ্যানেলটি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে বিশেষভাবে আগ্রহী।

১টার সময় এস্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হলাম। রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকেই বিখ্যাত ওয়াটারগেট বিল্ডিং। সেখানে খাওয়ার জন্য একটি সুন্দর হোটেল আছে। সেখানে গিয়ে এক বাংলাদেশীর সঙ্গে দেখা হলো, পরিচয় হলো। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে বললেন-

'আমার সৌভাগ্য আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছে। আজ দুপুরে আপনাকে আমি খাওয়াতে চাই।' খাওয়া-দাওয়ার পর আমি তাকে আমার গন্তব্যের কথা বললাম। তিনি বললেন, 'আমিও বাংলাদেশ দূতাবাসে যাব। আমাকে তিনটার সময় যেতে বলেছে।' আমরা ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশের দূতাবাসে পৌঁছলাম আড়াইটায়। পলিটিক্যাল বিভাগসহ সকলের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করে আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করলাম। আমার সঙ্গের ব্যক্তি পূর্বপরিচিত কিনা সকলেই

www.pathagar.com

সে সম্পর্কে জানতে চাইলেন এবং তার সমস্যার দ্রুত সমাধা করে দিলেন। দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সোয়া ৩টায় থেকে বিদায় নিলাম।

তারপর গেলাম কেনেডি সেন্টারে। আমার সাথের ব্যক্তিটিও আমার সঙ্গে কেনেডি সেন্টারে গেলেন। ভদ্রলোকের বাড়ি সন্দ্বীপে, নাম মোঃ আনিসুল হক। খুব অল্পদিন হয় আমেরিকাতে এসেছেন। এখন পর্যন্ত নিজেকে সেটেল্ট করতে পারেননি ঠিকভাবে। নিউইয়র্কেই থাকেন। ৫ টার বাসে নিউইর্য়কে যাবেন বলে জানালেন। ৪ টা বাজার দুই মিনিট আগেই রেজওয়ান চৌধুরী গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। রেজওয়ান চৌধুরীই মোঃ আনিসুল হককে সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করলেন। তার কোন বড় লাগেজ ছিল না। হ্যান্ডব্যাগসহ তাকে আমরা ওয়াশিংটন সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দিলাম এবং দু'একদিনের মধ্যে নিউইয়র্কে আমার আসার সংবাদ দিলাম। তিনি তার ওখানে আমাকে থাকতে অনুরোধ করলেন। আমি তাকে অবহিত করলাম আমার খালাতো বোন নিউইয়র্কে থাকে, আমি তার ওখানে থাকবো। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এভাবে ওয়াশিংটনের কাজ শেষ করলাম।

১৭ জুন সকাল ১১টায় ওয়শিংটন থেকে নিউইয়র্কের দিকে যাত্রা করলাম। ইতিমধ্যে আমার খালাতো বোনকে সংবাদ দিলাম। ৫ ঘন্টার জার্নি। বিকেল ৪ টায় আমরা নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড ম্যানাটনে নামলাম। সেখান থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে করে আমার খালাতো বোন আলোর বাসার কাছের একটি স্টেশনে নেমে তার বাসায় যেতে হবে। ম্যানাটনে নেমে আমি আমার খালাতো বোন আলোকে ফোন করলে সে বলল, তার স্বামী ইঞ্জিঃ এখলাসুর রহমান স্টেশনে থাকবেন। এভাবে ১৭ জুন ওয়াশিংটন থেকে নিউইর্য়কে এসে পৌছলাম।

নিউইর্য়কে এসে প্রথমে যোগাযোগ করলাম, সাবেক সংসদ সদস্য আনিসুজ্জামান খোকনের সঙ্গে। তিনি রাত সাড়ে ৯টায় আমার খালাতো বোনের বাসায় আসলেন। তার কাছে পরামর্শ চাইলাম, কি করে জাতিসংঘের মহাসচিবের সঙ্গে দেখা করা যায় ও আমার স্মারকলিপিটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা যায়। আনিসুজ্জামন খোকন বললেন- রওশন এরশাদের ভাই মহিউদ্দিন সাহেবের কথা। তিনি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সরকারের সময় জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দলমত নির্বিশেষে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সকল বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সর্বশক্তি ও আন্তরিকতা দিয়ে সাহায্যের চেষ্টা করতেন।

www.pathagar.com

আনিসুজ্জামান খোকন দায়িত্ব নিলেন, মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা। ইতিমধ্যে মিসেস ফাতেমা সালামকে টেলিফোন করলাম এবং আমার নিউইর্য়ক আসার কারণ জানালাম। তিনিও বললেন, হয় সরকারি সহযোগিতা, নয় মহিউদ্দিন সাহেবের সহযোগিতা। এর বাইরে কোনো পথ নেই। তিনি তার বাসায় পরদিন দুপুর বেলায় আমার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। আমার খালাতো বোন তার বাসায় যাওয়ার পথ আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। যেতে খুববেশি ঝামেলা পোহাতে হয়নি।

রেলস্টেশন থেকে তার বাসা কাছেই ছিল। তার ছোট ভাই রেলস্টেশনে এসে আমাকে তাদের বাসায় নিয়ে গেলো। ফাতেমা সালামের আম্মাও নিউইয়র্কে থাকেন। তার সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ। সকলের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ। আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, সবধরণের খোঁজ-খবর নিলেন তিনি। ফাতেমা সালাম বাংলাদেশী কমিউনিটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতাদেরও আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন চট্টগ্রামের। তিনি একসময় বড় সরকারি চাকরি করতেন। একজন ছিলেন ঢাকা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল তাঁর নাম মনে করতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তারা সকলেই আন্তরিকভাবে আমার উদ্যোগ সফল করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ফাতেমা সালামও মহিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

১৯ তারিখ রাতে মহিউদ্দিন সাহেব আমাকে এবং আনিসুজ্জামান খোকনকে তাঁর বাসায় দাওয়াত করলেন। তিনি তাঁর সাবেক কয়েকজন সহকর্মিকেও দাওয়াত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন মজিবুর রহমান, যিনি ১৯৭১ সালে প্রথম পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে কূটনৈতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। সুদীর্ঘদিন তিনি জাতিসংঘের সঙ্গেই যুক্ত। মহিউদ্দিন সাহেবও মজিবুর রহমান সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্মারকলিপি খানা পড়তে লাগলেন এবং মহিউদ্দিন সাহেব বললেন, 'স্মারকলিপিতে হিউম্যান ডিজাস্টার্ড পয়েন্ট আছে, স্মারকলিপির এই ধারায় ইচ্ছা করলে জাতিসংঘের মহাসচিব If Secretary general of united nations desire he can take over the matters for consideration.

আমাকে শান্তনা দিয়ে তিনি বললেন, 'আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। ভাল কাজের জন্য নেমেছ ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার তো কিছু নেই। জাতীয় সমস্যা সরকারের তুলে ধরার কথা, তারা দায়িত্ব পালনে অপরাগ। তুমি স্বেচ্ছায় এই মহান দায়িত্ব নিয়েছ।' তিনি আরো বললেন, 'কোনো শুভযাত্রাই ব্যর্থ হয় না'। তিনি ও মজিবুর রহমান সাহেব স্মারকলিপিটির কপি রেখে দিলেন। আনিসুজ্জামান খোকনকে তার

www.pathagar.com

সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে যোগযোগ রাখার জন্য অনুরোধ করলেন। এভাবেই অমানিশার কালোরাতে আকাশের এক কোণে একখন্ড আলো দেখা দিল। মহিউদ্দিন সাহেব ও তাঁর পরিবারের সকলকে সালাম জানিয়ে রাত ১২টায় আমার খালাতো বোনের বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

বোন বড়ই হোক বা ছোটই হোক, ভাইদের শাসন করা তাদের অভ্যাসের অংশ। দেরি করে বাসায় ফেরার কারণে বকাবকি করলো। এক কান দিয়ে শুনলাম অন্য কান দিয়ে বের করে দিলাম এটাই স্বাভাবিক। অনেকদিন পর ভাল ঘুম হলো।

এরপর শুরু হলো অপেক্ষার পালা। অবশেষে মহিউদ্দিন সাহেব আসিুজ্জামান খোকনকে অবহিত করলেন ২৩ জুন জাতিসংঘ অফিসে বিকেল ৩টায় মহাসচিবের পক্ষে - Francese Vendrell (DEA) আমাদের স্মারকলিপি গ্রহণ করবেন।

আনিসুজ্জামান খোকন ও আমি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের কাছে ফারাক্কা বাধের প্রতিক্রিয়া ও পানিসমস্যা সম্পর্কে স্মারকলিপি প্রদান করব। ইতিমধ্যে সাইদুর রহমান টেপার ছোট ভাই সাবু আমার জন্য দামি শার্ট-শুট কিনে আনলো দেখে তো আমি অবাক। তার বউ তুহিনও মেয়েদের সামনে বকাবাদ্য করাতে তারা হেসে কুটি কুটি।

যা হোক সাবুর দেয়া শুট পড়েই জাতিসংঘের অফিসে ঢুকলাম বুধবার ২৩ জুন ১৯৯৩ তারিখ বিকেল আড়াইটায়। গেইটে আমাদের কথা বলাই ছিল। Vendrell-এর পি এস একজন লেবাননী অল্প বয়সী মহিলা। তিনি আমাদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে Vendrell-এর অফিসে প্রবেশ করলেন ৩টার সময়। আমাদের আসন গ্রহণ করতে বিনীতভাবে অনুরোধ করলেন তিনি। তার আরো দু'জন সহকর্মি ও পিএস-সহ রুমের মধ্যে মোট ৬ জন। তিনি স্মারকলিপির সমস্ত পয়েন্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করলেন। তার অন্য দু'সহকর্মি তার ব্যাখ্যা নোট করে নিলেন। Vendrell আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন –

> 'আপনাদের দেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি মহিউদ্দিন সাহেব জাতিসংঘ অঙ্গণে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি মহাসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, মহাসচিবের নির্দেশেই তাঁর পক্ষে আপনাদের কাছ থেকে এই স্মারকলিপি গ্রহণ করছি।'

তিনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন –

'দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা ন্যালসন ম্যান্ডেলা তার দেশের হিউম্যান রাইটস সম্পর্কে

www.pathagar.com

জাতিসংঘে একটি প্রতিবেদন দিয়েছিল। ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতও ফিলিস্তিনিদের অধিকার সম্বলিত একটি প্রতিবেদন একসময় পেশ করেছিলেন। দু'টি বাদে তৃতীয় প্রতিবেদনটি হচ্ছে আপনার। জাতিসংঘের ইতিহাসে আপনার প্রতিবেদনটি হচ্ছে পানিসমস্যা নিয়ে প্রথম প্রতিবাদ প্রতিবেদন। আমরা এই প্রতিবেদনের যথার্থতা সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করব। আপনার প্রতিবেদন স্বাভাবিক পানিপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ফলে জলবায়ু Ecological Balance নষ্ট হওয়ার কথা ও আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের সহযোগি সংস্থা UNDP-কে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য আমরা অনুরোধ করতে পারি।'

এভাবেই জাতিসংঘের অফিস থেকে কাজ শেষ করে বিকেল ৫ টার দিকে আমরা বের হলাম। ইতিমধ্যে জানতে পারলাম আগামীকাল অর্থাৎ ২৪ তারিখে কানাডিয়ান টিভি চ্যানেলের সঙ্গে সকাল ১০টায় আমার ইন্টারভিউ হবে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

জাতিসংঘের বহুতল ভবনের ৬ তলায় সংবাদকর্মিদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য অফিস রয়েছে। বিশ্বের সব বড় বড় সংবাদ সংস্থার প্রত্যেকের নিজস্ব কক্ষ আছে। পরের দিন ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যেই এসে উপস্থিত হলাম। ১০টায় ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য ৬ তলায় যাবার জন্য লিফ্‌টে উঠেছি এমন সময় একজন ভারতীয় শিখ অফিসারও ফিলটে উঠলেন। তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন,-

> 'I know that you are going to give a TV interview about Farakka water disport betwen Bgngladesh & India. But by this way you would not able to achive anything rather then burning your hand in the politics in Bangladesh.

আমি বিনয়ের সঙ্গে তার কথার উত্তর দিলাম। সবসময়ে আমি বিশ্বাস করি- Hope for the best preper fot the wast. ৬ তলায় নেমে কানাডিয়ান টিভি চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিলাম। #

www.pathagar.com

বেগম খালেদা জিয়ার কাছে খোলা চিঠি

মাননীয় দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করবেন,

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিতে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমাদের বক্তব্য আপনার কাছে তুলে ধরা ও দলের অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে এই পত্র প্রদান।

আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে একমত হবেন, ১৯৯৭ সালের ১১ নভেম্বর আপনার নেতৃত্বে ৭ দল গঠনের পর থেকে আজ পর্যন্ত সরকার বিরোধী আপনার ঘোষিত প্রতিটি কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার লক্ষ্যে আমাদের দল সব শক্তি নিয়োজিত করেছে। সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি কর্মসূচিতে আমাদের দলের নেতা কর্মিরা জীবনবাজি রেখেছে বহুবার। আপনিও বারবার জনসম্মুখে ৭ দল ও ৪ দলের পক্ষ থেকে জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছেন। যদিও আমাদের দলের পক্ষে থেকে ৭ দল ও ৪ দলের সমান্তরাল অবস্থান পরিহার করে যুক্তফ্রন্টের কথা বলেছি। কিন্তু ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ছাড়া জাতীয় পর্যায়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া সাফল্যমন্ডিত হতে পারেনি।

আওয়ামী সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আগামীতে ৭ ও ৪ দলের যৌথ নির্বাচনই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল লক্ষ্য। কিন্তু ৪ দলের একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলেও ৭ দলের পক্ষ থেকে কোনো সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়নি। আমরা বার বার আপনাকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমাদের অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আলোচনার পর কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকরি হয়নি।

আমরা প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আপনাকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানাতে চাই, আপনি যদি মনে করেন, আগামী নির্বাচনে ৭ দলের অন্যতম সংগঠন

www.pathagar.com

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলের কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে সে কথা আপনি সততার সঙ্গে আমাদের জানিয়ে দিলেই ভাল হয় বলে আমরা মনে করি। সময় ক্ষেপন ও কৌশলে একটি রাজনৈতিক দলকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দোদুল্যমনতার মধ্যে ফেলে দেয়া নৈতিকভাবে সুবিধাবাদী চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ বলে আমাদের বিশ্বাস।

আপনি একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেত্রী। সাংগঠনিক অবস্থাসহ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিমন্ডলে আপনি সুবিধাজনক অবস্থানে আছেন। আপনার কাছে যা সামান্য মুখের কথা আমাদের কাছে তা দলের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।

পরিশেষে আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে দলের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে, আমরা মনে করে নেব প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলকে আপনি ঐক্যের মধ্যে মর্যাদা সহকারে রাখতে অনাগ্রহী। সেক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থাকবে নৈতিক কারণেই।

বিনীত
শেখ শওকত হোসেন নিলু
চেয়ারম্যান, পিএনপি

অনুলিপি :

১. অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব, বিএনপি, সাবেক বিরোধী দলীয় উপনেতা, জাতীয় সংসদ
২. মওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আমির, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৩. জনাব নাজিউর রহমান মঞ্জু, চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি (না-ফি)
৪. শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক, চেয়ারম্যান, ইসলামী ঐক্যজোট
৫. জনাব অলি আহাদ, সভাপতি, ডিএল
৬. জনাব শফিউল আলম প্রধান, সভাপতি, জাগপা
৭. এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার, চেয়ারম্যান, এনডিএ

সেদিনকার এ চিঠি দেয়া নিয়ে অনেকের মনেই হয়ত সংশয় দেখা দিয়েছিল কেন এ চিঠি দেয়া? আমি বিশ্বাস করি সেদিন যদি বেগম খালেদা জিয়া ৭ দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না করে এর অস্তিত্ব ও সাংগঠনিক কাঠামো ধরে রাখতেন তাহলে বিরোধী দল জামাত-বিএনপিকে টার্গেট করে যেভাবে গালিতে পরিণত করেছিল তা করতে পারতো না। প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দীন আহমেদকে রাষ্ট্রপতি না করে যদি প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও ভাষাসৈনিক অলি আহাদকে রাষ্ট্রপতি করা হতো তাহলে আর যা হোকে আজীবন আপসহীন অলি আহাদ, ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের মত মেরুদন্ডহীন ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতেন না। সর্বোপরি 'বেগম খালেদা জিয়া যে কথা দিয়ে কথা রক্ষা করেন' এ বিশ্বাস দেশবাসীর মনে প্রগাঢ় হতো। আর আজ যে আধিপত্যবাদী শক্তির কালো শিখন্ডি সর্বস্তরে শিকড় গেড়ে বসেছে তাও সম্ভব হতো না। ৭ দলীয় জোট ভেঙ্গে দিয়ে এ ক্ষতি হয়েছে দেশের এবং সৃষ্টি হয়েছে নেতৃত্বের প্রতি আস্থাহীনতার। #

www.pathagar.com

পলাশী দিবস ও আজকের প্রেক্ষাপট

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের সঙ্গে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে একমাত্র মীর মর্দন ও মোহন লালের নেতৃত্বাধীন সৈন্যবাহিনী ছাড়া অন্যরা পিছুটান দেয়। এমনকি একপর্যায়ে নবাবের বাহিনীর প্রধান সেনাপতিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি নিষ্ক্রিয় ও নিরব হয়ে পড়ে। মীর জাফর আলী খান, ইয়ার লতিফসহ গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতিদের জগৎ শেঠের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতামূলক যোগাযোগ ও মাঝ পথে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়ার আপসরফা হয় ক্লাইভের সঙ্গে।

পটভূমি : ১৭১৭ সালে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত সম্রাটের নিকট থেকে ভারতে বসে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিশেষ ট্যাক্স ফ্রি সনদপত্র লাভ করে। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে উক্ত সনদপত্রের অপব্যবহার করে দেশীয় সরকারগুলোকে বিশাল অংকের রাজস্ব থেকে কৌশলে বঞ্চিত করতে থাকে। নবাব আলীবর্দী খান বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবী গ্রহণ করলে প্রথমে তার সঙ্গেই ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব সংক্রান্ত সংঘাত সৃষ্টি হয়। নবাব ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির এই আচরণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

কলকাতারও গোড়াপত্তনের আগে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্র কাশিমবাজার অন্যতম প্রধান বাণিজ্য বন্দর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মূলত মুর্শিদাবাদ রাজধানী হলেও বাণিজ্যিক রাজধানী ছিল কাশিমবাজার। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি

www.pathagar.com

কাশিমবাজারে কুঠি নির্মাণ করে। ফরাসী এবং ওলন্দাজ বণিকরাও কাশিমবাজার কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকে। কিন্তু ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ছিল তীব্র। অন্যদিকে ভারত সম্রাটের বিশেষ সনদপ্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যিক তৎপরতা থেকে ক্রমাগতভাবে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত হতে থাকে। তারা ব্যবসায়িক সূত্রেপ্রাপ্ত বণিকের বিশেষ অধিকারের সুবাদে বার বার নবাবের আদেশ সুকৌশলে উপেক্ষা করতে থাকে।

দেশীয় সহযোগি বণিকদের মাধ্যমে নবাবের সভাসদদের মানসিকতা ও অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলোকে খুঁজে বের করার কাজে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি মনোনিবেশ করে। তরুণ নবাব ও তার বড় খালা ঘঁষেটি বেগমের মধ্যে বৈরি সম্পর্ক নির্ধারণ করতে সক্ষম হওয়ার পরই কোম্পানি বোর্ড বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজ ক্ষমতায় হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৩ জুন পলাশী আম্রকাননে যে যুদ্ধের প্রহসন সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল রীতিমতো সারা দুনিয়ার দেশপ্রেমিক শাসক ও নাগরিকদের জন্য এক ঐতিহাসিক শিক্ষণীয় বিষয়। এই যুদ্ধ যাত্রার পূর্বেই মীর জাফর আলী খান, রায় দুর্লভ ও ইয়ার লতিফের মত নবাবের সেনাধ্যক্ষদের ও সভাসদগণের সঙ্গে ক্লাইভের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। একদিকে নিজ প্রাসাদে ঘঁষেটি বেগম, মীর জাফর আলী খান, ইয়ার লতিফ, জগৎ শেঠ আর রায় দুর্লভরা বসে প্রতিনিয়ত চক্রান্তে লিপ্ত থাকে নবাবের সিদ্ধান্তকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য।

অন্যদিকে নবাবের প্রতিপক্ষ হিসেবে ঔপনিবেশিক শক্তি ইস্টইন্ডিয়া ও ক্লাইভ বাহিনী কিভাবে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল সেই ইতিহাস নতুন করে বলার কিছুই নেই। আমি ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের পরাজয়, পতন এবং আজকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোকপাত করে দেশের সরকার ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানাতে চাই।

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলার দিনগুলোতেও আধিপত্যবাদী ভারত একদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে নিজ করতলে রাখার নীলনক্‌শা প্রণয়ন করে। ১৯৭৬ সালে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে একটি ঐতিহাসিক পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে তিনি বলেছিলেন 'ফারাক্কা বাঁধ একতরফাভাবে চালু করে প্রমাণ করেছে ভারত একটি আধিপত্যবাদী দেশ।' তিনি এও বলেছেন, 'ব্যক্তি ইন্দিরা গান্ধী কিংবা শ্রী জ্যোতি

www.pathagar.com

বসুর সঙ্গে আমার যতই ভাল সম্পর্ক থাকুক না কেন আমাদের মনে রাখতে হবে তারা একটি আধিপত্যবাদী দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।'

আমি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত সম্রাটের বিশেষ সনদের কথা উল্লেখ করেছি। আজকের প্রেক্ষাপটে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি নেই। কিন্তু নতুন নামে নতুন আবরণে ভারতের টাটা কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করেছে। অর্থনৈতিক কারণেই যে রাষ্ট্র করায়ত্ব করার প্রয়োজন হয় সে কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। আমাদের এ কথাটিও মনে রাখতে হবে বিনিয়োগ মানেই দেশের উন্নয়ন নয়। একটি দেশে বিদেশী কোম্পানি বিনিয়োগ করে অধিক সুবিধা ভোগ করে লাভবান হওয়ার জন্যই। এ অবস্থায় অনিবার্যভাবে নিজেদের বিনিয়োগের পরিবেশকে সুন্দরভাবে রক্ষা করে লাভবান হওয়ার স্বার্থেই রাজশক্তির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ও আঁতাত গড়ে ওঠে।

ভারতের একটি সুবিশাল কোম্পানি টাটা (গ্রুপ) বাংলাদেশে ১৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এখন পর্যন্ত ৩টি খাতে তাদের বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে: (১) বাংলাদেশে তাদের প্রস্তাবিত স্টীল কারখানা- যা বছরে ২৫ লক্ষ মেট্রিকটন স্টীলজাত দ্রব্য উৎপাদন করবে। অথচ এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মোট চাহিদা ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

অন্যদিকে প্রস্তাবিত টাটা একাই উৎপাদন করবে ২৫ লক্ষ মেট্রিকটন। অর্থনীতির অতিসাধারণ নিয়ম অনুসারে বড় প্রতিষ্ঠান এর উৎপাদিত দ্রব্যের গুণ ভাল হবে এবং উৎপাদন খরচ কম হবে। অর্থনীতির এই সাধারণ সূত্র থেকেই বলা চলে বাংলাদেশের ছোট ছোট সকল স্টীল মিল বন্ধ হয়ে যাবে ভারতীয় টাটা স্টীল মিলের কারণে। তার পরও ৮ লক্ষ মেট্রিক টন উদ্বৃত্ত থাকবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরও সম্ভবত টাটা আসাম ও ত্রিপুরার বাজারের চাহিদার কথা চিন্তা করেই এই অতিরিক্ত ৮ লক্ষ টন উৎপাদনের চিন্তা করেছে।

এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই তারা বাংলাদেশের কাছ থেকে ট্রানজিট সুবিধা কৌশলে আদায় করে নেবে। তাদের পক্ষের বক্তব্য হবে ঈশ্বরদিতে উৎপাদিত দ্রব্য অর্থাৎ বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্য আমরা পশ্চিম বাংলায় না নিয়ে আসাম এবং ত্রিপুরায় নেব এতে বাংলাদেশের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত: গ্যাসভিত্তিক সারকারখানা নির্মাণের জন্য তারা প্রস্তাব করেছে। সকলেই জানে বাংলাদেশের গ্যাস সার উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। ভারতের নেপাল ভূটানসহ সারা পৃথিবীতে সারের চাহিদা থাকবে বহুদিন পর্যন্ত। এই সরকার এবং একটি পশ্চিমা কোম্পানি ভারতকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস

www.pathagar.com

দিতে চেয়েছিল। সেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়নি। বিকল্প পথে ভারতের একটি কোম্পানিকে বাংলাদেশের গ্যাসসম্পদ তুলে দেয়ার অভিপ্রায় গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত: গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা প্রস্তাব করেছে ভারতের টাটা কোম্পানি। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা আছে প্রচুর। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতেও প্রচুর অব্যবহৃত অর্থ পড়ে আছে। দেশের তরুণ ব্যবসায়ীদের সুযোগ দিলে গ্যাস থেকে তারাই বিদ্যুৎ কোম্পানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মেটাতে পারে।

আমি শুধুমাত্র উপমা হিসেবে ১৭১৭ সালের ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির বিশেষ সুযোগ লাভ ও আজকের টাটা কোম্পানির জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান সম্পর্কে তুলনামূলক আলোকপাত করলাম। ১৭৫৭ সালে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার মসনদ দখল করে রাজত্ব করতে চায়নি। তারা নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরিবর্তে অনুগত মীর জাফর আলী খানকে নবাবী প্রদান করতে চেয়েছে।

অর্থাৎ ব্যবসার নামে লুটতরাজের সুবিধার্থে তাদের নবাব পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ঠিক একইভাবে নতুন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানিও বাংলাদেশে তাদের পছন্দমত শক্তিকেই ক্ষমতায় আনতে চাইবে এটাই একটি স্বাভাবিক নিয়ম।

পাঠকের জানা আছে, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল দেশি-বিদেশি সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। আর ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে আ'লীগের জন্ম। এর অর্ধশতাব্দি পর ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আ'লীগ প্রধান শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন। ইতিহাসের এই যোগসূত্র যে নেহায়েতই কাকতালীয় নয় তা বাংলাদেশের ইতিহাস ও বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই চোখে পড়ে।

সর্বোপরি নতুন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের সম্পদ-এর নিরাপত্তার জন্য তাদের সেনাবাহিনী নিয়োগের দায়িত্ব নিতে পারে। ১৭১৭ সালে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি শুধুমাত্র ভারত সম্রাটের নিকট থেকে বাণিজ্যিক সুবিধার সনদ নিয়েছিল কিন্তু ১৭৫৭ সালে তারা গড়ে তুলেছিল এক বিশাল নিজস্ব সেনাবাহিনী। আর তাদের এই বাহিনী শেষপর্যন্ত ক্লাইভের নেতৃত্বে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং নবাব বাহিনীকে পরাভূত করেছিল। তাই আজকের নতুন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পটভূমিতে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুনের পলাশীর যুদ্ধ এবং ভারতের পরাধীনতা শুরুর ইতিহাস আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়। #

www.pathagar.com

১৯৪৭-এ উপমহাদেশ বিভক্তি ও বিপুল জনগোষ্ঠী উগ্রসাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার শিকার

১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে আমেরিকা থেকে দুবাই হয়ে ঢাকায় আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমেরিকা থেকে প্লেনে উঠার সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তিনি চট্টগ্রামের মানুষ, থাকেন আমেরিকাতে। সংযুক্ত আরব আমিরাতে তার বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে। বিশেষ করে দুবাইতে মাঝে মধ্যে সোনা বিক্রয় হয় প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে। তিনি এবার দুবাই যাচ্ছেন সে ধরণের একটা সোনার লড কেনার জন্য নিলামে অংশ নিতে। ভদ্রলোকের নাম রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরী। ৫০ উর্ধ্ব বয়স। আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর বিমানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে নিজের আসন পরিবর্তন করিয়ে আমার পাশে আসন গ্রহণ করলেন।

সন্ধা ৬টা ৪৫ মিনিটে কেনেডী বিমানবন্দর থেকে অ্যামিরাটসের বিমান আসবে দুবাই বিমান বন্দরে। সময় লাগবে ৮ ঘন্টার মতো। কিন্তু, সময়ের ব্যবধানের কারণে আমাদের প্লেন স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৬ টায় দুবাই বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানের মধ্যে রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ে খোঁজখবর নেন। ব্যবসা ছাড়া তার অন্য কোনো বিষয়ে ইন্টারেস্ট নেই।

www.pathagar.com

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম- আপনি দুবাইয়ে কতদিন থাকবেন। তিনি বললেন- দু'সপ্তাহ হতে পারে আবার এক মাসও হতে পারে। তিনি আমাকে একই প্রশ্ন করলেন- আমি বললাম আমি ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার। কিন্তু দুবাইয়ে ২৪ ঘন্টার জন্য প্রবেশ করে একটু ঘুরে ফিরে দেখে যেতে চাই। তিনি বললেন- ৭২ ঘন্টার জন্য পোর্ট এন্ট্রি নেয়ার ব্যবস্থা আছে। আপনি ৭২ ঘন্টা থেকে যেতে পারেন। তিনি এও বললেন- আমরা একই হোটেলে থাকতে পারি। আমি বললাম-বেশি দামি হোটেলে থাকার সামর্থ আমার নেই। আর দুবাই অত্যন্ত ছোট্ট শহর। ৭২ ঘন্টা থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন- এখানে 'প্যারিস হোটেল' নামে একটি হোটেল আছে যার মালিক তার এক নিকটাত্মীয়। ৬০ দিনার হলে থাকতে পারবেন। আর দুবাইতে বহু বাঙালি ব্যবসায়ি ও শ্রমিক আছে। তাদের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারবেন। তার কথামত ৭২ ঘন্টার ট্রানজিট এ্যান্ট্রির ব্যবস্থা করে দুবাইতে প্রবেশ করলাম। একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা প্যারিস হোটেলে গেলাম সকাল সাড়ে ৭টার দিকে।

এই সাত সকালেই মনে হলো রাস্তায় আগুনের হুলকা প্রবাহিত হচ্ছে। এরমধ্যেই লোকজন কাজে যাচ্ছে। হোটেলের রিসিপশনে গিয়ে আমরা দু'টো পাশাপাশি রুম নিলাম। প্রতিটি রুমে আছে একজনের থাকার মতো একটা সিঙ্গেল খাট ও ছোট্ট বাথরুম। ৬৫ দিনার হচ্ছে রুম ভাড়া। আমরা দুজনে নিজেদের রুমে ঢুকে প্রথমে গোসল সেরে নিয়ে নাস্তা খাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিলাম। দুবাই শহরে বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান ক্যারালা ও পাকিস্তানের হোটেল আছে প্রচুর। আমরা প্যারিস হোটেলের পিছনের একটা গলিতে একটি ইন্ডিয়ান কেরালা হোটেলে নাস্তা খেতে গেলাম। দুই দিনারের মধ্যে পরাটা, ডিম ও একগ্লাস লাচ্ছিসহ সুন্দর নাস্তার ব্যবস্থা। নাস্তা খেয়ে আবার হোটেলে ফিরে আসলাম। হোটেল পরিচালনা করছেন রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরীর এক নিকটাত্মীয়া।

৩৬ বছর আগে স্বামীকে নিয়ে সে দুবাই শহরে আসে। এখানে এসে তারা হোটেল ব্যবসা শুরু করেন। এখানে তাদের দুই মেয়ে ও এক ছেলের জন্ম হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা দুবাই শহরের সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত। ভদ্র মহিলা থাকেন হোটেলের ৫ম তলার চিলাকোটায়। একটি ব্যালকনি তিনি বাড়ির মত করে নিয়েছেন। রাশেদ চৌধুরী ও আমাকে রাতের বেলায় তার বাসায় খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। আমি কোনো কথা বললাম না। রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরী আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ভদ্রমহিলা রাত ৯টার দিকে তার বাসায় উপস্থিত থাকার কথা বললেন।

www.pathagar.com

এখান থেকে আমরা রওয়ানা হলাম পার-দুবাইয়ের দিকে। দুবাই শহর দু'ভাগে বিভক্ত, দুবাই ও পার-দুবাই। একটা লেকের মতো নদী দুবাই শহরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। লেকের সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ রয়েছে।

রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরীর মাথায় সবসময় একটি বিষয়ই কাজ করে সেটা হলো কিভাবে ব্যবসা করা যায়। ব্যবসা করার কি ব্যবস্থা আছে। তিনি বললেন-দুবাই হচ্ছে অফুরন্ত ব্যবসার সম্ভাবনাময় দেশ। আইন ও নিরাপত্তা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু ফ্রি পোর্টের সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে এই দুবাই শহরে। বুঝা গেল, দুবাই শহরে অনেক পরিচিত ব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধব আছে এবং নিউইয়র্কে থাকলেও তার মূল ব্যবসার স্থান হচ্ছে এই দুবাই শহর। পার দুবাইয়ে একটি বড় মসজিদ আছে এটা কেন্দ্রীয় মসজিদ নামেই পরিচিত। তিনি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কেন্দ্রীয় মসজিদের কাছে যেতে বললেন।

কেন্দ্রীয় মসজিদের কাছে একটি ছোট্ট গলির মধ্যে একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং। এ বিল্ডিংয়ের দু'তলায় একটি ছোট্ট অফিস 'দুবাই এন্টারপ্রাইজ লিঃ'। মালিক হচ্ছেন কক্সবাজারের এক ভদ্রলোক। আমদানি-রপ্তানিই হচ্ছে তার মূল ব্যবসা। সঙ্গে বাংলাদেশ বিমানের টিকেট বিক্রয়ের এজেন্সিও আছে তার। বহুমাত্রিক ব্যবসার সঙ্গে তিনি জড়িত। রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরীর সম্ভবত সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু ব্যবসায়ি পার্টনার হবেন তিনি। ভদ্রলোকের নাম রহমত উল্লাহ। তিনি হজ্ব করেছেন বহুবার। তাই নাম লেখেন আলহাজ্ব রহমত উল্লাহ। দুবাইয়ের সব মহলের সঙ্গে তার গভীর যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব রয়েছে। তিনি রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরীর জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সব ইনফরমেশন সংগ্রহ করেন। রহমত উল্লাহ সাহেব প্রথমে আমার সামনে মুখ খুলতে চাননি। রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরী তাকে বললেন - সবকথাই উনার সামনে বলতে পারো। কোনো অসুবিধা নেই। রহমত উল্লাহ বললেন - তোমার কাজ আগামী সপ্তাহে। এর মধ্যে একটা ছোট্ট কাজ আছে, করলে করতে পার। ১০০ মেট্রিকটন বাশমতি চাল আমদানি করতে হবে। দুবাইয়ের বাজারে পাকিস্তানি বাশমতি চালটা সকলেই কিনতে চায়। কিন্তু চাল লোড দেয়ার সময় আমদানিকারকের প্রতিনিধিকে অবশ্যই সেখানে উপস্থিত থেকে প্যাকিং করতে হবে।

তিনি এটাও বললেন-দুবাই পোর্ট পর্যন্ত সিএন্ডএফ প্রতি মেট্রিকটন চালের জন্য দিতে পারো ৫২৫ ডলার থেকে ৫৩০ ডলারের মধ্যে। রাশেদ চৌধুরী দামটা একটু বাড়ানোর আবদার করলেন ও করাচির কয়েকজন চাল রপ্তানিকারকের টেলিফোন নম্বর যোগাড় করলেন। আমি আমার প্লেনের টিকিট কনফার্ম করতে চাইলে রাশেদ চৌধুরী রেগে গেলেন। বললেন - এটাতো ৫ মিনিটের কাজ। সারাজীবনই রাজনীতি করেছেন। পকেটতো গড়ের মাঠ। ৫০ দিনারের হোটেলে

www.pathagar.com

থাকেন। এমনভাবে কথাগুলো বললেন রাগতো করতে পারলামই না বরং হেসে ফেললাম। রাশেদ চৌধুরী এটাও বললেন- ১০০ টন বাঁশমতি চালের কাজটা আমরা দু'জনে ভাগাভাগি করে করতে পারি। কারণ আগামী সপ্তাহে আমার খুব বড় ধরণের কাজ আছে দুবাইয়ে। আপনার কোনো আপত্তি না থাকলে আপনাকেই পাকিস্তান যেতে হবে।

সারাদিন ছোটাছুটি করে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরলাম। রাত ৯টায় প্যারিস হোটেলের মালিকের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য গেলাম। মালিকের দুই মেয়ে এক ছেলে। ছেলে থাকে আমেরিকাতে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। লন্ডন ও দুবাই মিলে তার বসবাস। তিনি এবং ছোট মেয়ে থাকেন দুবাইয়ে। দুবাই শহরে তার অনেক নিকটাত্মীয়স্বজন আছে। খুব সুন্দর রান্না করেছেন। চট্টগ্রামের মানুষ আমাদের তুলনায় তরকারিতে মশলা খায় বেশি। কিন্তু তিনি যা রান্না করেছেন তা সব বাংলাদেশীদের সুন্দর ও স্বাভাবিক খাদ্য। বাঁশমতি চালের পোলাও, বড় চিংড়ি মাছ ভাজি, খাসির গোস্ত, মুরগির গোস্ত, বড় পাবদা মাছ, কচিলাউ দিয়ে ঝোলের তরকারি। মেয়েসহ হোটেলের মালিক ও ম্যানেজারের সঙ্গে আমরা দু'জন একসঙ্গে খেতে বসলাম।

বাইরে থাকলে মানুষের জড়তা কেটে যায়। আগ থেকেই টেবিল সাজিয়ে রাখা হয়েছিল সুন্দরভাবে। আমরা নিজেদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে নিলাম। হোটেলের মালিকের নাম জোহরা হোসেন। তার স্বামীর নাম ছিল সাজ্জাদ হোসেন। মেয়েটি দুবাইয়ে একটি ইংলিশ মিডিয়াম কলেজে পড়াশোনা করছে। মিসেস জোহরা হোসেন আমাদের আহার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন এবং বললেন সেল্‌ফ সার্ভিস। তিনি বললেন- আরব দেশে জেনারেশন আফটার জেনারেশন থাকলেও নাগরিকত্ব পাওয়া যায় না। এই যে ব্যবসা দেখছেন একজন দুবাইয়ের নাগরিকের নামে আমরা ব্যবসা করি। কোনো কাগজপত্র নেই। ইচ্ছা করলে আজ রাতেই তারা আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারেন। আইনগতভাবে আমাদের কিছুই করার নেই। কিন্তু ঐতিহ্যগত কারণে আরবরা তা করে না।

আমি প্রশ্ন করলাম আপনার তো অনেক কষ্ট হয়। প্রচুর সম্পত্তিও আছে। দেশের বাড়ি ফিরে গেলেই তো পারেন। তিনি করুণভাবে হাসলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর করে বললেন-৩৬ বছর আগে এসেছি। মানুষ চলে নেশার ঘোরে। মৃত্যুর আগেরদিন পর্যন্ত সে ভাবতেই পারে না, সবকিছুই নির্ধারিত নিয়েমে চলবে এবং তার জন্য নির্ধারিত মাত্র সাড়ে তিনহাত জায়গা।

তিনি আরো বললেন- আপনার ভাই এখানেই মারা গেছেন। তার অবর্তমানে তার গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান দেখেই সময় কাটাই। তা ছাড়া হোটেল ব্যবসায় কাঁচা

www.pathagar.com

টাকা। প্রতিদিন রাত ১২ টার মধ্যে সব হিসাব নিকাশ তদারকি করতে হয়। দুঃখ কষ্ট যে নেই তা বলব না। কিন্তু এই নিয়েই জীবন।

খাওয়া দাওয়া শেষে তিনি ম্যানেজার সাহেবের কাছে জানতে চাইলেন - আমি কত নম্বর রুমে আছি। আমিই উত্তর দিলাম ১১৭ নম্বর রুমে আমি এবং ১১৬ নম্বর রুমে রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরী। তিনি ম্যানেজার সাহেবকে বললেন, আমাকে হোটেলের সবচেয়ে ভাল রুম বরাদ্দ দেয়ার জন্য। আর রাশেদ চৌধুরীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে বললেন- তার ১ হাজার কোটি টাকা থাকলেও ৬৫ টাকার রুমের উপর উঠতে পারবে না। এভাবে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে রাত ১১ টায় রুমে ফিরে আসলাম। ঘুমে চোখ বোজে যাচ্ছিল বলে এসেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরীর ডাকে ঘুম ভাঙল। তিনি রাতের বেলাতেই অনেক কাজ সেরে রেখেছেন। পাকিস্তান থেকে আগেও তিনি বাঁশমতি চাল আমদানির ব্যবসা করেছেন। তিনি আলহাজ্ব রহমতউল্লাহ সাহেবকে ১০০ টন চালের জন্য সিএন্ডএফ দুবাই পোর্ট ৫৩৬ ডলার করে ব্যাংকিং কাগজপত্র ঠিক করতে বললেন। আমাকে পাসপোর্ট ও টিকিট সঙ্গে নিতে বললেন। করাচিতে যোগাযোগ স্থাপন করে এফওবি করাচি প্রতিটন ৪৩৩ ডলারে এলপি গ্রহণের জন্য কাগজপত্র ঠিক করতে বললেন এবং করাচি থেকে রপ্তানি কারক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমার নামে একটি আমন্ত্রণপত্র ফ্যাক্স করে পাঠাতে বললেন। বিকেল ৩টার মধ্যে আমরা সব জরুরি কাজ সেরে ফেলতে সক্ষম হলাম।

পরদিন অ্যামিরাটস এয়ারলাইনে করে আমাকে করাচিতে যেতে হবে। দুবাই থেকে অ্যামিরাটস এর প্লেন ছাড়ে রাত সাড়ে ১১টায়। করাচিতে এসে পৌঁছবো আড়াইটায়। এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে বাজবে রাত ৩টা। তাই করাচিতে বলা হলো কেউ এয়ারপোর্টে থাকলে ভাল হয়। করাচির রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নাম ‘করাচি রাইস কর্পোরেশন’। করাচি এয়ারপোর্টে আমাকে রিসভ করবেন-‘করাচি রাইস কর্পোরেশন’-এর ম্যানেজার জনাব আসফাক হোসেন। এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে হোটেলে নিয়ে যাবেন তিনি। হোটেলের নাম ও রুম নম্বর আমাকে জানিয়ে দেয়া হলো।

সব কাজকর্ম শেষে রাতে রহমতউল্লাহ সাহেব, রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরী ও আমি রাতের খানা খেতে বের হলাম। আজ হোস্ট হলো আলহাজ্ব রহমতউল্লাহ সাহেব। তিনি একটি ইরানি হোটেল খুঁজে বের করলেন। ইরানি খাবার বেশ মজার। অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে আমরা হোটেলে ও রহমত উল্লাহ সাহেব বাসায় চলে গেলেন।

www.pathagar.com

পরদিন সকাল বেলায় আমরা দুজন নাস্তা খেয়ে রহমত উল্লাহ সাহেবের অফিসে গেলাম। করাচি থেকে দুবাই সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত কন্টেইনার ঠিক করতে হবে। একটি কন্টেইনারে করে ২০ টন করে চাল বহন করা যাবে। অনেক দেন-দরবার করে প্রতিটি কন্টেইনার ৬২০ ডলারে ঠিক করা হলো। সারাদিন গল্পগুজব করে কাটালাম। সন্ধ্যা ৭টার দিকে হোটেলে এলাম। সব কাগজপত্র নিয়ে রাত ৯টার দিকে হোটেল থেকে বের হলাম। রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরী খরচের জন্য আমার হাতে এক হাজার ডলার দিয়ে বললেন, ভাল হোটেলে থাকবেন, ভাল গাড়ি ব্যবহার করবেন। প্রতিদিন একবার কিংবা দু'বার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

পাকিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা

রাত সাড়ে ১১ টায় করাচির উদ্দেশে প্লেন ছাড়ল দুবাই এয়ারপোর্ট থেকে। প্লেনে বাংলাদেশী যাত্রীই বেশি। করাচিতে অ্যামিরাটসের প্লেন আসে আড়াইটায়। ১ ঘন্টা বিরতির পর সাড়ে ৩টায় ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়। সাড়ে পাঁচটায় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্লেন অবতরণ করে। করাচিতে নেমে ইমিগ্রেশন অতিক্রম করলাম। কাস্টমস্ চেকিং শেষ হলো। ল্যাগেজ নিলাম। আমাকে নিতে আসা আফসাক হোসেনের সাক্ষাৎ পেলাম না। এয়ারপোর্টে ঘুরাফিরা করতে লাগলাম। ট্যাক্সির লোকজন বার বার এসে প্রশ্ন করতে থাকে কোথায় যাবেন? অবশেষে বললাম আমার হোটেলের নাম আই আই, চুন্নিগড় রোড, করাচি। ট্যাক্সির ড্রাইভার ২৫০ টাকা ভাড়া চাইল। আমি ১৫০ টাকা বললাম। শেষে ১৮০ টাকায় ঠিক হলো।

করাচির জিন্নাহ্ এয়ারপোর্ট থেকে চুন্নিগড় রোড প্রায় ৪০ কিলোমিটার। পথিমধ্যে পুলিশ আমার গাড়ি থামাল। কোথা থেকে এসেছি জানতে চাইলো। সব কিছু বলার পর গাড়ি ও আমার ল্যাগেজ তল্লাশি করল। শেষে আমার শরীর ও মানিব্যাগ তল্লাশি করতে চাইলে আমি প্রচন্ডভাবে রেগে গেলাম। আমার দেহ ও মানিব্যাগ তল্লাশি করতে হলে হোটেলে যেতে হবে। আমি যখন ইংরেজিতে কথাবার্তা আরম্ভ করলাম পেট্রোল পুলিশের দল তখন একটু ঘাবড়ে গেল এবং আমার গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ির ড্রাইভার বলল- স্যার ওরা রাতের বেলায় গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদের বে-ইজ্জতি করে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়। এটাই হলো- ওদের টহলের মূল লক্ষ্য।

www.pathagar.com

৪ টার দিকে হোটেলে এসে পৌঁছলাম। দেখতে পেলাম রিসিপশনে একজন লোক ঘুমে ঢল ঢল করছে। আমি আমার বুকিং রুম নম্বরের কথা বলাতে তিনি নড়ে চড়ে বসলেন। আমার কাছে কোনো পাকিস্তানি টাকা ছিল না। রিসিপশনের লোকটিকে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ১৮০ টাকা দিতে বললাম। গাড়ির ড্রাইভার বললো- আমরা এই হোটেলের সাথে পূর্ব থেকেই পরিচিত। সকাল বেলায় টাকা দিলেও কোনো অসুবিধা নেই। ল্যাগেজ নিয়ে রুমে ঢুকছি এমন সময় আসফাক সাহেব এসে রুমে ঢুকলেন। তার পাঁচ মিনিট দেরি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বার বার দুঃখ প্রকাশ করতে থাকলেন। তিনি থাকেন নাজিমাবাদ উপ-শহরে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে করাচিতে এসেছেন। মূলত ভারতের বিহার ও উত্তর প্রদেশের মাঝখানে মোগলসরাই নামক স্থানে তাদের আদি বাড়ি।

১৯৪৮ সালে তার নানি ও মা-বাবা পূর্বপাকিস্তানে আসেন। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর। আবছা আবছা স্মৃতি ছাড়া ঢাকা সম্পর্কে তিনি আজ আর কিছুই বলতে পারেন না। বার বার তিনি বলতে লাগলেন তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। মালিক শুনলে লজ্জায় তার মাথা কাটা যাবে। আমি তাকে তার বাসায় চলে যেতে অনুরোধ করলাম। আসফাক সাহেব বললো – আপনি ঘুমিয়ে পড়েন আমি সোফাতে বসেই বাকি সময় কাটিয়ে দেব। কারণ এখান থেকে আমার বাসায় যেতে ১ ঘন্টা লাগবে। আবার ৮ টার মধ্যেই আসতে হবে, তাই এখানে থেকে যাওয়াই ভাল। আমি ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। সে সোফাতে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল ১০টায় করাচি রাইস কর্পোরেশন অফিসে গেলাম। হোটেল থেকে পায়ে হাঁটা পথ। আমাকে সোজা মালিকের রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। ভদ্রলোক আজাদ কাশ্মীরের লোক। সকলে তাকে রাজা সাহেব বলে ডাকেন। তিনি প্রথমে জানতে চাইলেন আমার কোনো অসুবিধা হয়েছিল কিনা? আমি বললাম- আসফাক সাহেব আগে থেকেই এয়ারপোর্টে ছিল। হোটেলে পৌঁছে দিয়ে নাস্তা খাবার ব্যবস্থা করে তার পর এসেছে। He is very very responsible person আমার কথা শুনে আসফাকের শুকনো মুখখানা করুণ হয়ে উঠল। কিভাবে সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে তা নিয়ে সারাক্ষণ সে উতলা হয়ে থাকতো। রাজা সাহেবের অফিস থেকেই রাশেদ চৌধুরীর সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। রাশেদ চৌধুরী আমি যা না তার দশগুণ বাড়িয়ে বললেন - আমি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নেতা ওয়াশিংটনে গিয়েছিলাম স্টেট ডিপার্টমেন্টের আমন্ত্রণে ইত্যাদি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

যা হোক রাজা সাহেব তার ব্যক্তিগত গাড়ি আমার ব্যবহারের জন্য দিয়ে দিলেন। আসফাককে ইতিমধ্যে তুমি করে ডাকা শুরু করলাম। সে সারাক্ষণ আমার সাথে থাকে। ৭/৮ দিনের মধ্যে চাল কন্টেইনারে তুলে দিয়ে জাহাজীকরণের ব্যবস্থা করা হলো। ইতিমধ্যে আসফাক আমাকে তার বাড়িতে দাওয়াত করল। আসফাকরা থাকে নাজিমাবাদ উপশহরে। প্লান করে নাজিমাবাদ উপশহর গড়ে তোলা হয়েছে। একদিকে পাকিস্তান হাইওয়ে অন্যদিকে আরব সাগর। সন্ধ্যার আগে এক অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নাজিমাবাদ উপশহরে মূলত ভারত থেকে আগত মোহাজের সম্প্রদায়ের বাস। সারি সারি দোতলা দালান, মোটামুটি প্রশস্ত রাস্তা। পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা অত্যন্ত সুন্দর। এখানে পাঠান সম্প্রদায়ের জন্য একটি কলোনি গড়ে তোলা হয়েছে। সমুদ্রের কাছা-কাছি জায়গাটার মধ্যে কমিউনিটি মার্কেট গড়ে তোলা হয়েছে। পাকিস্তানে এখন প্রচুর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বাস। তারা মূলত টেক্সটাইল মিলসহ বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক। নাজিমাবাদ উপশহরের পরই মৎস্য আড়ত। আমি আসফাকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং রাজা সাহেবকেও আমার সঙ্গে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর অনুরোধ করলাম।

পরদিন সন্ধ্যায় আসফাকদের বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। রাজা সাহেব বললেন, আসফাকের থাকার দরকার নেই। আমি তাদের বাড়ি চিনি। সন্ধ্যার পর হোটেল থেকে আমি আপনাকে তুলে নেব। সে মতে পরদিন সন্ধ্যায় তৈরি হয়ে হোটেলে অপেক্ষা করতে থাকলাম। সন্ধ্যার পর রাজা সাহেব নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে চলে আসলেন। আমরা আসফাকদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। গাড়িতে উঠে রাজা সাহেবকে বললাম- দাওয়াত খেতে গেলে মিষ্টি নিয়ে যেতে হয়। আমি তো করাচিতে ভালো মিষ্টির দোকান চিনি না? রাজা সাহেব বললেন- করাচির সবচাইতে ভাল ও বড় মিষ্টির দোকানটি সামনেই আছে।

মূল করাচি শহর ও নাজিমাবাদ উপশহরের সংযোগ স্থলে একটি বিরাট একতলা ভবন। উক্ত ভবনে বড় করে একটি সাইনবোর্ডে লিখা 'ভাসানী মিষ্টান্ন ভান্ডার'। গাড়ি এসে থামল সেই ভাসানী মিষ্টান্ন ভান্ডারের সামনে। বিভিন্ন ধরণের মিষ্টি থরে থরে সাজানো। তখন এক ধরণের অত্যন্ত পাতলা জিলাপি তৈরি হচ্ছিল। অনেকেই এই পাতলা জিলাপি কিনছে। আমরা বিভিন্ন ধরণের মিলিয়ে ৫ কেজি মিষ্টি নিয়ে আবার রওনা হলাম আসফাকদের বাড়ির উদ্দেশে। বাড়ির গেইটে গিয়ে হর্ণ বাজাতেই আসফাকসহ ৮/৯ জন পুরুষ ও ১০/১২ জন ছেলেমেয়ে ছুটে আসে আমাদের দিকে। আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। রাজা সাহেব মিষ্টির প্যাকেটগুলো আসফাকের হাতে দিলেন।

www.pathagar.com

আমাদের দোতলায় নিয়ে যাওয়া হলো। সকলেই আসফাক হোসেনের নিকটাত্মীয়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সাবেক পাকিস্তানের উপসচিব। তিনি ১৯৭১ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ছিলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তখন প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে কর্মরত ছিলেন তিনি। অল্পক্ষণ পরই আমাদের খাবার টেবিলে আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমাকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে বসানো হলো টেবিলের মাঝের চেয়ারটায়।

সবার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান রাজনৈতিক নেতা হিসেবে। মহিলারা আড়াল থেকে আমাকে দেখ্‌ছিল। আসফাকের নানীকেও আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। ৭৫ উর্ধ্ব বয়সের বৃদ্ধা রমণী, পূর্ণিমার চাঁদের মতোই স্নিগ্ধময়ী। বাংলাদেশের মহিলাদের মতো শাড়ি পরিহিত। সুন্দর উর্দুতে কথা বলেন। ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলতে পারেন। তবে বাংলা কথা বোঝেন ভালভাবেই। তিনি পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। শুরু করলেন তাঁর জীবন কাহিনী।

তাদের আদি বাড়ি ভারতের বিহার ও উত্তর প্রদেশের সংযোগস্থল মোগলসরাই নামক স্থানে। সেখানে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব তার পূর্বাঞ্চলীয় অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান দূর্গ নির্মাণ করেছিলেন। সেই দুর্গকে কেন্দ্র করেই মোগলসরাইয়ের উৎপত্তি। তার পরিবার বা স্বামী কোনো দিনই কোনো রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হননি। তার স্বামী পেশায় ঘড়ির ব্যবসায়ী ছিলেন। ছোট্ট একটা বাড়ি, দু'পুত্র, এক কন্যা নিয়ে তার ছোট সংসার। সকাল হলেই স্বামী চলে যেতেন দোকানে, ফিরতেন রাতে। এভাবেই গতানুগতিকতার মধ্যে চল্‌ছিল তাদের জীবন। এরই মধ্যে স্বাধীনতার বাণী নিয়ে এলো ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট।

১৫ আগস্টের কয়েকদিন পর সকালে কিছু লোক তার স্বামীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরই তার এক নিকটাত্মীয় এসে সংবাদ দিল তার স্বামীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। পাগলের মত ছুটে গেলেন তিনি স্বামীর কাছে। দেখতে পেলেন তার মৃত স্বামীর লাশ। রক্তে লালে লাল হয়ে গেছে সবুজ ঘাস। চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষ। কেউ মুখ খুলে কিছুই বলছে না, কেন তাকে হত্যা করা হলো? কি তার অপরাধ, এসব প্রশ্নেরও কোনো জবাব মিলছেনা।

www.pathagar.com

তখন পরিবারের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল, সমস্ত সহায়-সম্পদ ফেলে শুধুমাত্র জীবনের নিরাপত্তার জন্য তারা চলে যাবে পাকিস্তানে। সেমতেই তারা প্রথম আসে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের সৈয়দপুরে। তারপরে আসে ঢাকাতে। ঢাকার পুরনো শহরে তারা একটি বাড়ি কেনেন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে তারাও পৈত্রিক ঘড়ির ব্যবসা শুরু করে ঢাকাতেই। '৭১-এর ২৫ মার্চের পূর্বেই তার দু'পুত্র নিহত হয়। ঘড়ির দোকান লুট হয়। এরপর তারা যুদ্ধের মধ্যেই জুলাই মাসে চলে আসে করাচিতে। কিন্তু করাচিতে এসেও তারা রক্ষা পায়নি। তার মেয়ের জামাতা অর্থাৎ আসফাকের পিতা নিহত হন মোহাজের থাকার কারণেই।

তিনি বললেন – এখন আমাদের পরিবারের এ আসফাকই একমাত্র জীবিত পুরুষ সদস্য। নেহেরু-গান্ধী-প্যাটেলদের ভারতে আমাদের পরিচয় আমরা মুসলমান। মওলানা ভাসানী – শেখ মুজিবের বাংলাদেশে আমাদের পরিচয় আমরা বিহারি, আর ইয়াহিয়া – জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তানে আমাদের পরিচয় আমরা মোহাজের।

এর বাইরে কি আমাদের কোনো পরিচয় নেই? আমরা যে মানুষ, স্বামী-সন্তান নিয়ে আমাদের যে বাঁচার অধিকার আছে এ দাবি আমরা করবো কোন্ নেতার কাছে। কে আমাদের মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা দেবে?

তিনি আরও বললেন, খাঁচায়বন্দি পাখিকে ছেড়ে দিয়ে বলা হয় তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। সেই মুক্ত পাখি নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়। আমাদের রাজনীতিবিদরা স্বাধীনতার কথা বলে, জনজীবনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে কেন? একজন সাধারণ গৃহবধুর এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর আমার জানা ছিল না।

রাত ১১টার দিকে আসফাকদের বাড়ি থেকে হোটেলের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। ইতিমধ্যে আসফাকের যে আত্মীয় পাকিস্তানের উপ-সচিব ছিলেন তার সঙ্গে অনেক কথা হলো। তিনি এখন একটি কনসালটেন্ট প্রতিষ্ঠানের এমডি হিসেবে কাজ করছেন। করাচি শহরের মধ্যেই তার একটি অফিস আছে। ১৯৭১ সাল সম্পর্কে তার সঙ্গে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছিল।

আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী সেনাবাহিনী ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্ষমতার লিপ্সার কারণেই পূর্বপাকিস্তানে গণহত্যা চালানো হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলতে চাইলেন, জুলফিকার আলী ভুট্টোর এতে কোনো হাত ছিল না। সেদিন রাতে আর কথা হলো না। তিনি তার অফিসে আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমি বললাম করাচিতে আমার কাজ প্রায় শেষ। আগামীকাল ব্যাংকে কিছু কাজ আছে এবং একবার পোর্টে যাওয়া লাগতে পারে।

www.pathagar.com

তার পরই দুবাইয়ে ফিরে যাব। তিনি তার অফিসে আমাকে নিয়ে যেতে আসফাককে অনুরোধ করলেন। সবাইকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিলাম।

রাজা সাহেব গাড়ি চালিয়ে আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে রাত ১২টার দিকে আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। রাজা সাহেবের আর কোনো বিষয়ের উপর আগ্রহ নেই। শুধুমাত্র চাল দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে দিতে পারতেন কোনো চালের কি গুণ। সমস্ত পাকিস্তান তো বটেই ভারত-ভিয়েতনামসহ কোন্ বাজারের কি অবস্থা সবকিছুই তার নখদর্পনে। রাজা সাহেবের কাছ থেকে আমি একটি শিক্ষা নিয়েছি। আর সেটা হলো - এক ব্যক্তি বহুবিষয়ে পন্ডিত হতে পারে না।

পরদিন সকাল ১০টার মধ্যে রাজা সাহেবের অফিসে গেলাম। আসফাক সাহেব বললেন সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আপনার আর কোনো কাজ নেই। আমি দুবাইয়ে রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরীর কাছে টেলিফোন করলাম। তিনি আমাকে বললেন- ব্যাংকে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে একটু সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলে আসেন ও পোর্টে গিয়ে কৌশলে খোঁজ নিন যে আমাদের কন্টেইনারগুলো জাহাজিকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়েছে কিনা। রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরীর কথামতো আসফাক সাহেবকে নিয়ে প্রথমে ব্যাংকে গেলাম, তারপর পোর্টের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

করাচি সমুদ্রবন্দরের সব কন্টেইনার কোম্পানিরই নিজস্ব অফিস আছে। সেখানে দেখলাম আমাদের ৫টি কন্টেইনারই জাহাজিকরণের জন্য সিকিউরিটি এরিয়ার মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। দুপুর ১ টার মধ্যেই সম্পূর্ণ ফ্রি হয়ে গেলাম। আমি আসফাককে তার নিকটাত্মীয় সেই উপ-সচিব সাহেবকে ফোন করতে বললাম এবং বললাম তিনি ফ্রি থাকলে আমি তার অফিসে আসতে চাই। তিনি অফিসেই ছিলেন এবং আমাদের বাইরে না খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। আধঘন্টার মধ্যেই আমরা তার অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তার নামটি আমি এখানে উল্লেখ করলাম না, কারণ আলাপ-আলোচনার মধ্যেই তিনি তার নাম উল্লেখ না করার জন্য অনুরোধ করলেন। ১৯৬৯-৭১ সালের মধ্যে সংঘটিত অনেক গোপন তথ্যই তিনি আমাকে জানালেন, যা রাষ্ট্রীয়ভাবে অত্যন্ত গোপনীয়। তিনি দুপুর বেলায় তার অফিসে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি তার একটি ছদ্মনাম দিয়ে রাখলাম 'কাশেম'।

তিনি বললেন – ১৯৪৭ সালে পরিবারের সঙ্গে ভারত থেকে পাকিস্তানে আসেন এবং এখনকার হায়দরাবাদ নামক স্থানে তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজস্থান ও সিন্ধুর মরুদ্যানের পাশে দরিয়াসিন্ধের কূল ঘেঁষে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের

www.pathagar.com

পর এই হায়দরাবাদ শহরের গোড়াপত্তন হয়। ভারত থেকে আগত বিধ্বস্ত পরিবারগুলোকে আশ্রয় দেয়া হয়েছিল এই হায়দরাবাদ শহরে। পানি নেই, খাদ্য নেই, ভারত থেকে আসার পথে সন্ত্রাসীদের আক্রমণে আহতদের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই। এরমধ্যে কেউ বেঁচে আছে কেউ মরেছে। তাদের এ দুর্বিসহ জীবনচক্রের আর্বতে ধু-ধু মরুভূমির মধ্যে গড়ে উঠে হায়দরাবাদ ও করাচিতে মোহাজের কলোনী। পূর্বপাকিস্তানে কলোনী গড়ে উঠে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, সৈয়দপুর, দৌলতপুর প্রভৃতি স্থানে। হায়দরাবাদ ও করাচিতে তার ছাত্রজীবন শেষ হয়।

১৯৫৪-৫৫ সালে সিএসপি পরীক্ষায় তিনি সমগ্র পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তারপর থেকেই তিনি পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে কর্মরত। তিনি পূর্বপাকিস্তানের ফরিদপুরে ও সিলেটের ডিসি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬৮ সালে তিনি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারি সচিব হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি বললেন, সহকারী সচিব পর্যন্ত হওয়া যায় মেধার জোরে। তারপর শুরু হয় রাজনৈতিক প্রমোশন। তিনি দুঃখ করে বললেন - তাঁর অনেক জুনিয়র সহকারিও পাকিস্তানের সচিব হয়েছেন। কিন্তু তিনি উপসচিব হিসেবেই চাকরি জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন।

আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের চিন্তা করে। প্রশাসনের সব সময়ই দায়িত্ব থাকে রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপারে জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করার। তিনি তখন পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আদেশ দিলেন নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে পরবর্তী সরকারের রূপ কেমন হবে তার তথ্যভিত্তিক জনমত যাচাই করার। মুলত সেনা গোয়েন্দা সংস্থার উপরই এ দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। লে. জেনারেল হামিদ খানকে দায়িত্ব দেয়া হলো এ প্রতিবেদনগুলোর সমন্বয় সাধনের জন্য। তিনি বললেন – সবাইকেই যার যার মতো করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে। মি. কাশেম সাহেবও স্বররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার ৩-৪দিন পর রাওয়ালপিন্ডিতে সেনাসদর দপ্তরে বৈঠক হলো লে. জেনারেল হামিদ খানের সভাপতিত্বে।

সেনা গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে-আগামী নির্বাচনে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। প্রধান দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে

www.pathagar.com

কাইয়ুম খানের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগ। তারা ৭০-৮৫ টি আসনে জয়লাভ করতে পারবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। আওয়ামী লীগের অবস্থা হবে দ্বিতীয় তারা ৬০-৭০টি আসনে জয়লাভ করতে পারবে। নূরুল আমিন ও মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে পরিচালিত দল ও পাকিস্তান পিপল্স পার্টি ২৫-৩০ টি করে আসন পেতে পারে। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আসন সংখ্যাও ৪০-এর উর্ধ্বে হতে পারে।

এই প্রতিবেদন লে. জেনারেল হামিদ খানের কাছে জমা দেয়া হলো। আলোচনা ও সমালোচনার কোনো সুযোগ নেই। জনাব কাশেম সাহেবও তার প্রতিবেদন পেশ করলেন। তিনি প্রথমেই উল্লেখ করলেন, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাপ নির্বাচনে অংশ গ্রহন না করলে পূর্বপাকিস্তানে অন্য কোনো দল মাঠেই থাকতে পারবে না এবং প্রধান দল হবে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। তাদের আসন সংখ্যা হতে পারে কমকরে হলেও ১২০ বা তারও বেশি। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে পশ্চিম পাকিস্তানের কথা উল্লেখ করলেন-সিন্ধু প্রদেশে প্রধান দল হবে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পরিচালিত পাকিস্তান পিপল্স পার্টি (পিপিপি)। পাঞ্জাবে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে মমতাজ দৌলতানার মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান পিপল্স পার্টির মধ্যে। কাইয়ুম মুসলিম লীগ সীমান্তপ্রদেশে ভাল করতে পারে অর্থাৎ ৭-১০টি আসন পেতে পারে।

সবশেষ তিনি উল্লেখ করলেন – জামায়াতে ইসলামীসহ ছোট ছোট ইসলামী পার্টিগুলো এই মুহূর্তে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপল্স পার্টির পরোক্ষ সহযোগি শক্তি হবে। কোনো প্রতিবেদনই সম্পূর্ণ পড়া হয়নি। শুধুমাত্র কাশেম সাহেবের তৈরি প্রতিবেদনটি বৈঠকে সম্পূর্ণভাবে পড়ে শোনালেন লে. জেনারেল হামিদ খান এবং শেষে তাচ্ছিল্যের সূরে মন্তব্য করলেন 'ব্লাডি সিভিলিয়ান'। মনমরা হয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন জনাব কাশেম সাহেব।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন হয়ে গেল। যারা বলেছিল কাইয়ুম মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে ভাল ফলাফল করবে তাদের ভবিষ্যদ্বাণীর সব কিছুই অসত্য বলে প্রমাণিত হলো। কিন্তু তার পরও এই সব আহাম্মকদের চৈতন্যোদয় হলো না। ইতিমধ্যে কাশেম সাহেবকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বদলি করে ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে দেয়া হলো। প্রমোশন নিয়ে তিনি উপ-সচিব ডিফেন্স মিনিস্ট্রির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

www.pathagar.com

কাশেম সাহেবের মতে ১৯৭০ সালে ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে যোগদান করে তিনি দেখতে পান পূর্বপাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ছাতার নিচে সিরাজুল আলম খান ও আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে সশস্ত্র মিলিটেন্ট স্বেচ্ছাসেবক বিশাল বাহিনী গড়ে উঠেছে। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে তা অবহিত করেছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করে বলেছিলেন, এসব নিয়ে আমার চিন্তা করার তেমন কিছু নেই। নির্বাচিত সরকারই দেশের হেফাজত করবে। তাঁর এ মন্তব্য থেকে কাশেম সাহেব মনে করেছিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পূর্বে ডিফেন্স মিনিস্ট্রির কোনো সিভিল কর্মকর্তার সঙ্গেই সেনাবাহিনীর লোকেরা কোনো প্রকার পরামর্শ করেনি। যদিও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টই ছিলেন ডিফেন্স মিনিস্ট্রির দায়িত্বে। এভাবে আগ-পাছ , জনমত, সাপ্লাই লাইন কোনো কিছুর হিসাব-নিকাশ না করেই ২৫ মার্চে ঢাকাসহ সারা পূর্বপাকিস্তানে একটি সার্বিক যুদ্ধের ফ্রন্ট খোলা হয়। আর নির্বিচারে পূর্বপাকিস্তানের জনগণকে হত্যা ও অগ্নিসংযোগ করতে নামিয়ে দেয়া হলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে।

আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম – পাকিস্তানে কি এমন বিবেকবান লোক ছিল না, যারা বিশ্বাস করতো শুধুমাত্র অস্ত্রের জোরে মানুষকে দমন করা যায় না। পূর্বপাকিস্তানের ৯৯% জনগণ যেখানে প্রধমে গণতন্ত্র ও পরে স্বাধীনতা চেয়েছিল সেখানে এক হাজার মাইল দূর থেকে কিছু সেনা দিয়ে কি একটি দেশের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা চলে? আমি তাকে প্রশ্ন করলাম আপনি পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্ট্রির উপ-সচিব হিসেবে কি চিন্তা করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু করতে হলে সবার আগে ঠিক করতে হবে সাপ্লাই রোডের। সে বিষয়ে আপনাদের কি চিন্তা ছিল না? তিনি বললেন, সেনাবাহিনী নিজের করেই এই হামলার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। তারা হয়তো ভেবেছিল হত্যার বিভীষিকা দেখে মানুষ আত্মসমর্পণ করবে।

এরই মধ্যে পাকিস্তানপন্থিরা জনমত পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। আর শেষ ভরসাতো রয়েই গেল। কেননা শেখ মুজিবুর রহমান তো পাকিস্তানি জান্তার হাতে বন্দি আছেই। আমি আবার তাকে প্রশ্ন করলাম-এ যুদ্ধে ভারত কি ভূমিকা নিবে বলে আপনারা ভেবেছিলেন। তিনি বললেন-আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল ১৯৬৫ সালের পর থেকেই ভারত সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত হয়ে পড়ে এবং তিনি একটি বিশাল সুশৃঙ্খল স্বেচ্ছাবেক বাহিনী গড়ে তুলেছেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত: পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও পশ্চিম বাংলার হিন্দু নেতৃত্বের একটা বড় অংশ মিলে একটা অভিন্ন সত্তা হিসেবে বরাবরই সক্রিয়। ফলে একটা কৌশলগত সুযোগকে কাজে লাগাতে ভারত কখনও পিছপা হবেনা। আর এ প্রেক্ষাপটে যুদ্ধে তাদের অংশ গ্রহণটা ছিল একেবারে অবধারিত ব্যাপার। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রথম দিকে ভারত পাকিস্তানকে অবহিত করেছিল তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু ১৯৭১ সালের মে মাসেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বুঝতে পারে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য এবং কাশেম সাহেব বুঝতে পারেন, সেই যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ও অনিবার্য। তখন থেকেই পাকিস্তানী জেনারেলরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সিভিল অফিসারদের সঙ্গে আলোচনার শেয়ার করতে শুরু করে। পাক-ভারত যুদ্ধকে সামনে রেখে একটি কৌশলের কথা সামগ্রিকভাবে চিন্তা করা হয়েছিল। এ কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য ছিল যুদ্ধকে পশ্চিম ফ্রন্টে সীমাবদ্ধ রাখা। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল পশ্চিম ফ্রন্টে প্রবল চাপ দিলে পূর্বফ্রন্ট রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে পশ্চিম ফ্রন্টে চাপ দেয়ার শক্তিও পাকিস্তানের ছিল না।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিশষকরে জুলফিকার আলী ভুট্টো ইরান, লিবিয়া, লেবানন ও সৌদি আরবের সমর্থন ও সহযোগিতা আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। ইরাক ও মিসর ছিল সম্পূর্ণভাবে ভারতের পক্ষে। চীনের বক্তব্য ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তাদের মতে পূর্বপাকিস্তানের জনগণ স্বাধীনতা চায়, ভারত স্বাভাবিকভাবেই তাদের সহযোগিতা করবে। চীন ১৯৬৫ সালের ভূমিকা নিতে পারবে না। প্রকৃত অর্থে চীন কোনো ভূমিকাই গ্রহণ করেনি। সমগ্র ইউরোপ ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পূর্বপাকিস্তানে গণহত্যার ঘোরবিরোধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন ছাড়া প্রশাসনের সব অংশই মুজিবের মুক্তি ও পূর্বপাকিস্তানে গণহত্যা বন্ধের ঘোর সমর্থক। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কোনো জরুরি কাজের সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে পাওয়া যেতো না। তার কারণেই পাকিস্তানের বন্ধু দেশগুলোর কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব হতো না। এভাবে আসে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর।

তিনি বললেন, মুসলিম বন্ধু দেশগুলোর কাছ থেকে তিনশ' যুদ্ধবিমান সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু পাইলট পাঠাতে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাগে। সেসময় প্রেসিডেন্টকে কোথাও পাওয়া যায়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহাবিপর্যয় ঘটলো এবং পাকিস্তানের ৯৩ হাজার সৈন্য ভারতের হাতে বন্দি হলো।

www.pathagar.com

নৌবাহিনী ধ্বংসের মুখে, বিমানবাহিনীও অর্ধেক হয়ে গেছে। এর মধ্যেই জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিলেন। কাশেম সহেবকেও ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে ন্যস্ত করা হলো। দায়িত্ব নেয়ার দু'দিন পর অর্থাৎ ২২ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে আমন্ত্রণ জানালেন প্রেসিডেন্ট ভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আসলেন নতুন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে তিনি অবহিত করলেন - শেখ মুজিবুর রহমানকে তিনি মুক্তি দিতে চান। যতদ্রুত সম্ভব ওয়াশিংটনে এ বার্তা শুধুমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পৌছে দিতে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করলেন। ভুট্টো সাহেব এটাও বললেন - তা হলে তিনি বিশেষভাবে কৃতার্থ হবেন।

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তখন পাকিস্তানের জেলের মধ্যে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, এমনকি ঢাকার পতন সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি। অবশেষে ৫ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে ইসলামাবাদে অত্যন্ত গোপনে মুজিব ভুট্টো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভিতরে ভিতরে মুজিবের মুক্তি ও বাংলাদেশে প্রত্যবর্তনের কাজ চলতে থাকে। এ ভাবেই পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কাশেম সাহেব বলেই চললেন। আমি বললাম ভাই চা-নাস্তা না হলে তো আর আসর জমছে না। তিনি চা ও পাপর ভাজার ব্যবস্থা করলেন। তিনি বললেন, ১৯৭২ সালের ২৮ জুন পাকিস্তান-ভারত শিমলা শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। দফায় দফায় বৈঠক হলো। ২ জুলাই পর্যন্ত চলে এই শীর্ষ বৈঠক। তিনিও এই বৈঠকে পাকিস্তানের পক্ষে প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। এই বৈঠক শিমলা বৈঠক নামে ইতিহাস খ্যাত। তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোকে একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, শূন্যহাতে গিয়েছিলেন তিনি শিমলায়। ফিরে আসেন বিজয়ীর বেশে। পাঁচ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূমি দখল করে নিয়েছিল ভারত পশ্চিম ফ্রন্টে। ৯৩ হাজার বন্দীর মধ্যে ২০০ জনকে যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে বিচার করা যেতো। তাদেরকে অত্যন্ত কৌশলে তিনি মুক্ত করে আনেন। সর্বোপরি এই চুক্তিকে তিনি ভারত-পাকিস্তান চুক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কাশেম সাহেব বললেন - জুলফিকার আলী ভুট্টো হচ্ছেন পাকিস্তানের আণবিক শক্তির জনক। ১৯৭২ সালে কাদের খান ও লিবিয়ার একজন নাগরিক সম্ভবত

www.pathagar.com

তার নাম ড. আজিজ যিনি লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্ণেল গাদ্দাফির প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন। তারা উভয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ভবনে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের ভিজিটর লিস্টে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সে সময় প্রেসিডেন্টের উপস্থিতি দেখানো হয়েছিল তিনি বিশ্রামে আছেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো কাদের খান সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কতদিনের মধ্যে আণবিক ডিভাইস নির্মাণ করা সম্ভব। কাদের খান উল্লেখ করেছিলেন, অর্থের যোগান ঠিকমত থাকলে ৫-৬ বছরের মধ্যে পাকিস্তান আণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে বাজেট বহির্ভূতভাবে অর্থ যোগাড় করে আণবিক শক্তির জন্য কাজ শুরু করেছিলেন ভুট্টো ও কাদের খান।

পরের দিন করাচি ছেড়ে দুবাই এসে পৌঁছলাম। রাশেদ আহম্মেদ চৌধুরী এয়াপোর্টে আমাকে নিতে এসেছিলেন। চালের চালান এসে পৌঁছেছিল ৬-৭ দিন পর। হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল ৬ হাজার ডলার লাভ হয়েছে। প্রথমে কথা হলো- ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি ভাগ হবে। পরে রাশেদ চৌধুরী কি যেন মনে করে আমাকে ৫ হাজার ডলার দিয়ে দিল। এই ভাগাভাগির বিষয়টি দেখে প্যারিস হোটেলের মালিক মিসেস জহুরা হোসেন রাশেদ আহম্মদ চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সূর্য্য কি আজ পশ্চিম দিকে উঠেছে নাকি? সেসময় আমি রাশেদ চৌধুরীর ঠিকানা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি উড়ন্ত পাখি। বলতে গেলে রাশেদ চৌধুরীর বদান্যতায় এই জীবনে প্রথম বিদেশে নিজের হাত স্বচ্ছল হলো।

বিবাহের সময় স্ত্রীকে খুব ভালকিছু দিতে পারিনি। সবার আগে তার মুখখানা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। তার জন্য আড়াই ভরি ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন কিনলাম। বাচ্চাদের জন্য ছোট-খাট বাজার করে ঢাকায় ফিরে এলাম।

ভারত সফর

১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষসপ্তাহে আমি ওয়াশিংটনে ছিলাম হোটেল হিলটনে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের জন এফ কোলের সঙ্গে দেখা করতে যাব। হোটেলের লবিতে নেমেছি এমন সময় পরিচয় হলো আয়ারল্যান্ডের বাণিজ্য মন্ত্রী মি. জেম্‌স ওয়েল্‌স বেকারের সঙ্গে। তিনি ওয়াশিংটনে এসেছিলেন ব্যক্তিগত সফরে। দু'দিন আগে স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিল্ডিং-এর লবিতে তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়েছিল, কোনো কথা হয়নি। তিনি তার পরিচয় দিয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন- তিনিও স্টেট ডিপার্টমেন্টে যাবেন। I can

www.pathagar.com

acompany him তাঁদের এ্যাম্বাসির গাড়ি ছিল তাঁর সঙ্গে। একজন অফিসারও ছিল। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয়ের পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি কখনো আয়ারল্যান্ডে গিয়েছি কি না। আমি উত্তর দিলাম- আমি ইংল্যান্ডে গিয়েছি, কিন্তু আয়ারল্যান্ডে যাইনি। তিনি আমাকে আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমার সুবিধাজনক সময় কোনটি হতে পারে তিনি তা জানতে চাইলে আমি বললাম- নভেম্বর-ডিসেম্বর আমার জন্য সুবিধাজনক সময়। তিনি বললেন- নভেম্বর ডিসেম্বরে আয়ারল্যান্ডে খুব বেশি শীত থাকে। তিনি আমাকে নভেম্বর মাসে আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের কোনো এ্যাম্বাসি বাংলাদেশে নেই। আয়ারল্যান্ডের এ্যাম্বাসি আছে দিল্লিতে। সেখান থেকেই ভিসা নিতে হবে। আমি তাকে জানালাম ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি আয়ারল্যান্ডে আসব।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এও সিদ্ধান্ত নিলাম কলকাতা থেকে ট্রেনে করে দিল্লিতে যাব, পথিমধ্যে মোগলসরাই দেখে যাব। সেই মতে ঢাকা থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে মোগলসরাই তার পরে দিল্লি গিয়ে আয়ারল্যান্ডের ভিসা নেব। প্রথমে ঢাকা থেকে রাতের বেলায় বেনাপোলের উদ্দেশে রওনা হলাম। ঘন কুঁয়াশার মধ্যে পরদিন সকাল ৮ টার সময় বেনাপোলে পৌঁছলাম। ৯টা থেকে অফিস খোলা। বেনাপোলে আমাদের পরিচিত লোক ছিল। খুব অল্পসময়ের মধ্যে তারা সব কাজ শেষ করে ওপারে অর্থাৎ ভারতীয় অংশে যেতে দিল। সেখানে কাজ সারতে একটু সময় লাগল। সকাল ১১টার মধ্যে আমরা একটি ট্যাক্সি নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলাম।

সেদিন ছিল শনিবার। দু'টার মধ্যে কলকাতা পৌঁছে একটি গেস্ট হাউজে উঠলাম নিউমার্কেটের কাছেই। সেখানে গোসল করে গেস্ট হাউজের পাশে একটি মুসলিম হোটেলে খেতে গেলাম। হোটেলের মালিকের বাড়ি বাংলাদেশের নরসিংদী জেলায়। ঢাকা থেকে যারা এখানে আসে তারা অনেকেই এই হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে। ইতিমধ্যে নাসিম আহমেদ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। সেও দিল্লি যাবে। কলকাতা খাওয়ার হোটেলেই তার সঙ্গে বিস্তারিত কথা হলো। বিকেল ৫টায় একটি ট্রেন আছে কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার। রাস্তার মাত্র ৫টি স্টেশনে থামবে তার মধ্যে মোগলসরাইও আছে। আমি নাসিমকে বললাম- ভাই আমার তো একদিন মোগলসরাইতে থাকতে হবে। তার পরদিন আমি দিল্লিতে যাব। অর্থাৎ আমি দিল্লিতে পৌঁছাব সোমবার রাত ৮টার দিকে। নাসিম কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে আমার সাথেই থেকে যেতে চাইল। বিকেল ৫টায় ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর টিকিট নিয়ে মোগলসরাই হয়ে দিল্লির

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। টিকেট নিয়েছি দিল্লিরই। কিন্তু আমরা পথে মোগলসরাইয়ে একদিন কাটিয়ে পরের দিন যাব দিল্লিতে।

ভারতের ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভাল। চীন দেশেও আমি মঙ্গোলিয়া থেকে সাংহাই পর্যন্ত ট্রেনে ভ্রমণ করেছি। কিন্তু আমার কাছে ভারতীয় ট্রেন ব্যবস্থাপনাকেই উন্নততর মনে হয়েছে। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ট্রেনের ক্যান্টিনের লোক এসে রাতের খাবারের মেনু নিয়ে গেল। কোন্ সময় খেতে চাই তাও জিজ্ঞাসা করে গেল। আমরা বললাম সাড়ে ৮টা থেকে ৯ টার মধ্যে খাবার দিলে ভাল হয়। দুই ধরনের মেনু। ভিজিটেরিয়ান ও ননভিজিটেরিয়ান। আমরা ননভিজিটেরিয়ান মেনু চয়েজ করলাম। রাত ৯টার দিকেই আমাদের খাবার দেয়া হলো। তার মধ্যে ছিল দু'খানা করে লুচি, বিভিন্ন তরিতরকারি দিয়ে সবজি, ঘন ডাল, খাসির মাংস ও একটি করে ছোট্ট দই। প্লেটের এককোণে সুন্দর করে একটু আচারও দেয়া হয়েছে। খাওয়া দাওয়া শেষ করার পর ক্যান্টিন বয় জিজ্ঞাসা করল চা না কফি, আমরা কফি খেতে চাইলাম। কফি খাওয়ার পর কাপটাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে তারপর কম্বল ও বালিশ দিল। আমরা আরাম করে ঘুম দিলাম।

সকাল বেলায় হৈ-চৈ শব্দ শুনে ঘুম ভাঙ্গল। সকাল ৬টায় পাটনা স্টেশনে এসেছি। এর পরের স্টেশনই হচ্ছে মোগলসরাই। পাটনা থেকে বহু দূরে উত্তর প্রদেশের সীমানার মধ্যেই এই মোগলসরাই। সকাল সাড়ে ১০টায় আমাদের ট্রেন এসে থামল মোগলসরাইয়ে। ছোট্ট একটি স্টেশন। স্টেশন থেকে বের হয়ে অনেকগুলো ঘোড়ার টমটম গাড়ি দেখতে পেলাম। স্থানীয় অধিবাসিদের মধ্যে প্রায় সবাই মুসলমান। উর্দুতে কথা বলেন। কোথায় যাব সবাই জানতে চাইলেন। আমরা দু'জনেই বললাম একটি হোটেলে যেতে চাই। খুব কাছেই একটি হোটেল দেখিয়ে দিল স্থানীয় লোকেরা। কি কাজের জন্য এসেছি জানতে চাইল অনেকেই। আমরা বললাম মোগলসরাই দেখতে এসেছি। সকলেই অবাক হওয়ার মত করে আমাদের দিকে তাকাল। কারণ মোগলসরাই কেউ দেখতে আসে না। বাইরে থেকে মানুষ আসে তাজমহল দেখতে, আজমির শরীফ জিয়ারত করতে। গয়া-কাশিতে আসে ধর্ম, মানত পুরো করতে। মোগলসরাইয়ের প্রধান সড়কের দু'পাশে পুরনো ঘর বাড়ি, দেখতে যেন আমাদের পুরনো ঢাকা।

এখানকার মানুষের প্রধান কাজ হস্তশিল্প। তারমধ্যে চূড়ি, কানের দুল, মেয়েদের স্যান্ডেল, কাপড়ের উপর জরি বসানো এ সবই হচ্ছে প্রধান কাজ। বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা এসে অর্ডার দিয়ে যায় এবং মাল নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মার্কেটিং করে। কলকাতা ও বোম্বাই শহরের ক্রেতাই বেশি। চাকরি-বাকরি খুব একটা

www.pathagar.com

নেই বললেই চলে। এই মোগলসরাই ছিল সম্রাট আরঙ্গজেবের পূর্বাঞ্চলের অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান দূর্গ। পশ্চিমাঞ্চলের দূর্গ ছিল লাহোর আর দক্ষিণাঞ্চলের দূর্গ পুনাতে। এই পুনাতেই হিন্দু মারাঠা নেতা শিবাজির উত্থান হয়। প্রখ্যাত কংগেস নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মস্থানও এই পুনাতেই। ভারতের জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর হত্যাকারী কুখ্যাত নাথুরাম গডস্-এর জন্মস্থানও এই পুনা অঞ্চলেই।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিকেলে ঘুরে ফিরে শহর দেখতে লাগলাম। রেললাইনের দক্ষিণ পাশে মোগলসরাই শহর। আর উত্তর পাশে পুরাতন বড় বড় গাছ-গাছালি পরিবেষ্টিত ফাঁকা বেস্টনি। এর মধ্যেই পাথরের নির্মিত একটি ছোট একতলা ঘর। বহুদিন যাবত বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে।

মোগল বাহিনীর দূর্গের প্রধান কার্যালয় ছিল এই ঘরটি। আশে পাশে লোক ছিল কিন্তু ভেতরটা দেখার জন্য কেউ তেমন সাহায্য করতে পারলো না। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলে রাত ৭টার মধ্যেই হোটেলে ফিরে আসলাম। খুব ভাল হোটেল নয়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভাল রুমটি আমাদের দেয়া হয়েছিল। হোটেলের রুম ভাড়া ১৮০ রুপি। এর পরের স্টেশনই হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক রায়বেরিলি। যে আসন থেকে নির্বাচিত হন ইন্দিরা গান্ধী, রাজিব গান্ধীরা। কিন্ত আলোর নিচেই যে অন্ধকার তার জীবন্তপ্রমাণ হচ্ছে মোগলসরাই।

পরদিন সকাল ১০ টার দিকে রেলস্টেশনে উপস্থিত হলাম। নাসিম সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না কেন আমি এসেছি এই মোগলসরাইতে। সাড়ে ১০টায় ট্রেন ছাড়ল দিল্লির উদ্দেশে। রাত ৯টায় দিল্লি রেলস্টেশনে নামলাম। নাছিম সাহেবের অনেক জানাশোনা দিল্লিতে। তিনি বললেন, নিলুভাই একটি বেবিট্যাক্সি নিয়ে চলেন হোটেলে যাই। কাছেই ত্রিশটাকা বেবিট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে একটি হোটেলে উঠলাম। নভেম্বর মাসে দিল্লিতে ভীষণ শীত ও কুঁয়াশা। গরমপানির ব্যবস্থা ছিল হোটেলে। সোমবার সকাল ৮টার মধ্যে রেডি হয়ে আয়ারল্যান্ড এ্যাম্বাসিতে উপস্থিত হলাম। এগারশ' ভারতীয় রূপীর একটি ব্যাংক ড্রাফ্‌ট নিয়ে ফরম ফিলাপ করে সকাল ১০টার মধ্যেই ভিসার আবেদন জমা দিলাম। বিকেল ৫টায় পাসপোর্ট ডেলিভারী দেয়ার কথা জানাল এ্যাম্বাসি অফিস থেকে।

নাসিম সাহেবের কিছু কাজ ছিল দিল্লির পুরনো শহরে। আমিও তার সঙ্গে গেলাম সেখানে। সেখান থেকে গেলাম দিল্লির শাহি জামে মসজিদ দেখতে। তারপর লালবাগ কেল্লা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মোগল সাম্রাজ্যের শিল্পকলা,

www.pathagar.com

প্রসাদের নিরাপত্তা বেস্টনিসহ অনেক কিছু পারখ করলাম। তারপর ট্যাক্সি নিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে গেলাম যমুনার পাড়ে গান্ধী স্মৃতিসৌধে। সেখান থেকে ইন্দিরা গান্ধী যে বাড়িতে নিহত হয়েছিল সেই জায়গায়। ছোট তিন রুমের একটি হলুদ বাড়িতে বসবাস করতেন ভারতের শক্তিধর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। এখন সেটাকে ইন্দিরা স্মৃতি মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছে। যে জায়গাটিতে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সে জায়গাটি কাঁচের আবরণে ডেকে দেয়া হয়েছে। রক্তের দাগগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে বেহন্ত সিং-এর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন তিনি। এই বাড়িতেই ইন্দিরা গান্ধী বাস করতেন। সেখানে একটি অনেক পুরনো বড়ই (কুল) গাছ আছে। এই গাছের ছায়াতলে বসে তিনি বই পড়তে পছন্দ করতেন। তিনি যখন নিহত হয়েছিলেন, তখন যে কাপড়খানা তার পড়নে ছিল ভারতীয় মূল্যে তার দাম ছিল দু'শ রুপি। সেই হালকা সবুজ সূতি শাড়িখানাও ইন্দিরা গান্ধী স্মৃতি মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের চারিত্রিক আচরণগুলো সবদেশের নেতাদের কাছেই অনুকরণীয় হতে পারে। তাদের দেশপ্রেম ও সততা প্রশ্নের উর্ধ্বে। ইন্দিরা গান্ধী, ভিপি সিং, অটলবিহারী বাজপায়ী কিংবা জ্যোতিবসু এঁরা সত্যিকার অর্থেই দেশপ্রেম ও সততার রাজনীতির মূর্তপ্রতীক।

নাসিম বলল নিলু ভাই দিল্লিতে এসেছেন বেঁচে থাকলে আর কখনো আসবেন কিনা ঠিক নেই। দিল্লি শহর ও এর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দেখে যাই। ৩০ রুপি দিয়ে দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দেখার জন্য ব্যবস্থা আছে। নাসিমের কথামত মঙ্গলবার সকাল ১০টায় দিল্লি ট্যুরের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ভবন, পার্লামেন্ট ভবন, কুতুব মিনার, দিল্লি গেইট ও বিরালা ভবন (যেখানে গান্ধজীকে হত্যা করা হয়েছিল) ঘুরে ঘুরে দেখতে প্রায় ২টা বেজে গেল। আমরা কলকাতা ফেরার জন্য দিল্লি রেলস্টেশনের কাছে নামলাম। প্রথমে দুপুরের খানা খেয়ে পরে রওয়ানা হলাম রেলের টিকেট কিনতে। দিল্লি রেলস্টেশনের দুরপল্লার প্রায় সব টিকেটই বিক্রি হয় ব্ল্যাকে। অনেক কষ্ট করে ব্ল্যাকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর দু'টি টিকিট কিনতে সক্ষম হলাম। কলকাতার উদ্দেশে ট্রেন ছেড়ে যাবে রাত পৌনে ৮ টায়।

টিকিটে নির্দিষ্ট আসনের উল্লেখ আছে। কিন্তু দিল্লির আশপাশের যাত্রীরা এই নিয়ম-কানুন কিছুই মানে না। দিল্লি থেকে পাটনা পর্যন্ত প্রায় একই অবস্থা। আমরা দু'জন আমাদের আসনে বসলাম কিন্তু ট্রেন ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে বিনা

www.pathagar.com

টিকেটধারী বেশকিছু যাত্রী ট্রেনের কামরায় ওঠে বসল। তাদের মধ্যে একজন আমার পাশে চাপাচাপি করে বসে আস্তে আস্তে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের বড় কর্তা। আমি তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম বলে তার কথা শুনতে ভাল লাগলো না। নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ দিল্লিতে ছিল প্রচন্ড শীত। আমার শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জ্বর তো আছেই তার উপরে এভাবে ধাক্কা ধাক্কি করে ৩৬ ঘন্টার পথ পাড়ি দেয়ার দুঃস্বপ্নে আমি মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

নাসিম সাহেব আমাকে সাহায্য ও সেবা শুশ্রুষা করার চেষ্টা করেছিলেন সর্বশক্তি ও আন্তরিকতা দিয়ে। আমাদের কামরায় একটি বাঙালি পরিবার উঠেছিল। ভদ্রলোক ভারতীয় সেনাবাহিনীর ননকমিশন সদস্য। কাশ্মীর সীমান্তে চাকরিরত আছেন। ছুটিতে পরিবার নিয়ে কলকাতার বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছেন। তার নাম অখিল বিশ্বাস। তার স্ত্রী সূলচনা বিশ্বাস, তাদের দু'টি বাচ্চা। মেয়েটির বয়স ৬ এবং ছেলেটির বয়স ৪ বছর। আমরা যে চেয়ারগুলোতে বসেছিলাম ঠিক উল্টোদিকে মুখোমুখি হয়ে বসেছিলো তারা। আমি ও নাসিম বাংলায় কথাবর্তা বলাতে তারা আমাদের প্রতি আগ্রহ ভরে তাকাচ্ছিল।

প্রথমে সূলচনা বিশ্বাসই আমার কাছে জানতে চাইল। বলল- দাদা আপনারা কি ওপার বাংলা থেকে এসেছেন? আমি বললাম – হ্যাঁ, দিল্লিতে কিছু কাজ ছিল। সে জানতে চাইলো কোন্ জেলায় আমার বাড়ি। আমি বললাম- গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় আমার বাড়ি। নাসিম বলল- তার বাড়ি যশোর জেলায়। সূলচনা বিশ্বাস বলল- তার ঠাকুর দাদার বাড়ি ছিল পিরোজপুরের স্বরূপকাঠিতে। তাদের বর্তমান বাড়ি হরিদাসপুর নামকস্থানে। তাঁর স্বামীর বাড়ি কলকাতাতেই। তার বাবা মা হরিদাসপুরেই থাকেন। তারা প্রথমে কলকাতায় শ্বশুড়বাড়িতে যাবে তারপরে যাবে বাপের বাড়িতে। সূলচনা আমাকে দাদা বলে ডাকতে থাকলেন। আমার জন্য চেয়ারের উপরে শোয়ার ব্যবস্থা করার জন্য তার স্বামী অখিলকে অনুরোধ করলেন। তিনি মিলিটারী মেজাজ দেখিয়ে আমার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর নাসিম সাহেবও একটু সুবিধাজনকভাবে আরাম করে বসতে পারলেন।

ধীরে ধীরে আলাপচারিতা জমে উঠলো। দিল্লি থেকে একটি কম্বল কিনেছিলাম সেটি মুড়িদিয়ে শোয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মাথার কাছে ট্রেনের বগিতে একটি ছোট্ট ছিদ্র ছিল তা দিয়ে খুব জোরে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। তার উপর আগে থেকেই আমার শরীরে জ্বর ছিল। সবমিলে ভীষণ ঠান্ডা লেগে গেল।

www.pathagar.com

তাছাড়া যেখানে শুয়েছি সেখানে সোজা হয়ে শোয়ার কোনো উপায়ও ছিল না। সে কারণে আমার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। আমার বার বার উঠা-বসা দেখে সূলচনাসহ সকলেই একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। একবার আমি শুয়ে পড়ি আবার নিচে নেমে এসে বসি। এভাবে ছট্ফট্ করতে থাকলাম। জ্বরের জন্য কোনো ওষুধও সঙ্গে ছিল না। এ ভাবেই সকাল হলো।

সূলচনার বাচ্চা দু'টি রাতে ঘুমিয়ে ছিল। সকাল হতেই নানা ধরণের প্রশ্ন করতে থাকলো তাদের মাকে। প্রথমেই জানতে চাইল আমরা তাদের কি হই। সূলচনা বলল - তোমার মামা হয়। মেয়েটির নাম সূচিত্রা আর ছেলেটির নাম অশোক। সূচিত্রা তার মায়ের কাছে জানতে চাইল মামা এতোদিন আসেনি কেন? নানুর বাড়িতে তো এই মামাদের দেখলাম না? সে নানারকম প্রশ্ন করতে থাকে। তবে তারা দু'ভাইবোন মিলে আমাদেরকে সারাক্ষণ মামা মামা বলে মাতিয়ে রাখল।

সকাল বেলাতে ৬ জনের নাস্তা আনতে হবে। অখিলকে ১০০ টাকা দিয়ে নাস্তা আনতে বললাম। অখিল ইতস্তত করতে ছিল। আমি ধমক দেয়াতে সে সূলচনার দিকে তাকিয়ে শেষপর্যন্ত টাকাটা হাতে নিল। স্টেশনের কি নাম ছিল আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। যা হোক অখিল কিছু লুচি, সবজি ও মিষ্টি নিয়ে আসল নাস্তার জন্য। সূলচনা আমাদের পাঁচজনকে নাস্তা দিল। নিজেরটা রেখে দিল কিন্তু আমাদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজে কিছুই মুখে তুলল না। পাশের ১ জন অবাঙালি লোক অখিলকে জিজ্ঞাসা করল আমরা একই পরিবারের লোক কি না? ইতিমধ্যে অখিলের ৬ বছরের মেয়েটি আমার কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে দেখল আমার গায়ের সঙ্গে ঘেষে বসে তার মাকে বলল মা মামার ভীষণ জ্বর এসেছে। সত্যিই জ্বরের কারণে আমি ছট্ফট্ করতে ছিলাম। দুপুর দেড়টার দিকে আমাদের ট্রেন পাটনা স্টেশনে এসে থামলো।

দুপুরের খাবার কিনে আনলো অখিল কিন্তু আমি কিছুই খেতে পারলাম না। সে এক কেজি আপেলও কিনে এনেছিল। তার ১টা খেয়েছিলাম। ট্রেন আবার চলতে থাকলো। ১৯৪৭ সালের পরে সূলচনাদের ঠাকুর দাদারা পূববঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছিল পশ্চিম বাংলায়। কি কারণে গিয়েছিল সে সম্পর্কে সূলচনার কোনো ধারণাই নেই। তার জন্ম হরিদাসপুরে ছোট ঘরে। বাবা মায়ের কাছে শুনেছে পিরোজপুরের স্বরূপকাঠিতে তাদের অনেক বড় বাড়ি ছিল। সে না বললেও আমরা বুঝি সাম্প্রদায়িক হিংসা-প্রতিহিংসার ফলেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা ভারতে চলে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

মূলত সম্পত্তি দখলই হচ্ছে এই সাম্প্রদায়িক হিংসা-প্রতিহিংসা ছড়ানোর মূল কারণ। সাধারণ মানুষ কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমাদের ট্রেন বীরভূম স্টেশন দিয়ে বাংলা প্রদেশে প্রবেশ করলো।

ভারতে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ওষুধই কেনার নিয়ম নেই। আমার খুবই খারাপ লাগছিল। সুলচনা ছট্‌ফট্‌ করছিল – কখন আমরা কলকাতায় গিয়ে ওষুধ নিতে পারি। আর অবুঝের মত তার স্বামীকে বলছিল দাদার অসুখ তুমি ১টা ট্যাবলেটেরও ব্যবস্থা করতে পারলে না। বীরভূম ষ্টেশন ছেড়ে দিলে ৬ বছরের সূচিত্রা আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল খুব জ্বর। 'তোমার ভয় নেই মামা - আমি আছি না? কলকাতায় নেমেই তোমাকে ডাক্তার খানায় নিয়ে যাবো।' তখন আমার মনে এই ৬ বছরের শিশুই আমার ভরসার। সে হিন্দু নাকি মুসলমান তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

আর আমি মনে মনে অনেক কথা ভেবেছিলাম। এই শিশুবাচ্চা কি শুধু হিন্দু বাবা মায়ের ঘরে জন্ম নেয়ার কারণে আমাদের চিরশত্রুতে পরিণত হয়েছে। যে সাম্প্রদায়িকতা এই শিশুবাচ্চার ভালবাসা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে সেই সাম্প্রদায়িক হিংসা-প্রতিহিংসার রাজনীতির কি কোন প্রয়োজন আছে? শরৎ চন্দ্রের দেবদাস অসুস্থ হয়ে কারো স্নেহ বা ভালবাসার হাতের স্পর্শ পায়নি। আমি তো এই ৬ বছরের হিন্দু সুচিত্রার হাতের স্পর্শ পেয়েছি। সে আমাকে সাহস দিয়েছে – 'বলেছে তোমার কোনো ভয় নেই মামা, আমি তো আছি। কলকাতায় গিয়েই আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো।' যে শিশুর ভালবাসার অভিব্যক্তি ধ্বংস করে দেয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উগ্র ছোবল। সেই সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করে যে রাজনীতি তা কি মানুষের কল্যাণে কোনো অবদান রাখতে পারে? এই প্রশ্ন বার বার আমার মনে দাগ কাটছিল।

রাত ১০টার দিকে কলকাতা স্টেশনে নামলাম। সুলচনা ও তার স্বামী অখিল বিশ্বাস চেয়ে ছিল আমাদের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি। নাসিম সাহেবই হোটেলে নেয়া, ওষুধের ব্যবস্থা করা ও সেবা শুশ্রুষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। রাতে ঘুমের পিল খেয়ে ঘুমিয়েছিলাম।

পরদিন সকাল ১০ টায় একটি ট্যাক্সি নিয়ে আমরা বেনাপোল হয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম। #

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের ১০৩ বছরের পটভূমি

উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির উত্থানের পটভূমি : মোগল আমলে সম্রাট মুহাম্মদ শাহ ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশকে একত্রিত করে বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব আলিবর্দী খানের সময় বঙ্গদেশ এই অঞ্চলের একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ও ফরাসী বণিক গোষ্ঠী মোগল সম্রাটের নিকট থেকে বঙ্গদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুবিধাজনক সনদপত্র লাভ করে। সনদে প্রাপ্ত অধিকার বলে কলকাতা ও কোচিনে তারা ব্যবসায়িক কুটি স্থাপন করে কার্যক্রম শুরু করে। নবাব আলিবর্দী খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। ঘঁষেটি বেগম, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার মাতা আমেনা বেগম ও শওকত জং-এর মাতা এই তিনজন নারীই ছিলেন আলীবর্দী খানের উত্তরসূরী। এদিকে ঘঁষেটি বেগমের কোন সন্তানাদি ছিল না। সিরাজ-উদ-দৌলার বড় ভাইকে তিনি দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শিশুকালেই তার অকাল মৃত্যু হয়। ঘঁষেটি বেগমের স্বামী ঢাকাতে থাকলেও তিনি থাকতেন মুর্শিদাবাদে। আলিবর্দী খানের দ্বিতীয় কন্যা আমেনা বেগমের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা। আর শওকত জং বড় হয়ে ওঠেন পূর্ণিয়াতে। আলিবর্দী খানের মৃত্যু হলে সিরাজ-উদ-দৌলা খুব অল্পবয়সে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রতিহিংসার কারণে ঘঁষেটি বেগম নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে মেনে নিতে পারেনি।

www.pathagar.com

ঘটনাপ্রবাহে শওকত জং নিহত হলে ঘসেটি বেগম এই হত্যাকান্ডকে সুগভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মীরজাফর আলী খান আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পর যে সম্মান প্রত্যাশা করেছিলেন কার্যত তা না পাওয়াতে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি মোগল সম্রাটের দেয়া বাণিজ্যিক সনদপত্রের অপব্যবহার করে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিতে থাকে। তৎকালীন সময়ে বছরে প্রায় দেড়কোটি টাকার রাজস্ব ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি ফাঁকি দিত। এ সংবাদ দেশপ্রেমিক তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার গোচরীভূত হলে তিনি তা প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে সময় কাশিম বাজার একটি বড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নবাব বারবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করার পরও ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা তা মোটেই ভ্রুক্ষেপ করেনি। বরং নবাবের রাজসভাসদ ও দেশীয় রাজন্যবর্গ নিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন কোম্পানির কর্মকর্তারা। তারা এ আর লতিফ ও ঘসেটি বেগমের সাথে ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে এবং নবাবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অপপ্রচারে শুরু করে।

অন্যদিকে নবাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অতি উৎসাহীদের আচার-আচরণে সভাসদদের মধ্যে ক্ষুব্ধতা বৃদ্ধির উপাদান হিসেবে কাজ করে। তারা নবাবকে এমনভাবে ঘিরে রাখে, যাতে শুভ পরামর্শ গ্রহণ করার মানসিকতা তিনি হারিয়ে ফেলেন। আলিবর্দী খানের দূরদর্শী স্ত্রী তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ষড়যন্ত্রের মারাত্মক পরিণতির কথা অনুধাবণ করতে পেরে তরুণ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যা মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

অন্যদিকে অতিউৎসাহীদের বাড়াবাড়ির কারণে অন্ধকূপ হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। অথচ নবাব এর কিছুই জানতেন না। শেষপর্যন্ত, ষড়যন্ত্র, লোভ ও প্রতিহিংসার বেড়াজালে ১৭৫৭ সালে বঙ্গদেশের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হল। পুতুল নবাব হলেন মীরজাফর আলী খান। প্রথমেই তিনি আঘাত হানলেন সেনাবাহিনীর ওপর। মাত্র ২ মাসের মধ্যে তিনি ৮০ হাজার সেনাসদস্যকে চাকরিচ্যুত করেন। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির তাঁবেদারে পরিণত হন তিনি। এভাবে নিঃস্ব জাতিতে পরিণত হওয়ায় ব্রিটিশ উপনিবেশিকচক্র ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে শুরু করলো। ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ সিপাহীবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশের রাজ্যসীমা আফগানিস্তান পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলো। এ বিশাল ভারতের রাজধানী স্থাপিত হলো কলকাতায়।

www.pathagar.com

ব্যর্থ সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য ভারতে এক অভূতপূর্ব সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে নবাব ঘোষণা করে প্রদেশে প্রদেশে স্বদেশী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে ঝাঁসির রাণী গুরুত্বপূর্ণ সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্নভাবে সমন্বয়হীনতার কারণে সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হয় এবং এর দায়ভার মূলত বহন করতে হয় মুসলমান সমাজকেই। এই রাষ্ট্রীয় নিষ্ঠুর অত্যাচারের কারণে মুসলমান সমাজ অধঃপতনের শেষসীমায় নেমে আসে। পাশাপাশি ব্রিটিশের সহযোগি হিন্দু সম্প্রদায় বাংলার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন হতে থাকে। শুধু জমিদারিই নয় স্থানীয় প্রশাসন, চাকরিসহ সবধরণের সুবিধাই একচেটিয়াভাবে ভোগ করতে থাকেন উচ্চবর্ণের হিন্দুশ্রেণী এবং সমাজে আধিপত্যবাদীশ্রেণী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রশাসন তাদের ক্রীড়ণক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়।

বাংলা ছিল এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এর আয়তন ছিল ১ লাখ ৯০ হাজার বর্গমাইলের মতো। সে সময় লোকসংখ্যা ছিল ৮ কোটির মতো। আর যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা যায়। পাশাপাশি কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায় রাজধানীকে কেন্দ্র করে গোটা প্রদেশ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এমনকি কখনও কখনও ব্রিটিশ প্রশাসনকে শিখন্ডি হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করতে থাকে এই অভিজাত হিন্দু গোষ্ঠী। এ প্রেক্ষাপটে বঙ্গ দেশকে বিভক্ত করে, বঙ্গ-আসাম প্রদেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গ দেশকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেন।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে একটি প্রশাসনিক প্রদেশ এবং বাংলা ও আসাম নিয়ে অন্য একটি প্রদেশ, যার রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই নতুন বিভক্ত বাংলা ও আসাম প্রদেশের লোকসংখ্যার ৬০ ভাগ মুসলমান হওয়াতে হতদরিদ্র মুসলমানরা উপলব্ধি করেন নতুন এই প্রশাসনিক বিভাজনের ফলে তারা সর্বোতভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু কলকাতাকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্য চানক্যচক্রের কায়েমী স্বার্থের হোতারা তাদের শোষণের ও আধিপত্যের ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে বলে

www.pathagar.com

উগ্রমুর্তি ধারণ করে। হিন্দু জমিদার ও বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ মানুষের মধ্যে আবেগ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে এ নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বাংলার অঙ্গচ্ছেদন বলে গণসংগ্রামের পথ বেছে নেয়।

এখানে একটি ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন। কার্ল মার্কস তাঁর শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণে বলেছেন, 'শেষবিচারে মানুষ তার শ্রেণীস্বার্থের পক্ষেই অবস্থান গ্রহণকরে'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসন্দেহে একজন মানবসভ্যতার ধ্বজাধারী কবি। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের প্রশ্নে তিনি হিন্দু জমিদারশ্রেণীর অন্যতম প্রতিনিধি। হয়তোবা সে কারণেই তিনি কাশিম বাজারের রাজা শ্রী সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। অবশ্য এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন নবাব সলিমুল্লাহর ভাই নবাব আতিকুল্লা। আতিকুল্লার বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদানের কারণ অবশ্য ভিন্ন ছিল।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ প্রতিষ্ঠার পর তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন তার ঐতিহাসিক গান- 'এবার তোর মরা গাঙ্গে বান ডেকেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী'। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস হিন্দু জমিদারশ্রেণীর স্বার্থে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হয়। প্রকৃত অর্থে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার মত কোনো সংগঠনই তখন ছিল না।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে থাকেন নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়া অবহেলিত, অত্যাচারিত, দরিদ্র মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাই তিনি তরুণ এ কে ফজলুল হককে সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় একটি মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন। তিনি ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'নিখিলভারত মুসলিম লীগ'। তরুণ এ কে এফজুল হক সমগ্র ভারতের শিক্ষিত রাজনীতি সচেতন মুসলিম মনীষীদের এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে দাওয়াত করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে যা ছিল একটি অসম্ভব দায়িত্বসম্পন্ন উদ্যোগ।

অন্যদিকে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন দিকনির্দেশনার সৃষ্টি হতে থাকে। হিন্দু মনীষীগণ শিবাজীকে জাতীয় বীর ঘোষণা করে শিবাজী পূজা আরম্ভ। স্বদেশী আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুরু

www.pathagar.com

করে। কষ্টি পাথরের বিচারে এতে প্রমাণিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শেষপর্যন্ত মুসলমানাদের স্বার্থের প্রতি সামান্যতম সহানুভূতিও প্রদর্শন করতে পারেনি। মুসলিম মনীষীরা উপলব্ধি করেন ভারতের মুসলমানাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন পদত্যাগ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসন তাদের প্রশাসনিক অঙ্গীকার রক্ষায় দৃঢ়অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু দেশব্যাপী হিন্দু জমিদার ও বণিকশ্রেণী ব্রিটিশ নীতি-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও প্রভাব বিস্তারের কৌশল গ্রহণ করে। একদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি ব্রিটিশ পণ্য বর্জন। অন্যদিকে ব্রিটিশ নীতিনির্ধারণী ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের ত্রিমুখী কৌশল। যে কারণে ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এলে তিনি বঙ্গভঙ্গ বন্ধের ঘোষণা দেন এবং কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করেন। বঙ্গভঙ্গ রদ্ করে বিহার ও উড়িষ্যাকে বাংলা প্রদেশ থেকে আলাদা করেন।

পঞ্চম জর্জের এ দিল্লী সফর ও বঙ্গভঙ্গের ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন তার ঐতিহাসিক গান, "জয়হে জয়হে ভারত ও ভাগ্যবিধাতা।" বঙ্গভঙ্গের ঘোষণায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ভীষণভাবে হতাশ হয়ে পড়েন এবং ১৯১৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ-ভারতের রাজনীতিতে কলকাতার গুরুত্ব ক্রমেই কমে আসতে শুরু করে। অবশ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মধ্য দিয়ে কলকাতার গুরুত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালান। ১৯২২ সালে তার অকাল মৃত্যুতে এই উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। নতুন প্রদেশও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত হয়। ২৮টি জেলার সমন্বয়ে বাংলা প্রদেশ গঠিত হয় এবং জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মুসলমান। অর্থাৎ ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ৪ টি প্রদেশেই মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বঙ্গভঙ্গ রদ্ ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতের মুসলমানরা মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকেন। বিচক্ষণ মেধাবী রাজনীতিবিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৪০ সালে নিখিলভারত মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে দু'টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যার নাম ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। সেই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে ভারতকে ৩টি অংশে বিভক্ত

www.pathagar.com

করতে হবে। পশ্চিমে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং পূর্বে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কিন্তু পরবর্তী পর্যায় লাহোর প্রস্তাবকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে আখ্যায়িত করার বিভ্রান্তিকর প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান প্রস্তাব এক নয়। ১৯৪৬ সালে বিহারে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িতক দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলমান নিধনের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যোগ গ্রহণ করে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী এনে পাকিস্তান প্রস্তাব প্রণয়ন করেন। কিন্তু শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাব ছিল বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিত। 'শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা' গঠন করে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে মিলেমিশে বাংলার মানুষের উন্নয়ন করতে পারে।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ্ করা হলে বাংলার মুসলমানরা ভীষণ হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানাদের এ ক্ষুব্ধতার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা পরিদর্শনে এলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি নিজের জায়গা প্রদানের অঙ্গীকার প্রদান করেন। নবাব আব্দুল লতিফ তাকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাজ শুরু করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ফলে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করে কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা। এর কারণ হচ্ছে কলকাতায় বসবাসকারী হিন্দু জমিদারদের জমিদারি ছিল পূর্ববাংলায়। পূর্ববাংলার কৃষকপ্রজা মুসলমানদের রক্ত শোষণ করেই হিন্দু জমিদারদের বিলাস বহুল জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। স্বাভাবিক কারণেই জমিদারশ্রেণীর স্বার্থে তারা শিক্ষিত মুসলিম সমাজ সৃষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষপর্যন্ত সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। আজকের সুধীসমাজ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন, সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হলে আজকের বাংলাদেশের শিক্ষিত সুধীসমাজের উত্থানই সম্ভব হতো না। #

www.pathagar.com

একুশ আমাদের উজ্জীবিত আকাঙ্ক্ষা ও চেতনার উৎস

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ-ভারতের বিভক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের। যদিও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্বপাকিস্তান থাকার কথা ছিল না। কিন্তু ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবক্রমে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধনী এনে States-এর পরিবর্তে State নির্ধারণ করা হয়।

বাংলা প্রদেশের প্রধান দুই নেতা - নবাবজাদা খাজা নাজিমউদ্দিন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক মূলত মুসলিম লীগের রাজনৈতিক পরিমন্ডল থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছিলেন। মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতাদের মূলত উর্দুই ছিল পারিবারিক ভাষা। নবাবজাদা খান নাজিমউদ্দিন, নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, আই আই চুন্নিগর এমনকি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ভাষাও উর্দুই। কিন্তু পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বিশেষকরে পূর্বপাকিস্তানে বসবাসকারী মানুষের মাতৃভাষা বাংলা।

www.pathagar.com

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী থেকে যান কলকাতাতেই। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই বাংলা প্রদেশের মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারগুলোর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে পূর্বপাকিস্তানের জনগণের ভাব-আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করার মত কোনো নেতাই আর অবশিষ্ট থাকলো না।

মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে নবাবজাদা খাজা নাজিমউদ্দিনের গুরুত্ব মূলত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্‌র কারণেই। তিনি পূর্বপাকিস্তানের সাধারণ মানুষের নেতা ছিলেন না। সর্বোপরি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্বপাকিস্তানের জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বের উপেক্ষার কারণেই বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে, ইংরেজি ও উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এ উদ্যোগ মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জাতিসত্তাকে ধ্বংস করার এক দূরভিসন্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে সূচনালগ্নেই পূর্বপাকিস্তানের ছাত্রসমাজ এই জাতিসত্তা বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে। ১৯৪৮ সালে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন- 'উর্দু শেল বি দি স্টেট ল্যাংগুয়েজ অব পাকিস্তান'। তরুণ ও মেধাবী ছাত্রনেতা অলি আহাদ প্রথমে এ বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন - বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে। সেখান থেকেই ভাষাআন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

পর্যায়ক্রমে তমদ্দুন মজলিশ, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক, মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ, শ্রী মনোরঞ্জন ধর, আতাউর রহমান খান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমেদ, কমরেড মনিসিংহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ছাত্রসমাজের মধ্যে জনাব অলি আহাদ, কমরেড আব্দুল মতিন (ভাষামতিন), এড. গাজিউল হক ও এড. কাজী গোলাম মাহবুব এ আন্দোলনকে সমগ্র পূর্বপাকিস্তানের ছাত্র-জনতাসহ সর্বস্তরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী নেতৃত্ব উপলব্ধিই করতে পারেনি, পূর্বপাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষাকে গলাটিপে হত্যা করতে গেলে দেশের সর্বস্তরের জনগণ মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করবে। তারা ছাত্রসমাজের আন্দোলনকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নেয়নি।

www.pathagar.com

কারণ কায়েমী স্বার্থবাদী রাজনৈতিক শক্তি জনগণের মৌলিক অধিকার ও চেতনাকে সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ভাষার দাবিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত ও বানচাল করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু প্রতিবাদী ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে আসে। মিছিলে পাক স্বৈরাচার সরকারের পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে আসাদ, বরকত, রফিকসহ ছাত্রজনতার রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে যায়। তরপরও থেমে থাকেনি ছাত্রজনতা। মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যৌক্তিক পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। ভাষার দাবিতে শহীদ হয়ে এক গৌরবগাঁথা ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভাষা সৈনিকেরা বুকের রক্ত দিয়ে যে চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল তারই ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় মুক্ত স্বাধীন চেতনার চরম বহিঃপ্রকাশ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ।

১৯৫২-এর ভাষাআন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে দেশবাসির উপর। নূরুল আমিনসহ কায়েমী স্বার্থবাদী মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ক্রমাগতভাবে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। ফলে রাজনৈতিক পরিক্রমায় নতুন শক্তির পদচারণা শুরু হয় মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভারত থেকে পাকিস্তানে ফিরে আসেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকও রাজনীতিতে সক্রিয় হন।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতন হয়। ভাষাআন্দোলনের চেতনাকে মূলপুঁজি করে হক-ভাসানীর নেতৃত্বে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। যদিও হক-ভাসানীর নেতৃত্বে আস্থাশীল জনগণ পরবর্তীতে হতাশ হয়েছে নেতৃত্বের দুর্বলতা ও গোষ্ঠীপ্রীতির কারণে।

কিন্তু কৃষক শ্রমিক ছাত্র-জনতা নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছে। সংগ্রামের চেতনায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে একুশের মর্মবাণীকে বুকে ধারণ করে। আমরা সেদিকে লক্ষ্য করলেই অনুভব করতে পারি, একুশ পরিগণিত হয়েছে দেশবাসির ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার উৎস হিসেবে।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক একনায়ক সরকারের আবির্ভাব ঘটলে তার বিরুদ্ধেও একুশের চেতনাই হয়ে ওঠে পূর্বপাকিস্তানের জাতিসত্তা রক্ষা, গণতন্ত্র ও মুক্তির আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হিসেবে।

www.pathagar.com

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েও জাতীয় রাজনীতিতে গুণগত চেতনার বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। জনগণের বিরাট অংশ উপলব্ধি করতে থাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকে পূর্ববাংলার মানুষের মাতৃভাষা ও স্বাধীনসত্তা বিকাশের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং বাঙালির নিজস্ব ভাবধারা রক্ষা করা সম্ভব নয়। মূলত একুশের চেতনাই মানুষের মনে নতুন চিন্তা ও আশা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

সে কারণেই বহুবার ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে শহীদ মিনারকে। কিন্তু শহীদমিনার কোনো বাণিজ্যিক স্তম্ভ নয়। এর মূলে রয়েছে বাংলার ১৪ কোটি মানুষের বুকে লালিত বিশ্বাস ও গৌরবমন্ডিত জাতীয় চেতনা।

পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষার জন্য আত্মদানের নজির আর কোনো জাতির নেই। '৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে আন্দোলনের জন্য সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও যারা শহীদ হয়েছিলো সেটাকে ভাষাআন্দোলন মনে হলেও মূলত তা ছিল অন্যায়, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের ন্যায়ের সংগ্রাম। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পূর্ববাংলার মানুষের যে ঐতিহাসিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল তার বুনিয়াদ সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫২'র একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ভাষাআন্দোলনের পথ ধরেই। #

www.pathagar.com

ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও আজকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর বেগম খালেদা জিয়ার সরকার শাসনতন্ত্র অনুসারে কেয়ারটেকার সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে সামান্য আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয় বিচারপতি কে এম হাসানকে নিয়ে। একসময় তিনি বিএনপি'র সমর্থক ছিলেন বলে অভিযোগ আছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজকে নিয়েও অভিযোগ ছিল। সর্বোপরি ২২ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন ও সংঘাতময় পরিস্থিতির পটভূমিতে ১১ জানুয়ারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি নিজে প্রধান উপদেষ্টার পদ ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গর্ভনর ড. ফখরুদ্দিন আহম্মেদকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

এর মধ্যেই ৫৫তম একুশে ফেব্রুয়ারি নতুন চেতনা নিয়ে আমাদের সামনে সমাগত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে ২ ফেব্রুয়ারির বইমেলা উদ্বোধনের সময় প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দিন আহম্মেদ বলেছেন- ২১ আর ৭০-এর চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে। এ জন্য জাতিকে হতে হবে ঐক্যবদ্ধ। অর্থাৎ তিনি ২০০৭-এর একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাকে আখ্যায়িত করেছেন মূলত দূর্নীতি ও রাজনৈতিক অ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এ উপলব্ধিকে আমরা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

ওয়ান ইলেভেন-এর সরকারের সময় প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের যে সব নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের প্রায় সবাই উল্লেখিত রাজনৈতিক দল দু'টির গুরুত্বপূর্ণ নেতা। এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসছে সৎ ও যোগ্য রাজনেতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই অতিজরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত সময়োপযোগী জাতীয় দাবি হিসাবে বিচক্ষণতার সঙ্গে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই উদ্যোগের প্রতি সায় জানিয়েছিলেন। এমনকি তার নিজের শাসনকালসহ ২৫ বছরের দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ সম্পর্কে তদন্তের দাবিও তুলেছিলেন তিনি। তাঁর দলের মধ্যেও যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বা হচ্ছে তাদেরকে তদন্তের সম্মুখিন করলে কোনো প্রকার আপত্তি তুলবেন না বলেও তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেন।

এর পাশাপাশি শান্তিতে নোবেল বিজয়ী গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন - 'বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা আর্থিক লালসার কারণেই রাজনীতি করেন'। ড. ইউনুসের এ অভিযোগ সত্য হলে রাজনীতি ও ২১শে'র শহীদদের আত্মদানের গৌরবমন্ডিত বিষয়টিও কলঙ্কিত হয়ে যায়। অথচ তিনিও তখন নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করতে অন্তহীন চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

আমি ড. ইউনুস সাহেবকে প্রশ্ন করতে চাই- আপনি রাজনীতিতে আসতে চেয়েছিলেন কি উদ্দেশ্যে? অর্থলালসার কারণে নাকি দেশের সেবা করার জন্যে।

www.pathagar.com

আমি জানি না তিনি ঢালাওভাবে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যে সময় বক্তব্য দিয়েছিলেন তখন তিনি অতিরিক্ত উত্তেজিত ছিলেন কি না? আমরা যারা বাংলাদেশে রাজনীতি করি তাদের পক্ষ থেকে আমি ড. ইউনুস সাহেবের এ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেছিলাম তিনি রাজনীতিবিদদের মধ্যে শুধু কলুসতা আর দুর্নীতিই দেখেন। রাজনীতিবিদদের সেবা এবং আত্মত্যাগ দেখেননি। আমি ড. ইউনুসের মত একজন বিশ্বনন্দিত এনজিও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কোনো কঠোর মন্তব্য থেকে বিরত রইলাম। তবে তাকে রাজনীতি সম্পর্কে দু'টি কথা না বললেই নয় –

ড. মুহম্মদ ইউনুস সাহেবকে বলত হচ্ছে - তিনি রাজনীতিবিদ করমচাঁদ গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্ররঞ্জন দাস, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে কি বলবেন? ড. ইউনুস সাহেব - লালু, পাঞ্জু, ছাগল চোর ও ভূমি দস্যুদের রাজনীতিবিদ হিসেবে কল্পনা করে প্রকৃত রাজনীতিবিদদেরই কলসিত করছেন। এর অন্যতম কারণ হতে পারে রাজনীতি সম্পর্কে তার অজ্ঞতা।

তিনি দিল্লিতে গিয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন জনগণ চাইলে প্রয়োজনে তিনি রাজনীতিতে আসবেন। ঢাকা কিংবা বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই মহান উদ্যোগের ঘোষণা দিতে পারেননি। 'ভোরে উদিত সূর্যের প্রথম ঝলকেই বোঝা যায় দিনের আবহাওয়া কেমন যাবে'।

ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ ২১শের চেতনার কথা বলেছেন। কিন্তু ভুলে গেছেন ভাষাসৈনিক শ্রদ্ধেয় জননেতা অলি আহাদের নাম, ভুলে গেছেন কমরেড মতিনসহ সব ভাষাসৈনিকের নাম। কিন্তু এরাই ২১শের চেতনার উন্মেষ সৃষ্টিতে জীবন বাজি রেখে জাতির জয়গান গেয়েছিলেন।

মহান একুশের চেতনায় উজ্জীবিত দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই, রাজনীতিবিদরাই নন্দিত ও নিন্দিত হবেন। কারণ জনগণের প্রত্যাশা রাজনীতিবিদদের কাছেই। মহান ভাষাআন্দোলন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত

www.pathagar.com

জাতির সমস্ত সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন রাজনীতিবিদরাই। এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, আন্তর্জাতিক পরিসরে তার সাফল্য ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে মূলত গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই। গ্রামীণ ব্যাংকের বদৌলতেই তার এই নোবেল শান্তিপদক। আর এই গ্রামীণ ব্যাংকও প্রতিষ্ঠার জন্য অর্ডিনেন্স জারি করতে হয়েছিল একজন রাজনীতিবিদকেই।

২১শের চেতনা ও আজকের করণীয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথাও এসে গেছে। সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ৫৫তম ২১শে ফেব্রুয়ারির চেতনার মধ্যে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। দুর্নীতিবাজ, জাতীয় স্বার্থবিরোধী ভিনদেশী দালালদের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার পদচারণাই হোক একুশে ফেব্রুয়ারির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

লাখো কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হোক -

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
অমর একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি। #

www.pathagar.com

উপমহাদেশে মুসলিম জাতিসত্তা ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত স্বাতন্ত্র্যরক্ষা আন্দোলনের সিংহপুরুষ
নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াকু মানুষের মুক্তির অবিসংবাদিত নেতা
বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

মুক্তিরমন্ত্রে উজ্জীবিত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষক এবং উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা ও সমন্বয়ের রাজনীতির প্রবর্তক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান

www.pathagar.com

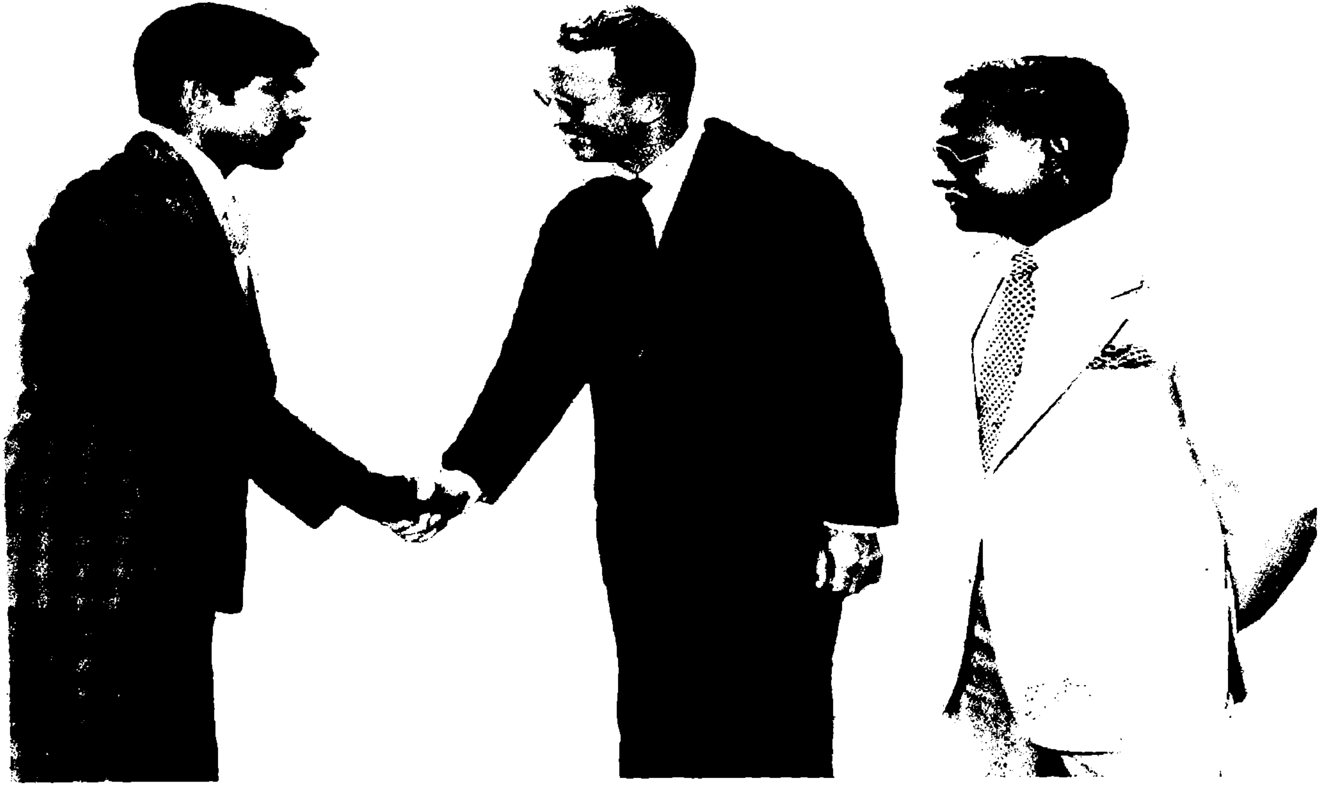

১৯৭৯ সালে ঢাকা বিমানবন্দরে বেলজিয়ামের রাজাকে অভ্যর্থনা জানানোর পর শেখ শওকত হোসেন নিলু'কে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান

www.pathagar.com

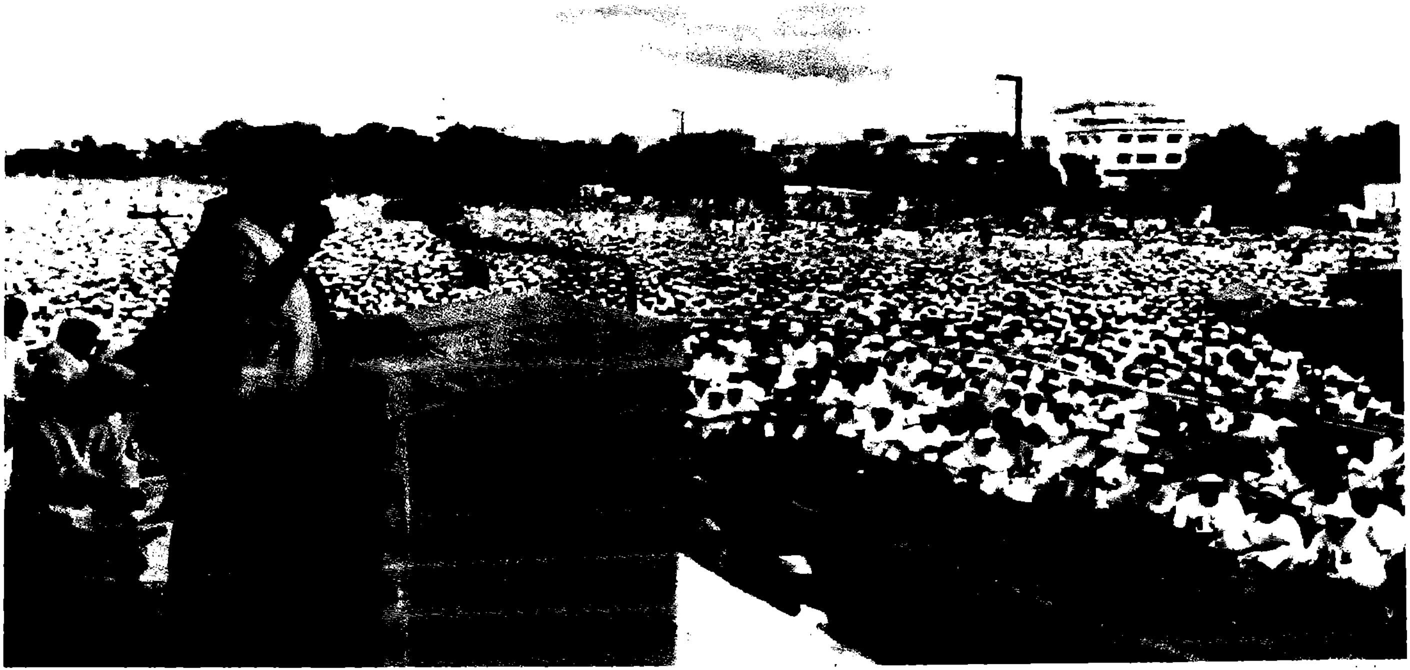

মানিক মিয়া এভিনিউতে তসলিমা নাসরিন বিরোধী আন্দোলনে তৌহিদী জনতার মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন শেখ শওকত হোসেন নিলু

www.pathagar.com

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকরত শেখ শওকত হোসেন নিলু

www.pathagar.com

পাকিস্তানের ফেডারেল মিনিস্টার মাহমুদ আলীর সঙ্গে ইসলামাবাদে শেখ শওকত হোসেন নিলু, ১৯৮০

চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেখ শওকত হোসেন নিলু
পাশে উপবিষ্ট বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর মেজর (অব.) শরিফুল ইসলাম ডালিম, ১৯৮০

www.pathagar.com

ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিল্ডিংএ এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব দ্য স্টেট ডিপার্টমেন্ট - মি. জন গ্যাস রাইটস্ এর সঙ্গে শেখ শওকত হোসেন নিলু, ২০০৬

ন্যাশনাল পিপল্স পার্টির আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন - জননেত্রী বেগম রওশন এরশাদ। তার বামপাশে উপবিষ্ট শেখ শওকত হোসেন নিলু

www.pathagar.com

উত্তর কোরিয়ায় একটি স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা বিপুল সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন শেখ শওকত হোসেন নিলু-কে, ১৯৮০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শুধুমাত্র শেখ শওকত হোসেন নিলুকে গ্রেফতার করতে শত শত পুলিশের এই সাঁড়াসি অভিযান, ১৯৯৯

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজি হেলেন ক্যাম্বল ও তার সহকারির সঙ্গে
বেলজিয়ামে - শেখ শওকত হোসেন নিলু, ২০০৫

www.pathagar.com

ম্যানচেস্টারের মেয়রের সঙ্গে শেখ শওকত হোসেন নিলু, ১৯৯০

ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে তখনকার রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস ও
ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর সঙ্গে - শেখ শওকত হোসেন নিলু

www.pathagar.com

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমানের সঙ্গে কুষ্টিয়া সীমান্তে
শেখ শওকত নিলু ও জননেতা খালেকুজ্জামান খান দুদু, ১৯৮০

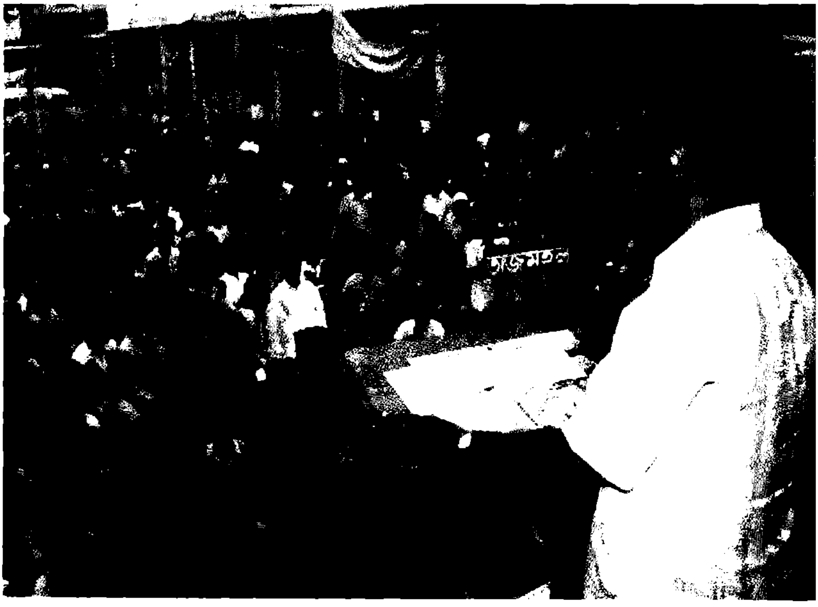

২০০৮-এর ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ঢাকার মিরপুর এলাকায়
একটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতারত শেখ শওকত হোসেন নিলু

www.pathagar.com

বেলজিয়ামের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটি টিমের সঙ্গে আলোচনারত
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও শেখ শওকত হোসেন নিলু

www.pathagar.com

রাজধানীর পূর্বানী হোটেলে পার্টির ইফতার পার্টিতে বা-দিক থেকে - ভাষা আন্দোলনের অগ্রনায়ক অলি আহাদ, শেখ শওকত হোসেন নিলু,
সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেইন মুহম্মদ এরশাদ, সাবেক রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ

www.pathagar.com

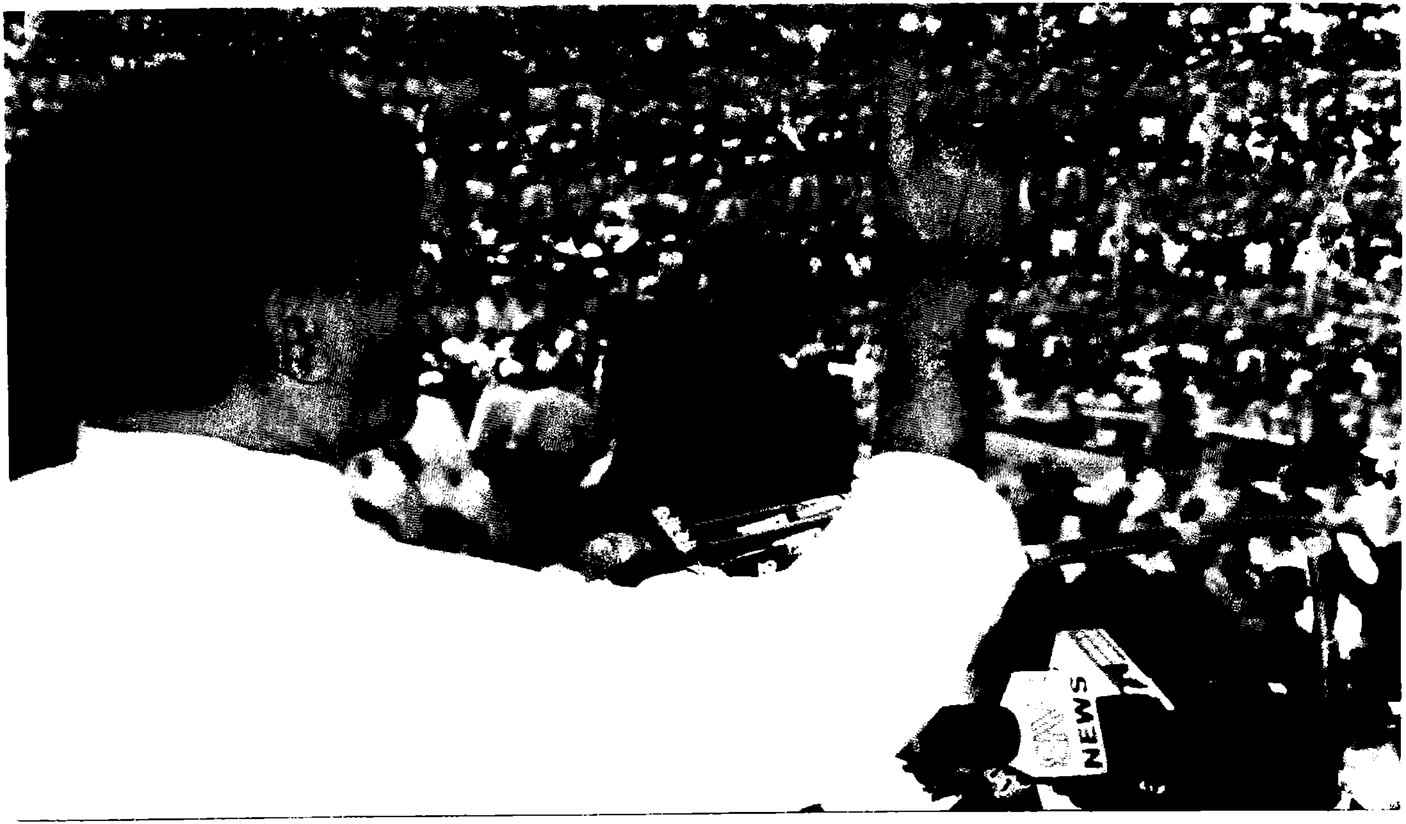

পল্টনে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখছেন শেখ শওকত হোসেন নিলু

www.pathagar.com

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ টি এম শামসুল হুদা'র সঙ্গে ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টির চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নিলু, সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য খালেকুজ্জামান খান দুদু ও মহাসচিব এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, ২০০৮

www.pathagar.com

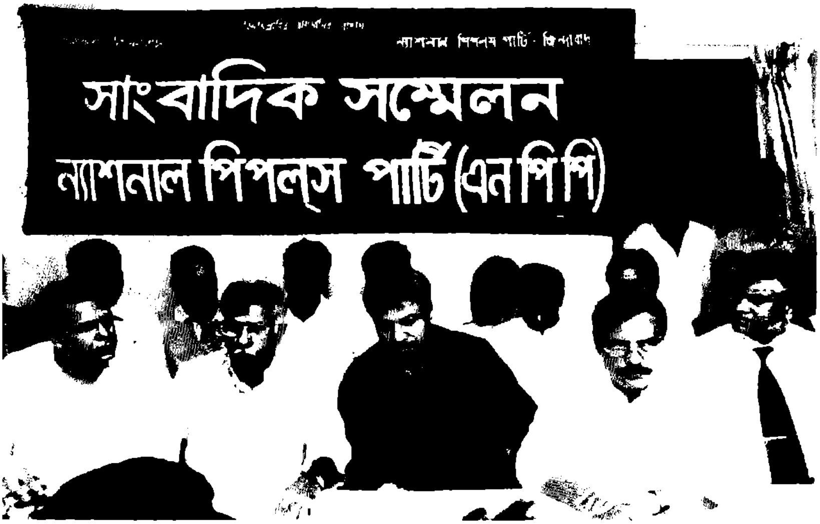

ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টির প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন ও পার্টির ঘোষণা
ডায়াসে পার্টির চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নিলু'র পাশে উপবিষ্ট মহাসচিব
এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ ও সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য খালেকুজ্জামান খান দুদু

ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন
পার্টির চেয়ারম্যান শেখ শওকত হোসেন নিলু, ২০০৮

www.pathagar.com

আনন্দঘন এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে দুই কন্যার সঙ্গে শেখ শওকত হোসেন নিলু

নাতনী এনিহা'র সঙ্গে শেখ শওকত হোসেন নিলু

www.pathagar.com

জাতীয় স্মৃতিসৌধে ন্যাশনাল পিপল্স মহিলা পার্টির পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য দিচ্ছেন মিসেস রাশেদা জামান, জেবি চায়না, মিসেস সালমা রহমান, কামরুন নেছা শিখাসহ পার্টির কেন্দ্রীয় মহিলা নেত্রীবৃন্দ, ২০০৭

খাগড়াছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম লং-মার্চের সময় শেখ শওকত হোসেন নিলু ও তার সহধর্মিনী মিসেস খায়রুন্নাহার খানম

www.pathagar.com

আমার পাকিস্তান, চীন ও উত্তর কোরিয়া সফর

১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে চীনে একটি যুবপ্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির ব্যবস্থাপনায়। সাবেক স্পীকার শ্রদ্ধেয় মির্জা গোলাম হাফিজ ছিলেন বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সমিতির সভাপতি। এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। আমার বন্ধু ওমর ফারুক খসরু ছিল মির্জা গোলাম হাফিজের খুবই নিকটজন। তিনি আমার নাম উত্থাপন করেছিলেন। যাওয়ার মাত্র ৫দিন আগে আমাকে অবহিত করা হয় এবং বলা হয় আমরা পাকিস্তান হয়ে চীন যাচ্ছি। এরই মধ্যে একদিন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আমাকে ও ওমর ফারুক খসরুকে ডাকলেন। মির্জা গোলাম হাফিজ ও ডিজি-এনএসআই শেখ আব্দুল হাকিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মির্জা গোলাম হাফিজ সাহেব আমাকে ও খসরু ভাইকে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ও শেখ আব্দুল হাকিম সাহেব আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হাকিম সাহেব কোনো কিছুই বললেন না। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই সব কিছু বললেন।

ঠিক হলো ঢাকা থেকে পিআইএ-এর ফ্লাইটে আমরা করাচি যাব। সেখানে তিনদিন থেকে রওয়ানা হব বেইজিং অর্থাৎ সে সময়কার পিকিং-এ। রোববার সকাল ৯টায় এয়ারপোর্টে উপস্থিত হলাম। তখন তেজগাঁও এয়ারপোর্ট চালু ছিল। আমার কিছু অতিউৎসাহী বন্ধু এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন। মোট ১৩ জন যুব সদস্য নিয়ে এই প্রতিনিধি দল। মরহুম এ কে ফিরোজ নুন, অধ্যাপক মাজেদুল ইসলাম, মিসেস রিতা রহমান ও মির্জা গোলাম হাফিজ সাহেবের ছেলে মির্জা এফরান বাবুও ছিল এই প্রতনিধি দলে।

www.pathagar.com

ভিআইপি লাউঞ্জ দিয়ে আমাদের প্লেনে তোলা হলো। লাউঞ্জে গিয়ে বসেছি। প্লেনে ওঠার সময় হয়েছে এমন সময় দেখি ডিজি-এনএসআই সেখানে উপস্থিত। লাগেজ পূর্বেই তোলা হয়েছিল প্লেনে। আমার সঙ্গে আছে ব্রিফকেস। হাকিম সাহেব আমাকে ডাক দিলেন। আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম তাকে দেখে। তিনি আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন – অত্যন্ত জরুরি। করাচি এয়ারপোর্টে কেউ একজন আমার সঙ্গে কথা বলবে। করাচি থেকে তার কথামত আমাকে কাজ করতে হবে। আমি রাষ্ট্রপতির মনোগ্রামযুক্ত খামখানা আমার ব্রিফকেসের মধ্যে রেখে দিয়ে ডিজি-এনএসআই সাহেবকে সালাম জানিয়ে প্লেনে উঠার জন্য রওয়ানা দিলাম।

সকাল ১১ টায় প্লেন ছাড়ল। ২ ঘন্টা ১৫ মিনিটের পথ করাচি বিমানবন্দর। আমরা পাকিস্তান সময় দুপুর সোয়া ১ টায় করাচি বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। বিমান থেকে নামার সময় বিমানের মুখেই দেখলাম একজন ভদ্রলোক তার হাতে ছোট্ট একটা প্লেকার্ড তাতে লেখা নিলু। আমি ভদ্রলোকের কাছে যেতেই তিনি বললেন - 'আমি পাকিস্তান সরকারের একজন অফিসার। আপনার জন্য ইসলামাবাদের অভ্যন্তরীণ টিকেট করা হয়েছে। আপনার সাথের অন্যরা করাচিতেই থাকবেন। আপনি স্বল্পসময়ের জন্য আমার সঙ্গে ইসলামাবাদ যাচ্ছেন।'

আমার মনে হলো পাকিস্তান এ্যাম্বাসির একটি অনুষ্ঠানে আমি তাকে দেখেছিলাম। পরে কনফার্ম হলাম তার নাম সরফরাজ খান। আমাদের অন্য সফরসঙ্গিরা থাকবেন করাচিতে রোববার থেকে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমরা বুধবার রাত ১০টায় এয়ার চায়নাতে করে বেইজিং-এর উদ্দেশে যাত্রা করবো। সরফরাজখান সাহেব আমাকে বললেন - আপনার লাগেজ ইসলামাবাদ নিয়ে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে। আমি ইসলামাবাদ যাচ্ছি এবং বুধবারের আগেই ফিরে আসছি। এই সংবাদটুকু শুধুমাত্র ওমর ফারুক খসরু ভাইকে দিলাম। তারা ইমিগ্রেশন চেকআপ শেষে হোটেলের উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো পিআইএ'র অভ্যন্তরীণ বিভাগে। প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় লাহোর, ইসলামাবাদ, পেশোয়ারসহ বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ প্লেন আছে।

এয়ারপোর্ট লাউঞ্জের মধ্যেই কফি হাউজ আছে। সেখানে বসে দু'জনে কফি খেলাম। সোয়া ২টায় প্লেনে উঠার ডাক এলো। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে প্লেনে উঠলাম। আড়াইটায় প্লেন ছাড়ে ছিল। করাচি থেকে ইসলামাবাদের উদ্দেশে। এখানেও ২ ঘন্টার প্লেন জার্নি। সাড়ে ৪টায় প্লেনটি ইসলামাবাদ এয়ারপোর্টে

www.pathagar.com

গিয়ে নামলো। ইসলামাবাদ এয়ারপোর্ট থেকে ইসলামাবাদ শহর প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে। এয়ারপোর্টের কাজ সেরে লাগেজ নিয়ে রওয়ানা দিলাম শহরের দিকে। করাচি ও ইসলামাবাদের আবহাওয়ার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান। নভেম্বর মাসে করাচির আবহাওয়া অনেকটা ঢাকার মতোই কিন্তু ইসলামাবাদে কনকনে শীত তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সে সঙ্গে প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস। ইসলামাবাদ এয়ারপোর্টের বাইরে এসেই বুঝলাম যে পোশাক পড়ে এসেছি তাতে চলবে না। এক মুহূর্তের মধ্যে নাক-কান হিমশীতল হয়ে এলো। দ্রুত গাড়িতে উঠলাম। সরফরাজখান আমার সাথে পিছনের সিটে উঠে বসলেন।

ইসলামাবাদ অত্যন্ত পরিপাটি একটি ছোট শহর। মূলত এক রাস্তার শহর। পাহাড়ের পাশ ঘেঁষেই পরিকল্পিতভাবে শহর গড়ে তোলা হয়েছে। পানির জন্য শহরের পাশেই একটি ড্যাম তৈরি করা হয়েছে। নামকরণ করা হয়েছে আইয়ুব ড্যাম। আমাদের গাড়ি একটি ছোট্ট দোতলা বাড়ির সামনে থামলো। দু'জন প্রহরী দ্রুত এসে গেট খুলে দিল। গাড়ির পিছন থেকে আমার লাগেজ নামিয়ে প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে আমাকে দোতলায় একটি রুমে নিয়ে গেল। সরফরাজখান আমাকে বিশ্রাম নেবার কথা বলে বিদায় নিলেন এবং আগামীকাল সকাল ১০টায় দেখা হবে বলে জানিয়ে গেল।

সামনের সিটে যে ভদ্রলোক বসে ছিলেন তিনি নিজেকে রেহান চৌধুরী বলে পরিচয় দিলেন। আমি গেস্ট হাউজে আমার জন্য নির্ধারিত রুমে প্রবেশ করলাম। রুমের ভিতর দু'টি সাজানো পরিপাটি খাট, ড্রেসিং টেবিল, টেলিফোন, টিভি আনুসঙ্গিক জিনসপত্র আমাকে বুঝিয়ে দিলেন গেস্টহাউজ কর্তৃপক্ষ। বিকেলে নাস্তা ও চা দেয়া হলো। জামাকাপড় পরিবর্তন করে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা ও চা খেয়ে নিলাম। গেস্ট হাউজের বয় এসে জিজ্ঞেস করলো রাতে কি খাবো। আমি বললাম বিশেষ কোনো পছন্দ নেই। ভাত হলেও ভাল, রুটি হলেও ভাল। কখন খাব জিজ্ঞেস করলে বললাম রাত সাড়ে ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে হলে ভাল হয়। রাতের বেলায় রুটি, মুরগি, দোপেয়াজি, বোরহানী ও ফল দেয়া হল। রুটিগুলো ছিল চমৎকার। রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ওঠে ৮টার মধ্যেই গোসল করে তৈরি হয়ে নাস্তা খেয়ে নিলাম। সরফরাজ খান আসলেন সকাল ৯ টার সময়। বাংলাদেশ এ্যাম্বাসি থেকে একজন অফিসার আসলেন। তিনি সেনাবাহিনীর সদস্য। সকাল ১০ টার সময় আর একজন অফিসার এলেন। সম্ভবত তিনি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রটোকল অফিসার। তিনি বললেন - সাড়ে ১০ টায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হবে।

www.pathagar.com

যে গেস্ট হাউজে ছিলাম সেখান থেকে ১০ মিনিটের পথ রাষ্ট্রপতি ভবন। আমাদের এ্যাম্বাসির লোকজন বললেন, রাষ্ট্রপতির প্রেরিত পত্রখানা কোথায়। আমি আমার ব্রিফকেসটা দেখালাম। তিনি বললেন, অন্য কোন কাগজপত্র থাকলে সেগুলো এখানেই রেখে যান। আমি ব্রিফকেসটি খুলে তার হাতে দিলাম। তিনি ব্রিফকেসটি খুলে সবকিছু গেস্ট হাউজে রেখে শুধুমাত্র চিঠির ঘামটা ব্রিফকেসে ভরে নিজেই ব্রিফকেসটি হাতে নিলেন। দু'টি গাড়িতে করে আমরা প্রেসিডেন্ট ভবনের দিকে রওয়ানা দিলাম।

১০টা ২৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করলাম। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভবন, ওয়াশিংটন হোয়াইট হাউজের আদলে নির্মিত। কিন্তু হোয়াইট হাউজের চেয়ে অনেক ছোট। প্রথমেই আমাদের একটি প্রশস্ত রুমে বসানো হলো। পরে অন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের একজন মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের এনএসপিসহ অন্য একজন কর্মকর্তা প্রেসিডেন্টের সামনে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত করা হল আমাকে ও বাংলাদেশ এম্ব্যাসির সেই আর্মি অফিসারকে। আমি এখন তার নামটি ঠিকভাবে মনে করতে পারলাম না বলে দুঃক্ষিত। তবে তিনি তখনকার কর্ণেল র‍্যাংকের কোনো অফিসার ছিলেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টসহ সকলেই দাঁড়িয়ে আমাদের অভিবাদন জানালেন। আমাদের কর্ণেল সাহেব আমার ব্রিফকেসটা খুলে আমাদের প্রেসিডেন্টের পত্রখানা আমার হাতে তুলে দিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে হস্তান্তরের ইঙ্গিত করলেন। আমি পত্রখানা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিলাম। তিনিসহ সকলে দাঁড়িয়ে পত্রখানা গ্রহণ করলেন। প্রেসিডেন্টের পাশের সোফাতে আমাকে বসতে দেয়া হল।

১০ মিনিটের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতকার শেষ হলে বিদায় নিলাম। পাকিস্তান সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী মাহমুদ আলী সাহেব আমাকে তার গাড়িতে উঠতে বললেন। আমাদের এম্ব্যাসির অফিসার আমার কাছে ও মাহমুদ আলী সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সরফাজ খানসহ অন্যরাও চলে গেলেন। আমাকে নিয়ে মাহামুদ আলী সাহেবের গাড়ী তার বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। মাহমুদ আলী সাহেব এক সময় ভাসানী ন্যাপের সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর সময় জনাব নূরুল আমিন পাকিস্তানের উপ-রাষ্ট্রপতি ও মাহমুদ আলী ফেডারেল মন্ত্রী মনোনীত হন। জুলফিকার আলী ভুট্টো শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করে তাকে

www.pathagar.com

ফেডারেল মন্ত্রীর মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি সাংবিধানিকভাবে মন্ত্রীর মর্যাদা পাবেন। সরকার পরিবর্তন হলেও মন্ত্রীর পরিবর্তন হবে না।

আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তিনি বলেন, দুপুরের খানা আমাকে তার সঙ্গেই খেতে হবে। তার বাড়ি ইসলামাবাদ পার্ক রোডে। এটা তার সরকারি বাড়ি নয়, নিজের বাড়ি। সরকার মন্ত্রী হিসেবে তাকে ভাড়া দেয়। তার বাড়িতে গিয়ে দেখলাম তিনি বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তাদের সবার নাম-ধাম আমার মনে নেই। তবে পাঞ্জাব ন্যাপের নেত্রী মিসেস কানিজ ফাতেমা,লে. জেনারেল গুল হোসেন, পাকিস্তান অবজারভারের ইসলামাবাদ ব্যুরো চীফ মি. মালিক, পাকিস্তান সিলেট কমিটির সভাপতি রাজা জাফরউল্লাহ খান, খাজা খায়রুদ্দিন সাহেবের বড় ছেলে এবং রাজা ত্রিবিদ রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি কারো সঙ্গে দেখা করতে চাই কিনা মোহাম্মদ আলী সাহেব জানতে চাইলেন। আমি বললাম ভুট্টো পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।

তিনি ভুট্টো পরিবারের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে কানিজ ফাতেমার সাহায্য চাইলেন। মাহামুদ আলী সাহেব আমার চীন যাওয়ার সময়সূচি তাকে অবহিত করলেন। কানিজ ফাতেমা বললেন, আজকের মধ্যে দেখা করানোর ব্যবস্থা করতে হলে তাকে এখনই করাচি চলে যেতে হবে। তিনি ১২টার প্লেন ধরে করাচি চলে গেলেন। আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো বিকেল ৩টার প্লেনে। মাহামুদ আলী সাহেব গাড়ি পাঠিয়ে তার এপিএস-কে দিয়ে আমার লাগেজ নিয়ে আসলেন। দুপুর বেলা আমরা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া সেরে ২ টার দিকে এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হলাম।

কানিজ ফাতেমা পাঞ্জাব প্রদেশ ভাসানী ন্যাপের সভাপতি ছিলেন এবং শ্রমিক রাজনীতির সাথেও জড়িত ছিলেন। ভুট্টো পরিবারের সঙ্গে মাহামুদ আলী ও কানিজ ফাতেমার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। মূলত জুলফিকার আলী ভুট্টোই মাহমুদ আলী সাহেবকে ফেডারেল মন্ত্রী করেন এবং শাসনতন্ত্রে এমনভাবে তার অবস্থান রাখেন যে, সরকার পরিবর্তন হলেও তাঁর মর্যদা অক্ষুন্ন থাকবে। সে কারণেই ভুট্টো সরকারের পতন হলেও মাহমুদ আলী সাহেবের অবস্থান ছিল অপরিবর্তিত।

সন্ধ্যার দিকে ইসলামাবাদ থেকে করাচি এয়ারপোর্টে এসে নামলাম। কানিজ ফাতেমা পূর্বেই করাচী বিমানবন্দরে আমার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। তার এক সহকর্মির গাড়ি থেকে আমরা ৭০ ক্লিফটন-জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাড়ির দিকে

www.pathagar.com

রওয়ানা দিলাম। বিমানবন্দর থেকে ক্লিফটন এলাকা বেশ দূর। প্রায় একঘন্টা লেগে গেল ভুট্টোর বাড়িতে পৌঁছতে। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নার মাজারের পাশ দিয়ে আমরা ভুট্টোর বাড়ির গেইটে থামলাম। তখন সময় সন্ধ্যা ৭টা। গেটে পিতল দিয়ে খোঁদাই করে লেখা আছে জুলফিকার আলী ভুট্টো বার-এট-ল। এই বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাবা শাহ নেওয়াজ ভুট্টো। তিনিও সিন্ধু প্রদেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং লারকানার নবাব ছিলেন।

কানিজ ফাতেমার সঙ্গে আগেই যোগাযোগ হয়েছিল। গেইট খুলে দিলে বাড়ির ভিতরে গাড়ি প্রবেশ করল। কানিজ ফাতেমা ও আমি ছিলাম পিছনের সিটে। আমরা একসঙ্গেই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমার পরনে ছিল কালো শ্যুট, সাদা শার্ট, কালো জুতা ও লাল টাই। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম সেই একই ড্রেস পরে। বাড়ির দরজা খুলতেই দেখতে পেলাম নুসরাত ভূট্টো ও বেনজীর ভুট্টোকে। নুসরাত ভুট্টো কানিজ ফাতেমাকে বোনজি বলে সম্বোধন করলেন। আমাদের ড্রইং রুমে নিয়ে বসানো হলো। ইরানি কার্পেট ও সুদৃশ্য ঝাড়বাতি দিয়ে ড্রইং রুম পরিপাটি করে সাজানো।

কানিজ ফাতেমা আমাকে নুসরাত ভুট্টো ও বেনজীর ভুট্টোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নুসরাত ভুট্টো একজন মধ্য বয়সী ছিপছিপে গড়নের রমণী। তিনি আমাকে বললেন - 'আমি ভেবেছিলাম আপনার অনেক বয়স। কিন্তু, এখন দেখতে পাচ্ছি আপনি বাচ্চা ছেলে।' বেনজীর ভুট্টো বলে ওঠল তুমি উনাকে আপনি আপনি করছো কেন? বাচ্চা ছেলে তুমি বলেই সম্বোধন কর। আমি আর চোখে তার দিকে তাকালাম। আমার তাকানোর ভঙ্গি দেখে সে হেসে ফেলল। ইতিমধ্যে কাজের লোক আমাদের জন্য নাস্তা নিয়ে আসলেন। নুসরাত ভুট্টো বললেন, রাত হয়েগেছে সেই বাংলাদেশ থেকে এসেছ নাস্তা আর চা খেয়ে যাবে তা হয়না। আমাদের সঙ্গে রাতের খানা খেয়ে যাবে।

মাত্র কয়েকদিন আগে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ছোট মেয়ের বিয়ের পানচিনি হয়েছে। সেই জন্য বাড়িতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের নাস্তা আমাদেরকে দেয়া হলো। আমরা তিনজন, নুসরাত ভূট্টো, বেনজীর ভুট্টো এবং তাদের দু'জন নিকটাত্মীয় শুধুমাত্র ড্রইং রুমে। পরে জেনেছি তাদের একজন জুলফিকার আলী ভুট্টোর ছোট বোন থাকে হায়দরাবাদে। আমরা হালকা মিষ্টিমুখ করলাম এবং গল্পগুজবে মেতে উঠলাম। কিন্তু, মূলত যে প্রশ্ন করার জন্য ভুট্টো পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলাম সেই প্রশ্ন করার জন্য অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছিলাম না। তবে সেই প্রশ্ন করেছিলাম-১৬ বছর পর।

আমি ঘুরে ঘুরে বাড়ির আঙিনা, ফুলের বাগান, দেয়ালের উচ্চতা দেখতে থাকলাম। বেনজীর ভুট্টো বুঝতে পারলেন, আমি তাদের বাড়ির কারোকার্য দেখতে চাচ্ছি। তিনি কাছে এসে সকল কিছু দেখাতে লাগলেন। তিনি আমাকে মি. নিলুর পরিবর্তে মি. হোসেন বলে সম্বোধন করলেন। এই প্রথম আমি তার দিকে ভালো করে তাকালাম। ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা শুকনো শুকনো মুখ, দুধে আলতা গায়ের রং এবং টানাটানা চোখ আর ছিপছিপে গড়নের এই মহিলাকে হালকা সবুজ স্যালুয়ার কামিজ পরিহিতা অবস্থায় অপূর্ব মনে হচ্ছিল। উপরে সাদা চুরিধারি দুপাট্টা মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচানো, পায়ে ছিল তার দুই ফিতার পাতলা স্যান্ডেল। ফিতার উপরে সম্ভবত ফল্‌স মুক্তার মতো কিছু একটা বসানো। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঐতিহ্যের গাম্ভীর্য নিয়ে তাকে মনে হচ্ছিল ইতিহাসের বিশ্ব সুন্দরী কল্পিত ক্লিউপেট্রার মত।

তিনি প্রথমে আমাকে প্রশ্ন করলেন, জেল খাটার কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি না। আমি আমার প্রথম জেল জীবনের পুলকিত অনুভূতির কথা তাকে বললে তিনি অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি বললেন - মাত্র এক সপ্তাহ আগে তিনি তার ছোট বোনের বিয়েতে যোগদানের জন্য জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আজ রাতে আবার গ্রেফতার হতে পারেন। তিনি আমার পড়ালেখার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম এ। তিনি বললেন, তার সাবজেক্টও ইতিহাস। জমে উঠল এভাবে আলাপচারিতা। ইতিমধ্যে ডাইনিং টেবিলে আমাদের ডাক পড়ল। ঘরোয়া পরিবেশে ৮ জন একসঙ্গে খেতে পারে এমন একটি ছোট ডাইনিং টেবিলের মাঝের চেয়ারটায় বসতে দেয়া হলো আমাকে। একটিতে বসলেন কানিজ ফাতেমা অন্যদিকে নুসরাত ভুট্টো। তার পাশের চেয়ারে বসলেন বেনজীর ভুট্টো। খাওয়ার সময় নুসরাত ভুট্টো পূর্বপাকিস্তানে তার পরিচিতজনদের খোঁজ খবর নিলেন। তিনি অলি আহাদ, কমরেড তোহা, মশিউর রহমান যাদু মিয়া ও মুসলিম লীগের কিছু নেতার খোঁজখবর নিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবার সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে বার বার তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক রাত পরে আমরা বিদায় নিতে চাইলাম। নুসরাত ভুট্টো আমাকে বললেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এই বিপদের সময় অনেক নিকটজনও দেখা করতে চায় না। আপনি সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। আবার বেনজীর ভুট্টো তার কথার মধ্যে বাধা

www.pathagar.com

দিয়ে বললেন, বাচ্চা ছেলেকে তুমি আপনি আপনি করছ দেখে আমার রাগ হচ্ছে। তিনি এমনভাবে কথা বললেন, আমরা সকলেই হেসে ফেললাম।

সকলকে বিদায় দিয়ে রাত ১২টার দিকে হোটেলে ফিরলাম। প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে ছিল শুধু ওমর ফারুক খসরু ভাই। তাকে সকল কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন - রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন আমাকে ও আপনাকে বঙ্গভবনে ডেকেছিলেন এবং এয়ারপোর্টে একমাত্র হাকিম সাহেবকে দেখেছিলাম তখনই বুঝেছিলাম কোনো একটা মিশন আছে। গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল বেলায় সবার সঙ্গে দেখা হলো। এ কে ফিরোজ নুন রসিক মানুষ। বহু ধরনের রং তামাসা করেন তিনি। ৪৮ ঘন্টা আমার নিরুদ্দেশের কথা জানতে চাইলেন। আমি নিরব রইলাম। খসরু ভাই শুধু মিটমিট করে হাসলেন। এভাবে হৈ-হুল্লা করে দিন কেটে গেল। রাত ৮টায় এয়ারপোর্টে রিপোর্ট করার কথা।

ফিরোজ নুন বায়না ধরলেন ভাত খাবেন। আমাদের জানা ছিল না পাকিস্তানে ভাত রান্না করা হয় ঘি দিয়ে। দু'-তিনজন বাদে সকলেই ঘি' মেশানো ভাত খাসির রেজালা দিয়ে খেলাম। রাত ১০টার সময় প্লেন ছেড়েদিল পিকিং-এর উদ্দেশে। রাত ১২ টা থেকে ঘি সিদ্ধভাত যারা খেয়েছিলাম সকলেরই পেট খারাপ করলো। অবশ্য প্লেনে ওষুধের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তারপরেও আমাদের সবার অবস্থাই বেসামাল হয়ে পড়েছিল। পরদিন সকালে পিকিং এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম। চীনে বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে মেজর ডালিম ও তার স্ত্রী এবং চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আমাদের অভিবাদন জানালেন পিকিং এয়ারপোর্টে।

নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের হোটেলে। সে সময় বিদেশী মেহমানদের জন্য একটি মাত্র হোটেল ছিল পিকিং-এর তিয়েনমিন স্কোয়ারের কাছে। সেখানেই নেয়া হলো আমাদের। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, শুধুমাত্র পরবর্তী কর্মসূচি জানিয়ে দেয়া হল। সমগ্র চায়নার নিয়ম হচ্ছে রাতের আহার সন্ধ্যা ৭টা মধ্যেই শেষ করতে হবে। চীনে আমাদের সফর সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমাদের জানতে হবে চীনের ইতিহাস ও সভ্যতার কথা। নৃতাত্ত্বিকভাবে চীনা জাতি হচ্ছে, মঙ্গোলিয়ান জাতিগোষ্ঠীর প্রধান অংশ। বহু উপধারা থাকা সত্ত্বেও মঙ্গোলিয়া, চীন, নেপাল, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া হয়ে জাপান পর্যন্ত এই বিশাল জনগোষ্ঠী একই নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ। প্রায় ২২/২৩শ' বছর আগ থেকে চীনারা সুসভ্য জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। আধুনিক চীনের ইতিহাসে তাং-রাজ বংশ ও শুভ-রাজং বংশের সময় চীনের উন্নয়ন সম্পর্কে বহু উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সময় মধ্য

www.pathagar.com

এশিয়ায় যাযাবর জাতিগুলো অত্যাচারী, আক্রমণকারী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার এই আক্রমণকারীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই চীনা রাজারা নির্মাণ করেছিল ঐতিহাসিক গ্রেটওয়াল যা পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম।

চীনা রাজ বংশগুলোর মধ্যে সাং বংশের রাজত্বকাল ছিল প্রায় ছ'শ বছর। এদের পরাজিত করে চাউ রাজ বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই চাউ রাজ বংশের সময়েই ঐক্যবদ্ধ চীন দেশের গোড়াপত্তন হয়। সাং বংশের যখন পতন হয় এবং চাউরা সমগ্র চীনে শাসনপ্রতিষ্ঠা করে তখন সাং রাজতন্ত্রের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাউ শাসন মেনে নিতে পারেননি। তার নাম ছিল কিৎসি। তিনি তার প্রায় পাঁচ হাজার অনুগামীদের নিয়ে চীন ত্যাগ করে কোরিয়াতে চলে যান এবং কোরিয়া উপ-দ্বীপের প্রতিষ্ঠা করেন।

উপরের ঐতিহাসিক তথ্যগুলো জানার জন্য আমাদের খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটির দরকার পড়ে না। কিন্তু এদের গোড়ার ইতিহাসটা একটু জেনে নিলে ভাল হয়। চীন ও ভারতবর্ষ হচ্ছে দু'বোনের মত। হিমালয়ের উত্তরে চীন ও দক্ষিণে ভারতবর্ষ। সে কারণেই চীন আমাদের দেশের সব কার্যকলাপের ন্যাচারাল পার্টনারে পরিণত হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে চীনকে খন্ড বিখন্ড করে ফেলার চিন্তা করা হয়েছিল। কিন্তু, চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা ছানিয়াত সেন, মাও সে-তুং, চৌ-এন-লাইয়ের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর চীন আবার একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্র হিসেবে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই চীন দেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল যুব চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। অপরূপভাবে সাজানো কেন্দ্রীয় যুব কমিটির পার্টি অফিস। আমাদের গাইড মিসেস লি, সুন্দর বাংলা বলতে পারতেন। চীনা যুব কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতাদের দু'একজন সুন্দর ইংরেজিতে কথা বলতে পারতেন স্বাভাবিকভাবেই। আমাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়। আমরা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন তাদের সামনে তুলে ধরলাম।

পরদিন আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সে-তুং এর মমি ও চৌ-এন-লাই'র মমি দেখাতে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও ডিফেন্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছিল। চীনা সাংস্কৃতিক অঙ্গণে অপেরা নাটক খুবই জনপ্রিয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের একটি ইতিহাস ভিত্তিক অপেরা দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এর পর

www.pathagar.com

চীনা শিক্ষা ব্যবস্থা দেখার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এ সময় ভারতে ক্ষমতাসীন হন মুরারজী দেশাই-এর জনতা পার্টি। ডাঃ স্বামী সুব্র মনিয়াম ছিলেন জনতা পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল। তিনিও একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে সে সময় চীনে এসেছিলেন। আমি হোটেলের যে রুমে থাকতাম ঠিক তার উল্টো দিকে থাকতেন স্বামী সুব্র মনিয়াম। অসাধারণ পন্ডিত মানুষ তিনি। তার প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন, লে. জেনারেল জেকব। তিনি ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন ইহুদি ধর্মাবলম্বী। তার সঙ্গে আমার দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। তিনি দাবি করতেন পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর বিজয়ে তিনিই মূল-কারিগর।

আমাদেরকে চীনের প্রাচীর দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এর নির্মাণ শৈলি ও কারিগরি কৌশল এতই নিখুঁত ছিল যার ফলে ৬টি ঘোড়া একসঙ্গে দেয়ালের উপর দিয়ে ছুটে যেতে পারে। চারশ গজ দূরে দূরে সেনা সদস্যদের থাকার জন্য পরিখার মত ব্যুহ নির্মাণ করা হয়েছে। সম্ভবত মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিগুলোর আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

আমাদেরকে হুয়াংহো নদী দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এক সময় এই নদীই ছিল চীনের দুঃখ দুর্দশার কারণ। উত্তর-পশ্চিমে মঙ্গোলিয়া সীমান্ত থেকে শুরু করে দক্ষিণে সাংহাই পর্যন্ত সারা চীন দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। চৌ-এন-লাই যখন প্যারিসে লেখাপড়া করতেন তখন তিনি যে মার্সিডিজ গাড়িটি ব্যবহার করতেন তা দর্শনার্থীদের দেখার জন্য যত্নসহকরে রাখা হয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে। প্রায় ১ মাস ১০ দিনের এ দীর্ঘ সফর থেকে চীনের সমাজ ও লোকাচারের অনেক নিদর্শন দেখার সুযোগ হয় আমাদের।

চীনের কমিউনিস্ট ব্যবস্থা দেখা ও বোঝার জন্য আমরা অতিবাহিত করেছিলাম ৭দিন। সবশেষে সাং হাই শহরে এলাম। যে হোটেলে আমাদের রাখা হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই হোটেলটিকেই রূপান্তরিত করা হয়েছিল মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের হেডকোয়ার্টার হিসেবে। এখানে আমাকে এবং ওমর ফারুক খসরুকে তিনঘন্টার জন্য একটি আলোচনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে চীনের পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন মি. চৌ নামে একজন বিচক্ষণ বৃদ্ধ ব্যক্তি। আমার মনে হয় তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূ-প্রকৃতি, নদী শাসন, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর মঙ্গলা সমুদ্রবন্দর প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর সর্বশেষ জ্ঞান দেখেআমি বিমোহিত হয়েছিলাম।

www.pathagar.com

আমি তাকে দু'টি জটিল প্রশ্ন করেছিলাম। এর একটি হলো সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেও চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চৌ-এন-লাই এর মতো একজন অভিজাত পরিবারের সদস্যকে কেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন- To run a country it needs art but reality is such that within a twinkle a person cannot acquire or achieve this art it needs time.

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে চীন সমর্থন করেনি কেন? এটা কি তাদের জাতীয় আদর্শের পরিপন্থি কাজ নয়? এই প্রশ্নের জবাব তিনি দিয়েছিলেন তার ভাষায় এভাবে - 'বাংলাদেশের মানুষের প্রবল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করে চীন। বাংলাদেশের মানুষের এই মনোভাবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে তারা। তবে আধিপত্যবাদী শক্তি ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশের জনগণের সে আকাঙ্ক্ষাকে ব্যবহার করে যে সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করেছে চীন এ অংশের বিরোধী। বাংলাদেশের মানুষ যখনই সম্প্রসারণবাদ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করবে চীন ও তার জনগণ সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়াবে।'

পরিশেষে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় বললেন - Pakistan is our trusted friend. ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে পিকিং এ খবর এলো আমরা ৭ সদস্য প্রতিনিধি দল নিয়ে উত্তর কোরিয়া সফরে যাচ্ছি। আমরা সাংহাই থেকে পিকিং-এ ফিরে এলাম। অধ্যাপক মাজেদুল ইসলাম, এ কে ফিরোজ নুন, ওমর ফারুক খসরুসহ ৬ জন ঢাকায় ফিরে এলেন। আমরা ৭জন রওয়ানা দিলাম উত্তর কোরিয়ার দিকে। উত্তর কোরিয়াতে সে সময় বাংলাদেশের কোন দূতাবাস ছিল না। পিকিং থেকেই উত্তর কোরিয়ার সব কার্যকলাপ পরিচালিত হতো। সে কারণেই পিকিং দূতাবাসের রাজনৈতিক সচিব মেজর ডালিম আমাদের সফর সঙ্গি হলেন। বিকেল ৩টায় পিকিং এয়ারপোর্ট থেকে রওয়ানা দিয়ে সাড়ে ৪ টায় পিয়ং ইয়ং বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। ১৯৮০ সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই চীনে অনুভূত হল ভীষণ শীত। এয়ারপোর্ট থেকে রাজধানী শহর প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে।

১৯৫০সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কোরিয়ায় যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে এতো বড় যুদ্ধ আর কোথাও হয়নি। মার্কিন বিমানবাহিনী সেখানে কার্পেট বোম্বিং করেছিল। একটি পুরো বাড়ি কোথাও অক্ষত ছিল না। অর্থাৎ নতুন করে গড়ে তুলতে হয়েছে উত্তর কোরিয়াকে।

www.pathagar.com

আমাদেরকে নিয়ে তোলা হলো রাজধানীর সবচেয়ে অভিজাত হোটেলে। তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে একটি নদী। কিন্তু জানুয়ারি মাসে নদীতে কোনো পানি নেই। শত শত শিশু নদীর উপর বরফের মধ্যে খেলাধুলা করছে। তারা কেউ শীতে খুব বেশি কাতর বলে মনে হচ্ছে না। বরং সবাই খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত। আমরাও নদীর পাড়ে গেলাম ও বরফের উপড় দিয়ে হাঁটাহাঁটি করলাম।

আমাদেরকে একটি শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে আমাদেরকে বিপুলভাবে অভিবাদন ও সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। যেমনটা একজন রাষ্ট্র নায়ককে জানানো হয়। কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি কিম-উল-সং এর সঙ্গে আমাদের সম্মানে ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। পরে কিম-উল-সং এর সঙ্গে তার গ্রামের বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম।

আমাদের দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ডিমার্গেশন লাইন যা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে বিভক্ত করে রেখেছে। একদিকে মার্কিন ও দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে অন্যদিকে উত্তর কোরিয়ায়ার সেনাবাহিনী। ডিমার্গেশন লাইনের দু'পাশে বড় বড় পাথর দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে ট্যাঙ্ক ও সাজোয়া বহর দ্রুত ছুটে আসতে না পারে। উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বললাম। তাদের মনোবল ও দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত ও বিমোহিত হয়েছিলাম। দেশপ্রেম ও দৃঢ়তা কাকে বলে উত্তর কোরিয়ার সেনাসদস্যদের না দেখলে তা বিশ্বাসও হতো না। একেই বলে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী।

ফিরে এলাম উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ং ইয়ং এ। পিয়ং ইয়ং থেকে যথাক্রমে বেইজিং, সাংহাই ও ব্যাঙ্কক হয়ে ঢাকায় ফিরলাম।

পাকিস্তান, চীন ও উত্তর কোরিয়া এই তিনটি দেশই এখন আণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে নিউক্লিয়ার্স ক্লাবের সদস্যরাষ্ট্রের মর্যাদায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এশীয় অঞ্চলে সামরিকশক্তির ভারসাম্য রক্ষায় এ ত্রিদেশীয় ঐক্যবদ্ধ অগ্রযাত্রার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। #

www.pathagar.com

জাতীয় পার্টিতে যোগদান

১৯৯৮ সালের ১০ নভেম্বর চট্টগ্রামের আউটার স্টেডিয়ামের জনসমাবেশ থেকে বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট আন্দোলনের সূচনা করে। কিন্তু ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনে ৭ দলীয় জোটের পরিবর্তে বিএনপি'র নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশ নিলে পিএনপি, জাগপাসহ আমরা জাতীয় পার্টির সঙ্গে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে ৫ দলীয় ইসলামী জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশ নেই। নির্বাচনে ৪ দলীয় জোট বিপুল বিজয় অর্জন করলে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ফলাফল প্রকাশের আগেই লন্ডন চলে যান। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন এক জটিল সঙ্কটময় পরিস্থিতির শিকার। দু'টি প্রধান রাজনৈতিক শক্তির উভয়েই এরশাদ সাহেবের সমর্থন চায়। পাশাপাশি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে বশে রাখার জন্য কৌশল হিসেবে তারা মামলা-হামলার খড়্গ তাঁর মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখে। ৫ দলীয় জোটের মধ্যে ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলন নির্বাচনের পরই আলাদা রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে। মরহুম জমির আলী মুসলিম লীগ নিয়েই রাজনীতি করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। আমি ও শফিউল আলম প্রধান রাজনৈতিকভাবে তখন অনেকটাই হতাশাগ্রস্ত। এরই মধ্যে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার লন্ডন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

www.pathagar.com

আমি লন্ডনে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবের নিকটাত্মীয় রওশন এরশাদের ছোটভাই মুর্শেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করি। তিনিই আমাকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ আমাকে একটি হোটেলে আসার অনুরোধ করেন। কাছেই হয়তোবা কোনো এক জায়গায় তিনি থাকতেন। নির্দিষ্ট সময়ে টিউবলাইন ধরে আমি হোটেলে উপস্থিত হই। দেশের সার্বিক রাজনৈতিক অবস্থার সকল খোঁজ খবর রাখতেন তিনি লন্ডনে বসেই। আমাকে তিনি বললেন - ছোট দল করে কি লাভ। আস সকলে মিলে জাতীয় পার্টিটাকে একটি বড় রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত করি। তিনি শফিউল আলম প্রধানকেও একসঙ্গে নিয়ে কাজ করার প্রস্তাব করলেন। আমি বললাম - দেশে ফিরে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।

ইতিমধ্যে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশে ফিরে আসলেন। আমিও দেশে ফিরে আসি। এরই মধ্যে আমি আমার দলের নেতা-কর্মিসহ শফিউল আলম প্রধান একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা করি। শফিউল আলম প্রধান ও আমি এই সিদ্ধান্তে উপণীত হই যে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবের সঙ্গে তার নেতৃত্বে রাজনীতি করা যায়। এ রকম অবস্থায় একদিন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ বি এম শাহজাহান আমাকে ফোন করেন। তিনি আমাকে ও শফিউল আলম প্রধানকে একসঙ্গে চা পানের আমন্ত্রণ জানালেন। সে মতেই একদিন আমরা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানীস্থ কার্যালয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসি। আলোচনা চলা অবস্থাতেই সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ অফিসে উপস্থিত হন এবং তিনিও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার সূত্র ধরেই সিদ্ধান্ত হয় আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করব। বন্ধু সাংবাদিক স্টালিন সরকার আমাদের ঐক্য প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অবশেষে ৯ জুলাই ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে ৩ দলের প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূলত আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের দল বিলুপ্ত করে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করি। এভাবেই আমাদের জাতীয় পার্টির রাজনীতির স্রোতধারায় নতুনভাবে যাত্রা শুরু হয়। জাতীয় পার্টির রাজনীতিতে প্রবেশের বহুপূর্বেই এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদারের সঙ্গে আমার গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

ক্ষমতাচ্যূত হওয়ার পর থেকেই বহুবার জাতীয় পার্টি ভাঙ্গনের কূপানলে পতিত হয়। এই ভাঙ্গন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় - শামসুল হুদা চৌধুরী-ডা. এম এ মতিন, কাজী জাফর-শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মিজানুর রহমান চৌধুরী-আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এবং ডা. এম এ মতিন-নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন

www.pathagar.com

ব্যাকেটভূক্ত জাতীয় পার্টির ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ সৃষ্টির মাধ্যমে। এ ভাঙ্গনের ফলে জাতীয় পার্টি দুর্বল থেকে আরো দুর্বলতর হয়ে পড়ে। জাতীয় পার্টির ইতিহাসে এ বি এম শাহজাহানই প্রথম ব্যক্তি যিনি পিএনপি ও জাগপা থেকে আগত এক ঝাঁক ত্যাগী, নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মিকে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করাতে সক্ষম হন। তিনিই জাতীয় পার্টিকে হীনস্বার্থান্বেষী শক্তির হাত থেকে মুক্ত করে কর্মিনির্ভর রাজনৈতিক দলে পরিণত করেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ বি এম শাহজাহানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি পার্টির চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় স্ত্রী বিদিশা এরশাদ। ফলে পার্টিতে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্বের কারণেই এক সময় এ বি এম শাহজাহান দলের মহাসচিবের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন।

নতুন মহাসচিব হিসেবে দয়িত্বপ্রাপ্ত হন এবিএম রহুল আমিন হাওলাদার। আমি পার্টির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কমিটির প্রেসিডিয়ামের সদস্য ও জাতীয় কৃষক পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হই। শফিউল আলম প্রধান প্রেসিডিয়াম সদস্য ও ছাত্র বিষয়ক সমন্বয়কারী মনোনীত হন। এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরী ও আনিসুর রহমান দলের ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হন। তখন দলের কোনো কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল না। অনেক চেষ্টার পরও তৎকালীন নেতৃত্ব অফিস নিতে ব্যর্থ হন। সে অবস্থায় শফিউল আলম প্রধানের তদারকিতে পুরানা পল্টনে দলের নতুন কেন্দ্রীয় কার্যালয় নেয়া হয়।

ঢাকায় দলের মহাসমাবেশ ডেকে দলকে গতিশীল ও সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রুহুল আমিন হাওলাদার, আমি, শফিউল আলম প্রধান, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, মরহুম আবু সুফিয়ান, অতিরিক্ত মহাসচিব আনোয়ার হোসেন, এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরী, অধ্যাপক ইকবাল হোসেন রাজু, জহিরুল ইসলাম জহির, আরিফ খান, এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ ও মোঃ আবদুল হাই মন্ডলসহ এক ঝাঁক নেতাকর্মি দলকে নতুন প্রত্যয় নিয়ে সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত হই। অবশ্য এর কিছুদিন আগ থেকেই সরদার আমজাদ হোসেন দলের কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকেন। কাজী জাফর আহমেদ বহুদিন অস্ট্রেলিয়ায় নির্বাসিত জীবনযাপন শেষে দেশে ফিরে তাঁর সহকর্মিদের নিয়ে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন।

এদিকে ১৮ বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, জিয়াউদ্দিন বাবলুও জাতীয় পার্টির রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে

www.pathagar.com

থাকেন। ২০০৫ সালের প্রথম দিকেই প্রকৃত অর্থে জাতীয় পার্টি একটি বিকল্প জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে দেশবাসীর সামনে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে।

মূলত জেলাগুলোকে সংগঠিত করার কাজে দলের মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদর ও শফিউল আলম প্রধানকে নিয়ে আমিই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে থাকি। অতিরিক্ত মহাসচিব হিসেবে দলের দুর্বলতম স্থানগুলোকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে আনোয়ার হোসেনের ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গঠনমূলক। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের জেলাতেই কাজ করতে পারেননি। কারণ এ জেলাতে তাঁর রাজনৈতিক গুরু শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়ি এবং রাজনৈতিক গুরুর প্রতি আনোয়ার হোসেন ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল।

জাতীয় পার্টির ৫ বছরের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে দু'টি ঘটনা আমার জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়ে আছে এবং থাকবে। এর একটি হলো জাতীয় কৃষক পার্টির মহাসমাবেশের পোস্টারে দলের মহাসচিবের নাম না দেয়া। এ আচরণ নিঃসন্দেহে শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ। যদিও প্রথমদিকে দলের মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার এর জন্য ভীষণ সংক্ষুব্ধ হন। কিন্তু কৃষক পার্টির সমাবেশকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতাও করেছিলেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে - আনোয়ার হোসেনকে দলের অতিরিক্ত মহাসচিবের পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান প্রসঙ্গে। আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে হয়তো এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি এড়ানো সম্ভব হতো। প্রধানত শাহ মোয়াজ্জেম সাহেবের উপর ক্ষুব্ধ হয়েই দলের চেয়ারম্যান এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে এটাও সত্য, আন্তরিকভাবে আমি চেষ্টা করলে আনোয়ার হোসেনের ব্যাপারে চেয়ারম্যান এরশাদের ভুল বুঝাবুঝির বিষয়টির একটা সম্মানজনক সুরাহা হয়ে যেতো। কিন্তু আমি সে নৈতিক দায়িত্ব পালন না করতে পারার ব্যর্থতা আমাকে এখনও বিশেষভাবে পীড়া দেয়।

চেয়ারম্যান এরশাদের নেতৃত্বে দলে যখন নবজাগরণের সৃষ্টি হতে থাকে ঠিক সে সময় কোনো এক অজানা মহল চেয়ারম্যানের দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর ভর করে দলের মহাসচিবকে বিভিন্নভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। আমরা যৌথভাবে দলের স্বার্থে মহাসচিব বিরোধী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে সক্ষম হই।

ইতিমধ্যে ৪ দলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ পর্যায়ে আসলে ২০০৭ সালের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে সকলেই ভাবতে শুরু করে এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ প্রায় সব মহলই রাজনৈতিক এই সিদ্ধান্তে উপনিত হন

www.pathagar.com

যে এরশাদের জাতীয় পার্টিই হবে জয়-পরাজয়ের প্রধান ফ্যাক্টর। ৪ দলীয় জোটের অন্যতম প্রধান শরিক দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ইফতার পার্টিতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও মহাসচিবকে দাওয়াত করেও ইফতার পার্টিতে জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দকে আসতে বারণ করেছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ। স্বাভাবিকভাবেই জামায়াতে ইসলামীও ৪ দলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মিদের অসন্তোষ ছিল তীব্র। কিন্তু এরপরও এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা ও অন্যান্য বিষয়গুলো ঝুলে থাকার জন্য কৌশলগত কারণেই আমরা ৪ দলীয় জোট সরকারের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে থাকি। আমার নিজের বিশ্বাস ও অভিমত ছিল জাতীয় পার্টি এককভাবেই নির্বাচনী লড়াই করবে। তবে প্রয়োজন হলে সমমনাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবে। আমার কাছে বিএনপিকেই জাতীয় পার্টির নিকটতম সমমনা রাজনৈতিক দল হিসেবে মনে হয়েছে।

বিএনপি'র উপর তলার নেতারা ২০০৭ সালের নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে তাদের পক্ষে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং জাতীয় পার্টির নেতৃত্বের একাংশকে বিএনপি স্বাভাবিক বন্ধু হিসেবে মনে করে (ন্যাচারাল ফ্রেন্ড)। সে অংশের নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন - বেগম রওশন এরশাদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, রাজিয়া ফয়েজ, আবদুস সাত্তার, আবুল কাশেম, মজিবুর রহমান, তাজুল ইসলাম চৌধুরী, মশিউর রহমান রাঙা, আবু সুফিয়ান, ব্রিগে. জে. মাহমুদুল হাসান প্রমুখ। দলের মহাসচিবের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল। তবে উপরোল্লেখিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মহাসচিবের দ্বিমত না থাকলেই জাতীয় পার্টিকে বিএনপি'র পক্ষে রাখা সম্ভব হতো।

কিন্তু কৌশলগত কারণে, তারা আমার সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন। এর সূত্রপাত হয় ২০০৫ সালের ভিয়েতনাম দূতাবাসের একটি অনুষ্ঠানে মেজর জেনারেল আব্দুর রহিম (ডিজি-এনএসআই)-এর সঙ্গে পরিচয়ের মধ্য দিয়ে। আমি তাকে আমার ভিজিটিং কার্ড দিতেই তিনি আমাকে বললেন – 'আমি তো আপনাকেই খুঁজছি।' তিনি আমার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার জন্য গুলশানে তাদের একটি অফিসে আমন্ত্রন জানান।

তার কথা মতো একদিন সকাল ৯ টায় গুলশানের একটি বাড়িতে আমি তার সঙ্গে দেখা করি। তিনি এরশাদ সাহেবের জাতীয় পার্টিকে আগামী নির্বাচনে পক্ষে রাখার জন্য তাদের কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। আমি প্রায় সববিষয়েই তার সঙ্গে একমত হই। শুধুমাত্র এরশাদকে চাপের মুখে রাখার জন্য

www.pathagar.com

তাঁরা যে কৌশল অবলম্বন করেন তার সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে আমি বলি – চাপ প্রয়োগ করে কাউকে পক্ষে রাখা অর্থহীন। বরং আস্থায় নিয়ে কাজ করলেই ফল ভালো পাওয়া যাবে। তিনি বললেন – এরশাদকে আস্থায় নেয়ার অর্থ তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদ, ৪০ টি সংসদীয় আসনের নিশ্চয়তা। যার মানে হচ্ছে জাতীয় পার্টি হবে সরকারের মূল চালিকা শক্তি। বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি তাতে রাজি হতে পারেননি। তিনি আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য বেগম জিয়ার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

তার দু'দিন পর সকাল ১০ টায় জেনারেল রহিম ও আমি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর বাসভবনে এক বৈঠকে মিলিত হই। জেনারেল রহিমকে একজন সহজ সরল স্বাধীনচেতা মানুষ হিসেবেই মনে হয়েছে।

প্রথম দর্শনেই বেগম খালেদা জিয়া আমাকে নিলু বলে সম্বোধন করলেন। এই আচরণে জেনারেল রহিমও আস্থার সঙ্গে সব বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করলেন। আলোচনার একপর্যায়ে বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "তিনি ভারতীয় টাটা কোম্পানিকে তাদের শর্তে বিনিয়োগের অনুমতি দেবেন না। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশের সব দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত ২৫ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে কাউকে গ্যাস দেয়ার শর্ত মেনে চুক্তি করলে একদিনের জন্য তা ব্যাহত হলে ক্ষতিপূরণের মামলা করে তারা বাংলাদেশকে বিপদে ফেলবে"। দ্বিতীয় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল - তারেক রহমানকে নিয়ে। জেনারেল রহিম বললেন, সরকারকে ও আপনাকে যারা আক্রমণ করতে চায় ও দেশবাসীর সামনে হেয়প্রতিপন্ন করতে চায় তারা তারেক রহমানকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করবে। বিরোধীদের জন্য এটি একটি সহজ পন্থা। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধবাদীরাও গহর আইয়ুবকে বেছে নিয়েছিলেন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে। ইন্দিরা গান্ধীকে যারা আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন তারা বেছে নিয়েছিলেন সঞ্জয় গান্ধীকে। এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যারা আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন তারাও বেছে নিয়েছিলেন, শেখ কামাল ও শেখ জামালের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের কৌশল। মানুষকে বিভ্রান্ত ও ক্ষুব্ধ করে তোলার এটাই সহজ পথ।

সেদিনের মতো আলোচনা এখানেই শেষ হয়। আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনি অফিসে চলে গেলেন। এর পূর্বে আমাকে জেনারেল রুমির সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ করলেন। জেনারেল রুমির সঙ্গে এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদারেরও যোগাযোগ ছিল। আর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের

www.pathagar.com

দ্বিতীয় স্ত্রী বিদিশা এরশাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল মেজর জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি তখন কুমিল্লার জিওসি। মাঝে মধ্যেই বিদিশা এরশাদ তার সঙ্গে দেখা করতে কুমিল্লা যেতেন। মাসুদউদ্দিন চৌধুরী ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখ্যার্জিকে বিদিশা এরশাদ তার ঘনিষ্ঠ আপনজন বলে উল্লেখ করে জাতীয় পার্টির রাজনীতিতে গুরুত্ব পাওয়ার চেষ্টা করতেন। যদিও এর পেছনে কিছুটা সত্যতাও ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাবেই তিনি এসব কথা বলাবলি করতেন। এর পাশাপশি দলের মধ্যে কিছু কূটিল ও জটিল লোক নিজেদের স্বার্থে বিদিশা এরশাদকে ব্যবহার করে সুবিধা নিতে চাইতেন। কিন্তু বিদিশা এরশাদের প্রতি তাদের সামান্যতম স্নেহ বা শ্রদ্ধাও ছিল না। আমার সঙ্গে বিদিশা এরশাদের সম্পর্ক ছিল চমৎকার। বিদিশা ও আমি উভয়েই সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখেই চলতাম (Respectable distance)। কিন্তু আমাকে তিনি বহুবিষয়েই সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন। আমার কাছে মনে হয়েছে বিদিশা এরশাদ ছিলেন সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ। তিনি যা বুঝতেন অকপটে তাই বলতেন। রাজনৈতিক কূটিলতা তিনি বুঝতেন না।

ইতিমধ্যে দলের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ৪ দলীয় শীর্ষনেতা কাজী ফিরোজ রশিদ মূল দলে ফিরে আসলেন। ঘনিয়ে আসতে লাগলো জাতীয় নির্বাচনের সময়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট রাজপথের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করতে লাগলো। এখানে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। 'আমাদের জাতীয় সম্মেলনে সৌজন্যমূলকভাবে বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনাসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। বেগম খালেদা জিয়াকে একটি প্রতিনিধি দল দিয়ে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যবস্থা করলেন দলের মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার।

আমার সঙ্গে শফিউল আলম প্রধান, আবু হোসেন বাবলা, মরহুম আবু সুফিয়ান ও গোলাম কিবরিয়া টিপু প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভূক্ত হলেন। বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে বৈঠকের ব্যবস্থা হলো। দলের পক্ষ থেকে রুহুল আমিন হাওলাদার বেগম খালেদা জিয়ার হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দিলেন। তিনি আমাদের চা পাণের আমন্ত্রণ জানালেন। আমরাও এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকলাম। প্রথমেই তিনি টেবিলের নিচ থেকে একটি ফাইল তুলে নিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন - এটা আপনাদের নেতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ফাইল। তাঁকে ঠিকঠাক মত কাজ করতে বলবেন। অন্যথায় তার জন্য আমার কিছুই করার থাকবে না। আমরা চুপ করে রইলাম।

www.pathagar.com

আমার কাছে মনে হলো, তিনি এরশাদ সাহেবকে ভয় দেখিয়ে বশে রাখতে চাইছেন। আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য ১৪ দলের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির কথা উত্থাপন করলে তিনি অত্যন্ত রুক্ষতার সঙ্গে বললেন, এবার আন্দোলন-ফান্দোলন চলবে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে পিটিয়ে ঠান্ডা করে দেয়া হবে। আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম - গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার প্রধানের মুখে ফ্যাসিস্টসুলভ কথাবার্তা শোভা পায় না ম্যাডাম। এও বললাম - ফ্যাসিস্ট আচরণ কোনোদিনই জয়লাভ করতে পারেনি। ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে সামনাসামনি এমন শক্ত কথা বলার জন্য রুহুল আমিন হাওলাদারসহ অন্যান্যরা গভীর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ৪ দলীয় জোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করার দিন দেশব্যাপী লগি-বৈঠা নিয়ে হানাহানি শুরু হলো। জাতীয় পার্টির মধ্যে কাজী জাফর আহমদ, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, জি এম কাদের, ফজলে রাব্বী চৌধুরী, তাজুল ইসলাম চৌধুরী ও শামীম ওসমানরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে মহাজোট গঠন করার জন্য কাজ শুরু করেছিলেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, বেগম রওশন এরশাদ, গোলাম মসি বিএনপি'র সঙ্গে যোগাযোগ ও দেন-দরবার করতে থাকেন। বিএনপি'র পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ করেন, তারেক রহমান ও লুৎফুজ্জামান বাবর। এর মধ্যে একদিন মেজর জেনারেল রুমি আমাকে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ করেন। মূলত তিনি একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে আমাকে যোগাযোগ করার কথা বলেন। আমি সে মোবাইলে ফোন করলে তারেক রহমান সাহেবের পিএস অপু টেলিফোন ধরেন এবং আমাকে হাওয়া ভবনে যাওয়ার অনুরোধ করেন। এভাবেই তারেক রহমানের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সূত্রপাত হয়।

বিএনপি'র মধ্যে বঞ্চিত গ্রুপ মনে করেন, তারেক রহমানই তাদের দুর্দশার জন্য দায়ী। তারা তারেক রহমান ও বাবরের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে অতি বাড়াবাড়ি বলে মনে করতেন। এরশাদের জাতীয় পার্টির সঙ্গে বিএনপি'র সফল নেগোসিয়েশন ব্যর্থ করে দিতে পরোক্ষভাবে তারাও ভূমিকা পালন করেন। এমনকি, মোসাদ্দেক আলী ফালু যিনি জিয়া পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি তিনিও তারেক রহমানের সাফল্য সহ্য করতে পারতেন না।

অন্যদিকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অবস্থা অনেকটা ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় সেরকম। সে কারণেই নিজেই সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে চান। এমনকি এরশাদ সাহেবের বিশ্বস্ত দলের মহাসচিবকেও এই ধরনের

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমঝোতার আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করেননি। আমি তারেক রহমান ও ডিজি (এনএসআই) মেজর জেনারেল রাজ্জাকুল হায়দার সাহেবকে এসব আলোচনায় দলের মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদারকে অন্তর্ভূক্ত করার অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার কথাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেননি। তাদের মূল বিবেচনায় ছিল রংপুর ভিত্তিক জাতীয় পার্টির এমপিগণ। সে ভাবেই রংপুরের এমপি'দের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে জাতীয় পার্টির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন বিএনপি নেতারা।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ৪ দলীয় জোট সরকার রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। কিন্তু আন্দোলনের মুখে বিচারপতি কেএম হাসান ক্ষমতা গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং পরিস্থিতি জটিলরূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। এটা সবারই জানা যে, ৪ দলীয় জোটের প্রধান দল বিএনপি এবং মূল নেতা বেগম খালেদা জিয়া। কিন্তু ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কি কারণে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে সমাবেশের আয়োজন করেছিল। তারা কি জানতো না, ১৪ দলসহ মহাজোট রাজপথে হানাহানি-রক্তারক্তির সুযোগ খুঁজছে। তাহলে তারা ৪ দলীয় জোট পরিহার করে এককভাবে সে হানাহানির মুখে সমাবেশের কর্মসূচি দিল কেন? আজও আমার কাছে তা বোধগম্য নয়।

ইতিমধ্যে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এক বিশাল টিম নিয়ে লন্ডনে যান। ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, জিয়উদ্দিন বাবলু, এইচএম গোলাম রেজা প্রমুখ সেই টিমে তাঁর সফরসঙ্গি ছিলেন। লন্ডন থেকে দেশে ফিরলে এরশাদ সাহেবকে বিপুলভাবে এয়ারপোর্টে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন। এরশাদ সাহেব সাংবাদিকদের বলেন, যাদের কাছে সুবিধা বেশি পাব তাদের সঙ্গেই জোট বাধবো। এয়ারপোর্টে শ্লোগান উঠে জোট জোট মহাজোট। ইতিমধ্যে বি. চৌধুরী ও কর্ণেল অলি আহমদের নেতৃত্বে নবগঠিত এলডিপি মহাজোটে যোগদানের ঘোষণা দেন। চার দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকও আওয়ামী লীগের সঙ্গে ৫ দফা চুক্তি করে মহাজোটে শরিক হন।

লন্ডনে যাওয়ার পূর্বে এরশাদ সাহেব বেগম রওশন এরশাদকে একটি পত্রের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি'র সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে যান। কিন্তু এয়ারপোর্টে নেমেই তিনি রংপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পথে পথে দলীয় সবাবেশে কোন্ জোটে যোগদান করা উচিৎ বলে জনতার কাছে জানতে চান। তিনদিন পর ঢাকায়

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডিয়ামের সভা আহ্বান করেন তিনি। সেদিন ছিল ১৮ ডিসেম্বর ২০০৬ সাল। প্রেসিডিয়ামের সভা শুরু হলে দলের মহাসচিব কাজী জাফর আহমদকে বক্তব্য দেয়ার অনুরোধ করলেন। কাজী জাফর আহমদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে মহাজোটে যোগদানের যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করলেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানালেন।

আমি দলীয় চেয়ারম্যানের কাছে নিজের অভিমত ব্যক্ত করার জন্য অনুমতি চাইলাম। চেয়ারম্যান অনুমতি প্রদান করলেন। আমি বললাম জাতীয় পার্টিকে আমি একটি জাতীয়তাবাদী ইসলামিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী দল হিসেবে মনে করি। এককভাবে জনতার রায় নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে দেশ ও জাতির সেবা করাই আমাদের লক্ষ্য। সে অবস্থার ব্যতিক্রম হলে, ফ্রন্ট রাজনীতিতে বিএনপি আমাদের মত ও আদর্শের নিকটতম রাজনৈতিক দল। ফ্রন্ট করতে হলে প্রথমেই আমাদের বিএনপি'র কথা বিবেচনায় নেয়া উচিত। আমি এও বললাম এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। সংখ্যাগরিষ্ঠদের অভিমতই গ্রহণযোগ্য এবং দলীয় চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

আমার বক্তব্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে বেগম রওশন এরশাদ বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন। তিনি এরশাদ সাহেবের দেয়া চিঠি পাঠ করলেন এং দেশে ফিরে তার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো কথা না বলেই মহাজোটে যাওয়ার ঘোষণাকে রাজনৈতিকভাবে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সিদ্ধান্তহীনভাবেই প্রেসিডিয়ামের সভা শেষ হয়। ইতিমধ্যে বেগম রওশন এরশাদের নেতৃত্বে রাজিয়া ফয়েজ ও মজিবুর রহমানকে নিয়ে আমি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে একাধিকবার দেখা করলাম। পরের দু'টি বৈঠকে যুক্ত হল ফকরুল ইমাম, এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ ও মাইনুদ্দিন ভূঁইয়া।

অন্যদিকে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বিএনপি'তে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। একপর্যায়ে তার সঙ্গে যুক্ত হন - রাজিয়া ফয়েজ, মুনসুর আলী সরকার, ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল প্রমুখ। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের সঙ্গে এরশাদের জাতীয় পার্টি, বি চৌধুরির এলডিপি, শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের ইসলামী ঐক্যজোটের সমন্বয়ে মহাজোট গঠিত হয়।

www.pathagar.com

নির্বাচনের জন্য আসন সমঝোতায় জাতীয় পার্টিকে ৫০, এলডিপি ২৯, ইসলামী ঐক্যজোটের মুফতি শহীদুল ইসলামসহ ৩টি (যে মুফতি শহীদুল ইসলামের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা নিজেই জেএমবি গঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন)।

৩ জানুয়ারি মনোনয়ন যাচাই-বাছাইয়ের শেষ দিন ও ৪ জানুয়ারি মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। জাতীয় পার্টি মহাজোটের ৫১ আসন পেলেও দেশের সব আসনেই মনোনয়ন জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন এরশাদ। যাচাই-বাছাইয়ের দিন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মনোনয়ন বাতিল হয়ে যায়। ফলে জাতীয় পার্টি নির্বাচন বর্জনের ডাক দেয়। সে ডাকের সঙ্গে প্রথমে এলডিপি ও পরে আওয়ামী লীগ অংশ নেয়। ৩ তারিখ রাতে বেগম রওশন এরশাদের নেতৃত্বে আমিসহ ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে 'হাওয়া ভবনে' দেখা করি। সিদ্ধান্ত হয় বেগম রওশন এরশাদ নির্বাচনের পক্ষে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন।

বিবৃতি প্রস্তুতের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয় এবং সকাল ১১ টায় বিবৃতি স্বাক্ষরের পর অন্যসব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। বেগম রওশন এরশাদের বিবৃতিটি প্রস্তুত করে নিয়ে আমি ও এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ সকাল সাড়ে ১০টায় তার গুলশানের বাসভবনে যাই। তিনি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। সকাল ১১ টায় বেগম খালদা জিয়ার সঙ্গে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ছিল। তবে সেদিনই মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। আমাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যাপারে বেগম রওশন এরশাদের সিদ্ধান্ত চাইলাম। তিনি বললেন একটু পরে জানাবেন। আমরা বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত থেকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। সাড়ে ৩টায় তিনি বললেন একটু পরেই জানাচ্ছি। এরপর তার সঙ্গে আর যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নি।

ইতিমধ্যে প্রশাসনের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (তাদের নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত রইলাম) আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করল। আগেও তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। আমরা তাদেরকে বললাম ২২ জানুয়ারির নির্বাচন হবে না। আপনারা আমাদের এ নির্বাচনে অংশ নিতে অনুরোধ করছেন কেন? তারা দু'জনই বলল, আমাদের দিকে তাকিয়ে ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়নের বিষয়টি চিন্তা করে, শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা রক্ষা করার স্বার্থে আপনারা এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন।

www.pathagar.com

অবশেষে ৫ জানুয়ারি হোটেল পূর্বানীতে আমরা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জাতীয় পার্টি (নিলু-ফরহাদ) নতুনভাবে যাত্রা শুরু করি। নির্বাচন কমিশন আমাদের প্রতীক বরাদ্দ করলেন 'আম'। এরশাদ সাহেব আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করলেন না। শুধুমাত্র দু'লাইনের একটি প্রেসরিলিজ পাঠালেন সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য। শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শেখ শওকত হোসেন নিলুকে দলের সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো।

জানুয়ারির ১১ তারিখে দেশে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে নতুন কেয়ারটেকার সরকার গঠিত হল। উপরোল্লেখিত দু'জনের একজন ছিলেন তখন বিদেশে। অন্যজনকে চাকরিচ্যুত করা হল। তিনি নিশ্চয় ইতিহাস খ্যাত হায়দারের মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন। তিনি হচ্ছেন - মেজর জেনারেল রাজ্জাকুল হায়দার।

মুহূর্তের মধ্যে রাজপথের সব আন্দোলন থেমে গেল। এমনকি কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য প্রত্যেক শুক্রবার বাদ জুম্মা যে দাবি উত্থাপন করা হতো তাও বন্ধ হয়ে গেল। #

www.pathagar.com

ইউরোপীয় ইউনিয়নের আমন্ত্রণ ও বেলজিয়াম সফর

২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাংলাদেশ আমেরিকান এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ তার দু'জন বিদেশী বন্ধু ও আমাকে একটি হোটেলে দুপুরে খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। দেশের সার্বিক পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এর মধ্যে একজন আমাকে বলল - তুমি তো বহুবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেছ কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কে তোমার কোনো প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। সম্ভব হলে একবার ইউরোপীয় ইউনিয়নভূক্ত দেশগুলো তোমার দেখা উচিত। আমি তাকে বললাম – ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে কখনো আমন্ত্রণ পেলে তখন দেখা যাবে।

সে মতে এ বছরেরই ২৪ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল আমাকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রথমে যেতে হবে বেলজিয়াম তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ২০ এপ্রিল দলের ভাইস চেয়ারম্যান এটিএম গোলাম মাওলা চৌধুরী ও যুগ্ম-মহাসচিব অধ্যাপক ইকবাল হোসেন রাজুকে সঙ্গে নিয়ে ২০ এপ্রিল রাত ৮টার এ্যামিরাটসের টিকেট সংগ্রহ করতে সক্ষম হই।

www.pathagar.com

আমার বড় দুলাভাই থাকেন লন্ডনে তাকে আগেই অবহিত করেছিলাম ২৩ তারিখে লন্ডনে পৌছব। কিন্তু ২২/২৩ তারিখে দুবাই-লন্ডন লাইনে ফ্লাইট কনফার্ম করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ২১ তারিখেই লন্ডন যেতে হল। বাসায়ও বলা ছিল ২৩ তারিখে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করব। ২০ তারিখ রাতেই আমার স্ত্রী ও দু'কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মেডিসিনসহ ছোটখাট নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী কিনে নিতে হলো। গভীর রাত পর্যন্ত আমার দু'মেয়ে লাগেজ গুছিয়ে দিল। সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যে ঢাকা এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং করতে হবে। জাতীয় কৃষক পার্টির অফিস সম্পাদক বাহারুল আলম বাহার ভাই ও জাতীয় যুব সংহতির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক এসএম আবুল বাশার সকাল ৬ টার মধ্যেই বাসায় এসে উপস্থিত হয়। তাদের দু'জনকে নিয়ে বিমানবন্দরের দিকে রওয়ানা হলাম।

আমার গন্তব্যস্থল লন্ডন হিথরো বিমানবন্দর। কিন্তু এ্যামিরাটসে বিমান পরিবর্তন করতে হবে এবং দুবাইতে দু'ঘন্টা যাত্রাবিরতি হবে। কিন্তু ঢাকা থেকে বিমান ছাড়তে এক ঘন্টা দেরি হওয়ার কারণে, দুবাইয়ে নেমেই দ্রুত বিমান পরিবর্তন করতে হল। বিমানবন্দরে অবস্থানের সুযোগ পাওয়া গেল না। পরিশেষে বিকেল ৬টায় হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। ইংল্যান্ডে তখন সন্ধ্যা হতো অর্থাৎ সূর্যাস্ত যাবার সময় ছিল সাড়ে ৮টা। সাড়ে ৬টায় বের হয়ে দেখলাম বিকেলের পড়ন্ত বেলা। বড় দুলাভাইয়ের বাসা হিথরো বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে। লন্ডন শহরের যেদিকে বিমানবন্দর অবস্থিত তার ঠিক বিপরীত দিকে। আগে থেকে বলা হয়নি, ইমিগ্রেশন পার হয়ে বড় দুলাভাইকে ফোন করলাম। ফোন রিসিভ করলেন বড়আপা। তিনি আমার কথা শুনে অবাক হয়ে বললেন - তোমাকে নিতে আসতেতো কমপক্ষে দু'ঘন্টা সময় লাগবে। কারণ তোমার দুলাভাই এখনও বাসায় আসেনি। ছেলেমেয়েরা কেউ বাসায় নেই। আমি বললাম আমাকে নিতে আসতে হবে না। আমি নিজেই চলে আসতে পারবো।

প্রথমে ভাবলাম ট্যাক্সিতে করে যাব। কিন্তু তাতে ৮০ পাউন্ড লাগবে। অথচ তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। এ অবস্থায় পাতাল রেলে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করি। লন্ডন শহরের পাতাল রেল যাতায়াত খুবই আরাম দায়ক। মাত্র একটি লাইন পরিবর্তন করলেই দুলাভাইয়ের বাসার একেবারে কাছে চলে যেত পারবো। খরচ হবে মাত্র ৫ পাউন্ড। তাই পাতাল রেলের টিকেট কিনে রওয়ানা হলাম। ডিস্ট্রিক লাইনে করে Holbon স্টেশনে নেমে সেন্ট্রাল লাইন ধরে Read-Brige স্টেশনে নেমে দুলাভাইয়ের বাসায় টেলিফোন করলাম। দুলাভাই ইতিমধ্যে বাসায় ফিরেছেন। আগেভাগে আমার আসার সঠিক তথ্য দিতে না পারার কারণে দুলাভাই অবশ্য আমার উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যা হোক, রাগ-অভিমান ভুলে

www.pathagar.com

তিনি খুবদ্রুত গাড়ি নিয়ে Read-Brige স্টেশনে এসে আমাকে তুলে নিলেন।

এ দিকে আমার বেলজিয়াম যেতে হবে লন্ডন থেকে ট্রেনে কিংবা গাড়িতে করে। ২৪ তারিখ সকাল ১০টায় আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সার্ক ইন-চার্জের সঙ্গে। সেমতে ২৩ এপ্রিলের মধ্যে আমাকে পৌঁছাতে হবে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে। এর আগে আমি কখনও বেলজিয়ামে যাইনি।

জাতীয় যুব সংহতির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আহাদ চৌধুরী আমাকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কো-অর্ডিনেটর সোহবান চৌধুরীর ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন। সিলেটের সেলিম চৌধুরী ও আহাদ চৌধুরী, আমার বেলিজিয়াম সফরের কথা অবহিত করেছিলেন সোবহান চৌধুরীকে। আমি লন্ডনে গিয়ে সোবহান চৌধুরী ও ফরিদ হাসানকে টেলিফোন করেছিলাম। ফরিদ হাসান থাকেন লন্ডন শহর থেকে প্রায় ২০০শ' মাইল দূরে। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। লন্ডন থেকে ব্রাসেলসে আমাকে যেতে হবে ট্রেনে করে। বড় দুলাভাইকে জিজ্ঞেস করলাম কোন স্টেশন থেকে বেলজিয়ামের ট্রেন ছাড়ে। তিনি সঠিক করে বলতে পারলেন না। বন্ধু আবদুস সালেকের ব্রীকলেনের অফিসে গিয়ে তাকেও জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না। তবে আন্তট্রেন ও বাস ছাড়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে। Alegate East থেকে district লাইন ধরে গেলাম Victoria স্টেশনের ইনফরমেশন সেন্টারে। সংবাদ নিয়ে জানতে পারলাম ভিক্টোরিয়া থেকে কোন ট্রেন ইউরোপের অন্য কোনো দেশে যায় না। Waterloo থেকে ইংল্যান্ডের বাইরের দেশগুলোতে ট্রেনে যেতে হয়।

ভিক্টোরিয়া থেকে আবার টিউব ধরে (ইংল্যান্ডের পাতাল রেলকে টিউব বলে) গেলাম Waterloo স্টেশনে। টিকিট কিনতে গিয়ে দেখলাম টিকেটের মূল্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের। আমি টিকেট মাস্টারকে বললাম - কমখরচে কি করে আপ-ডাউনের টিকেট পাওয়া যাবে। তিনি ২৩ তারিখে যাওয়া ও ২৮ তারিখে ফিরে আসার অফেরতযোগ্য টিকেট দিলেন। মূল্য ১১০ ইউরো। সোবহান চৌধুরীকে ফোন করে আমার বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে পৌঁছানোর সময় জানিয়ে দিলাম।

আমি আশা করেছিলাম তিনি আমাকে একটি হোটেল কিংবা মোটেলের সন্ধান দিবেন। কিন্তু তিনি বললেন, তিনি নিজেই আমাকে ব্রাসেলসে রেল স্টেশনে Received করবেন। এর আগে আমি জানতাম না যে তিনি ব্রাসেলসে থাকেন না। তিনি থাকেন ব্রাসেলস থেকে ৭০ মাইল দূরে নামুর নামে একটি শহরে। পূর্ব

www.pathagar.com

নির্ধারিত সময়ে Waterloo থেকে বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। রেলের গতিবেগ ঘন্টায় ২৬০ কিমি। সে হিসেবে Waterloo থেকে ব্রাসেলস পৌঁছাতে সময় লাগবে আড়াই ঘন্টা। ইতিমধ্যে সুড়ঙ্গ পথে পার হলাম ইংলিশ চ্যানেল। ৫ মিনিটের জন্য ফ্র্যান্সের একটি স্টেশনে থামলো ট্রেন। তারপর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

সোবহান চৌধুরী আগে থেকেই রেল স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমরা একে অন্যকে পাচ্ছিলাম না। শেষে একজন লোককে অনুরোধ করলাম সোবহান চৌধুরীকে ফোন করার জন্য। তিনি ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে সোবহান চৌধুরীকে পেয়ে গেলাম। তিনি আমাকে একটি স্থানে দাঁড়াতে অনুরোধে করলেন এবং ৫ মিনিটের মধ্যেই এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তার গাড়ির ড্রাইভার। ইউরোপ আমেরিকাতে সাধারণত সবাই নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে থাকে। কিন্তু সোবহান চৌধুরী নিজে গাড়ী ড্রাইভ করেন না। তার ড্রাইভার আমার লাগেজ নিজের হাতে তুলে নিলেন। চৌধুরী সাহেব আমার ব্রীফকেসটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন এখানে সামান্য নাস্তা করে তারপর রওনা হবো। আমি তাকে বললাম, একটি হোটেলে পৌঁছিয়ে দিলে ভাল হয় না? তিনি আমার উপর ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, আপনাকে হোটেলে থাকতে হলে আমাকে ৭০ মাইল গাড়ি চালিয়ে এই সাজ-সকালে রেল স্টেশনে আসতে হবে কেন? তিনি প্রথমে আমাকে একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীর দোকানে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের বাড়ি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানায়। ১৯৭৩ সালে বেলজিয়ামে এসেছেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম বাংলাদেশী। সেখান থেকে চললাম সোবহান চৌধুরীর বাড়ির দিকে।

অনেকেরই জানার কথা – জার্মান ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তীস্থানের একটি সরু দেশ হচ্ছে বেলজিয়াম। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে বেলজিয়াম নিজেকে নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু নাৎসী-হিটলার বেলজিয়ামকে নিরপেক্ষ থাকতে দেয়নি। তার সৈন্যবাহিনী বেলজিয়াম দখল করে ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করে এবং ডাইজিংক সমুদ্রবন্দর দখল করে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

কিন্তু হিটলারের বাহিনী বেলজিয়াম দখল করলেও যে অঞ্চলটির দখলে নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং যেখান থেকে স্বাধীন বেলজিয়ামের সরকার পরিচালিত হতো তার নাম Namur City। এই Namur City-তেই বসবাস করেন সোবহান চৌধুরী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ৬ বছরের মধ্যেও এ Namur City-'র পতন হয়নি। শান্তিবাদী বেলজিয়ামের রাজ পরিবার ও জনগণ সে সময় এখানে গড়ে তুলে

www.pathagar.com

ছিলেন এক অজেয় প্রতিরোধ। বিশাল ডেলামাইড পাহাড়ের নিচে গড়ে তোলা হয়েছিল সেনাসদর দপ্তর। শহরের গণ্যমান্য সকলেই চিনেন সোবহান চৌধুরী সাহেবকে। তার একটি রেস্তোরা, একটি গ্রোসারীর প্রতিষ্ঠান এবং ফোন ফ্যাক্সের দোকান আছে।

২৪ এপ্রিল সকাল ১০ টায় আমার সঙ্গে প্রথম ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেক্রেটারিয়েটে সার্ক দেশগুলোর প্রধান মিস এনিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে। যদিও ঢাকা থেকে সমস্ত কর্মসূচি প্রায় চূড়ান্ত করা হয়েছিল। মিস এনিয়ান একজন স্পেনের নাগরিক। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে তার পরিচ্ছন্ন ধারণা আছে। তার সঙ্গে কথাবার্তা শেষে ২৪ তারিখের কর্মসূচি শেষ হলো। তিনি আমাকে জানালেন, ২৬ এপ্রিল আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান ব্রাসেলসে আসছেন।

২৫ তারিখ আমার সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করা হলো ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সার্ক সাব-কমিটির প্রধান মিসেস নোনা কিং এর সঙ্গে। তিনি ইংল্যান্ড থেকে নির্বাচিত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য। বৈঠক হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্ট ভবনে মিসেস নোনা কিং-এর নির্ধারিত কক্ষে। আমি মিসেস এনিয়নকে অনুরোধ করলাম সোবহান চৌধুরীকে আমার সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত থাকতে। অনুমতি প্রদানের জন্য তিনি মিসেস নোনা কিং-এর সঙ্গে কথা বলে আমার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

২৫ তারিখ ১১টায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টে আমাদের নির্ধারিত বৈঠক। সকাল সাড়ে ১০ টার মধ্যে আমাদের উপস্থিত হতে হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্ট ভবনে। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলাম। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আগেই আমাদের নাম রিসিপশনে দেয়া ছিল। মিসেস নোনা কিং এর ব্যক্তিগত সচিব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাকে ও সোবহান চৌধুরীকে ৩য় তলায় মিসেস নোনা কিং এর কক্ষে নিয়ে গেলেন। সৌজন্য আলাপচারিতার পর শুরু হলো আনুষ্ঠানিক বৈঠক। প্রথমে তিনি জানতে চাইলেন আমাদের দলের অবস্থা। আমি আমাদের দলের বর্তমান ও অতীত সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলাম। তিনি আরো জানতে চাইলেন আমাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে। আমি বললাম আমরা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। সঙ্গত কারণেই আগামী সংসদ নির্বাচনে আমরা অংশ নেব।

www.pathagar.com

তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন - ২০০৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমার অভিমত কি। আমি বললাম, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টের ২০০৫ সালে গৃহিত রেজুলেশনে এর মধ্যে অনেক জায়গাতেই বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক অস্বচ্ছ অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কোন জায়গাতে নেতিবাচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে জানতে চাইলে আমি বললাম - বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অত্যাচার হচ্ছে এ বক্তব সঠিক নয়। কিছু কিছু রাজনৈতিক নিপীড়ন হয়তো হয়েছে কিন্তু কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। ..... আমি বললাম - মৌলবাদী শক্তির উত্থান হয়েছে বাংলাদেশে এ বক্তব্যের সঙ্গে আমি কোনক্রমেই একমত নই। কারণ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। আর সরকার ও প্রধান বিরোধীদলীয় পার্লামেন্টারী পার্টির নেতাও একজন মহিলা। ..... আমি বললাম – সন্ত্রাস হচ্ছে বাংলাদেশের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সমাজের প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে - শান্তি ও উন্নয়নের চেতনা। আমার যুক্তি তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। তবে কিছুটা বিস্মিত হলেন বলে আমার মনে হয়েছে।

মিসেস নোনা কিং বললেন – আমার সঙ্গে তোমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আগামীকাল বৈঠক আছে। তুমি একদিন বেলজিয়ামে থাকতে পারলে ২৭ এপ্রিল আমি, আমার কয়েকজন সহযোগি সংসদ সদস্যের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে পারতাম। আমি বললাম – ২৮ তারিখ পর্যন্ত আমাকে ব্রাসেলসেই থাকতে হবে। কারণ ২৮ এপ্রিল আমার সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের DG (External)-এর বৈঠক আছে সকাল সাড়ে ১০ টায়। তারপর আমি যাবো জার্মানিতে।

২৭ তারিখে সকাল ১০ টায় পুনরায় বৈঠকে বসলাম নোনা কিংসহ অন্য দু'জন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্ট মেম্বারদের সঙ্গে। তাদের একজন ফ্রান্স থেকে নির্বাচিত, অন্যজন স্পেন থেকে নির্বাচিত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্ট সদস্যরা প্রায় ১ ঘন্টা আমাদের দেশের সার্বিক রাজনীতি সম্পর্কে খুটিয়ে খুটিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত জানতে চাইলেন। ১১ টার সময় নোনা কিং এর ব্যক্তিগত সচিব আমাকে ও সোবহান চৌধুরীকে নিয়ে গেলেন অন্য একজন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্ট সদস্যের কাছে। ২০০৫ সালে গৃহিত রেজুলেশন সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি অন্যদের কাছে যা বলেছি তাকেও একই কথা বললাম।

www.pathagar.com

তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন - Yesterday I had a talk with your Foreign Minister, I could not understand who is represnting the Government.

I said our Foreign Minister is representing the Government and I am representing the country. তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন - আমার জার্মান সফরের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা? আমি বললাম - আমি ফ্রাঙ্কফোর্টে যাবো, তিনি বললেন - তুমি মিউনিক শহরও দেখে আসতে পার। যদি মিউনিক যাও তাহলে অবশ্যই হিটলারের গ্যাস চেম্বার দেখে আসবে। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি ও সোবহান চৌধুরী Namur City-র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পরদিন অর্থাৎ ২৮ তারিখ সকাল সাড়ে ১০টায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের DG (External) মিসেস হেলেন ক্যাম্বলের সঙ্গে আমার নির্ধারিত বৈঠক হবে। মিসেস হেলেন ক্যাম্বল দু'বার বাংলাদেশ সফর করেছে। বেগম খালেদা জিয়া, সাইফুর রহমান ও শেখ হাসিনার সঙ্গে বাংলাদেশে তার পরিচয় হয়েছে। বেলজিয়ামে পরিচয় হলো আমার সঙ্গে। তাকে সাহায্য করার জন্য দু'জন সহযোগী তার সব কথোপকথনই লিপিবদ্ধ করে নিলেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে তাকে বেশ সহানুভূতিশীল বলে মনে হলো। তিনি ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাউন্সিলারের কাছ থেকে আমার সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছেন। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্টে গৃহিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্পর্কে আমার দৃঢ় ও যুক্তিযুক্ত বক্তব্যকে প্রশংসা করলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম শেখ হাসিনা ও ১৪ দলের কেয়ারটেকার সরকার এবং নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে তার মূল্যায়ন কি? তিনি আমার প্রশ্ন শুনে মৃদু হাসলেন এবং বললেন - আগামীতে কেয়ারটেকার সরকারের মধ্যে কিভাবে তার নিজের লোকদের জায়গা করে দেয়া যায় এটাই মূলত তার আন্দোলন। অর্থাৎ নিরপেক্ষ প্রশাসনের পরিবর্তে তার পক্ষের লোকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য। বিদায় নেয়ার মুহূর্তে মিসেস হেলেন ক্যাম্বাল আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন - Be touch with me. আমিও Thank you very much বলে বিদায় নিলাম।

দুপুর দু'টার ট্রেনে করে রওয়ানা হলাম জার্মানির ফ্রাঙ্কফ্রোর্টের উদ্দেশে।

www.pathagar.com

ফ্রাঙ্কফ্রোর্ট পৌঁছে ফোন করলাম আমার ছোট বোনকে। সে থাকে মিউনিকে। আমার দু'ভাষী আমাকে অনুরোধ করল, মিউনিকে গিয়ে হিটলারের কনসেনটেশন ক্যাম্প দেখার জন্য। ফ্রাঙ্কফোর্টে জার্মান মিউজিয়াম দেখলাম এবং পরদিন মিউনিকের উদ্দেশে রওনা হলাম। বেলজিয়াম থেকে জার্মানিতে প্রবেশ করলেই যেকোন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবে জার্মানিরা একটি আলাদা জাতি। তাদের আচার-আচরণ, চেহারা দেহের গঠন সব কিছু মিলিয়ে মনে হবে তারা ইউরোপের অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র। আমি যখন মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে অবসর সময় কাটাচ্ছিলাম তখন আমার বাবা আমাকে পড়ার জন্য তিনটি বই দিয়েছিলেন। তার একটি এডলফ হিটলার রচিত ম্যাইনক্যাম্প, দ্বিতীয়টি কেনেডির এবং অন্যটি কাজী নজরুল ইসলামের নারী কবিতা। উল্লেখিত বই ৩টি আমি একেবারেই মুখস্ত করে ফেললাম।

জার্মানিতে পা দিয়েই হিটলার তার জাতি সম্পর্কে যা বলেছেন তা মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। সব জায়গাতেই হুবহু মিল আছে। শুধুমাত্র আঁতকে উঠলাম তখনই যখন মিউনিকে কনসেনটেশন ক্যাম্প দেখলাম। ১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই ক্যাম্পে রাজবন্দিদের গ্যাসচেম্বারে পুড়িয়ে হত্যা করা হতো। যুদ্ধের সময় এখানেই হাজার হাজার হিটলারের বিরুদ্ধবাদী ও ইহুদিধর্মাবলম্বীদের মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে হত্যা করা হতো। অতীত ইতিহাসে রাজা, বাদশা ও শাসকদের অনেক নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার নজির আছে। কিন্তু হিটলারের সুপরিকল্পিত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষ হত্যার এমন নিষ্ঠুর ইতিহাস আর দ্বিতীয়টি নেই। দেশের মধ্যে যে শাসক অত্যাচারী, বিশ্বসম্প্রদায়ের জন্যও তিনি হুমকিস্বরূপ। আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে মিউনিক কনসেনটেশন ক্যাম্প দেখে। #

www.pathagar.com

হাসিনা-লারমা'র সংবিধানবিরোধী কালোচুক্তি খালেদা-নিজামিরা গ্রহণ করেছেন কি?

পটভূমি

১৯৪৭ সালে যে অঞ্চল নিয়ে পূর্বপাকিস্তান গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঐতিহাসিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় - ত্রিপুরার মহারাজাও নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে। কিন্তু সে সময়কার মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা নাকি তাতে রাজি হননি। সে অতীত ইতিহাস নিয়ে লেখার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আমি বাংলাদেশের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ময়মনসিংহ থেকে জনাব নূরুল আমিন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে রাজা ত্রিদিব রায় জয়লাভ করেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময় তারা দু'জনেই পাকিস্তানে থেকে যান এবং স্বাধীনতার পর তারা বাংলাদেশে আসতে অস্বীকার করেন। শেখ মুজিবুর রহমান রাজা ত্রিদিব রায়ের এই মনোভাবে প্রচন্ডভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের বাঙালি বানানোর ভুল চেষ্টায় লিপ্ত হন। তিনি ভুলে যান বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বাংলা ভাষা-ভাষী ছাড়াও বহু উপজাতির বসবাস আছে। তাদের সবার জাতিসত্তা রক্ষা করা পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্ব। উপজাতি জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তা নির্মূলের সেই প্রচেষ্টা শুরুর মধ্য দিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সূত্রপাত হয়।

www.pathagar.com

আয়তনে এই অঞ্চল বাংলাদেশের ১০ ভাগের এক ভাগ। হাজার হাজার একর জমি বছরের পর বছর পতিত পড়ে থাকে। ১৯৭৮ সালের দিকে সন্দ্বিপ এক ভয়াবহ সামুদ্রিক ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। মেঘনা নদীর স্রোতপ্রবাহ সন্দ্বীপের পশ্চিমাংশে প্রচন্ড আঘাত হানে এবং সন্দ্বীপের দুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয়হীন-ভূমিহীন-গৃহহীন হয়ে পড়ে। এই জটিল পরিস্থিতিতে সন্দ্বীপের গৃহহীন জনগোষ্ঠীর একাংশ সরকারি পতিত পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয়গ্রহণ করে। যে সমস্ত অঞ্চলে এই নদী-ভাঙ্গা মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে সেসব জায়গায় আদিবাসীদের কোন বসবাস ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে রয়েছে বিশাল বনভূমি। মূল্যবান বনজসম্পদ বেষ্টিত এ বনভূমির রয়েছে বিশাল গুরুত্ব। সব্জি উৎপাদনের জন্যেও এ ভূখন্ড অত্যন্ত উপযোগী। স্বাভাবিকভাবেই কৃষিক্ষেত্রে অধিক দক্ষ জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। যার ফলে এ অঞ্চলে নতুন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতি সঞ্চার হয়েছে।

এ পটভূমিতে পার্বত্য চট্টগামের আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করার ফাঁদ পাতে একশ্রেণীর আধিপত্যবাদী শক্তির তাঁবেদারগোষ্ঠী। তারা বাংলা ভাষা-ভাষী ও আদিবাসীদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত সৃষ্টি করে। হানা-হানি ও রক্তক্ষরণের পথ বেছে নেয় ভিনদেশী এই কূটিল চক্রটি। এর ফলে নিরীহ মানুষ হত্যা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ সীমান্তের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে তারা সুবিধামত হামলা পরিচালনা করে। তারা বাংলাদেশের এই বিশেষ অংশকে রক্তাক্ত জনপদে পরিণত করার জঘন্য কর্মপন্থা গ্রহণ করে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও জনগণের নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে বহু দেশপ্রেমিক সেনাসদস্য নির্মমভাবে নিহত হয়। আমি সব শহীদ সেনাসদস্যসহ নিহত সকলের প্রতি জাতির পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নিকটাত্মীয় ও জাতীয় সংসদের চীফহুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্তু লারমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের দায়িত্ব প্রদান করে। একপর্যায়ে একটি সন্ত্রাসী গ্রুপের সঙ্গে সরকার জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তি নিঃসন্দেহে সংবিধানবিরোধী ও শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার পরিপন্থি। আমরা শেখ হাসিনা ও সন্তু লারমার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিটিকে একটি কালো চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেছি।

www.pathagar.com

১৯৯৮ সালে মাটিরাঙ্গাতে সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা বাংলা ভাষা-ভাষী এলাকায় প্রবেশ করে রাতের আঁধারে ৭ জন নিরীহ বাঙালিকে হত্যা এবং ১২ জনকে গুলিবিদ্ধ করে আহত করেছিল। এর প্রতিবাদে বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী এক বিরাট প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেছিল। সে সময়ের জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির প্রধান শফিউল আলম প্রধান, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের তৎকালীন প্রচার সম্পাদক আব্দুল কাদের মোল্লা ও আমি সে জনসভায় গিয়েছিলাম। নিহত ৭ জনের মধ্যে ৩ বছরের একজন বালক ও ১১ বছরের একটি বালিকাও ছিল। এই বালক-বালিকারা জানে না কি তাদের অপরাধ। কি কারণে তাদের এরকম নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমার মনে হয়েছে জন্মই যেন তাদের অপরাধ। কারণ তাদের পিতা-মাতা বাংলা ভাষায় কথা বলে এবং তারা মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য বাঙালি জাতীয়তাবাদের একমাত্র ধারক হিসেবে নিজেদেরকে জাহির করতে যারা প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন এবং বাঙালিত্বের প্রশ্নে যারা জীবন পর্যন্ত বিসর্জনে সদাপ্রস্তুত রয়েছেন বলে জোরপ্রচারণা চালাচ্ছেন রাঙ্গামাটির এ নির্মম নাৎসী হত্যাকান্ডের পরও তাদের রহস্যজনক নিরবতার তাৎপর্য অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। জঘন্য এ হত্যাকান্ডের ব্যাপারে তারা একটি কথাও বললেন না কেন? এ প্রশ্ন দেশবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এমনকি যারা ভূমিহীন মানুষের জন্য ভূমির অধিকারের দাবিতে সোচ্চার সে বামপন্থি রাজনীতিবিদদের ইতিহাসের এ নৃশংস হত্যাকান্ডের পরও মুখে কুলুপ এঁটে রাখার রহস্য কি?

আমি সে সব প্রশ্নে যাব না। আমি শুধুমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে অতীত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কারণ ক্ষমতার চার দেয়ালের মাঝে থেকে অনেকেই অতীত ভুলে যায়। ১৯৯৭ সালের ১০ নভেম্বর চট্টগ্রামের আউটার স্টেডিয়ামে লক্ষ লক্ষ জনতাকে সামনে রেখে ৭ দলের কাঠামো গঠন করা হয়েছিল। দলগুলোর নাম ঃ

> "০১. বেগম খালেদা জিয়ার- বিএনপি ০২. অধ্যাপক গোলাম আজমের- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ০৩. কাজী জাফর আহম্মেদ-শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন-এর জাতীয় পার্টি, ০৪. অলি আহাদের- ডেমক্রেটিক লীগ, ০৫. এস এম সোলায়মানের - কৃষক-শ্রমিক পার্টি (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স-এনডিএ), ০৬. শফিউল আলম প্রধানের- জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি, ও ০৭. আমার নেতৃত্বাধীন - প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল।"

www.pathagar.com

এ ৭-দলের একটি লিঁয়াজো কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিএনপি'র সাবেক মহাসচিব ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার এই লিঁয়াজো কমিটির অঘোষিত সভাপতি ছিলেন এবং সমন্বয়কারী ছিলেন প্রয়াত জনাব আনোয়ার জাহিদ।

দেশের রাজনৈতিক মহল যখন অবহিত হতে থাকে শেখ হাসিনা-সন্তু লারমা'র সঙ্গে সংবিধানবিরোধী কালো চুক্তি করার হীনষড়যন্ত্র করছে তখন ৭ দলীয় লিয়াঁজো কমিটি সিদ্ধান্ত নিল যেদিন এই চুক্তি স্বাক্ষর হবে সেদিনই দেশব্যাপী প্রতিবাদ হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের দিন প্রতিবাদ হরতাল কর্মসূচি আহ্বান করা হয়নি। পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হল ৯ জুন পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে লংমার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

লিয়াঁজো কমিটিতে জনাব আনোয়ার জাহিদ বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিলেন একমঞ্চ থেকে বেগম খালেদা জিয়া'র নেতৃত্বে ঢাকা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে লংমার্চ পরিচালিত করার জন্য। কিন্তু বিএনপি'র একটি অংশ জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন আমির অধ্যাপক গোলাম আজমের সঙ্গে একসঙ্গে উঠতে বাঁধা প্রদান করে। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয় ৮ জুন দু'জায়গা থেকে লংমার্চ শুরু হবে। অন্য ৫ (পাঁচ) দলের নেতারা দু'জায়গাতেই ভাগ হয়ে উপস্থিত থাকবেন এবং বক্তব্য দেবেন। বিএনপি পল্টন ময়দানে এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ রমনার বটমূল থেকে যাত্রা শুরু করবে। সকাল ৯ টায় শুরু হয় লং-মার্চের কর্মসূচি। অলি আহাদ সাহেব বার্ধক্যজনিত কারণে উপস্থিত হতে পারেননি।

কাজী জাফর আহমদ, শফিউল আলম প্রধান ও আমি পল্টন ময়দানে নেতা-কর্মিসহ উপস্থিত হই। বিএনপি'র সিদ্ধান্ত ছিল শুধুমাত্র দলীয় প্রধানরাই সভা শুরুর পরে বক্তব্য দেবেন। সংসদ সদস্য মেজর (অব) আক্তারুজ্জামান সভা পরিচালনা করেছিলেন। তিনি প্রথমেই আমার নাম ঘোষণা করলেন। আমার বক্তব্য শেষ হতেই বেগম খালেদা জিয়া তার নাম ঘোষনার নির্দেশ দিলেন এবং লংমার্চ শুরুর ঘোষণা দিলেন। মূলতঃ বক্তা ছিলাম আমি ও বেগম খালেদা জিয়া। কাজী জাফর আহমেদ-শফিউল আলম প্রধান ও আমার একই গাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ শফিউল আলম প্রধান সড়ক পথ পরিহার করে আকাশ পথে চট্টগ্রামে পৌছলেন। এটিএম গোলাম মওলা চৌধুরী, আলহাজ্ব নূরুল আমিন সরকার, শেখ আলমগীর হোসেনসহ আমরা কাজী জাফর আহম্মেদের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ খানা মাইক্রোবাস নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশও প্রায় ১৫০ খানা বিভিন্ন ধরনের গাড়ি নিয়ে একই সঙ্গে রওয়ানা হল। বিএনপি'র গাড়ি বহরে প্রায় ৭শ' গাড়ি ছিল। রাস্তার দু'পাড়ে হাজার হাজার জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। গাড়ী বহরের বাইরেও জনতার শ্লোগান

www.pathagar.com

ছিল হাসিনা-সন্তু লারমার কালোচুক্তি মানিনা-মানবোনা। ধীরগতিতে গাড়ি বহর এগিয়ে চলছে চট্টগ্রাম মহাসড়ক ধরে। কিন্তু কাঁচপুর ব্রিজের আগেই গাড়িবহর থামিয়ে দেয়ার জন্য শামীম ওসমান ও জেনারেল শফিউল্লাহ'র নেতৃত্বে সন্ত্রাসী বাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে। চূড়ান্তশক্তি নিয়ে তারা লং-মার্চের গতি থামিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে।

বেগম খালেদা জিয়া আশ্রয় গ্রহণ করলেন একটি পেট্রোল পাম্পে। মহাসড়ক বন্ধ হয়ে গেল। আমি এবং কাজী জাফর আহম্মেদ একই গাড়িতে ছিলাম। প্রায় দু'ঘন্টা চলতে থাকল চরম উত্তেজনা। জামায়াতে ইসলামীর সহকারি মহাসচিব মুহম্মদ কামারুজ্জামান ও তৎকালীন প্রচার সম্পাদক আব্দুল কাদের মোল্লা দু'টি মোটর সাইকেলে করে বেগম খালেদা জিয়া যেখানে ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। তারা এ দু'টি মোটরসাইকেল পাঠিয়ে দিলেন কাজী জাফর আহম্মেদ ও আমাকে বেগম খালেদা জিয়া যেখানে আছেন সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিএনপি'র নীতিনির্ধারণী ব্যক্তিদের মধ্যে বেশির ভাগই লংমার্চের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে পরের দিন হরতালের কর্মসূচি ঘোষণার কথা বললেন।

কিন্তু অভিজ্ঞ কাজী জাফর আহম্মেদ বললেন ভিন্ন কথা। তিনি বেগম খালেদা জিয়াসহ সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন - এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। আপনি কর্মসূচি প্রত্যাহার করলে দেশবাসী ধরে নেবে আপনি পরাজয় মেনে নিয়েছেন। সিরাজুদ্দৌলাও ভেবেছিল পলাশী থেকে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তনের পর নতুন শক্তি সংগ্রহ করে তিনি লর্ড ক্লাইভকে পরাভূত করবেন। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। তিনি এও বললেন ৪৮ ঘন্টা মহাসড়ক বন্ধ রাখা সরকার ধারণ করতে পারবে না। একমাত্র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, মুহম্মদ কামারুজ্জামান, আবদুল কাদের মোল্লা ও আমি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজী জাফর আহম্মেদকে সমর্থন করলাম। বেগম খালেদা জিয়াও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করলেন। ২ ঘন্টার মধ্যেই আওয়ামী পেটোয়া বাহিনী মহাসড়ক খুলে দিতে বাধ্য হল। মনস্তাত্ত্বিক পরাজয় ঘটল শেখ হাসিনা সরকারের।

নতুন উদ্দীপনা নিয়ে যাত্রা শুরু হল লংমার্চের। পথে পথে চলছিল গণসংবর্ধনা। মূলত বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশই কর্মসূচির মূল সংগঠক। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা নেমে এলো। সামনে ফেনীতে রাতের আঁধারে বেপরোয়া সন্ত্রাসের কথা শোনা গেল। আমাদের গাড়িতে আমি, কাজী জাফর আহমেদ, শাহ্ শহীদ সরোয়ার, এটিএম গোলাম মওলা চৌধুরী। রাশেদা চৌধুরী ও জাফর চৌধুরীকে আমি পূর্বেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ফেনীতে পিএনপি'র উদ্যোগে একটি

www.pathagar.com

গণজমায়েত করার জন্য। তারা ফেনীর বাসস্ট্যান্ডের প্রবেশ মূলে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দলের ব্যানারে একটি সমাবেশ মঞ্চ করেন। অবশ্য সব দলের লোকই সেখানে উপস্থিত হয়ে সমাবেশকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছিল। পরে জেনেছি জয়নাল হাজারীও এ সমাবেশকে বাঁধা দেয়নি বরং গোপনে সাহায্যই করেছিল। তার এ গোপন সাহায্য ছাড়া রাত ১২টার সময় সভাস্থলে বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব ছিল না। জয়নাল হাজারী ও তার লোকদের বিরোধিতা না করার কারণ ছিলো ফেনী জেলার একটি জনগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িত। আর হাসিনা-সন্তু লারমার কালোচুক্তি এ ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থি। শেষরাত পর্যন্ত পথে পথে লক্ষ লক্ষ মানুষের এই গণজাগরণ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। ভোর রাত ৫টার সময় আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছলাম। আমার স্ত্রী খায়রুন নাহার খানম, আমাদের পার্টির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মুন্নি, কেন্দ্রীয় ভাইস-চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি মরহুম আলী হোসেন একটি হোটেলে ৪টি রুম নিয়ে আগে থেকেই বসা ছিলেন।

কাজী জাফর আহম্মেদের জন্যও একটি রুম রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমরা সংবাদ পেলাম তার জন্য বেগম খালেদা জিয়ার পাশে সার্কিট হাউজেও রুম রাখা হয়েছে। আমরা তাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে হোটেলে হাত-মুখ ধুয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে পরবর্তী কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য রওয়ানা হলাম। সার্কিট হাউজের সামনের মোড়েই সকাল ৭ টায় গণসমাবেশ শেষে পুনরায় লংমার্চ শুরু হবে। খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের উদ্দেশে বেগম খালেদা জিয়া, কাজী জাফর আহম্মেদ, আব্দুল মান্নান ভূইয়া, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল নোমান, শফিউল আলম প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে মওলানা ফজলুল হক আমিনিসহ আমি গণসমাবেশে বক্তব্য দিলাম। সকাল ৭-টায় লক্ষ লোকের সমাবেশ শেষে গাড়িবহর ধীর গতিতে খাগড়াছড়ি অভিমুখে রওয়ানা হলো।

বিকেল ৩-টায় আমরা খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে সমাবেশে উপস্থিত হলাম। কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মেদ ছিলেন সার্বিক দায়িত্বে। আমরা সবাই বক্তব্য শেষ করলে ৭-দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বেগম খালেদা জিয়া। তিনি বলেন, বাংলাদেশে কোনো বাঙালি-পাহাড়ির ভেদাভেদ নেই। আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক এবং সমঅধিকারী। আবার আমরা ক্ষমতায় গেলে হাসিনা-লারমার কালো চুক্তি বাতিল করবো।

২০০১ সালের অক্টোবর মাসে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসেছেন হাসিনা-লারমার কালোচুক্তি কি বাতিল করেছেন? #

www.pathagar.com

স্বাধীনতা দিবসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

আইয়ুব খান আহূত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং পূর্বপাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে আইয়ুব খান তার মন্ত্রীপরিষদ দুই প্রদেশের গভর্ণর এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কিন্তু আইয়ুব খানের মন্ত্রীপরিষদও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এই অনৈক্যকে প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সামরিক বাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খানকে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। তিনি তার মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠকে সামরিক বাহিনীর প্রধান ইয়াহিয়া খানকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানান। বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একমাত্র দেশকে রক্ষার জন্য সামরিক আইন জারি করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তিনি। ইয়াহিয়া খান সভাস্থলে চুপচাপ বসে থাকেন। সকলের বাকবিতন্ডা উপভোগ করে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একান্ত আলাপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি।

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া খানের আইন উপদেষ্টা জি ডাব্লিউ চৌধুরীর The Last Days of United Pakistan বইয়ের উদ্ধৃতি অনুসারে দুই পুরনো বন্ধু ও সহকর্মি প্রেসিডেন্ট ভবনের কেবিনেট কামরা হতে অতিসন্নিকটবর্তী আইয়ুব খানের দফতরে গেলেন। সেখানে আইয়ুব খান ইয়াহিয়াকে সামরিক আইন জারি করে সরকারকে উদ্ভূত পরিস্থিত থেকে উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেন। ইয়াহিয়া স্বীকার করলেন যে, সামরিক আইনই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একমাত্র সমাধান। কিন্তু, তিনি সরকারের সমর্থনে সামরিক আইন জারির আগে কিছু শর্তারোপ করেন যা তিনি আগেই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কোর-কমান্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

প্রথমত: প্রাদেশিক গভর্নরদের ও মন্ত্রিসভাকে বাতিল করতে হবে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে সামরিক বাহিনীর প্রধানের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান।

দ্বিতীয়ত: পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই জাতীয় পরিষদ ও দুটি প্রাদেশিক পরিষদকে বাতিল করতে হবে- পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাপ্রধানের এ শর্তেও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান।

তৃতীয়ত: শাসনতন্ত্রকে বাতিল করতে হবে। কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কাছে বর্তমান শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে বলেন, আমি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র চালু রাখার অনুরোধ করতে পারি না। এই প্রথম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আঁতকে উঠলেন এবং বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন শাসনতন্ত্র বাতিল ? না সেটা অসম্ভব। কিন্তু এরই মধ্যে আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন ইয়াহিয়া খান কি চাচ্ছেন। কারণ, ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার কাছে তিনি যা চেয়েছিলেন বিষয়টি তারই অনুরূপ। শাসনতন্ত্রের অবর্তমানে সামরিক আইন প্রশাসক হবেন দেশের সর্বময় কর্তা। নিরুপায় আইয়ুব খান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশকে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসনের আবর্তে নিপতিত করেন।

২৫ মার্চ প্রথমে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জাতির উদ্দেশ্যে বেতারে ভাষণ দিয়ে নিজের পদত্যাগের ঘোষণা প্রদান করেন এবং সামরিক বাহিনীর

www.pathagar.com

প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ২৬ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণ দেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ২৪ মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান পিপল্স পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে রাওয়ালপিন্ডিতে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

পিলু মোদীর 'জুলফী মাই ফ্রেন্ড' বইতে এই বৈঠককে রহস্যজনক বলে উল্লেখ করে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই বৈঠকেই ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর সাথে অলিখিত চুক্তিতে উপনীত হন যে, তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোই হবেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী।

১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট দেশে নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। একব্যক্তি একভোট এই মূলনীতিতেই পাকিস্তানের পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

পাকিস্তানের দুই অংশে দুটি দল আঞ্চলিক জনমতের ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দুই অঞ্চলে দু'জন নায়কে পরিণত হন। পাকিস্তানের পাঞ্জাব ও সিন্দু প্রদেশে ভারত বিরোধী উগ্র অবস্থা গ্রহণ করে পশ্চিম পাকিস্তানে পিপল্স পার্টি এবং পূর্বপাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবির ভিত্তিতে ৬ ও ১১ দফার বক্তব্যকে সামনে নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নির্বাচন বর্জন ও দক্ষিপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর অন্তঃকলহ শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণে অধিক সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে শেখ মুজিব ইংল্যান্ড যাবেন বলে ঘোষণা প্রদান করেন। এ সময় আওয়ামী লীগের তরুণ নেতারা তাকে ইংল্যান্ডে যেতে নিষেধ করেন। কারণ, এ সময় আমেনা বেগম কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা 'আমার কথায়' প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমান ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন মমতাজ দৌলতানা ও ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে গোপন

www.pathagar.com

শলাপরামর্শ করার জন্য। শেখ মুজিবুর রহমান তরুণ নেতাদের বলেন, তিনি ইংল্যান্ড যাচ্ছেন সিলেটী ভাইদের সঙ্গে দেখা করার জন্য, পাকিস্তানের কোনো নেতার সঙ্গে গোপন বৈঠক করার জন্য নয়। অবশেষে সব বাধা উপক্ষো করে ১৯৬৯ সালের ২৫ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমান ৭ দিনের সফরে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইংল্যান্ডে সফরের সঙ্গে কোনো রাজনেতিক কারণ যুক্ত আছে কিনা-শেখ মুজিবুর রহমান এ প্রশ্নের উত্তরে সাফ জবাব দেন- তার এই সফরের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই এবং তিনি ব্যক্তিগত কাজের জন্যই ইংল্যান্ড যাচ্ছেন।

সফর শেষে ইংল্যান্ড ত্যাগ করার পূর্বে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন শেখ মুজিবুর রহমান। সাংবাদিকরা জানতে চান, তিনি মমতাজ দৌলতানা কিংবা জুলফিকার আলী ভুট্টো বা অন্য কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছেন কি না?

শেখ মুজিব বলেন - 'পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো নেতা বা কর্মকর্তার সঙ্গে কোনো প্রকার সৌজন্য সাক্ষাৎও আমি করিনি।' এক প্রশ্নকারীকে তিনি বলেন - 'পর্দার অন্তরালে রাজনীতি করার অভ্যাস আমার নেই। আমার রাজনীতি অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ নভেম্বর ১৯৬৯)। কিন্তু আমেরিকান টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ভিন্ন প্রতিবেদন। সেখানে দেখানো হয় শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খান আন্তরিক পরিবেশে আলোচনায়রত। রিপোর্টে এটাও উল্লেখ করা হয় পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ইয়াহিয়া খান আর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।

সম্ভবত সে সময়ই শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহন করেছিলেন-যার প্রেসিডেন্ট হবেন ইয়াহিয়া খান, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, মমতাজ দৌলতানা প্রতিরক্ষা মন্ত্রিসহ মোট ১৭সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। এই মন্ত্রিসভার ১০জন পূর্বপাকিস্তান থেকে এবং ৭জন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। কাইয়ুম মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামি ও পিপিপি ছাড়া সব রাজনৈতিক দলকেই মন্ত্রিসভায় অংশীদারিত্ব দেয়া হবে। ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ রাওয়াল পিন্ডিতে ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকা আলী ভুট্টোর রহস্যজনক বৈঠক ত্রিমুখী সন্দেহ ও একে অপরকে পাহারা দেয়ার রাজনীতির সূত্রপাত ঘটায়। যদিও নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে

www.pathagar.com

জয়লাভ করার জন্য সকল প্রকার নৈতিক সমর্থন প্রশাসনের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগকে দেয়া হয়েছিল এবং একইভাবে সমর্থন দেয়া হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপল্স পার্টিকে।

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে সর্বমোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ১৬৯ আসন। তার মধ্যে আওয়ামী লীগ একাই পায় ১৬৭ আসন। একটি পায় পিডিপি'র নূরুল আমিন এবং অন্যটি পান স্বতন্ত্র প্রার্থী পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ত্রিদিব রায়। উল্লেখ্য যে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও পায়নি।

স্বাভাবিক নিয়েমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রেসিডেন্ট সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানাবেন এটাই প্রত্যাশিত এবং সকল শাসনতান্ত্রিক বিষয়গুলো সংসদে আলোচনা হবে। শাসনতন্ত্রের সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন করতে হলে জাতীয় সংসদই হবে তার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু বাদ সাধলেন পাকিস্তান পিপল্স পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভূট্টো। আইয়ুব খানকে সরিয়ে ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা গ্রহণে প্ররোচিত করতে ভুট্টোর নাটকীয় কারসাজির কথা পরে জানা যায়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদের প্রত্যাশায় তিনি ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সমর্থনসূচক রহস্যজনক বৈঠকও করেছিলেন। আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের একক সংখ্যাগলিষ্ঠতার ফলে তার সেই প্রত্যাশা বাধাগ্রস্ত হলো। তিনি শুরু করলেন বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র ও টালবাহানা। জামায়াতে ইসলামী থেকে শুরু করে ওয়ালী খানের ন্যাপসহ বলতে গেলে পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানালেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মপ্রক্রিয়া

পূর্বপাকিস্তানে সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ, অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, আ স ম আব্দুল রব প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেই বিরাট সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। শেখ সাহেব ছিলেন মাঝামাঝি

www.pathagar.com

অবস্থানে। তিনি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এক ধরনের কথা বলতেন, আর ভারতের চিত্তরঞ্জন সূতারের সঙ্গে বলতেন অন্য কথা। কিন্তু, জনগণ শেখ মুজিবকেই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মুল নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

১৯৭১ সালের ২৭ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টো বিশাল এক প্রতিনিধি দল নিয়ে পূর্বপাকিস্তানে আসেন শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য। ৩ দিন অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাদের মধ্যে দফায় দফায় শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

কিন্তু, সংসদের বাইরে দু'টি দলের মধ্যকার আলোচনা অচলাবস্থা নিরসন করতে পারবে না বলেই রাজনৈতিক মহলে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। পূর্বপাকিস্তানের ছাত্র-জনতা বিশ্বাস করতে থাকে পাকিস্তানী কায়েমী রাজনৈতিক শক্তি ও সামরিক জান্তা বাংলা ভাষাভাষী রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দিতে চায় না।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অবশ্য ১ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকাতেই আহ্বান করেছিলেন। এ থেকেই মনে করা যায় যে ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তরে আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু, ভুট্টোর খামখেয়ালি ও ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করতে বাধ্য হলেন। জেনারেল টিক্কা খানসহ পাকিস্তানি কয়েকজন জেনারেল ও লারকানার জমিদার জুলফিকার আলী ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের কারণেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করতে বাধ্য হন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল পূর্বপাকিস্তানের জনগণ। এ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর বাইরে গিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রত্যাশা করতে লাগল দেশবাসী। কিন্তু আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্ব ছিল দোদুল্যমান ও পরিকল্পনাবিহীন।

২ মার্চ হোটেল পূর্বানীতে শেখ সাহেব কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে পারলেন না। ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্র জনসভা আহ্বান করা হলো। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে ২ মার্চ আ স ম আব্দুর রব পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। ৩মার্চ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্রনেতা শাজাহান সিরাজ।

www.pathagar.com

৭ মার্চ আওয়ামী লীগের জনসভায় সংগ্রামের যে কর্মসূচি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে মন্দের ভাল বলে উল্লেখ করেছে। তিনি 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান' বলে বক্তৃতা শেষ করেছিলেন। এর মধ্যেও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি। কিন্তু ৬দফা কর্মসূচি বিশ্লেষণ করলে যে কোন সাধারণ মানুষই বুঝতে পারবে যে ১৯৬৬ সালেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। কারণ একটি দেশে যেমন দু'জন প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না, তেমনই একই দেশে দু'ধরণের মুদ্রা থাকতে পারে না।

আ স ম আব্দুর রবের বক্তব্যকে যদি আমরা সত্য ধরে নেই তাহলে বলতে হচ্ছে ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই কথা বলতে চাননি। সিরাজুল আলম খানের পরিকল্পনা অনুসারে মাঠের মধ্যে গ্রুপ করে সচেতন কর্মিবাহিনীকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তাদের উচ্ছ্বাসের কারণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বক্তৃতায় বলেন -

> 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'

১৯৮৯ সালের ২৫ সংখ্যা 'সাপ্তাহিক মেঘনায়' মুজিবের ৭ সহযোগী শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আ স ম আব্দুর রবের তথ্যবহুল একটি সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। সে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন -

> '১৯৭০-এর নির্বাচনের পর মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর মধ্যে বেশ কয়েকবার আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। সবশেষে আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয় ১৭ মার্চ থেকে। আলোচনা চলছিল গভর্ণর হাউসে।'

সম্ভবত ২৩ তারিখের নির্ধারিত বৈঠকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যেই একটা ফয়সালা করার চেষ্টা করেন। তাদের ফয়সালায় পূর্বপাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের ব্যাপারে মোটামুটি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ২৩ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রশ্নে দোদুল্যমান ও সিদ্ধান্তহীন।

১৯৮৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক মেঘনায় মুক্তিযুদ্ধের প্রখ্যাত সংগঠক এবং এক সময়ের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক অন্য আরেকটি সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। যেখানে তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেন -

www.pathagar.com

'২৫ মার্চ রাতের বেলায় তিনি বঙ্গবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসায় যান। তিনি বঙ্গবন্ধুকে তার সঙ্গে চলে আসার অনুরোধ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বঙ্গবন্ধু তার সঙ্গে আসেননি।'

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা নিরীহ জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। শত শত নিরীহ মানুষ, ছাত্র-জনতা আর ইপিআর শহীদ হল। এর মধ্যে আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের দেখা হয়। তারা একসঙ্গে নৌকায় করে কেরাণীগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা গগনের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় নৌকায় বসেই তারা শুনতে পারলেন বেতারযন্ত্রে সে সময়কার এক তরুণ সেনা অফিসার মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণা। সে ঘোষণায় প্রথমে বলা হয়েছিল-

'আই মেজর জিয়াউর রহমান ডিক্লেয়ার ইনডিপেনডেন্টস অব বাংলাদেশ'।

পরে আবার আব্দুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খান উভয়েই শুনলেন -

'আমি মেজর জিয়া বলছি - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি'।

১৯৭২-এর ৫ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ মুজিবুর রহমান মুক্ত হয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে আলাপকালে প্রথম জানতে পারেন -

'১৬ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী ভারত-বাংলাদেশের যৌথবাহিনীর কাছে ৯৩ হাজার সেনাসদস্য নিয়ে জেনেভা কনভেনশনের আওতায় আত্মসমর্পণ করেছে, এ অবস্থায় অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন বাংলাদেশের।

২০ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পরাজিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতা গ্রহণের আহ্বান জানান। রাজনৈতিক নেতা ভুট্টো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সব সংজ্ঞা পরিত্যাগ করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক আইন প্রশাসক হন যা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা।

www.pathagar.com

১৯৭২-এর ৫ জানুয়ারি জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয় ৮ জানুয়ারি। সেদিন রাতে তিনি মুক্ত হয়ে পাকিস্তান থেকে লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। যাত্রার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে জানতে চান ঢাকার অবস্থা কেমন? জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বলেন -

> ভারতীয় সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে পূর্বপাকিস্তান দখল করে নিয়েছে।

আলোচনার একপর্যায়ে শেখ মুজিব, জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বলেন -

> ঢাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনী তাকে গ্রেফতার করলে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো যেন তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন।
>
> জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রতি উত্তরে বলেন - 'আমরা উভয়ে একসঙ্গে কাজ করব। (সূত্রঃ আত্মঘাতি রাজনীতির তিনকাল, সরকার শাহাবুদ্দিন আহমেদ - পৃষ্ঠা-৫৮৯)।

উপরোল্লেখিত বক্তব্য সম্পর্কে অনেকের ভিন্নমত থাকতে পারে, কিন্তু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দিল্লি থেকে ঢাকায় আসার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভারতীয় বিমানে ঢাকায় আসার অনুরোধ করলে তিনি তা অস্বীকার করেন। তিনি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি বিমানে করে ঢাকায় আগমন করেন। অথচ ব্রিটিশ সরকার সে সময় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি।

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী প্রখ্যাত ইটালিয়ান সাংবাদিক ওরিয়ানা ফ্যালসির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এ সাক্ষাৎকারে তিনজন নেতা '৭১ সালে শহীদের সংখ্যা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন - মৃতের সংখ্যা ৫০ হাজারের কাছাকাছি হবে।

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন - মৃতের সংখ্যা ১০ লাখের মতো হতে পারে।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন - মৃতের সংখ্যা ৩০ লাখ।

ইটালিয়ান সাংবাদিক ওরিয়ানা ফ্যালসি বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার ঘোষিত এ সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কোনো তথ্যনির্ভর বা পরিসংখ্যানভিত্তিক কি না?

স্বাধীনতার ৩৮ বছর পর আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব ১৯৭১ সালের প্রতিটি শহীদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা জাতির নৈতিক দায়িত্ব। কারণ এ শহীদরাই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বীরসন্তান।

আমি ২০০৩ সালে দিল্লি গিয়েছিলাম। তখন সেখানকার দিল্লি গেট দেখতে গিয়েছিলাম। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর ১৪ হাজার ৩৪৭ জন নিহত সেনাসদস্যের নাম খোদাই করে লেখা রয়েছে সেখানে।

আয়ারল্যান্ড বিভিন্ন পর্যায়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একশ আশি বছর যুদ্ধ করেছে। আয়ারল্যান্ডের বর্তমান রাজধানী ডাবলিনে স্যার ফিলট সিডনিসহ সব শহীদের নাম খোদাই করে লেখা আছে। আমাদের শহীদদের সম্মানেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাঁদের প্রতি জাতিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকার ও দেশপ্রেমিক জনতাকে নিতে হবে বাস্তবধর্মী উদ্যোগ। #

www.pathagar.com

আধিপত্যবাদীদের ষড়যন্ত্র কি আজও আগের মতোই চলছে?

ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে নিজের বিবেকের প্রতি চরম অন্যায় করা হবে। কারণ ২০০৫ সালের মার্চ মাসে আমার স্ত্রীকে নিয়ে ব্যাংকক যাই তার চিকিৎসার জন্য। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল মান্নান ব্যাংকক বামরুনগ্রাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। হাসপাতালে মাওলানা আব্দুল মান্নান ছিলেন ৮১২ নং রুমে। আমার স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮২২ নং রুম। পরে জানতে পারলাম, প্রায় ৩ মাস ধরে মাওলানা আব্দুল মান্নান এ হাসপাতালে আছেন। তার ছেলেরা পাশেই একটি ফ্লাটবাড়ি ভাড়া করে পালাক্রমে থাকে এবং অসুস্থ পিতার সেবাশুশ্রুষা নিজেরাই করে।

আমি বাহাউদ্দিন সাহেবের ফ্লাটবাড়িতে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি জোহরের নামাজ আদায় করে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বসলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার একপর্যায়ে আমাকে বললেন - 'নিলুভাই আপনাদের মত নেতাদের লেখা উচিত। আপনি যদি ১৫ দিনেও একটা লেখা দেন, দেশবাসী আপনার ও আপনাদের দলের কথা পরিচ্ছন্নভাবে জানতে পারবে।' আমি ইনকিলাবে আপনার লেখা ছাপানোর ব্যবস্থা করবো। আপনি অল্পসময়ের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারবেন, আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সঙ্গে এই লেখালেখি আরও একটি নতুনমাত্রা যোগ করবে।

www.pathagar.com

আমার কাছে তার উপদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হল। দেশে ফিরেই সময়ের সঙ্গে তালমিলিয়ে লিখতে শুরু করলাম। অতিঅল্প দিনের মধ্যে বাহাউদ্দীন সাহেবের কথা সত্যে প্রমাণিত হল। সে কারণে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গত বছর সরকারের ব্যর্থতা ও সফলতা নিয়ে লেখার আগে আমি ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও জাতীয় সংগ্রামের আলোকে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরার চেষ্টা করি। কারণ ইতিহাসের অবমূল্যায়ন জাতিকে ছোট করে তোলে। আর মানসিকভাবে জাতি ছোট হয়ে আসলে আধিপত্যবাদী শক্তিই দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নিয়ে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ পায়। নিরপেক্ষ ইতিহাসবোধ থেকে সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন - ব্রিটিশ ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু জমিদারশ্রেণী ও মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক দল ছিল 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'। আর মুসলমানদের দল ছিল 'মুসলিম লীগ'। ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক। তিনি ভারতের পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম প্রধান অংশগুলোকে নিয়ে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাব করেন। সেক্ষেত্রে পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তান প্রদেশ নিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং বাংলা ও আসামের সমন্বয়ে পূর্বাঞ্চলে আর একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই ঐতিহাসিক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মূলত ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। লাহোর, কলকাতা, বিহারসহ সারা ভারতে মুসলিম নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে। অত্যন্ত কৌশলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি ধ্বংস করে দেয়। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট সৃষ্টি হয় এক ভঙ্গুর পাকিস্তান রাষ্ট্রের। ১৯৪৮ সালে রাজশাহীর কারাগারের খাপরা ওয়ার্ডে প্রথম এই ভঙ্গুর রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করে বামপন্থি প্রগতিশীল নেতা কর্মিরা। ১৬৫৬ সালে কাগমারিতে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ঘোষণা করেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এক রাষ্ট্র হিসেবে থাকতে পারে না। তার ঘোষণার মধ্য দিয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেশবাসী দেখতে শুরু করে। সে কারণে ইতিহাসের সত্যের নিরিখে বলতেই হবে- মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীই হচ্ছেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা।

সে সময়ের আওয়ামী লীগ এক পাকিস্তান রাষ্ট্রেই বিশ্বাসী ছিল। তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করেই মানুষের মধ্যে ক্রমাগত স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে

www.pathagar.com

উঠে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ঐক্যের সৃষ্টি হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। আর এভাবেই ধাপে ধাপে মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীক। '৭০ সালে নির্বাচনে একক বিজয় তারই প্রতিচ্ছবি। তাকে কেন্দ্র করেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম গণমানুষের প্রাত্যহিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়। সে কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই বাঙালি জাতিসত্ত্বার ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা।

এবার আলোকপাত করা যাক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কে। তিনি তখন তরুণ এক মেজর। ২৫ মার্চের কালোরাতে অতর্কিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি হত্যাকান্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লে জাতি দিক-নির্দেশনাবিহীন পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়। সে পটভূমিতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের জনগণকে সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করার আহ্বান জানান। তার এই দৃঢ় মরণপণ সাহসী আহ্বান রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ দেশবাসীকে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করে। এ কথাও ঠিক, একদিনের এ ঘোষণাতেই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়নি। তবে পাশাপাশি একথাও সকলকে মনে রাখতে হবে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙ্গে তরুণ মেজর জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন তা নিঃসন্দেহে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গৌরবমন্ডিত অধ্যায়। একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই তিনজনের একজনকে অন্যজনের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চায়। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন হলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পারবো এরা সকলেই অবদান রেখেছেন আমাদের জাতিকে মুক্ত করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনের ঐকান্তিক বিশ্বাস থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন - "Let us forget; and forgive. Let us work together for the better future of our nation."

ভারতের জাতির পিতা করমচাঁদ গান্ধীকে উগ্র হিন্দু নাথুরাম গুলি করলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, 'হে রাম, ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে তুমি রক্ষা কর'।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ঠিক একই উদ্দেশ্যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য দালাল আইন প্রত্যাহার করে বিভেদ নীতির অবসান ঘটিয়েছিলেন। কারণ বিভেদ নীতি, হিংসা-প্রতিহিংসার রাজনীতি শুধুমাত্র আধিপত্যবাদী শক্তিকে দেশের

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কূটিল ভেদনীতির অবসানকল্পে সেদিনকার এই বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মত বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণেই।

মূলত এ লেখা তৈরি করতে চেয়েছিলাম ৪ দলীয় জোট সরকারের সফলতা ও ব্যর্থতার কথা নিয়ে। এ দিকে ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগটি বারংবার আবর্তিত হচ্ছে সে কারণেই আমাকে পরিচ্ছন্নভাবে সকল রাজনৈতিক নেতা-কর্মিদের স্ব-স্ব অতীত ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলতে হচ্ছে - মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীই হচ্ছেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতির পিতা এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক। এ সত্য ইতিহাসকে যেই অবমূল্যায়ন করবে, ধরে নিতে হবে তিনি স্বীয় স্বার্থে দূরভিসন্ধি হাসিলের রাজনৈতিক বাণিজ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন।

আজকের রাজনৈতিক পটভূমি ও সমস্যার কথা আলোচনা করতে হলে প্রথমেই উল্লেখ্য করতে হবে দেশের সর্বক্ষেত্রে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি সম্পর্কে। কিন্তু সন্ত্রাসের কারণে দুর্নীতি ধামাচাপা পড়েছে। তবে দুর্নীতিতে কোন্ দল শ্রেষ্ঠ, তা নির্ধারণ করাই আজ অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখন বড় দলগুলো তো বটেই, ছোট দলগুলোও দুর্নীতি সম্পর্কে খুব একটা বলতে চায় না। শুধুমাত্র দাতাগোষ্ঠী মাঝে মধ্যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে দুর্নীতি যে একটা খারাপ কাজ তা দেশবাসীকে জানিয়ে দিচ্ছে। দাতাদের বক্তব্য থেকে মনে হয় অমানিশার কালো অন্ধকারের ফাঁকে জোনাকি আলোর মিটে মিটে আভা উদ্ভাসিত হচ্ছে। কিন্তু, রাজনীতিতে সরকারবিরোধী আন্দোলনের প্রধান বিষয়বস্তু হওয়া উচিত ছিল দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন। দেশের সাধারণ মানুষ যে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা হয়রানির শিকার হচ্ছে সে সম্পর্কে বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য নেই। বরং বিরোধী দলের মূল নেতৃত্ব থেকে এমন একটা ভাব প্রচ্ছন্নভাব দেখানো হচ্ছে যে যা পারো দুর্নীতি করে সম্পদ গোছাও। শুধুমাত্র আমাদের ক্ষমতায় আসার পথকে পরিচ্ছন্ন করে দিলেই তোমাদের লুটপাট জায়েজ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মিদের চেয়ে দুর্নীতিবাজরাই আছে সুবিধাজনক অবস্থানে। অর্থাৎ এই আমলে জনগণকে বঞ্চিত করে, হয়রানি করে সম্পদ লুণ্ঠন কর, আগামীতে যারাই ক্ষমতায় আসুক না কেন তা জায়েজ করে সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার গ্যারান্টি অবশ্যই রয়েছে। এই দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক পরিমন্ডল থেকে পরিত্রাণের পথ কি তা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই জানেন।

www.pathagar.com

প্রথম বোমাসন্ত্রাস শুরু হয় আওয়ামী লীগ আমলেই। যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমাহামলার মধ্য দিয়ে যে সন্ত্রাসের সূচনা হয় পরবর্তিতে রমনাবটমূলে ও পল্টনে সিপিবি'র সমাবেশের হামলার মাধ্যমে তা দানবীয় রূপলাভ করে। তারপরে ধীরে ধীরে এই বোমা হামলার সংগঠকরা বেশ শক্তিশালী নেটওয়ার্ক সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৫-এর ১৭ আগস্ট ৬৪ জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় একই সঙ্গে বোমা হামলা চালিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। সে দিন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫ দিনের চীন সফরে রওয়ানা হয়েছিলেন। তার যাত্রার সময় ছিল দুপুর ১২টা। বোমা হামলা সংঘটিত হয়েছিল ঠিক একই সময় একই সঙ্গে ৩০মিনিট-এর ব্যবধানে। আমার কাছে প্রথম মনে হয়েছিল - যারা চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব চায় না, কিংবা চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব হলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তারাই এ বোমা হামলা চালিয়েছে। কিন্তু, পরেরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতি বীনা সিক্রির বক্তব্য, 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এই বোমা হামলা চালানো হয়েছে।' যা দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিন্দার ঝড় বইতে লাগল। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় প্রায় সকলেই বললেন - 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এই বোমাবাজদের লালন-পালন করছে। তাদের ছত্রছায়াতেই ইসলামী মৌলবাদী শক্তির সন্ত্রাসের উত্থান হয়েছে।' আমার মনে প্রশ্ন জাগে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বীণা সিক্রি কিভাবে নিশ্চিত হলেন যে, এই বোমা হামলার সাথে ইসলামি আন্দোলনের কর্মিরা জড়িত। না-কি ইসলামকে হেয়প্রতিপন্ন করতে তাদেরই ইন্ধনে এ বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে ?

আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে, বোমাবাজরা যখন দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে চলেছে ঠিক তখনই ওয়াকার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, চরমোনাইর পীরসাহেব ও ইশা আন্দোলনের আমীর সৈয়দ ফজলুল করিম, আটরশির পীরসাহেবের পুত্র ও জাকের পার্টি চেয়ারম্যান পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সল এমনকি বিএনপি'র নীতি-নির্ধারণী কমিটির অন্যতম সদস্য কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমেদরা কিভাবে এতদ্রুত এই বোমা হামলার নেপথ্য নায়কদের চিনতে পেরেছেন। তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে মনে হচ্ছিল বোমাবাজদের নাটেরগুরু কোন্ অপশক্তি তা শুধু চিনতে পারলেন না বেগম খালেদা জিয়া। এটা কেমন বেমানান ও হাস্যকর কথা ?

অবশ্য ২০০৫-এর ১৩ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা একটি মুক্তআলোচনার আয়োজন করে। আমাকেও সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এসেছিলেন শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও সাবেক আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু আর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সেই মুক্তআলোচনায় বক্তব্য রাখেন - মুহম্মদ কামারুজ্জামান।

www.pathagar.com

অনেক আলোচনার পর জনাব কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ্য করে বলেন, বেগম সাজেদা চৌধুরীর ধানমন্ডির বাসভবনে আমাদের দলের সাবেক আমীরসহ দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের আপ্যায়ন করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদসহ অনেকের সঙ্গে শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জনাব কামারুজ্জামানের বক্তব্য অনুসারে আজ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বিএনপি থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই বোমা সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যাবে। এই কথার রাজনৈতিক তাৎপর্য আমি অনুধাবণ করতে পারিনি।

যা হোক, সবশেষে সাংবাদিকদের একটি অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার একটি বক্তব্য আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। তিনি বলেছেন - 'মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, তারেক রহমান, ডিজিএফআই ও ডিজিএনএসআইকে গ্রেফতার করলেই বোমা হামলার উৎস পাওয়া যাবে এবং বোমা হামলা বন্ধ হয়ে যাবে।'

ভারতের বাংলাদেশস্থ রাষ্ট্রদূত শ্রীমতি বীনা সিক্রি চমৎকারভাবেই বুঝতে পেরেছেন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যই দেশব্যাপী বোমা হামলা হয়েছে। কিন্তু আমার বুঝতে কষ্ট হয়, তিনি ইসলামের পক্ষে বলেছেন না বিপক্ষে বলেছেন।

শেখ হাসিনা অবশ্য নিজামী, মুজাহিদ, তারেক রহমান সম্পর্কে বলেছেন। এই বিষয়টি না হয় স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু ডিজিএফআই এবং ডিজিএনএসআই এ দু'জনকে গ্রেফতার করতে পারলে বোমা হামলা বন্ধ হবে এই কথাটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা চলে না। কারণ, প্রথমত এ দু'টি সংস্থা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত। দেশবাসীর কাছে এই সংস্থাগুলোকে বিতর্কিত করে তোলার পিছনে আসল রহস্য কী? কার স্বার্থে এই অপপ্রচার? সংস্থা দু'টির প্রধান দু'জনই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সদস্য। একজন ১৩শ' গেরিলা সদস্যের নেতৃত্বে দিয়ে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। ১৭৫৭ সালে সিরাজ-উদ-দ্দৌলা'র পরাজয়ের পর মীর জাফর আলী খাঁ পুতুল নবাব হয়েছিলেন এবং ২ মাসের মধ্যেই ৮০ হাজার সদস্যকে চাকরিচ্যুত করেছিলেন। ধ্বংস করেছিলেন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীন সেনাবাহিনীকে। তাহলে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে দেশটাকে 'করদ' রাজ্যে পরিণত করতে আদিপত্যবাদীদের ষড়যন্ত্র কি সে যুগের মত আজও অব্যাহত রয়েছে? #

www.pathagar.com

তসলিমা নাসরিন বিরোধী আন্দোলন

১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন একটি বই প্রকাশ করে। তার মধ্যে ইসলাম ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার ফলে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ তসলিমা নাসরিনকে দেশ থেকে বহিষ্কার, তার প্রকাশিত বই বাজেয়াপ্ত ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার দাবি জানাতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এ বই প্রকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতা করে ভারতের আনন্দবাজার গোষ্ঠী। এরই প্রতিবাদে 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। পর্দার আড়াল থেকে মাওলানা আব্দুল মান্নান ও সামনে থেকে আনোয়ার জাহিদ এই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনে কারিগরের ভূমিকা পালন করে। মূলত এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মাদ্রাসাভিত্তিক অরাজনৈতিক ও অসংগঠিত শক্তিকে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে রূপান্তরের চেষ্টা চালান হয়।

প্রথমে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক করা হয় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমের শ্রদ্ধেয় খতিব আলহাজ্ব মাওলানা ওবায়দুল হক এবং সদস্য সচিব করা হয় মুফতি ফজলুল হক আমিনিকে। শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক, মাসিক মদীনা সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, সৈয়দ ফজলুল করিম পীরসাহেব চরমোনাই, ব্যারিস্টার মাওলানা কোরবান আলী, কর্ণেল (অবঃ) খন্দকার আবদুর রশিদ, জনাব এম এস সোলায়মান, এড. মোহাম্মদ আইনউদ্দিন, শফিউল আলম প্রধান, মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামীসহ আমিও এ সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে ছিলাম।

কি রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে এই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছিল তার সঠিক মূল্যায়ন দূরূহ ও দুঃসাধ্য কাজ, যা এখন পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কারণ হচ্ছে, তসলিমা নাসরিনের পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে - ভারতের আনন্দবাজার গোষ্ঠী। কিন্তু ইসলামপন্থি দলগুলোর বক্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী। আমার জানামতে, প্রকৃতঅর্থে মার্কিন কোনো গোষ্ঠী তসলিমা নাসরিনের পৃষ্ঠপোষকতায় জড়িত ছিল না। সে কারণেই এ পরিষদের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মিল হয়নি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত: বায়তুল মোকাররমের খতিব অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কিন্তু তিনি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। স্বাভাবিকভাবেই এ নেতৃত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ করা অত্যন্ত কঠিন ও অপ্রাসঙ্গিক যার সঙ্গে আমি নিজেকে মিলিয়ে কাজ করতে পারিনি।

অবশ্য আমি পরে বুঝতে পেরেছি এই আন্দোলন ছিল মূলত 'অস্তিত্বহীন ছায়া'র বিরুদ্ধে আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে সরকারের কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অন্যদিকে একজন লেখিকার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে কতগুলো রাজনৈতিক দলকে ব্যতিব্যস্ত রাখা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য এ আন্দোলনের ফলে গ্রাম পর্যায়ে মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষক ও ছাত্ররা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই শক্তিই পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামি ঐক্যজোটের ব্যানারে রাজনীতিতে একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও এককভাবে এই শক্তি জাতীয় রাজনীতিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয় না। কিন্তু আওয়ামী লীগের পক্ষে যেমন হিন্দু ভোটের একটা সমষ্টিগত সমর্থন থাকে তেমনি এই মাদ্রাসা ভিত্তিক শক্তিটিও তার বিপক্ষে বিএনপি'র পক্ষে একটি সমষ্টিগত শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে যা ভোটের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে যদিও চরমোনাই-এর পীর মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম এ ঐক্যজোটের সাথে থাকেননি এবং তিনি বিশ্বাস করতেন নারীর নেতৃত্ব ইসলামি দৃষ্টিতে নাজায়েজ। এ রাজনৈতিক বক্তব্যে আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার ওপর খুব বেশি প্রভাব পরেনি। কারণ শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সমর্থকরা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে আদর্শগতভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু বিএনপি ও বেগম খালেদা জিয়ার সমর্থকগোষ্ঠী বহুধারা, উপধারার মিলিত সংমিশ্রণে। সেই সংমিশ্রণকে ক্ষতিগ্রস্ত করাই এ নারী নেতৃত্ববিরোধী বক্তব্যের মূল লক্ষ্য। যদিও এই দেশে ঐতিহাসিকভাবে সত্য হচ্ছে, পীরসাহেবদের কথায় ভোটের রাজনীতিতে খুব বেশি প্রতিক্রিয়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

যেমন ফরিদপুরের আটরশির পীর দাবি করেন তার ৩ কোটি মুরিদ রয়েছে। একবার তারা জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনেই প্রার্থী দিয়েছিলেন। অর্থও খরচ করেছিলেন প্রচুর। ৩ কোটি মুরিদ থাকলে প্রতিটি সংসদীয় আসনে গড়ে তাদের ১০ হাজার মুরিদ থাকার কথা। পীরের প্রতি অনুগত থাকলে তারা প্রতিটি সংসদীয় আসনে কমপক্ষে ১০ হাজার করে ভোট পাবেন। কিন্ত দেখা গেল তাদের ভোট কোথাও ২শ' কোথায় ৫শ'। ঠিক তেমনি করে চরমোনাই পীরের অবস্থাও একই রকম।

যা হোক আমি শেষপর্যন্ত তাদের সঙ্গে কাজ করতে পারিনি এবং একপর্যায়ে এসে এ সংগ্রাম পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সংগ্রম পরিষদের চাপের ফলে বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল। এমনকি তিনি ভারতের আনন্দবাজার গোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় থেকেও সেদেশে নিরাপদে থাকতে পারছেন না। #

www.pathagar.com

সামরিক শাসন অবৈধ নয়
প্রসঙ্গ : সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী

২০০৫-এর ৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত সাংবাদিক আবেদ খানের একটি লেখার সূত্র ধরেই আমার এ লেখাটির অবতারণা। তিনি তার নিজের পত্রিকায় লিখেছেন - 'বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্র না বিপজ্জনক রাষ্ট্র?' আবেদ খান আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক। তিনি লিখেছেন - বাইরের দুনিয়ার এখন গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে এটাই। আরো লিখেছেন - বাংলাদেশে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের যেখানে নিরাপত্তা নেই সেখানে বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথায়? তার বক্তব্যের প্রকৃত লক্ষ কি বোঝা বেশ কঠিন।

প্রথম কথা হচ্ছে-বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্র কিনা? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত ২ বছর যাবত ঘুরে ফিরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অকার্যকর রাষ্ট্রের কথা শোনা যাচ্ছে। অকার্যকর রাষ্ট্রের মানে হচ্ছে-যে রাষ্ট্র সে দেশের জনগণকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। কী লক্ষ্য অর্জনে, কাদের খুশি করতে আর 'কার স্বার্থে আবেদ খান বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে অঙ্গুলি নির্দেশনা করতে চান' সে বিষয়টি আমি এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না।

প্রকৃত অর্থে তিনি ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে সেই রাষ্ট্রটিকে অকার্যকর বলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলতে চান কি? সরকারের ব্যর্থ শাসনের কারণে, দুঃশাসনের কারণে বাংলাদেশ তার নিজস্ব কার্যকারিতা হারিয়েছে বলে এ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রয়োজনীয়তা এখন আর নেই। আবেদ খানের বক্তব্যের মধ্যে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে আছে বলে মনে হয়েছে। কিন্তু আবেদ খান বলেননি - কি কারণে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ অকার্যকর হতে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

আবেদ খান প্রশ্ন রেখেছেন - 'বাংলাদেশ একটা বিপজ্জনক রাষ্ট্র কিনা?' বিপজ্জনক রাষ্ট্র কাকে বলে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরকার। 'যে রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতি, এমনকি জননিরাপত্তাকে হুমকির মধ্যে নিপতিত করে তাকেই প্রতিবেশিরা বিশ্বসমাজে বিপজ্জনক রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করে।' আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আবেদ খানদের কাছে জানতে চাই, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে আজপর্যন্ত বাংলাদেশ কার জন্য ক্ষতিকর কিংবা বিপজ্জনক কার্যকলাপ পরিচালনা করেছে তার একটি খতিয়ান যদি তিনি দেশবাসীর সামনে উত্থাপন করতেন তাহলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা-কর্মিসহ সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হতো।

আসলে আবেদ খানরা যা বলতে চান - 'সৎ সাহস নিয়ে কিংবা যে প্রভুর স্বার্থরক্ষা করতে চান, পরিষ্কার ভাষায় বিভিন্ন কারণে তারা সে কথা বলতে পারছেন না।' কারণ হচ্ছে তাদের বক্তব্য আমাদের জাতীয় মর্যাদা ও স্বার্থের পরিপন্থি। ভারতের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানীও বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অন্যতম সংগঠক, সংখ্যালঘু মুসলিম নিধনের নায়ক গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পশ্চিম বাংলার বর্তমান মূখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভাষায় বাংলাদেশ সন্ত্রাস এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অভয়ারণ্য। সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে আসামের ত্রিপুরার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না বর্তমান বেগম খালেদা জিয়ার সরকার। সে কারণেই চিহ্নিত প্রভুদের স্বার্থে ভিতর থেকে আবেদ খানরা প্রচার চালাচ্ছে বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ ও বিপজ্জনক রাষ্ট্র বলে।

ড. কামাল হোসেন

ব্যক্তিগতভাবে ড. কামাল হোসেনকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তার একটি বক্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। গত কয়েকদিন আগে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে সন্ত্রাসবিরোধী পেশাজীবী সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর কছম' ১৯৭১ সালে যেমন করে রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পন করিয়ে ছিলাম এবারও রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করাবো। ১৯৭১ সালে তো আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় বন্ধুবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে করে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলাম। এবার ড. কামাল হোসেন আত্মসমর্পণ করাতে চাচ্ছেন কাদের? তিনি পরিষ্কার ভাষায় সুনির্দিষ্ট করে বললে বেশি ভাল হয় বলে আমার বিশ্বাস। তিনি আসলে কার কথা বলছেন তা বুঝে ওঠা বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিলের নির্দেশ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের হাইকোর্ট সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল করে রায় প্রদান করেছে। বিজ্ঞ বিচারকগণের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে আপীল করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কিছু বলা যুক্তিসঙ্গত হত না, যদি কোনো বিশেষ মহল এই রায় নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টির না করতো। গত ৪ সেপ্টেম্বর একটি রাজনৈতিক সমাবেশে জনৈক বক্তা বলেছেন - ৫ম সংশোধনী বাতিলের পর সেই সময়ের সরকারের সব কার্যকলাপ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং অবৈধ কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাড় কবর থেকে তুলে বিচার করতে হবে।

প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে ড. কামাল হোসেন সম্পর্কে বলতে হয় - তিনি ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রধান প্রণেতা। যদিও ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের পর তিনি তৎকালীন প্রবাসী সরকারের সঙ্গে কোনোক্রমেই যুক্ত ছিলেন না। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের গোড়াপত্তন হয়। কোনো প্রকার পার্লামেন্টারি পার্টির সিদ্ধান্ত ছাড়াই একটি ঘোষণার মাধ্য দিয়ে প্রবাসী সরকারের যাত্রা শুরু। অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের যাত্রা শুরু। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১৭ এপ্রিলের সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। পাকিস্তানের কারাগারে আটক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভাইস প্রেসিডেন্ট, তাজউদ্দিন আহম্মেদকে প্রধানমন্ত্রী এবং খন্দকার মোশতাক আহম্মেদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করে প্রবাসী সরকারের যাত্রা শুরু হয়।

১৯৭১ সালের ৫ ও ৬ ডিসেম্বর ভূটান ও ভারত পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সঙ্গে আসেন ড. কামাল হোসেন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পাস হয়। পিছনের কার্যকলাপ বিশেষ ব্যবস্থায় বিশেষ আইনে পরিণত হয়ে তা বাংলাদেশের সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। আর এটাকে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করতে ড. কামাল হোসেনদের কোনোই বেগ পেতে হয়নি।

www.pathagar.com

১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের ৪টি সংশোধনী গৃহিত হয়। ৪র্থ সংশোধনী মাত্র ১৫ মিনিটের ব্যবধানে সংসদে পাস করানো হয়। এ সংশোধনীতে সংসদ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনসহ বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় বাকশাল সরকার পদ্ধতি চালু করেন। এর ফলে সরকারি কর্মচারিদের রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে বাধ্য করা হয়। তারই পাশাপাশি অল্প কিছুদিন পর ৪টি মাত্র সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা ছাড়া সব পত্রিকা তিনি বন্ধ ঘোষণা করেন।

১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হলে আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থি নেতা খন্দকার মোশতাক আহম্মেদ শাসনতন্ত্র স্থগিত ঘোষণা করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। কিন্তু ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গঠিত সংসদ বাতিল করেননি। অর্থাৎ একই সঙ্গে সামরিক শাসন ও জাতীয় সংসদ চলতে থাকে। এই শাসন ব্যবস্থার বৈপরীত্বের পটভূমিতে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জেনারেল খালেদ মোশাররফ খন্দকার মোশতাক আহম্মদকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে। মাত্র ৪ দিন পরে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিচারপতি সায়েম প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করলেও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

আমাদের রাষ্ট্র পরিচালিত হয় আইন, বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগের মাধ্যমে। আইন পরিষদের মূল দায়িত্ব আইন প্রণয়ন করা। বিচার বিভাগের এখতিয়ার আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও আইন অনুসারে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা করা। বিচার বিভাগ কোনো সময়ই আইন প্রণয়ন করে না, অর্থাৎ শাসনতন্ত্র সংশোধন সংযোজনের কোনে এখতিয়ার বিচার বিভাগের নেই। তবে দেশের ভূখন্ড বা এর অংশ বিশেষ সর্বসম্মতিক্রমে অন্য কোনে দেশকে হস্তান্তর করা হলে কিংবা সংবিধান বা রাষ্ট্রের মৌলিক চেতনার পরিপন্থি কোনো আইন প্রণয়ন করলে সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ আইন ও প্রশাসনিক বিভাগের সিদ্ধান্তকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে।

১৯৭৪ সালে বেরুবাড়ি, দহগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বিচার বিভাগ বেরুবাড়ি হস্তান্তরে বাধা দিতে পারত, ভারতের সুপ্রীম কোর্ট যা করেছে। তার ফলশ্রুতিতে বেরুবাড়ি গ্রহণ করেও ভারত দহগ্রম বাংলাদেশকে হস্তান্তর করতে পারেনি।

www.pathagar.com

১৯৭৬ সালে বিচারপতি সায়েম পদত্যাগ করলে শহীদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন সামরিক আইন বলেই। ১৯৭৭ সালের শেষদিকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং ১৯৭৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ থেকে সাম্যবাদী দল পর্যন্ত সব দলই সেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের আসাদুজ্জামান খান এবং মহিউদ্দিন আহম্মেদ দলের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা ও উপনেতা নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের দলীয় নেতা নির্বাচিত হন আব্দুস সবুর খান। মাওলানা আব্দুর রহিম, অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মেদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, শাজাহান সিরাজ ও মোহাম্মদ তোহা গুরুত্বপূর্ণ বিরোধীদলীয় সদস্য হিসেবে সেই সংসদে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আর সেই জাতীয় সংসদেই পাস করা হয় ৫ম সংশোধনী বিল।

১৯৭১ সালের দু'বছর পর ১৯৭৩ সালের ১৩ জানুয়ারি যেভাবে শাসনতন্ত্রে পূর্বের দু'বছরের সরকারি সব কার্যকলাপ সংযোজিত হয়ে বৈধতা অর্জন করে ঠিক একইভাবে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সব সরকারি কার্যকলাপ শাসনতন্ত্রে সংযোজিত হয়ে সাংবিধানিক বৈধতা লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের সমর্থনেই। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সরকারি সব কার্যকলাপকে শাসনতন্ত্রে সংযোজনের মাধ্যমে বৈধতা প্রদান করা হয়। এ সম্পর্কে এক সময়ের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহম্মেদের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনীতা আমি এই মুহূর্তে অনুভব করছি না। শুধু প্রেসিডেন্ট থেকে পুনরায় প্রধান বিচারপতি হওয়ার জন্য জাতীয় সংসদে যে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল সে সম্পর্কে দু'একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করছি।

পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয়জীবনে কোনো এক ব্যক্তির জন্য এ ধরণের সংবিধান সংশোধনীর ঘটনা নজিরবিহীন। সে সম্পর্কে আমাদের দেশের কোনো বুদ্ধিজীবীকেই আজ পর্যন্ত টু শব্দটা পর্যন্ত উচ্চারণ করতে দেখা যায়নি। হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে ইতিমধ্যে একটি চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক রায় দিয়েছে। বিজ্ঞ বিচারকদ্বয় বিশেষ মহলের ক্রীড়ণক দুজন বিতর্কিত আইনজীবীর আবেদনকে আমলে নিয়ে যেভাবে রাজনৈতিক রায় ঘোষণা করেছে তাতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সাংবিধানিক আইন প্রণয়ণের এখতিয়ার শুধুমাত্র বিচার বিভাগের হাতে। আর সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা খর্ব করার এই রিটের পক্ষে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা কিভাবে যুক্ত হতে পারে তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না। সর্বোচ্চ আদালতকে

www.pathagar.com

রাজনেতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার দায়ে রিটপিটিশনার, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীও বিজ্ঞ বিচারকদ্বয়কে একসময় ইতিহাসের কাঠগড়ায় অবশ্যই জবাবদিহিতা করতে হবে।

সুপ্রীমকোর্টের ফুল বেঞ্চে অবশ্যই তার চূড়ান্ত রায় হবে। আমি সে বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। আমি শুধু এ রায়ের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার দু'একটি উপমা উপস্থাপন করে সুপ্রিমকোর্টের রায় না হওয়া পর্যন্ত সকলকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানাবো।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। প্রথমে ইস্কান্দর মির্জা এবং পরে আইয়ুব খান সামরিক শাসন বলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। সেই সময়কার পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পীকার মৌলভী তমিজউদ্দিন খান সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণার জন্য সুপ্রীমকোর্টে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। কিন্তু পাকিস্তানের সুপ্রীমকোর্ট সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করেননি।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৩৭টি দেশ সামরিক সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। জাতিসংঘে তাদের বিরুদ্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা কিংবা সামরিক আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়নি। According to International Law stable Government is the Legal Government-এর অর্থ হচ্ছে সামরিক শাসন মানেই বে-আইনি শাসন নয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ১৯৭৫ সালে ৭ নভেম্বর এবং ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ দু'বার সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে খুব বেশি অমঙ্গল বয়ে এনেছে, গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, একথা রাজনৈতিক বিষয়ে প্রাজ্ঞ বিশ্লেষকরা স্বীকার করবেন না।

১৯৭৫ সালের ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ১৯৮২ সালের সামরিক শাসনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন অনেকেই। তাদের মুখোশ উন্মোচন করার ইচ্ছা আমার এই মুহূর্তে নেই। শুধু একটি কথাই বলতে চাই, 'রাধিব, বাড়িব, ব্যঞ্জনও কাটিব, তবু হাঁড়ি ছোব না'।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে আবার মূল কথায় ফিরে আসা যাক। স্বনামধন্য সাংবাদিক আবেদ খানের নতুন তত্ত্ব 'বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র না বিপজ্জনক রাষ্ট্র' এবং ড. কামাল হোসেনের 'আল্লাহ্র কছম রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করাবোই', '১৭ আগস্টের দেশব্যাপী বোমা হামলা' ও 'দু'জন বিচারপতির ২৭ বছর আগের ৫ম সংশোধনী বাতিল' দেশবাসীর কাছে মহাবিপদ সংকেত কিনা সুধী সমাজসহ রাজনৈতিক মহলকে তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। #

www.pathagar.com

আমাদের শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ

আমাদের জাতীয় শাসনতন্ত্র আরম্ভ হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রবাসী পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যেই। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠমোর মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনকেই আমরা উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির কারণ হিসেবে বিবেচনা করছি। অথচ সেই নির্বাচনে বিজিত সদস্যদের নিয়েই গঠিত হয় আমাদের প্রথম জাতীয় সংসদ। আর ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গৃহিত স্বাধীনতার ঘোষণার ভিত্তিতেই ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরকে অস্থায়ী রাজধানী করে বাংলাদেশের বৈধ সরকার গঠন করা হয়। আমাদের শাসনতন্ত্রকে বার বার অধ্যাদেশ যুক্ত করে এর রূপ পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু তার পরও একে শাসনতন্ত্রের ধারাবাহিক ক্রমবিকাশই বলতে হবে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণ কুষ্টিয়া জেলার মুজিব নগরে মিলিত হয়ে গণপরিষদ গঠন করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণাকে ১০ এপ্রিলের ঘোষণাপত্রে অনুমোদন করা হয়। এ ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পূর্ণবিবরণ

যেহেতু ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এক শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেহেতু এ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনকেই আওয়ামী লীগ হতে নির্বাচিত করেছিল এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন এবং যেহেতু আহুত এ অধিবেশন স্বেচ্ছাচারি ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জনগণের ন্যায্য আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখন্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনাকালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধেও নজিরবিহীন নির্যাতন ও অসংখ্য গণহত্যা চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব করে তুলেছে এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাদের

www.pathagar.com

বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশ ভূখন্ডের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। সেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন সে রায় মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করছি।

এতদ্বারা আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবে।

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক থাকবেন। তিনি ক্ষমাপ্রদর্শনের ক্ষমতাসহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইনপ্রণয়ণের অধিকারী হবেন। তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজন বোধে অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা থাকবে। গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও তা মুলতবি করার ক্ষমতা তার থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, কোনো কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা যদি রাষ্ট্রপ্রধান কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যদি অক্ষম হন তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সবক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই স্বাধীনতা ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, আমাদের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউছুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপরাষ্ট্রপ্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করলাম।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের প্রস্তাবনায় বাংলাদেশের প্রথম শাসনতন্ত্র পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। এই সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সম্পর্কে বলা হয় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের কথা। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হয় - সাবেক পূর্বপাকিস্তানই বর্তমান সার্বভৌম বাংলাদেশ। সরকারের চরিত্র সম্পর্কে বলা হয় - পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই হবেন সরকার প্রধান অর্থৎ ব্রিটিশ ও ভারতীয় শাসনব্যবস্থার অনুরূপ। যদিও জাতীয়তাবাদের কোনো ব্যাখ্যা ১৯৭২ সালের শসনতন্ত্রে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ বাঙালি নাকি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এরও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল না। কিন্তু শাসনতন্ত্রের Premable -এ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের উল্লেখ আছে পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ বাংলাদেশের একজন নাগরিক বাংলাদেশী হিসেবে গণ্য হবে।

প্রত্যেকটি দেশের শাসনতন্ত্র হচ্ছে একটি নির্মানাধীন ঘর। প্রতিমুহূর্তেই তার নতুন নতুন সাজসজ্জার প্রয়োজন হয়। আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করি তা হলে দেখতে পাব আব্রাহাম লিংকন থেকে কংগ্রেসম্যান জেফারসন ও বির্ডের পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সকলেই শাসনতন্ত্রে নতুন নতুন সংশোধন এনেছেন। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯৭৪-৯৬ সালের নাগরিক আইন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুধুমাত্র সামাজিক ব্যবস্থায়ই নয় শাসনতন্ত্রেই বর্ণবাদ ও দাস ব্যবস্থা যুক্ত ছিল। অর্থাৎ আফ্রিকান আমেরিকান নাগরিকেরা দাস হিসেবে গণ্য হতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক বিধানের মধ্যেই এমনকি আফ্রিকান আমেরিকানরা ও সাদা আমেরিকানরা বাসে বা ট্রেনে পাশাপাশি বসতেও পারতেন না রাষ্ট্রীয় আইনানুসারেই। ১৯৫৫ সালে রোজা পার্ক নামের একজন বিপ্লবী আফ্রিকান-আমেরিকান নেত্রী এ অমানবিক ও নাগরিক মর্যদার প্রশ্নে বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রীয় আইন মানতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন।

রোজা পার্কের বক্তব্য ধরেই শুরু হয় নাগরিক অধিকার আন্দোলন এবং কিং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে ১৯৬২-৬৪ সালের মধ্যে এ আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয় এবং সমঅধিকারের ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক আইন প্রণীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক আইনবিশেষজ্ঞরা একে বলেন - শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ।

www.pathagar.com

আমরা যদি ভারত-পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণ করি তা হলে দেখতে পাব পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ব্যারিস্টার আছপ আলীসহ অনেক মেধাবী ব্যক্তিগণ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে নিজেদের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় খুব একটা ছেদ পড়েনি। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক গণতন্ত্র বিরোধী জরুরি আইন প্রণয়ন।

পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ও বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস বার বার বাধাগ্রস্ত হয়েছে প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশ ও সামরিক শাসনের আদেশ জারির মধ্য দিয়ে। এর ফলে স্বাভাবিক শাসনতান্ত্রিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে বার বার। যার ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশ জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর মধ্যেও পাকিস্তানে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জুলফিকার আলী ভুট্টো, বাংলাদেশে ড. কামাল হোসেন, শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের মেধা ও সময়োপযোগী বিচক্ষণতায় ৩৮ বছরে আমাদের শাসনতন্ত্র পূর্ণতা লাভ করেছে।

১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রের হিউম্যান রাইটস, সিটিজেন রাইটস, রিলিজিয়াস রাইটসহ বহু সময়োপযোগী আইন সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাসনতন্ত্রের চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন আনেন। শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনীতে সকল প্রকার নাগরিক অধিকার অর্থাৎ বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা, সংবাদপত্র প্রকাশ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয় পার্লামেন্টের মাধ্যমে। শাসনতন্ত্রে একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় এবং সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করা হয়। ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের দলীয় রাজনীতি এমনকি সেনাবাহিনীর সদস্যদেরও দলীয় সদস্য হতে বাধ্য করা হয়। যাকে এককথায় বলা চলে স্বেচ্ছাচারী একব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার শাসনব্যবস্থা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে খন্দকার মোশতাক আহাম্মেদ শাসনতন্ত্র স্থগিত করে মার্শল 'ল' অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করতে থাকেন এবং ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর থেকে আরম্ভ করে যত

www.pathagar.com

সামরিক ফরমান জারি হয় তার সবগুলোকে সংবিধানের সঙ্গে যুক্ত করে তৃতীয় জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্রের ৫ম সংশোধনী হিসেবে গৃহিত হয়। এই ৫ম সংশোধনীও শাসনতন্ত্রের চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে ৫ম সংশোধনী ও তৃতীয় জাতীয় সংসদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে এই প্রথম সংসদে ব্যাপক রাজনৈতিক নেতৃত্ব সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও আওয়ামী লীগ ছাড়াও মুসলিম লীগের খান-এ-সবুর, জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগ (মিজান) এর মিজানুর রহমান চৌধুরী, সাম্যবাদী দলের মোহাম্মদ তোহা, ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, ওয়ার্কাস পার্টির রাশেদ খান মেনন, জাসদের শাহজাহান সিরাজ প্রমুখ এই সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

সরকারি দলের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টের নেতা নির্বাচিত হন শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত আইনবিদ ও শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞ। যদিও পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ণের পূর্বেই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বহুদলীয় গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও হিউম্যান রাইটসসহ বহুকিছুই অনুমোদন করা হয়। এই সংসদের মাধ্যমে গৃহিত হওয়ার পর তা শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হয়। সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক সংযোজন ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণআস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর ভিত্তি। এতে করে রাষ্ট্রের কাঠামোগত চরিত্রের পরিবর্তন সাধিত হয়।

দ্বিতীয়ত বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের হত্যাকারীদের বিচার মওকুফ যা একটি নিন্দিত উপমা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তবে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা থেকে শাসনতান্ত্রিক সরকারে রূপান্তরিত করতে এর কোনো বিকল্প ছিলনা। এ ব্যবস্থাকে বলতে হবে - 'প্যাকেজ ড্রিল'।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর খন্দকার মোস্তাকের সরকারের আইনমন্ত্রী ছিলেন শ্রী মনোরঞ্জন ধর। তিনিই এই কালো অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন এবং তৃতীয় জাতীয় সংসদ সে অধ্যাদেশটি প্যাকেজ ডিলের আওতায় শসনতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন ৫ম সংশোধনী এনে। এই অধ্যাদেশটি আবার বাতিল করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের হত্যাকারীদের বিচারের

www.pathagar.com

আওতায় আনা যেত কিন্তু তৃতীয় জাতীয় সংসদে তা করা হয়নি। ৫ম সংশোধনীর আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। এর ফলে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ৫ম শাসনতান্ত্রিক সংশোধনীর মাধ্যমে ।

১৯৮১ সালের ৩০শে মে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর উচ্চভিলাসী কিছু বিপথগামী সদস্যের অভ্যুত্থানের ফলে নিহত হন। উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার প্রথমে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং পরে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে জয়লাভ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

অবশেষে ১৯৮২ সালের ২৫ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে সামিরক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনকাল ছিল প্রায় ৯ বছর। তার সময় দু'বার সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং চারজন প্রধানমন্ত্রী হন। এরা হলেন - আতাউর রহমান খান, মিজানুর রহমান চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও কাজী জাফর আহমেদ। তার সময় শাসনতন্ত্রে মৌলিক পরিবর্তন হয় বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে। আমি এর কোনো তাৎপর্য দেখতে পাই না সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। বরং এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নিজেরা হীনমন্যতায় ভুগতে পারেন।

পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশেই রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছুই নেই। যেমন তুরস্ক, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া-এই তিনটি দেশ মুসলিম দেশ হিসেবেই খ্যাত। বাংলাদেশেও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করার ফলে জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে সংকট দেখা দিয়েছে এবং সংখ্যা লঘুরা উপেক্ষিত হয়েছে।

এরপর নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের ৩ মাসের মেয়াদকাল ১৯৯১ সালে সর্বপথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা যৌথভাবে আবার শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করেন এবং পার্লমেন্টারি পদ্বতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

বিচারপতি শাহাবুদ্দিনকে নিয়েও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করতে হয়। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করার পর পূনরায় তাকে প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত করতে শাসনতন্ত্রের সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি আন্দোলন গড়ে তুলে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপি একটি এক দলীয় নির্বাচন করে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করে যা আমাদের শাসনতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি এবং ২০০৭ সালের ১২ জানুয়রি থেকে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২৬ টি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এর ফলে শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন, ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ ও ড. ফখরুদ্দিন আহমদের সরকার আমাদের আন্দোলনের ফসল। এ সরকারের মেয়াদকালের সব কার্যাকলাপ আমরা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভূক্ত করে এর বৈধতা প্রদান করব। তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০০৮সালের ২৯ডিসেম্বর ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে সংসদও সরকার গঠিত হলে ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ সরকারের বহু কার্যক্রমের বৈধতা প্রদান করেছে ও অর্ডিনেন্সকে শাসনতন্ত্রের অংশে পরিণত করা হয়েছে।

আমি জাতীয় শাসনতন্ত্রকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন, ইউনিয়ন পরিষদকে থোক বরাদ্দের ক্ষমতা ও শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি প্রদান শাসনতন্ত্রে সংযুক্ত করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। #

www.pathagar.com

পাকিস্তানসহ উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভূমিকম্প ও আমার পাকিস্তান সফরের অভিজ্ঞতা

২০০৫ সালে দু'টি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সারা পৃথিবীকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। এর একটি 'সুনামি' যা ইন্দোনেশিয়ার জাভা থেকে শ্রীলঙ্কা হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত সমুদ্রতলে ভূকম্পন ও এর ফলে সৃষ্ট তীব্র জলোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

অন্যটি হলো ৮ অক্টোবর ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে ভূমিকম্পের প্রলয়ঙ্করী আঘাত। 'ভারতের কাশ্মীর অঞ্চল ও পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে আফগানিস্তানের কাবুল' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ ভূকম্পন এলাকা। এ ভূমিকম্প রেখে গেছে ধ্বংসের পদচিহ্ন। তবে মূলতঃ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদসহ আজাদ কাশ্মীর অঞ্চলেই ধ্বংস ও হতাহতের কালোছায়া প্রসারিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যক্তিগত কারণে ওয়াশিংটনে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। ওয়াশিংটনে যাদের সঙ্গে আমার কাজ তাদের সবাইকে স্বল্পসময়ের মধ্যে একত্রিতভাবে ওয়াশিংটনে পাওয়ার জন্য সমন্বয় করছিলাম। ১১ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আমি ওয়াশিংটনে থাকতে পারবো বলে উল্লেখ করে তাদেরকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেছিলাম। কিন্তু যার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি আলোচনার প্রয়োজন, তিনি ১৭ অক্টোবরের আগে ওয়াশিংটনে থাকতে পারবেন

www.pathagar.com

না বলে জানালেন। শেষে আমি ১৫ অক্টোবর থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত ওয়াশিংটনে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এ বিষয়ে আমি পরবর্তী লেখাতে বিস্তারিত আলোচনা করব।

সাধারণত আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাই ঢাকা-লন্ডন-নিউইয়র্ক রুটে। এ রুটে এ্যামিরাটসের বিমানে যাতায়াত করি এবং স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে কম মূল্যের টিকিট পাওয়ার চেষ্টা করি। এবার অনেক চেষ্টা করেও এই টিকেট খরচ কমানোর কোনো ব্যবস্থা করতে পারলাম না। পরিশেষে পাকিস্তান এয়ারলাইন্সে ঢাকা-করাচি-ম্যানচেষ্টার রুটের টিকেট কিনলাম। ১৩ অক্টোবর সকাল ১১টায় ঢাকা থেকে করাচি এবং করাচি থেকে ম্যানচেষ্টার হয়ে নিউইয়র্কের পথে রওয়ানা হলাম। জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদকে অনুরোধ করলাম সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে আমার বাসায় চলে আসার জন্য। কিন্তু ১১ অক্টোবর দিবাগত রাতে এ্যাডভোকেট ফরিদুজ্জামান আমাকে ফোন করে জানাল তার আগামীকাল সকাল ১১ টায় সুপ্রীমকোর্টে একটি মামলার হেয়ারিং আছে। এ সময়ের মধ্যে সে বিমানবন্দর থেকে সুপ্রীমকোর্ট পর্যন্ত ফিরতে পারবে কি না? আমি তাকে না আসার জন্য অনুরোধ করলাম।

অবশেষে একমাত্র এ টি এম গোলাম মাওলা চৌধুরীকে নিয়েই বাসা থেকে ঢাকা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। এরই মধ্যে পাকিস্তানের ভয়াবহ ভূমিকম্পের সংবাদ পত্রপত্রিকায় ও টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখতে পেলাম। প্রথমে বলা হলো ইসলামাবাদের একটি বহুতল ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আজাদ কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। করাচিতে ছিল যাত্রা বিরতি। আমাকেসহ ট্রানজিট যাত্রীদের হোটেলে নেয়া হল। সমস্ত পরিবেশ শোকে মুহ্যমান। প্রতিটি মানুষ উদ্ধার কাজে ও দুর্গতদের সাহাযের জন্য ব্যাকুল। হোটেলের বেয়ারা আমাকে পাকিস্তানের দুর্গত মানুষের জন্য নামাজ আদায় করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করার অনুরোধ করলো। একজন সাধারণ নাগরিকের এ আহ্বানে আমার হৃদয় কেঁপে উঠল।

পাকিস্তানের টিভিতে দেখলাম প্রথমেই ব্রিটিশ মেডিকেল টিম ও উদ্ধারকর্মিরা পাকিস্তানে পৌঁছেছে খাদ্য, ওষুধ ও তাঁবু নিয়ে। এরপরই এসেছে চীন ও তুরস্কের উদ্ধারকর্মি দল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঘোষণা করেছেন পাকিস্তানের বিপর্যয়কর মুর্হূতে পাকিস্তান বন্ধুহীন নয়। ভারতের ১০০ কোটি মানুষও আছে তাদের পাশে। তিনি ভারতের সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্যের

www.pathagar.com

কথা ঘোষণা করলেন ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সব ঘটনা প্রবাহ দেখতে দেখতেই ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন মন নিয়ে করাচি থেকে রওয়ানা হলাম ম্যানচেস্টার হয়ে নিউইয়র্কের দিকে।

নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনে গেলাম। পূর্বনির্ধারিত কাজগুলো ঠিকমতোই চালিয়ে যাচ্ছি আর খবর রাখছি বাংলাদেশ সরকারের দিকে। তাদের মানবিক আচরণের দিকে। ২১ অক্টোবর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমসের মোবিন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে। সেখানে দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম আরশাদ উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারলাম বাংলাদেশ সরকারের কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সৌজন্য সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যও পাকিস্তানে যাননি। কিছু বিস্কুট ও তাঁবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। মনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিলাম একজন নগণ্য রাজনৈতিক কর্মি হলেও এই বিপদসংকুল মুহূর্তে আমি পাকিস্তানের দুর্গত মানুষকে বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের সহানুভূতি পৌঁছে দেব।

ওয়াশিংটনে দূতাবাসগুলোর জন্য একটি বিশেষ কমপেক্স গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাকিস্তান দূতাবাস পায়ে হাঁটার দুরত্ব। হেঁটেই পাকিস্তান দূতাবাসে গেলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম আমি পাকিস্তানে যেতে চাই। ভিসা বিভাগ থেকে জানতে চাওয়া হল, আমি পাকিস্তানের কাউকে চিনি কি-না? আমি বললাম পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী মুহাম্মদ আলী সাহেবকে আমি চিনি। পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের পুত্র এজাজুল হক সাহেবকেও আমি চিনি। ১৯৮০ সালে বেনজীর ভুট্টোর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। পরবর্তী সময় ১৯৯৫ সালে লন্ডনে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। ভিসা বিভাগ থেকে প্রশ্ন করা হল কি ধরণের ভিসা আমার প্রয়োজন। আমি বললাম - একবার যেতে পারাটাই আমার জন্য যথেষ্ট। সে অনুসারে ভিসার ব্যবস্থা করে দেয়া হল। ভিসা নেওয়ার পরে খুঁজতে থাকলাম কোনো বন্ধু-বান্ধবের টেলিফোন নম্বর পাওয়া যায় কিনা। অবশেষে পেলাম একজন পূর্বপরিচিত বন্ধুকে তার নাম আব্দুল জব্বার ইসলাম। এক সময়ে নারায়নগঞ্জে তাদের বাসা ছিল। আদমজী পরিবারের নিকটাত্মীয়। এখন থাকে রাওয়াল পিন্ডিতে। ৪৬/১, ব্যাংক রোড, রাওয়ালপিন্ডি তার ঠিকানা।

নিউইয়র্ক ফিরে আসলাম ২৩ অক্টোবর। আমার ছোট বোন নিউইয়র্কে থাকে। তার স্বামীকে বললাম ২৬ তারিখে আমার পাকিস্তানে যাওয়ার টিকেট ঠিক করতে। ২৪ তারিখে জাতীয় পার্টির পক্ষে নিউইর্য়কে আমার ইফতার পার্টি পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। আব্দুল জব্বার ইসলামকে ফোন করে আমাকে

www.pathagar.com

করাচি থেকে ইসলামাবাদে নেয়ার ব্যবস্থা করার অনুরোধ করলাম। আগমনের উদ্দেশ্যও তাকে জানালাম। তিনি ভীষণ খুশি হয়ে বললেন, আমি নিজে করাচি বিমানবন্দরে এসে আপনাকে রিসিভ করবো। আমি দুশ্চিন্তা মুক্ত হলাম। ২৭ তারিখে বিকাল ৪টায় করাচি বিমানবন্দরে অবতরণ করে ইমিগ্রেশন পার হতেই বন্ধু আব্দুল জব্বার ইসলাম আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন বিমানবন্দর থেকে আমাদের বাইরে যেতে হবে না। ৬টায় অভ্যন্তরীণ বিমানে আমরা ইসলামাবাদ যাবো।

দু'জন ৬টায় করাচি থেকে ইসলামাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। ৮টায় ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। তিনি বিমানে বসেই আমাকে অবহিত করলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে সভাপতি এবং ইসলামাবাদের সিনেটর ও ফেডারেল মন্ত্রী তারিক আজিজ খানকে সদস্য সচিব করে দুর্যোগ মোকাবেলা ও উদ্ধার কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি আরো জানালেন ৬৩টি দেশের ভিআইপিরা পাকিস্তানের জনগণকে সহানুভূতি ও সৌজন্য প্রকাশ করার জন্য এসেছেন। তিনি আমার কথাও পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী তারিক আজিজ খানসহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করেছেন। আমাকে একটি গেস্ট হাউজে তুলে দিয়ে তিনি বললেন - আগামীকাল সকাল ৮টায় আপনাকে তারিক আজিজ খানের বাসায় যেতে হবে। তিনি ৯টার মধ্যে ভিআইপিদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি দুর্গত এলাকা বালাকোট, মনসুরা ও এবোটাবাদ জেলা সফরে যাবেন।

সকাল ৯টায় ৩টি বিশেষ হেলিকপ্টার করে আমরা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে রওয়ানা হলাম। একটি হেলিকপ্টারে জনাব তারিক আজিজ খান, আমি, জর্দানের রাণী, তুরস্কের একজন মন্ত্রী ও ইরানের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। অন্য দু'টি হেলিকপ্টারে মেডিকেল টিম ও বিভিন্ন দেশের সংবাদ মাধ্যমের কর্মিরা। গাড়িতে করে এ সব জায়গায় যাওয়ার কোনো পথ নেই। ভূমিকম্পে পাহাড় ধসে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ৫০০ ফুট উঁচু পাহাড় গুড়ি গুড়ি হয়ে ফেটে পড়েছে। পাহাড়ের পাদদেশে ঘর-বাড়িসহ মানুষ পাথর চাপা পড়েছে। এই ধ্বংসযজ্ঞ ভয়াবহতম। একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক বললেন - It is not the tragedy in Pakistan– it is the human tragedy of the world and all the civilised people to face the problem togather. তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করলেন - People of Pakistan and people of Bangladesh inherits common tradition. ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যার আগেই

www.pathagar.com

ইসলামাবাদে ফিরে এলাম। পাকিস্তানের এ ভয়াবহ ধ্বংসলীলা দেখে বার বার আমার মনে হচ্ছিল মহেঞ্জোদারু ও হরপ্পার কথা।

২৯ অক্টোবর সকাল ৯ টায় আবার ফিরে এলো আমার বন্ধু আব্দুল জব্বার ইসলাম। সঙ্গে নিয়ে এল এক ট্রাক খাদ্যসামগ্রি ও কিছু ওষুধ। আহতদের জন্য ইসলামাবাদ হাসপাতালে বিশেষ সেন্টার খোলা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের শত শত ডাক্তার এসেছে সেবাকার্য পরিচালনার জন্য। একজন সুইডিস রেডক্রস মহিলা কর্মিকে দেখলাম, নিজেই ট্রাক থেকে ওষুধের বড় বড় প্যাকেট নামাচ্ছেন। আমাদের দেশের সদরঘাট কিংবা কমলাপুর রেলস্টেশনে কুলিরা যেভাবে কাজ করে ঠিক তেমনিভাবে। আমার সঙ্গে সাংবাদিক ছিল তারা তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি তাদের পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন - She has no time to take with the Journalist. She further added that every second is very much important to save to life and that is more important to her. আমি প্রথমেই ওষুধ নিয়ে মেডিকেলের শিশু ওয়ার্ডে ঢুকলাম। সঙ্গে নিলাম বিস্কুট ও জুস। এমন হৃদয়বিদারক দৃশ্য যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

একটি ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয় - একজন ১২/১৩ বছরের বালিকা স্কুলের ছাত্রী ভূমিকম্প শুরু হলে সে প্রথমে ঘর থেকে বের হয়ে আসে, পরে তার মনে হয় সে তার কিতাব ফেলে এসেছে। যখনই সে তার কিতাব আনতে ঘরের মধ্যে পা দিয়েছে অমনি দরজার একটি পাল্লা তার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে এবং একটি পা সম্পূর্ণ গুড়িয়ে যায়। সে ভালভাবে কথা বলতে পারে। তার বর্ণনা শুনে আমি চোখের পানি সংবরণ করতে পারিনি। এই যান্ত্রিক যুগেও মানুষ কত অসহায়।

হাসপাতালে আহত রোগীদের জন্য খাদ্য সামগ্রি নিয়ে চললাম পার্ক রোডের দিকে যেখানে তাঁবু টানিয়ে শত শত ক্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে। তাঁবু, ওষুধ ও খাদ্যসামগ্রির কোনো সংকট নেই। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির সংকট ছিল বলে আমার মনে হয়েছে। ক্যাম্পগুলোতে সাড়া পড়ে গেল বাংলাদেশ থেকে তাদের ভাই এসেছে। তাদের এ সংকটকালীন সময়ে একাত্মতা প্রকাশের জন্য। সহানুভূতি প্রকাশের জন্য দেশী-বিদেশী বহু সাংবাদিক আমাকে সংবাদ সম্মেলন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমি সে অনুরোধকে যুক্তিযুক্ত মনে করিনি। আমি মনে করি পাকিস্তানের জনগণের এ সংকটময় মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে বলতে হবে - বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ তোমাদের বিপদে তোমাদের সঙ্গে আছে যা বলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং।

www.pathagar.com

আমি ঠিক জানিনা, হয়তোবা পাকিস্তানের জনগণ প্রত্যাশা করেছিল বাংলাদেশের কোনো বড় নেতা, রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীকে তারা এ সময় শান্তনা পাওয়ার জন্য তাদের পাশে পাবে। অনিবার্য কারণে তা সম্ভব হয়নি। তাই অগত্যা দুধের সাধ গোলে মিটিয়ে নিল পাকিস্তানের সংবাদপত্র জগত ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া।

সে যা হোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, সৌদি আরবসহ পাকিস্তানের বন্ধু দেশগুলো ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে ওঠতে সাহায্য প্রদান করেছে। রিলিফ ও পুনর্বাসন কাজ পরিচালনার জন্য ভারত ও চীন সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। যত হেলিকপ্টার প্রয়োজন ভারত ও চীন সরবরাহ করবে দুর্গত মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে তুলতে। পুনর্বাসন কাজে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা তখন পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারেনি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু আমার বিশ্বাস জন্মেছে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ এর নেতৃত্বে অর্থসংকট কোনো বড় সমস্যা হবে না। আমি ১৩ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। করাচি এবং ইসলামাবাদেও বহু মার্কিন ও ইউরোপিয়ান সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। সবক্ষেত্রেই আমার কাছে মনে হয়েছে আণবিক শক্তি অর্জনের পরও পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ পাকিস্তানকে একটি শান্তিবাদী দেশের ইমেজ তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন। এটা বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছে। পাকিস্তান সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যবাদ বিরোধী মানবকল্যাণে নিবেদিত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। আঞ্চলিক সমস্যাগুলোর ন্যায় সঙ্গত সমাধান পাকিস্তান একান্তভাবে কামনা করে।

৩১ অক্টোবর সকালে ইসলামাবাদ থেকে করাচিতে ফিরে এলাম। সকাল ১১ টায় আমার হোটেল কক্ষে সাক্ষাৎ করতে এলেন পাকিস্তান পিপল্স পার্টির কয়েকজন নেতা। তাদের নেত্রী বেনজীর ভুট্টো-নুসরাত ভুট্টো থাকেন দুবাইতে। জারদারী আছেন লন্ডনে। পাকিস্তান পিপল্স পার্টির নেতৃবৃন্দ জনগণের পক্ষ থেকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং আমার কোথাও পরিদর্শনের ইচ্ছা আছে কিনা জানতে চাইলেন। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে উত্তর দিলাম আর কোথাও পরিদর্শনের ইচ্ছা আমার নেই।

পরদিন ১ নভেম্বর সকাল ৭টায় করাচি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রার প্রাক্কালে নিউইর্য়ক ও ওয়াশিংটন সম্পর্কে লেখার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহে লিখতে হল পাকিস্তানের ৮ অক্টোবরের ভূমিকম্প সম্পর্কে। হয়তো একেই বলে নিয়তি। #

www.pathagar.com

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্লিপ্ততা দেশকে বন্ধুহীন রাষ্ট্রে পরিণত করবে

অতিসম্প্রতি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের পটভূমিতে ১৬ জন সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান বুশ প্রশাসনের কাছে প্রেরিত এক পত্রে বাংলাদেশের সন্ত্রাস পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন। একই সময় ঢাকাস্থ মার্কিন চার্জ দ্যা এফেয়ার্স একটি আলোচনা সভায় সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে - 'সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও দুর্নীতি দমনে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশকে ব্যর্থরাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে।' জাতীয় সংসদে স্পীকার জমিরউদ্দিন সরকার মার্কিন চার্জ দা এফেয়ার্সের বক্তব্যকে এখতিয়ার বহির্ভূত হস্তক্ষেপ বলে নিন্দা করেছেন।

জাপা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এই বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশকে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে তাদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে। সরকারকেই দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল বন্ধুরাষ্ট্রের উৎকণ্ঠা প্রশমিত করতে হবে।

www.pathagar.com

২০০১ সালের অক্টোবর মাসে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে দুই দলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করে। পার্লামেন্টারী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার প্রধানই তার নিজের চাহিদা ও বিবেচনা অনুসারে মন্ত্রিসভা গঠন ও দপ্তর বন্টন করে থাকেন। মন্ত্রিসভা গঠনের সময় অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হলেও অল্পসময়ের ব্যবধানে তাকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। তখন এ পদে স্বনামধন্য ব্যবসায়ী এম মোরশেদ খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কোন্ বিবেচনায় এবং কোন্ অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে মোরশেদ খানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছে সে বিষয়ে বেগম খালেদা জিয়াই ভাল জানেন।

এম মোরশেদ খান এদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়ী। একসময় তিনি জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৯১ সালের পর তিনি বিএনপি'র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। তবে আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে তার নিবিড় যোগসূত্র ছিল সব সময়ই। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করলে সে সময় তিনি মন্ত্রী পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূতের পদটি বাগিয়ে নিতে পেরেছিলেন। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগেএই দুই বিএনপি নেতা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের উত্তোলিত গ্যাস ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত দেন-দরবার করেছেন বলে রাজনৈতিক মহলে প্রচার ছিল। কথিত সেই দু'জনই পরবর্তী পর্যায়ে জোট সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হন।

৩টি ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে

প্রথমত: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় যোগদানের আগে ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী বোমা হামলা ও তথাকথিত মুসলিম মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের তার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার দায়িত্ব স্বীকার করানো। পাশাপাশি ১৬ জন কংগ্রেসম্যান ও সিনেট সদস্যের মার্কিন সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রদান ও বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়ে জাতিসংঘে আলোচনার এজেন্ডা সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয়ত: ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'দি ফান্ড ফর পিস' তাদের গবেষণার বিষয়বস্তুতে আফগানিস্তান ও আইভরিকোস্টের পাশাপাশি বাংলাদেশকেও একই সারিতে শামিল করা।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত: বাংলাদেশস্থ মার্কিন কূটনীতিকের উত্থাপিত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তব্য এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পীকার জমিরউদ্দিন সরকারের এ সংক্রান্ত রুলিং।

১৬ জন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও সিনেট সদস্যের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, বেগম খালেদা জিয়া সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে তারা মোটেও সন্তুষ্ট নন। যদিও আমরা এ বক্তব্যকে প্রেসিডেন্ট বুশ প্রশাসনের বক্তব্য নয় বলে মনে করতে পারি। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, মার্কিন রাষ্ট্রযন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে সরকারের ব্যর্থতা, সীমাহীন উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতার কারণে আমাদের ব্যাপারে এই বিভ্রান্তি দানা বেঁধেছে। ১৬ জন কংগ্রেসম্যান ও সিনেট সদস্য যে অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধে এনেছে, প্রকারান্তরে তা দেশের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করেছে। বেগম খালেদা জিয়ার সরকার সে অভিযোগ খন্ডন করে সরকারের সুশাসনের কথা ও দেশের পক্ষে অন্য দু'জন কংগ্রেসম্যান ও সিনেট সদস্যের বক্তব্য কেন পাল্টাভাবে উপস্থাপন করতে পারলেন না? এর দায়ভার কে বহন করবে? এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা ও নিষ্ক্রিয়তাই যদি দেশকে মাথা পেতে নিতে হয়, তাহলে জনগণের শত শত কোটি টাকা খরচ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই 'শ্বেতহস্তি' পোষার আদৌ কোনো যৌক্তিকতা আছে কি?

'দি ফান্ড ফর পিস' একটি ওয়াশিংটনভিত্তিক বেসরকারি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশে যদি কোনো কোরিয়ান একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে তার মালিক কোরিয়ান। কিন্তু বিশ্ববাজারে তার উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশী পণ্য হিসেবে গণ্য হবে। ঠিক একইভাবে ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানটি কার স্বার্থে, কি উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে 'সন্ত্রাসী-মৌলবাদী রাষ্ট্র' হিসেবে আখ্যায়িত করতে চাচ্ছে আদৌ এর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে হবে।

রাজনৈতিক মহলকেই এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংঘাত ও জাতীয় স্বার্থের পরিধির গভীরতা কতটুকু তা বোঝাতে আমি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জেল থেকে তার কন্যা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রেরিত একটি পত্রের অংশ বিশেষ

www.pathagar.com

থেকে উদ্বৃতি তোলে ধরতে চাই। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বহু গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে কারাবন্দি করা হয়। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রী রাজা গোপালচারী, ব্যারিস্টার আসাফ আলী, ডাঃ রাধা কৃষ্ণসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের এলাহাবাদ জেলে এনে বন্দি রাখা হয়। ১৯৪২ সালে এলাহাবাদ জেলে বসেই পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু তার কন্যাকে যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি উল্লেখ করেন -

> 'যুদ্ধ বাধান হয় শাসকগোষ্ঠী ও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য। কিন্তু প্রচার করা হয় জাতীয় স্বার্থরক্ষার কথা বলে। সাধারণ মানুষ বুঝতেও পারে না, কি লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুদ্ধ হচ্ছে। এমনকি সেনাসদস্যরা যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর ফিরে আসে না পরিবারের মাঝে, যাকে স্ত্রীর পাশে আর দেখা যায় না, ডাক শোনে না পুত্র কন্যাদের, তারাও জানে না কি কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের জীবন দিতে হচ্ছে।'

পন্ডিত জওহরলার নেহেরু আরও লিখেছেন -

> 'যুদ্ধ শুধুমাত্র বিভীষিকার প্রতীক। মানব সভ্যতার জন্য অকল্যাণকর।'

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'দি ফান্ড ফর পিস', তাদের বিভিন্ন বক্তব্যের মধ্যে একটি জায়গায় উল্লেখ করেছেন নিজ দেশের নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সেদেশের সরকারের। সে কাজে তারা ব্যর্থ হলে 'আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ শুধু বৈধই নয় তা বাঞ্ছনীয়ও বটে'।

অত্যন্ত বিচক্ষণ ও সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ওয়াশিংটনভিত্তিক এই গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান 'দি ফান্ড ফর পিস' আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি সংগঠন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়া এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রথমত: কিছু লোকের চিন্তার ফসল হিসেবে এর উৎপত্তি হয়। পরে পরিকল্পনা, অর্থ যোগান এবং সবশেষে লক্ষ্য অর্জনে কর্মকান্ড চালানো হয় সমন্বিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে।

'দি ফান্ড ফর পিস'-এর পরিকল্পনাকারীরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে বেছে নিয়েছে পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের মত গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

স্থানকে। এ সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ দু'বছরের বেশি নয়। এর আগেও এ সংগঠনটি মোট ১২টি কারণে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ করা চলে বলে অভিমত প্রকাশ করে। কিন্তু এ সংগঠনটির আত্মপ্রকাশের পূর্বেই এ ধরণের অভিযোগের ভিত্তিতে আমাদের প্রতিবেশি শক্তিশালী রাষ্ট্রটি হস্তক্ষেপ করে অন্য রাষ্ট্র গ্রাস করারও দৃষ্টান্ত রয়েছে।

জওহরলাল নেহেরুর আমলে স্বাধীন হায়দরাবাদে ভারত সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল হায়দরাবাদের নিজামের ব্যর্থশাসনের কথা উল্লেখ করেই। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সিকিমে সৈন্য প্রেরণ করেছিল রাজার কাছ থেকে গণতন্ত্র রক্ষার কথা বলে। শেষপর্যন্ত সিকিমকে গ্রাস করেই ফেলে ভারত। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভেতর থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। ঢাকাস্থ মার্কিন চার্জ দ্য এফেয়ার্স-এর প্রদত্ত বক্তব্যকে আমার কাছে মনে হয়েছে সরকার ও জনগণকে সার্বিক বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ার মত।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিক্সন সরকার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও ডেমোক্রেটরা ও মার্কিন জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। সে সময়ের বিশ্ব পরিস্থিতিও ছিল ভিন্নরকম। পরবর্তী পর্যায়ে মার্কিন নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলাদেশকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা। দীর্ঘসময় বাংলাদেশকে কোটা সুবিধা প্রদানের মধ্যদিয়ে এ নীতি প্রতিফলিত হয়। ইসরাইল, মিসর, পাকিস্তানের পরই বাংলাদেশ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক আনুকূল্য লাভকারী দেশগুলোর একটি। বহু ধরনের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের মুখোমুখি হয়েও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশকে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মার্কিন জনগণ ও তার বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তোলার এ প্রয়াস ছিল নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস রাজনৈতিক দলগুলোকে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে গঠনমূলক ঐক্য প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য কোনো জাতীয় প্রশ্নেই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব একসঙ্গে বসে একপেয়ালা চা পান করার সৌজন্যবোধটুকুও প্রদর্শন করতে পারেনি।

www.pathagar.com

১৭ আগস্টের দেশব্যাপী বোমা হামলা, ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের ওপর বোমা হামলা, সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এস এম এস কিবরিয়া হত্যাকান্ড এবং ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করেছে। কিন্তু সরকারে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় ভাবমূর্তিকে পুনরুদ্ধারের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এমনকি বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-এর মত জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব একসঙ্গে বসতে পারেননি। এর দায়ভার সরকার প্রধান হিসেবে বেগম খালেদা জিয়াকেই বহন করতে হবে।

১৭ আগস্টের দেশব্যাপী বোমা হামলার পর সুনির্দিষ্টভাবে প্রস্তাব করেছিলাম দেশের স্বার্থে উপযুক্ত পার্লামেন্ট সদস্যদের নিয়ে পশ্চিমা বন্ধুরাষ্ট্রসমূহকে বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে। আমি যাদের নাম উল্লেখ করেছিলাম তারা হলেন - ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, ওসমান ফারুক, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, তোফায়েল আহমদ, শ্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, জি এম কাদের প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ। এমনকি প্রয়োজন মনে করলে তরুণ মাহি বি চৌধুরীকেও সঙ্গে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও ভারতের বিভিন্ন দলের নেতা ও সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্যও আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবেই বলেছিলাম।

এই সাধারণ একজন রাজনৈতিক কর্মির বক্তব্য সরকার প্রধানের কর্ণকুহুরে প্রবেশ করেনি। কিন্তু জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের পর তিনি হয়তোবা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন তিনি দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন করেছেন। আর তা পুনরুদ্ধারে সর্বদলীয় জাতীয়ভিত্তিক ও গঠনমূলক ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্লিপ্ততা দেশকে বন্ধুহীন রাষ্ট্রে পরিণত করবে'। এক্ষেত্রে সরকার প্রধান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়ভারই প্রধান। তাই সমালোচনার জন্য নয়, পর্যালোচনার জন্য কতগুলো ঘটনার উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ২০০১ সালে বেগম খালেদা জিয়া-নিজামী সাহেবরা ক্ষমতায় আসার পর সকলেই মনে করেছিল বাংলাদেশের সঙ্গে

www.pathagar.com

ওআইসি'র সম্পর্ক ভাল হবে। কিন্তু কোনোপ্রকার সমীক্ষা, গ্রাউন্ড ওয়ার্ক ছাড়াই বাংলাদেশ ওআইসি'র মহাসচিবের পদপ্রার্থী হয়ে জয়লাভে ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যেও বাংলাদেশ সরকার আস্থা হারিয়েছে। সর্বোপরি মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও সিনেটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা বাংলাদেশের সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূখর হয়ে পড়েছে। মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যের প্রতীক সউদী আরব সরকারের কাছে প্রেরিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ১০ মাসেও পরিচয়পত্র উপস্থাপন করতে পারেনি। বর্তমানে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসে কোনো রাষ্ট্রদূত নেই। এ থেকেই প্রমাণিত হয় বাংলাদেশ সরকার মার্কিন কূটনৈতিক দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারপরও সরকার চলছে গড্ডালিকা প্রবাহে। আগামী ২০০৬ সালের ১ অক্টোবর পর্যন্ত এভাবেই চলবে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের আত্মজীবনী 'মাই লাইফ'-এর একটি উপমা উপস্থান করতে চাই।

সুধী সমাজ নিশ্চয় আবগত আছেন - ১৯৯১ সালে ইউরোপের মূল ভূখন্ডে বসনিয়া সমস্যার সূত্রপাত হয়। বসনিয়ার জনবসতির ৪৫ ভাগ মুসলমান। বসনিয়ার রাজনৈতিক সমস্যা মূলত ধর্মীয় দ্বন্দ্ব। ইতিহাসবিদরা ভাল করেই জানেন - ইউরোপে তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মিলনস্থল হচ্ছে এই বসনিয়া। পশ্চিম থেকে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য এখানে এসেছিল ক্যাথলিক হলি রোমানরা। পূর্ব থেকে এসেছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা এবং দক্ষিণ থেকে অটোমান সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য মুসলমানরা। পরিসংখ্যান অনুসারে এককভাবে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়। এখানে সার্ব জনসংখ্যা ছিল ৩০ ভাগ এবং ক্রোয়েটরা ১৭ ভাগ। কিন্তু মুসলমানরা ছিল অস্ত্রবলে দুর্বল এবং ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র ও নেতাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। যখন বসনিয়ায় মুসলমানরা গণহত্যার শিকার হচ্ছিল তখন শত আবেদন-নিবেদনের পরও সাধারণ বসনিয়ার মুসলমানাদের রক্ষায় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। বৃটেন ও ফ্রান্স মানবাধিকারের কথা বললেও নিরীহ বসনিয়ার মুসলমানদের রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ভূমিকা গ্রহণে কৌশলে বাধা দিয়ে আসছিল এবং সময় ক্ষেপণের মধ্যদিয়ে মুসলিম গণহত্যাকে সহযোগিতা করে চলেছিল।

www.pathagar.com

তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ভাষায় 'অনেক ইউরোপিয়ান নেতাই চাচ্ছিল না বলকানের হৃৎপিন্ডের ওপর নতুন করে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম হোক।' আজকের প্রেক্ষাপটে ঠিক একইভাবে অনেকেই চাইবে না বাংলাদেশ একটি আধুনিক মুসলিম রাষ্টের মর্যাদা গ্রহণ করে এই অঞ্চলের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হোক। আর সে কারণেই বাংলাদেশকে মৌলবাদী ব্যর্থরাষ্ট্র বলা হচ্ছে। সুদূর লন্ডনে বসে গাফ্‌ফার চৌধুরী সাহেবরা লিখছেন - 'বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করার ষড়যন্ত্র চলছে। সেজেগুজে গিয়েও বেগম খালেদা জিয়া মার্কিনীদের মন জয় করতে পারেননি।' মুনতাসির মামুনরা লিখেছেন - বাংলাদেশের ৪০ ভাগ লোক মৌলবাদী।

আর কৌশলে সরকারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা তাঁবেদাররা নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করে শত্রুদের বাংলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিচ্ছে। আমি মনে করি এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন ও জনগণ বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। কারণ আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের ৮৫ ভাগই হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে। অনুদানের ৭০ ভাগ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের কাছ থেকে।

পরিশেষে আমি সরকার ও জনগণকে সতর্ক করে বলতে চাই - পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই নির্লিপ্ততা দেশকে বন্ধুহীন রাষ্ট্রে পরিণত করবে এবং একসময় দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপরও তা চরম আঘাত হানতে পারে। #

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন প্রসঙ্গ

২০০৫ সালের ৯ মে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন নিয়ে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে সবচেয়ে বেশি লেখা-লেখি হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। আমি কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষক নই, একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মি। কিন্তু বহুদিন ধরে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে ভিন্ন ভিন্ন মত একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় থাকতেই পারে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচন নিয়েও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়ন থাকাটাই স্বাভাবিক। আমি সেদিকে যেতে চাই না। আমি আমার দৃষ্টিতে এই নির্বাচনের রায় ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে দু'একটি কথা উপস্থাপন করছি।

১৯৯৬ সালে বিএনপি পরাজিত হলে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহম্মেদ আমাদের সামনে একটি চমৎকার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন - 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে জনমত প্রধানত দু'টি ধারায় বিভক্ত। একটি আওয়ামী লীগের পক্ষে, অন্যটি আওয়ামী লীগ বিরোধী। আওয়ামী বিরোধী জনমত মূলত ৩টি রাজনৈতিক উপধারায় বিভক্ত। বেগম খালেদা জিয়ার জাতীয়তাবাদী ধারা, পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয়তাবাদী ও প্রশাসনিক সংস্কারের ধারা এবং ইসলামি শক্তির ঐক্যবদ্ধ ধারা। এই তিনটি শক্তিই মূলত আওয়ামী বিরোধী প্রধান শক্তি।'

২০০১ সালে এই শক্তিগুলোর মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ২০০৫ সালের ৯ মের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে এই তিনটি ধারার সমন্বয় না হওয়াতেই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মীর নাসির উদ্দিনের ভরাডুবি হয়েছে। শহীদ জিয়াউর রহমানের রক্তের দাবি ও সমন্বয়ের রাজনীতি জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা পড়ে গেছে।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে এই নির্বাচনের ফলাফল ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের জাতীয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে কি না?

আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে চাই আগামি ২০০৬ সালে যে পটভূমিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই পটভূমি ও সমন্বয়হীনতা থাকলে এর প্রভাব অবশ্যই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে।

গত ২ এপ্রিল চট্টগ্রাম লালদীঘি ময়দানে জাতীয় পার্টির জনসভা ছিল। এ জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। জনতার মাঝখান থেকে বারবার দাবি তোলা হয়েছিল সিটি কর্পোরেশনে জাতীয় পার্টির চট্টগ্রাম মহানগরীর আহ্বায়ক সোলায়মান শেঠ'কে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে মেয়র পদপ্রার্থী ঘোষণা দেয়া হোক। কিন্তু আমাদের বিচক্ষণ পার্টি প্রধান পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সবদিক বিবেচনা করে কৌশল নির্ধারণ করেন। আমরা ত্রি-মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে দ্বি-মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র উন্মোচন করি। কিন্তু তারপরও আওয়ামী বিরোধী ৩টি ধারার জনমতকে মীর নাসিরউদ্দিন কাজে লাগাতে পারেনি।

গত সংসদ নির্বাচনে এই এলাকায় আওয়ামী লীগ বিরোধী ভোট ছিল ১ লক্ষের বেশি। এবার কমেছে ১ লক্ষ অর্থাৎ গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৫০% ভোট

www.pathagar.com

পেয়েছেন মীর নাসিরউদ্দিন। পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টির নিরব ভূমিকা ও ইসলামী শক্তির সঙ্গে সমন্বয়হীনতাই এর কারণ বলে আমি মনে করি।

আমার বিবেচনায় যেকোন নির্বাচনে প্রার্থী একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনে প্রধান দুই প্রার্থীর মানসম্পর্কে পর্যালোচনা করলে পরিষ্কারভাবেই বলা চলে মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী গণ-মানুষের কাছের লোক। মাটি ও মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক মীর নাসিরের চেয়ে অনেক বেশি নিবিড়। যতবার পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম গিয়েছি প্রতিবারই মহিউদ্দিন চৌধুরী আমাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ছুটে এসেছেন। তিনি আমাদের দলও করেন না, আমাদের আদর্শেও বিশ্বাসী নন। কিন্তু তার এই সৌজন্যমূলক আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

গত ২ এপ্রিল লালদীঘি ময়দানের জনসভা শেষ করে আমি এবং শফিউল আলম প্রধান রাতেই ঢাকায় ফিরে আসি। দলের চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার ও চেয়ারম্যান-এর রাজনৈতিক সচিব কাজী ফিরোজ রশিদ কক্সবাজার সম্মেলনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামেই থেকে যান।

শফিউল আলম প্রধানের কিছু কিছু অদ্ভুত আচরণ আছে। যেমন তিনি সিগারেট ও চা-পানে খুববেশি অভ্যস্ত। সে রাতেও তার কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। এর ফাঁকে ফাঁকে রিক্সা চালক, বাসের হেলপার, চা'র দোকানের কর্মচারি, পথচারি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিজের পরিচয় গোপন রেখে স্থানীয় নেতাদের সম্পর্কে, দলের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে থাকেন। সে রাতে আমরা প্রায় ৭০ জন বিভিন্নশ্রেণী পেশার লোকের সঙ্গে কথা বলি। দু'-চার জন ছাড়া প্রায় সকলেই বললেন - মীর নাসির উদ্দিন দীর্ঘদিন যাবত জনবিচ্ছিন্ন এবং মন্ত্রী হয়ে কিছুটা অহংকারীও হয়ে উঠেছেন। পক্ষান্তরে মহিউদ্দিন চৌধুরী সম্পর্কে তাদের মতামত, জানাজা থেকে শুরু করে বিয়ের অনুষ্ঠান পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রামের সব শ্রেণীপেশার মানুষের সঙ্গেই যুক্ত থাকেন। আর সোলায়মান শেঠ সম্পর্কে অভিমত রাজনীতিতে নবাগত কিন্তু সম্ভ্রান্ত পরিবারের সৎ চরিত্রের ব্যাক্তি।

চৌদ্দগ্রামের একটি হোটেলে গাড়ী থামিয়ে আমরা চা পান করছি। নিজেদের অভিজ্ঞতা ও নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে করতে শফিউল

www.pathagar.com

আলম প্রধান ভাই বললেন - 'এই নির্বাচনে মহিউদ্দিন চৌধুরী জিতলেও জয়লাভ করবে, আবার পরাজিত হলেও জয়লাভ করবে।'

আমি অবশ্য জামায়াতে ইসলামী'র সাংগঠনিক শক্তির কথা তুলে ধরেছিলাম। প্রধান ভাই বললেন - 'জনমতকে পাশ কাটিয়ে বা উপেক্ষা করে শুধুমাত্র সাংগঠনিক শক্তি ও প্রশাসনিক বা অর্থনৈতিক শক্তি দিয়ে কোনোদিনও জয় লাভ করা যায় না।'

তরুণ তারেক রহমানসহ সরকারি পক্ষের মহারথীগণ চট্টগ্রামে এসে চেষ্টা করেও পরাজিত হয়েছেন। এখন বলছেন স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে না। আমি বলি চট্টগ্রামের নির্বাচনের ফলাফল বেগম খালেদা জিয়া ও নিজামীর জন্য ২নং বিপদ সংকেত।

১নং বিপদ সংকেত অনেক আগেই অতিবাহিত হয়েছে। প্রয়োজন হলে তার ব্যাখ্যা আমি দেব। চট্টগ্রামের সিটি কর্পোরেশনের পরাজয়কে আমি বেগম খালেদা জিয়া ও নিজামী সাহেবদের ২নং বিপদ সংকেত হিসেবে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাব। #

www.pathagar.com

জাতীয় নির্বাচন ২০০৭
সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের আন্দোলন

৩১ মার্চ মুনতাসির মামুন ও ১ এপ্রিল এ বি এম মুসা ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারে প্রকাশিত প্রবন্ধে সুশীলসমাজের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন। ঢাকার একটি পাঁচ তারা হোটেলের হল রুমে সুশীল সমাজের মহারথীদের এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ ইউনুসসহ সমাজের গুণীজনেরা। তারা উপলব্ধি করেছেন, দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবি। এ সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকতে পারে অন্তত আমার কাছে তা মনে হয়নি। কারণ পাঁচবার একটি দেশ বিশ্ব দরবারে দুর্নীতিতে এক নম্বর অবস্থান গ্রহণ করলে রাজনীতিতে সৎ

www.pathagar.com

লোকের নেতৃত্ব গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিকভাবেই জাগতে পারে। আর দিনের পর দিন শুধু গলাবাজি করে সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কাজের জন্য জনগণের কল্যাণের জন্য কোনো পদক্ষেপই নেয়া হচ্ছে না। এই গোলকধাঁধার আবর্তে যোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বে নিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা সুশীল সমাজেরতো বটেই আপামর জনগণের মধ্যেই জাগতে পারে।

কিন্তু প্রথমেই এই সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের আন্দোলনের বিরোধিতা করলেন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। কানের চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেই তিনি বললেন এই সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব সম্পর্কে জনগণই সিদ্ধান্ত নিবেন তাদের যোগ্যতা কি এবং কতটুকু। তারপর মুনতাসির মামুন, এ বি এম মুসার মতো প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা মত প্রকাশ করলেন শুধুমাত্র সততা ও যোগ্যতা থাকলেই হবে না। বিশেষ মহলের প্রতি আনুগত্যও থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে দূর্নীর্তিবাজ, কালোবাজারী, সন্ত্রাসী কিংবা অযোগ্য হলেও ক্ষতি নেই। মুনতাসির মামুন অনেক কথাই বলেছেন - বিশেষকরে সেনাবাহিনীর সদস্যদের সম্পর্কে তার বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে। সেনাবাহিনীর কারণেই বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর মতো দল আজ ক্ষমতায়। অবশ্য জাতীয় পার্টি সম্পর্কে তিনি পালন করেন পুরোপুরি নিরবতা। তিনি লিখেছেন - সেনাবাহিনীর অত্যাচারের কারণেই ২০০১ সালের নির্বাচনে হিন্দু সম্প্রদায় ভোট দিতে পারেনি। কিন্তু কোন্ কোন্ জেলায় কোন্ কোন্ কেন্দ্রে হিন্দুরা ভোট দিতে পারেননি সে সম্পর্কে তার কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই। শুধুমাত্র সেনাবাহিনীবিরোধী নেতিবাচক প্রপ্রাগান্ডার জন্যই তার এ বক্তব্য। মুনতাসির মামুনের বক্তব্য যদি সঠিক হয় অর্থাৎ সেনাবাহিনী স্বাধীনতার পক্ষ শক্তিকে পরাজিত করানোর জন্য হিন্দু সম্প্রদায়কে ভোট দিতে বাধা দিয়ে থাকে তাহলে মুনতাসির মামুনের কথা মতো শেখ হাসিনাই স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির প্রধান ব্যক্তিত্ব।

শেখ হাসিনা নির্বাচিত হন গোপালগঞ্জ জেলার 'কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া' থানার সমন্বয়ে গঠিত গোপালগঞ্জ-৩ আসন থেকে। এই নির্বাচনী এলাকায় ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১,৮৬০০০জন। ১৭টি ইউনিয়ন ও দুটি পৌরসভা নিয়ে এই নির্বাচনী এলাকা গঠিত। এরমধ্যে কোটালীপাড়ার ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪টিতে

www.pathagar.com

দু'একজন মুসলমান ছাড়া বাকি সবাই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। যথা (১) রামশীল (২) কলাবাড়ি (৩) বান্ধাবাড়ি (৪) সাদুল্লাপুর এবং (৫) টুঙ্গিপাড়া থানায় ১টি গোপালপুর ইউনিয়ন। এ ৫টি ইউনিয়নে ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ভোট পেয়েছেন ৯৮.০২ ভাগ। অর্থাৎ এই অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই শেখ হাসিনাকে ভোট দিতে সক্ষম হয়েছেন এবং তিনি ২০০১ সালে পেয়েছেন ১,৫৬,০০০ ভোট অর্থাৎ ৮৩ ভাগ। ঠিক তেমনি করে গোপালগঞ্জ-২ এর মধ্যে সাতপাড়া ও ঘাইন্দা সুর এলাকাটি ১০০ ভাগ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী শেখ সেলিম ভোট পেয়েছেন ৯৫ ভাগের বেশি। ঠিক তেমনি বাগেরহাট-৩ আসন চিতলমারী, মোল্লাহাট এলাকা নিয়ে গঠিত চিতলমারী থানার একটি ইউনিয়নের নাম বানিয়ার চং। এই ইউনিয়নে শেখ হেলাল ভোট পেয়েছেন ৯৫ ভাগেরও বেশি। এই ইউনিয়নে ১০০ ভাগ হিন্দু ভোটার।

উপরোল্লেখিত পরিসংখ্যান থেকে প্রমাণিত হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সেনাবাহিনী ভোট দিতে বাধা দিয়েছে বক্তব্য সঠিক নয়।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না আমাদের দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিতে 'সেনাবাহিনীর গোড়াপত্তন এবং সেনাবাহিনী ব্যক্তি বিশেষের নয়, দেশের মর্যাদা সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে কেন দেখতে চান না?'। সেনাবাহিনী সম্পর্কে মুনতাসির মানুনের এই মূল্যায়ন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন বা অব-মূল্যায়ন ছাড়া আর কি হতে পারে। সর্বোপরি ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যকে সেনাবাহিনী প্রধান রাখার পরও সে সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রতি অনুগত থেকেছেন। দেশপ্রেমিক এই সেনাবাহিনী সম্পর্কে মুনতাসির মামুনদের মত বুদ্ধিজীবীদের কাছে দেশবাসী সহনশীল ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণই প্রত্যাশা করে। দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি এখানেও ঢালাওভাবে ব্যবহারের বিষয়টি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর এটাকে মুক্তবুদ্ধিচর্চার ছদ্মাবরণে জাতির প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও তামাশা দেখানোর মত আচরণ ছাড়া অন্যকিছু কল্পনাও করা যায় না।

www.pathagar.com

এ বি এম মুসা লিখেছেন - 'সৎ ও যোগ্য লোক নির্বাচিত হয়ে আসলেও সংসদ সদস্যরা ৭০ অনুচ্ছেদ খড়গের কারণে কিছুই করতে পারে না।' তার এই বক্তব্য থেকে বের হয়ে এসেছে সম্ভাবনাময় দলগুলোর বর্তমান নেতৃত্ব সৎও নয়, যোগ্যও নয়। তিনি আরো লিখেছেন - 'সুশীলসমাজের সমন্বয় করার জন্য যে ২৪ জনের কমিটি হয়েছে তারা একমত হতে পারবেন না।' আমার কাছে মনে হচ্ছে তিনি কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

আমি সুশীল সমাজের সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সঠিক ও সময়োপযোগী বলে মনে করি এবং বিশ্বাসকরি Hope for the best। আজ যা হবে না, আগামীকাল তা হতেও পারে। #

www.pathagar.com

দাতা ও প্রভাবশালী বন্ধু দেশগুলোর ভূমিকা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দাতা ও প্রভাবশালী বন্ধু দেশগুলোর প্রতিনিধিদের আচরণ ও ভূমিকা ভাইরাসের মতই। তারা সবসময়ই ডিকটেড করতে পছন্দ করে। একদিকে তারা গণতান্ত্রিক শাসন ও আইন শৃঙ্খলারক্ষার কথা বলে। অন্যদিকে মানবাধিকারের সার্বজনিন চেতনার ভিত্তিতে কঠোর শাসন ও শৃঙ্খলার বিরোধিতা করে। এটাকে দ্বৈত চরিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ বলা চলে। প্রকৃত অবস্থা দাঁড়ায় তারা "চোরকে বলে চুরি করতে এবং একইসঙ্গে গৃহস্তকে বলে সজাগ থাকতে"। এর মধ্যে নিজেদের স্বার্থ ও প্রভাব বলয় সৃষ্টিই তাদের মূল লক্ষ্য।

দাতারা সাধারণত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে চীন ও ভারত ছাড়া অন্য কারো সঙ্গেই সেই অর্থে সমীহ আচরণ করে না। তবে আচরণের ডিগ্রীর তারতম্য লক্ষ্য করা যায় ভিন্ন দেশে ভিন্ন আঙ্গিকে। পাকিস্তান, বার্মা, সৌদি আরবেও তাদের খবরদারি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মত দেশে সেটা অনেকটা নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের মতই মনে হয়। আমাদের দেশের ৩৭ বছরের শাসনকালের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ব্যর্থতা ও সফলতা নিয়েই। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ

www.pathagar.com

মুজিবুর রহমান এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে বাদ দিলে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার সফলতা এবং ব্যর্থতা। একটি প্রবাদ গ্রামে-গঞ্জে প্রচলিত আছে 'অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই'। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অভিজ্ঞতার কোনোই দরকার নেই। বিভিন্ন সূত্রে শুনা যাচ্ছে এই তিন নেতাই রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি থেকে হাতগুটিয়ে নিয়েছেন।

অন্যদিকে দুই নেত্রীর বিরুদ্ধেও চলছে আইনী ব্যবস্থা। বলা হচ্ছে কোন ব্যক্তিই আইনের উর্ধ্বে নয়। '১৪ কোটি মানুষ তা বিশ্বাস করে। কিন্তু এই তিন নেতার শূন্যতা কার স্বার্থে? এই তিন নেতার অভিজ্ঞতার শূন্যতা পূরণ মনে হয় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার প্রধানসহ প্রায় সকলেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পক্ষে।

ভিন্নমতও থাকতে পারে। কিন্তু প্রকাশ্যে তার কোন অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ থেকেই দেশবাসী আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য দেশব্যাপী ঘরোয়া রাজনীতি চালু করে দেয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এখন রাজনৈতিক দলের নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকরণের প্রসঙ্গটি সামনে চলে এসেছে। এর দু'টি দিক খোলাসা করা দরকার।

প্রথমত রাজনৈতিক দলগুলোকে আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রণ করা যা অনেক সময়ই নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত যে সব রাজনৈতি দল দলগতভাবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিবে তারা নির্বাচনে এক পারসেন্ট ভোট না পেলে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনকৃত দলের মর্যাদা হারাবে। মনে রাখতে হবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বাদে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রধান ৩টি রাজনৈতিক দলই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানই বিএনপি'র নেতা-কর্মিদের আস্থার স্থান। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানারাই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মিদের আস্থাভাজন নেতা। আর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ও বেগম রওশন এরশাদই হচ্ছে জাতীয় পার্টির মূল নেতা। এদের বাদ দিয়ে কিংবা পাশ কাটিয়ে- বি.চৌধুরী, ড. কামাল হোসেন, কর্ণেল অলি, মান্নান ভূঁইয়া, আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীসহ অনেকের পক্ষেই জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা পালনতো দূরের কথা নিজেদের নির্বাচনী আসনটিও রক্ষা করতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। সেক্ষেত্রে

www.pathagar.com

১৫১টি আসনে জয়লাভের কোনো প্রশ্নই উঠে না। তাই তাদের প্রস্তাবিত সংস্কার প্রকৃত অর্থেই তাৎপর্যহীন। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে মনে রাখা দরকার উল্লেখিত নেতৃবৃন্দ কখনও একটি ছোট দলেরও মূল নেতা ছিলেন না। তাদের অবস্থা ছিল মূল নেতার হুকুম তামিল করা কিংবা পাশে বসে শোভাবর্ধন করা। এ জাতীয় ব্যক্তিদের দিয়ে কখনোই গণতান্ত্রিক পথে একটি বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই উপরোক্ত নেতাদের প্রত্যাশা বর্তমান সরকার (সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক/অন্তবর্তীকালীন সরকার) তাদের প্রশাসনিক এবং আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে দলীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করাবেন এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তারা জনগণের মুখোমুখি হবেন। এ প্রত্যাশা সরকার প্রধানের জাতির কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকারের পরিপন্থি। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তা হলো দলীয় রাজনৈতিক সংস্কার অর্থহীন নয় কিন্তু যা দেশের জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন তা হলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংস্কার।

রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ও প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকারের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও জবাবদিহিতামূলক ভারসাম্যের অনুপস্থিতি বিগত সরকারগুলোর শাসনামলে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারিতা ও দৌরাত্ম দেখার অভিজ্ঞতাও আমাদের অনেক হয়েছে। এই এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য চাই জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থা। পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে এক ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিহত করার পথ আছে। কিন্তু গত ৩টি আমলে সে ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারেনি। এমনকি দলীয় পার্লামেন্টারী পার্টিতে মূল নেতৃত্বের বিপক্ষে কোনো গঠনমূলক আলোচনা বা পর্যালোচনারও সুযোগ নেই। আজকের অনেক বিপ্লবী সংস্কারপন্থি নেতার মুখে শোনা যাচ্ছে ৫০ বছরের জন্য জাতির নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ হয়েছে। চাটুকারিতার সে বাহার দেখলে গরু-ছাগলও লজ্জা পেত।

১৯৮২ সালের পর আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। আজও সেনাবাহিনী গণতন্ত্র, সু-শাসন ও জাতীয় স্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সে কারণেই সংঘাতময় রাজনীতির অবসানের লক্ষ্যে রাজনীতিবিদ, বিচারপতি ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে শাসনতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংহত করতে হবে এবং একমাত্র এই প্রক্রিয়াতেই একব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা ও দূর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

www.pathagar.com

আমরা মনে করি ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠন সময়ের দাবি। মহামান্য রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে ৭ সদস্যের এই সিকিউরিটি কাউন্সিলে থাকবেন: (১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, (২) মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা, (৩) প্রধান বিচারপতি (৪) সেনাবাহিনী প্রধান, (৫) নৌ-বাহিনী প্রধান ও (৬) বিমান বাহিনী প্রধান। রাজনীতিবিদ, বিচারপতি ও সেনাবাহিনীর এই সমন্বয়ের উদ্দ্যোগের মধ্যে টেক্সই গণতান্ত্রিক কাঠামো, দূর্নীতি প্রতিরোধ ও একব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতামূলক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপররিসীম। আর এভাবে গঠিত ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সুরক্ষার গ্যারান্টি ক্লোজ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

আমাদের দেশের ৩৭ বছরের শাসনামলে আমরা কৃষক-শ্রমিকের পক্ষে অনেক কথাই বলেছি। কিন্তু কৃষক-শ্রমিকের কাছে শাসনব্যবস্থার সুফল পৌঁছে দিতে পারিনি। সেই লক্ষে জেলা ও উপজেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হলেও তার স্থায়িত্ব ছিল অত্যন্ত কমসময়।

অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদের হাতেও কোন আর্থিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। আজ দেশের এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সত্যিকার কল্যাণ সাধন করতে হলে ইউনিয়ন পরিষদকে উন্নয়ন বাজেট থেকে বরাদ্দ দেয়া ছাড়া অন্যকোনো বিকল্প নেই। আমরা ইউনিয়ন পরিষদকে উন্নয়ন বাজেট থেকে প্রতি বছর এক কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দিয়ে কৃষক ও গ্রামোন্নয়নে এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়ে ২০০৮ সালের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টিকে এ মুহূর্তে অতিজরুরি মনে করি। আর এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা সম্ভব বলে দেশবাসী মনে করে। #

www.pathagar.com

মেধাশূন্য জাতীয় সংসদ

২০০৫-২০০৬ সালের জাতীয় বাজেট ৯ জুন জাতীয় সংসদে উত্থাপন করলেন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। এ বার নিয়ে তিনি ১১ বার জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপন করলেন। বাংলাদেশের প্রথম অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ সালের জাতীয় বাজেট দেয়া হয়েছিল ৭৮০ কোটি টাকার, আর এ বার বাজেট দেয়া হয়েছে ৬৪ হাজার কোটি টাকার। অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এ বারের বাজেট সবচাইতে বড় জাতীয় বাজেট। স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল চলতি অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যনির্ভর যুক্তি ও উপাত্তের উপর ভর করে সম্মানিত সদস্যরা সংসদীয় ধারার উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন এ অধিবেশনে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ অধিবেশন বর্জনের মাধ্যমে বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় দায়িত্ব পালনে

www.pathagar.com

চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল জাতীয় পার্টিসহ অন্যান্য বিরোধী দল বাজেট অধিবেশনে অংশ নিয়েছে এবং টি এম ফজলে রাব্বি চৌধুরী, জিএম কাদের, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, মাহি-বি চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে জাতীয় সংসদকে প্রাণবন্ত করেছে। এর সঙ্গে এডভোকেট আব্দুল হামিদ, আব্দুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেন গুপ্তসহ আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারিয়ানরা অংশগ্রহণ করলে জাতীয় সংসদ অনেক সচল ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারত।

আমি সরকার পক্ষের সংসদ সদস্যদের বক্তব্য ও উপস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছি। কিন্তু জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বাজেট অধিবেশনেও তাদের উপস্থিতির নেতিবাচক চিত্র ও বক্তব্যের গুণগতমান আমাদের বিশেষভাবে মর্মাহত করেছে। সংসদে অনুপস্থিত আওয়ামী লীগকে তীব্রভাবে আক্রমন ছাড়া বাজেটের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর ওপর তাদের আলোচনা-পর্যালোচনা ছিল একেবারেই গৌণ। কোনো একটি বিষয়ের ওপরই সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের যুক্তিপূর্ণ, গঠনমূলক, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ দৃষ্টিগোচর হয়নি বরং অনেক ক্ষেত্রেই সরকার দলীয় সংসদ সদস্যরা ধান বানতে শিবের গীত গেয়েছেন। যেমন বাজেট অধিবেশনেও অনেকেই শেখ মুজিব বনাম জিয়াউর রহমান ও স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রসঙ্গ তুলেছিল।

উপস্থিতি সম্পর্কে আমার তেমন কিছুই বলার নেই। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া-ই সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের বলেছেন - আপনারা অধিবেশনে উপস্থিত না হলে আমাকে বাধ্য হয়েই সংসদ ভেঙ্গে দিতে হবে। তারপরও এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে তা বলা যায় না। কোরাম সংকটের কারণে বহুবার অধিবেশন মুলতবি রাখতে হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সংসদ সদস্যরা সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত হবে না। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে উদঘাটিত হয়েছে বর্তমান জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্যে ২৪% রাজনৈতিক নেতা কর্মি, ৭৩% বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ী, ৩% অন্যান্য পেশার সঙ্গে জড়িত আছেন।

দলগত অবস্থানের ক্ষেত্রে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি প্রায় অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ১৭ জন সংসদ সদস্যের

www.pathagar.com

১৭ জনই রাজনৈতিক নেতা-কর্মি। অন্যান্য ছোট দলগুলোর নেতা-কর্মিরাও কমবেশি রাজনৈতিক চেতনাপম্পন্ন। অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বে চেয়ে ব্যবসায়ীসহ অন্যান্যরাই বেশি মনোনয়ন পেয়ে আসছে। এ অবস্থায় বলাচলে সংসদীয় পদ্ধতি সমৃদ্ধশালী করার জন্য তারা নির্বাচন করেনি বা নির্বাচিত হননি। তাই স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় সংসদের এই কোরাম সংকট। বিশেষকরে বড় দু'টি দলের মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় দেখা যায় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ নেতারা দলীয় মনোনয়ন পান না। মনোনয়ন পান কালো টাকার মালিক, যারা জাতীয় সংসদ সদস্য পদকে তাদের সামাজিক মর্যাদার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আরও একটি কারণ হচ্ছে দলীয় নেতৃত্বের প্রতি সর্বক্ষেত্রে শর্তহীন আনুগত্যের প্রত্যাশা। সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, মেধাবী নেতারা দলীয় নেতৃত্বের কাছে সম্পূর্ণ আস্থাভাজন হতে পারে না। চাটুকারদের তোষামোদ ও বেহায়াপনা আচরণ তাদের কাছে বেমানান হিসেবে গণ্য হয়।

এর জন্য বেশি দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। দু'একটি দৃষ্টান্তই বিষয়টি বোঝার জন্য যথেষ্ঠ। ২০০১ সালের নির্বাচনে সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী'র মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দলীয় মনোনয়ন পাননি- পেয়েছেন আলী আকবর লবির মতো একজন ব্যবসায়ী। ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত এবং লে. জেনারেল মীর শওকত আলীও দলীয় মনোনয়ন পাননি।

অন্যদিকে সাবেক ছাত্রনেতা ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে মনোনয়ন না দিয়ে আওয়ামী লীগ একজন ব্যবসায়ীকে মনোনয়ন দিলেন যার সঙ্গে খুলনার এরশাদ শিকদারের বিশেষ যোগাযোগ ছিল বলে পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়েছিল। অর্থাৎ বড় দু'দলই রাজনৈতিকভাবে অভিজ্ঞ মেধাবী ব্যক্তিদের সংসদ সদস্য করে আনার প্রচেষ্টার পরিবর্তে মূলত কালো টাকার মালিক, সন্ত্রাসরক্ষক ও গডফাদারদের সংসদ সদস্য করে আনার চেষ্টা করেছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী একবার বলেই ফেলেছেন, অনেকের চেয়ে তার কাছে জয়নাল হাজারির প্রয়োজন বেশি।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সংসদে সম্মিলিত বিরোধী দলে ১০ জন সংসদ সদস্যও ছিল না। এই সংসদের ন্যাপ ভাসানীর ডা. আলীম আল রাজী ও এনায়েতউল্লাহ খান

এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মেজর এম এ জলিল, ভাষা সৈনিক অলি আহাদ, কুমিল্লার আব্দুর রশিদ ইঞ্জিনিয়ারসহ ৩০-৩২ জন সেই সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য হিসেবে জয়লাভ করেছিল বলে জোর প্রচারণা ছিল। খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদকে নির্বাচনী ফলাফল সম্প্রচার বন্ধ করে দু'দিন পর তাকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। প্রথম জাতীয় সংসদে ২০ থেকে ৩০ জন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য থাকলে কি ক্ষতি হতো শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের?

অতীত নিয়ে বেশি লেখা-লেখি করার ইচ্ছা আমার নেই। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের দৃশ্যমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রায় সকলেই জয়লাভ করেছিলেন। দক্ষিণপন্থি আব্দুস সবুর খান, মাওলানা আব্দুর রহিম, মধ্যপন্থি মিজানুর রহমান চৌধুরী, আসাদুজ্জামান, মহিউদ্দিন আহমেদ ও বামপন্থি অধ্যাপক মোজফফর আহম্মেদ, মোহাম্মদ তোহা, রাশেদ খান মেনন, শাহজাহান সিরাজসহ অনেকে। জিয়াউর রহমানের জীবদ্দশায় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার চালু থাকলেও জাতীয় সংসদেই দেশের রাজনীতি ও প্রশাসন পরিচালিত হয়েছিল এবং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

আমার লেখার বিষয়বস্তু আগামী ২০০৭ সালের নির্বাচন। কারো মাথায় টিউমার হলে পায়ে অপারেশন করে লাভ নেই। ইতিমধ্যে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটলিয়নের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির প্রচেষ্টা হচ্ছে এবং ক্রসফায়ার-এর মাধ্যমে সন্ত্রাস দমনের চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কি সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ সম্ভব?

যেখানে জাতীয় সংসদ এবং বড় বড় পার্লামেন্টারী দলের নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে সন্ত্রাসীরাই ভোট ব্যবস্থার অন্যতম চালিকা শক্তি। সেক্ষেত্রে সন্ত্রাসী সৃষ্টির কারখানা খোলা রেখে পছন্দমত সন্ত্রাসী হত্যা করে সন্ত্রাস দমন সম্ভব হতে পারে না। আমি নাম ও সময়ের উল্লেখ করে বড় বড় নেতা-নেত্রীদের জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন কিংবা বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে চাই না। শুধুমাত্র আয়নায় নিজেদের চেহারাটা দেখার বিনীত অনুরোধ জানাতে চাই।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই। রাজনীতিতেও এর ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য পার্লামেন্টারী পার্টিতে

www.pathagar.com

দলীয় মনোনয়ন দেয়ার সময় প্রথমেই প্রশ্ন আসে নির্বাচনে তিনি কত টাকা খরচ করতে পারবেন। যদিও নির্বাচন কমিশন আইন করে বলে দিয়েছে ৫ লাখ টাকার বেশি খরচ করা যাবে না এবং খরচ-এর খতিয়ান দাখিল করার সময় অগণিত অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের সত্যায়িত রশিদ দাবি করা হয় যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে, অর্থ ও সামাজিক শক্তির দিক লক্ষ্য রেখেই পার্লামেন্ট মেম্বার হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়।

১৯৮৬ সালেও দলের মধ্যে কিছু অভিজ্ঞ নেতা যেন নির্বাচনে জয়লাভ করতে না পারে তার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্রের কারণেই ড. কামাল হোসেন, মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান ও মিসেস জোহরা তাজ-এর মত যোগ্য নেতারা জয়লাভ করতে পারেনি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল বলে প্রচার আছে। ব্যারিস্টার মওদুদ আহম্মেদ, কাজী জাফর আহম্মেদ ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে একই কৌশলে দলের ভিতর থেকেই ষড়যন্ত্র করে সংসদ নির্বাচনে বিজয় অর্জনে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছিল।

এতে দল যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশ। আজ প্রত্যেক দিন ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, শেখ রাজ্জাক আলীর মত বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের সাংবাদিক সম্মেলন করে আইনের ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে। এসব ব্যক্তিবর্গ সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলে জাতীয় সংসদেই তারা আইনের প্রয়োজনীয়তা ও সংশোধনীর উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারতেন।

প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বড় দলের মার্কার মালিক নেতা-নেত্রী-সুশীলসমাজ ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের কাছে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই - সত্যিকার অর্থেই যদি গণতান্ত্রিক সমাজ ও প্রশাসন গড়তে চান, জাতীয় সংসদকে দেশ পরিচালনার মুখ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চান, তাহলে শুধুমাত্র অর্থ ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি কিংবা মস্তাননির্ভর নেতা-নেত্রীদের পরিবর্তে সৎ, মেধাবী ও রাজনীতিতে নিবেদিত মননশীল ব্যক্তিদের পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী করে সংসদে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

আজ যে জাতীয় সংসদ আছে এর মধ্যে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, কাজী জাফর আহম্মেদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, রাজিয়া ফয়েজ, শফিউল আলম প্রধান, ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ, সাইফুদ্দিন আহম্মেদ

www.pathagar.com

মানিক, সর্দার আমজাদ হোসেন, আনোয়ার জাহিদ, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, শফিকুল গণি স্বপন, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম' প্রমূখ ব্যক্তিরা থাকতে পারতো। তাহলে জাতীয় সংসদের চেহারাই হতো আলাদা।

দেশপ্রেমিক সৎ ব্যক্তিদের মাধ্যমে সংসদ পরিচালিত হলে কোরাম সংকটের কারণে বারংবার সংসদ অধিবেশন স্থগিত করতে হতো না। আর জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত সংসদে জাতীয় স্বার্থে তৈরি হতো বস্তুনিষ্ঠ নতুন ও সংস্কারমূলক আইন। এর ফলে প্রয়োজনীয় সংসদীয় দিকনির্দেশনার মাধ্যমে উপকৃত হতো দেশবাসী। #

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশনের ভোটার লিস্ট প্রণয়ন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

আওয়ামী লীগের সময় নিয়োগপ্রাপ্ত আবু সাঈদ-এর সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর সংবিধানের ১১৮(১) ধারা বলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এম এ আজিজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দান করেন। এই কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা চলে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি শাসনতন্ত্রের রক্ষাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ব্যক্তি কিংবা দলীয় স্বার্থ কোনোক্রমেই তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না, এটাই সাধারণভাবে সব মানুষের বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে আইনগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত নিরপেক্ষ বিচারপতি ছাড়া অন্য কাকে অধিক নিরপেক্ষ হিসেবে গ্রহণ করা যায়? এ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন না করে অকারণে নিবার্চন কমিশন সম্পর্কে বিষোদগার কোনোক্রমেই দেশের গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় সহায়ক হতে পারে না।

শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টি অতি জরুরি। আর এর জন্য ৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর, ইচ্ছা করলেও সরকার তাদের পদচ্যুতি ঘটাতে পারে না। এর মধ্যে রয়েছে (১) মহামান্য রাষ্ট্রপতি (২) জাতীয় সংসদের স্পীকার (৩) প্রধানবিচারপতিসহ হাইকোর্টের বিচারপতিবৃন্দ (৪) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারবৃন্দ (৫) এটর্নি-জেনারেল (৬) পিএসসি'র চেয়ারম্যান (৭) মহাহিসাবরক্ষক।

www.pathagar.com

এসব পদের দায়িত্ব গ্রহণের পর স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেই সরকার তাদের জায়গায় অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করতে পারবেন। অন্যথায় সাংবিধানিকভাবে তাদের পদত্যাগে বাধ্য করাতে বেশ জটিল পথে অগ্রসর হতে হবে। রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগে বাধ্য করতে হলে প্রথমে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করতে হবে। অভিযোগ প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত হলে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থনের ভিত্তিতেই কেবল রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেন্ট করা যেতে পারে।

অতিসম্প্রতি ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগের বিষয়টি কিন্তু ইমপিচমেন্ট-এর পর্যায়ে পড়ে না। বিএনপি'র সংসদীয় দল বি চৌধুরীকে শুধুমাত্র পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক অভিযোগও উত্থাপন করা হয়নি তার বিরুদ্ধে।

সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের একটি নির্বাহী আদেশ তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল নাসিম চ্যালেঞ্জ করলে, আব্দুর রহমান বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ঘোষিত আদেশ প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত সবাইকে মেনে নিতে হবে। এর ব্যতিক্রম দন্ডণীয় অপরাধ ও চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। অতিসাম্প্রতিককালে নিশ্চয়ই সবারই মনে থাকার কথা টঙ্গী-গাজীপুর উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যকার মতপার্থক্যের কথা। এ প্রেক্ষাপটে সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু সাঈদ, পত্রিকাসহ সংবাদ মাধ্যমে ঘোষণা প্রদান করেছিলেন তার পদত্যাগের মতো কোনো কারণ বা প্রয়োজন তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। বরং সরকার প্রয়োজন অনুভব করলে পদত্যাগ করতে পারে। এসব ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় সরকার ইচ্ছা করলেও শাসনতান্ত্রিক পদ থেকে কাউকে অপসারিত করতে পারে না।

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের প্রক্রিয়া সংবিধানের ১১৮ (১) ও ১১৮ (২) ধারামতে সংযোজন করা হয়েছে। শাসনতন্ত্রে বহুবার সংশোধণ সংযোজন পরিবর্ধন আনা হলেও ১১৮(১) এবং ১১৮(২) এর কোনো পরিবর্তন কিংবা সংশোধন করা হয়নি।

ভারতের শাসনতন্ত্রের আদলেই বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া সংবিধানে অন্তভূক্ত করা হয়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এম এ আজিজকে নিয়োগ দেয়ার পূর্বে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেনি তৎকালীন সরকার। এ ব্যবস্থা এর আগে কেউ করেছে কিনা সে বিষয়টিও বিবেচনায় আনা হয়নি। এর

www.pathagar.com

ফলে অন্যকোনো বিরোধীদলের সঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেয়ার পূর্বে কোনো প্রকার আলোচনা করেননি। এই রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। আমরা নিজেরা যা করিনা অন্যেরা সেই কাজটি করবে। এই প্রত্যাশা আমাদের মনে জাগ্রত হওয়ার কারণ কি? এর মানে হচ্ছে আমরা যে কাজটি করবো না, অন্যকে সেই কাজটি অবশ্যই করতে হবে। এই দাবিকে কি কোনোক্রমেই যুক্তিযুক্ত দাবি বলে গণ্য করা চলে?

বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পর সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতবিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তখন আওয়ামী লীগসহ অনেকেই সেই মতবিনিময় সভায় যোগদান করেনি এবং তাদের মূল্যবান পরামর্শও নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করেনি। বর্তমানে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ ৫ জন কমিশনার কর্মরত। এই পাঁচজনের মধ্যে বিচারপতি মাহফুজুর রহমান বাদে বাকি ৪ জনই সে সময় ভিন্ন ভিন্ন পদমর্যাদায় নির্বাচন কমিশনে কর্মরত ছিলেন। তখন স ম জাকারিয়া সচিবের পদে অধিষ্ঠিত থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থেকেছেন এবং কমিশনারদের সঙ্গে একত্রে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশে বর্তমানে ৪টি রাজনৈতিক দলকে বড় দল হিসেবে গণ্য করা হয়। জাতীয় পার্টি তার মধ্যে একটি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আমাদের পার্টিকেও সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমাদের পার্টির অন্যতম প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহম্মেদ আমাদের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ সংলাপে অংশ নেয়ার পূর্বে দলের চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রতিনিধি দলকে তাদের বক্তব্য সম্পর্কে গাইডলাইন প্রদান করেন। তিনি বলেন নতুন ভোটার লিস্ট হালনাগাদ করার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। আমাদের দলের পক্ষ থেকে নতুন ভোটারলিস্ট করা বা হাল নাগাদ করাকে সার্থক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। বিশেষভাবে নতুন ভোটারলিস্ট করার প্রশ্ন গুরুত্ব পায়, ঢাকা চট্টগ্রামসহ আদমজীর মত নগরীগুলোতে ভোটারদের ঠিকানা পরিবর্তনের কারণে।

সবদিক বিবেচনায় রেখে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে নতুন ভোটার লিস্ট করা হলে তা হবে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কারণ আগের ভোটার লিস্টে যাদের নাম ছিল তাদের অনেকেই হয়তোবা মারা গেছেন। ৬ বছরে নতুন ভোটারের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। শহর অঞ্চল পরিবর্তন করে সর্বোপরি, ভোটার লিস্ট থেকে কারও নাম বাদ পড়লে তিনি ভোটার হওয়ার বিধিবদ্ধ বিধান মতে অবশ্যই নির্বাচন কমিশনে আবেদন করে ভোটার হতে

www.pathagar.com

পারবেন। এই নতুন ভোটার লিস্টের ব্যবস্থা যতোটা সম্ভব ত্রুটিমুক্ত করাই নির্বাচন কমিশনের দক্ষতার স্বাক্ষর হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু কি আশ্চর্যজনক আচরণ! প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাকে করলে শেখ হাসিনা বা ড. কামাল হোসেন খুশি হবে বা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নিরব। আবার বিচারপতি এম এ আজিজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা বিবৃতি দিলেন, এই নির্বাচন কমিশনারকে তারা মানেন না। ড. কামাল হেসেন-এর বক্তব্য কিছুটা ব্যক্তি অহঙ্কার ও অসুস্থতার শামিল। তিনি বলেন, 'সকলের পরামর্শ অনুসারে', এ কথার অর্থ কি দাঁড়ায়। আর এ ব্যাপারে তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবও নেই। মাঝে মধ্যে তারা একে-ওকে বিতর্কিত বলে আখ্যায়িত করেন। এভাবে নতুন দু'জন নিয়োগকৃত নির্বাচন কমিশনারকে বিতর্কিত বলা হচ্ছে। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাই সমাজজীবনে বিতর্কিত নন এমন ব্যক্তি কে?

শৃঙ্খলা

নির্বাচন কমিশনে শৃঙ্খলা বলে একটা কথা আছে। কিন্তু বর্তমান নির্বাচন কমিশনে কোনোপ্রকার শৃঙ্খলা বা অফিসিয়াল গোপনীয়তা বলে কিছুই নেই। একটি প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয় অংশ জনগণকে অবহিত করতে হলে সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত নিয়মাবলী অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনার এক জিনিস নয়। নির্বাচন কমিশনার ব্যক্তিবিশেষ। কিন্তু নির্বাচন কমিশন হচ্ছে প্রতিষ্ঠান যা রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ। অথচ কি দুর্ভাগ্য দেশের নির্বাচন কমিশনের! দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদা প্রেস ব্রিফিং করে নথিতে তারা যে মত প্রকাশ করেন - তা সাংবাদিকদের অবহিত করে। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই - তাদের এ আচরণ পশথ গ্রহণের অঙ্গীকার ভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে কি না? পত্রিকায় লেখা হচ্ছে - কমিশন দু'দলে বিভক্ত। এর ফলে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ বর্তমান নির্বাচন কমিশনে শুধুমাত্র বেগম খালেদা জিয়াপন্থি নয়, শেখ হাসিনা ও ড. কামাল হোসেন পন্থিরাও আছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে নির্বাচন কমিশনের মত নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থেকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত লোকদের দিয়ে অন্যান্যরা দল নিরপেক্ষ ব্যবহার পেতে পারে কিনা?

আমি ভারতের সাবেক নির্বাচন কমিশনার টি এন সেনের একটি উক্তি উপস্থাপন করতে চাই। তিনি বলেছেন, 'নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তার দায়িত্ব ক্ষমতাসীন পার্টির প্রতি যেমন একজন নির্দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতিও ঠিক তেমন আচরণ

www.pathagar.com

করা। টি এন সেনের বক্তব্যকে যদি আমরা নির্বাচন কমিশনের মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে এ কে মোহাম্মদ আলী ও এম এম মুনসেফ আলীর আচরণকে আমরা কোন্ দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করবো? তারা দলীয় স্বার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করতে পারছে কিনা?

দু'ধরণের বক্তব্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া হুমকির মুখে

নির্বাচন কমিশন এর মধ্যে ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও কমিশন নতুন ভোটারলিস্ট তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সে অনুসারে কাজ শুরু করে। যারা নতুন ভোটার লিস্ট প্রণয়নের বিরোধী তারা সমন্বিতভাবে রাজপথে আন্দোলন, কোর্টে আইনগত লড়াই ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে দু'জন কমিশনারকে দিয়ে ভিন্নমত গ্রহণ করে অবস্থান নিয়েছেন। কিন্তু নতুন ভোটার লিস্ট প্রণীত হলে দেশের কিংবা নির্বাচন এর স্বচ্ছতার জন্য কি প্রকার ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কে তারা কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য দিতে পারেননি।

প্রথমত প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন ১৬৪ কোটি টাকা এই নতুন ভোটার লিস্ট প্রণয়নে খরচ হবে এবং এর সিংহভাগ নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাত করবে। কাজ শুরু হওয়ার পূর্বেই তিনি নির্বাচন কমিশনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি করবে তা বুঝলেন কেমন করে? এর পাশাপাশি তিনি বলেছেন তার সমর্থক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়কে ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে সরকার ও নির্বাচন কমিশন। এই বক্তব্যের সমর্থন করে বক্তব্য দিয়েছেন মেজর জেনারেল (অব) শ্রী সি আর দত্ত। তিনি বলেছেন, দু'কোটি হিন্দু ভোটারের বিপুল অংশকে বাদ দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু কি কৌশলে ভোটার লিস্ট থেকে বাংলাদেশী নাগরিক হিন্দু সম্প্রদায়ের ভোটারদের বাদ দেয়া হবে বা হওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে সে সম্পর্কে শেখ হাসিনা কিংবা সি আর দত্তরা সুনির্দিষ্ট করে কিছুই বলতে পারেননি।

শেখ হাসিনা ১৬৪ কোটি টাকার মধ্যে বিশাল দুর্নীতির আশঙ্কা দেখেছেন। কিন্তু ২৫ হাজার কোটি টাকার মধ্যে দুর্নীতির আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে দুর্নীতিবিরোধী কোনো আন্দোলনের সূত্রপাত করেননি। এ থেকে মনে হয় নির্বাচন কমিশনের অর্থ সাশ্রয় কিংবা দুনীতি প্রতিরোধ তার মুখ্য ইস্যু নয়। মুখ্য ইস্যু হচ্ছে নতুন ভোটার লিস্ট প্রণয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। অন্যদিকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব তারেক রহমান বলেছেন - গত ভোটার

www.pathagar.com

লিস্টে ৬৪ লক্ষ অতিরিক্ত ভূয়া ভোটার করা হয়েছিল, তার এই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেখ হাসিনা এই অভিযোগের কোনো সোজা উত্তর দেননি এবং এই অভিযোগ অস্বীকারও করেননি। বলেছেন - ৬৪ লক্ষ ভূয়া ভোটার থাকলে ২০০১ সালের নির্বাচনের বৈধতা থাকে না। তিনি তারেক রহমানের অভিযোগ অস্বীকার না করার মাধ্যমেই স্বীকার করে নিয়েছেন সংখ্যায় ৬৪ লক্ষ না হলেও বর্তমান ভোটার লিস্টে ভূয়া ভোটার থাকতে পারে। কিন্তু নাগরিক সচেতনতা সৃষ্টি হলে এবং সকল রাজনৈতিক দল সতর্ক থাকলে নতুন ভোটার লিস্টে কাউকে বাদ দেয়া মোটেই সহজসাধ্য কাজ হতে পারে না।

গত ভোটার লিস্টে ঢাকা শহরের শুধুমাত্র স্টেডিয়ামের আশপাশে ৩০ হাজার ভোটারের নাম ভোটার লিস্টে অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই একটি পরিসংখ্যান থেকেই গত ভোটার লিস্টে অতিরিক্ত ভূয়া ভোটার আছে কিনা তা বুঝে নেয়ার ভার আমি ছেড়ে দিতে চাই বিবেকবোধ সম্পন্ন জনগণের উপর।

মেজর জেনারেল (অব) সি আর দত্তের দু'কোটি হিন্দু ভোটারের দাবি প্রকৃত অর্থে পরিসংখ্যান সম্মত কিনা - আমি বলতে পারবো না। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রথমে ভূটান ও পরে ভারত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ৫ ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গন্ধীর সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে ৬ দফা শান্তি ও মৈত্রি চুক্তির খসড়া পর্যালোচনা করা হয়। শ্রী ডি পি ধর এই চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করেন। এর ৫ম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় - All the rufuge who has migrated East Pakistan to India would returned back to Independent Bangladesh with full respect. প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সব সদস্য সে পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সে বৈঠকে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী প্রবাসী সরকারের ভারতস্থ বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশী মন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ মুখ খুললেন। তিনি বলেন - Your execlancy madam I have a simple submission to the Honorable house. You should mension that all the refuge should returned back to the independent Bangladesh. Who have lift East Pakistan After 25th march 1971 only ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীসহ সকলেই খন্দকার মোশতাক আহম্মেদের প্রস্তাব মেনে নিলেন।

আজকে সি আর দত্ত বাবু ২ কোটি হিন্দু ভোটারের দাবি উপস্থাপন করেছেন কোন সময় থেকে তা দেশবাসীকে অবহিত করলে সকলের বুঝতে সুবিধা হবে এবং বর্তমানে তাদের অবস্থান কোথায় তাও পরিস্কার হওয়া দরকার। স্বচ্ছ পরিসংখ্যান জানার জন্যও তা অতি জরুরি। #

www.pathagar.com

৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থ হলো কেন?

২৭ অক্টোবর বেগম খালেদা জিয়ার সরকার পদত্যাগ করার মধ্যদিয়ে কেয়ারটেকার সরকারের ৯০ দিনের শাসনতান্ত্রিক সরকারের মেয়াদ শুরু হয়। ৯০ দিনের মধ্যে একটি নির্বাচিত সরকারকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার মধ্যে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমরা যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তারা প্রায় সকলেই সে সম্পর্কে অবহিত আছি। কিন্তু প্রায় নিশ্চিত করেই বলা হলো তাদের ২৭ জানুয়ারির মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রায় অসম্ভব।

কেন এমন হলো

আলোচনার শুরুতেই শাসনতন্ত্র অনুসারে বিচারপতি কে এম হাসান প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করতে চাই। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগসহ অনেক রাজনৈতিক দলই কে এম হাসানকে নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। তাদের বক্তব্য হচ্ছে - কে এম হাসান এক সময় বিএনপি'র সক্রিয় নেতা ছিলেন। তারপর তিনি প্রায় ১০ বছর বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। আমার প্রশ্ন সেই ১০ বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৫ বছর শাসনকালও অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু তখন কোনো পক্ষ থেকেই বলা হয়নি কে এম হাসান দলীয় রাজনীতির গন্ডিতে আবদ্ধ। অথচ যখন প্রশ্ন এলো কে এম হাসান কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হচ্ছেন তখনই আপত্তি ও আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হলো।

প্রায় ৬ মাস ধরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিচারপতি কে এম হাসান ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজকে কোনোক্রমেই মেনে নেয়া হবে না বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এ ইস্যুতে আন্দোলনও চলছিলো। এরইমধ্যে বিএনপি'র মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের মধ্যে

www.pathagar.com

বহুবার নাটকীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। কূটনৈতিক পাড়া থেকে বিশেষকরে পশ্চিমা কূটনৈতিক মহলের উদ্যোগ ছিলো লক্ষণীয়। তারপরও সমস্যার সমাধান হয়নি, প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে। জাতীয় নির্বাচন প্রশ্নে ন্যূনতম সমঝোতাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

অবশ্য এ কথা বলতেই হবে বিচারপতি কে এম হাসান অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ। তিনি যখন উপলব্ধি করতে পেরেছেন তাকে নিয়ে বিতর্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তখন তিনি নিজেই প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অপারগতার কথা জানিয়েছেন। এর পর স্বাভাবিক কারণেই নির্বাচন প্রক্রিয়া কিংবা সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ব্যহত হওয়ার কথা ছিলনা।

পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ আজিজ, নির্বাচন কমিশনার স ম জাকারিয়া প্রমুখকে নিয়ে দর কষাকষির মধ্যে ৯০ দিনের অনেক বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সে সময় শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। পরিশেষে উপদেষ্টামন্ডলীর এক অংশের পদত্যাগ পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা দ্রুততার সঙ্গে উপদেষ্টামন্ডলী গঠন করেন এবং নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তফসিল কিছুটা পরিবর্তন করেন। সব রাজনৈতিক দলই নতুন তফসিল অনুসারে ২২ জানুয়ারির নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

কিন্তু ৩ জানুয়ারি মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন মহাজোট সব মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিলে জাতীয় জীবনে এক মহাসংকটের সৃষ্টি হয়। নির্বাচন হয়ে উঠে তাৎপর্যহীন। যদিও আইনগত কাঠামোর মধ্যে তখনও সবকিছুই থাকে ঠিকঠাক মত। বেগম খালেদ জিয়া, সাইফুর রহমান, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ ১৭জন হেভী ওয়েট প্রার্থী ৯ম জাতীয় সংসদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষকরে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল নিশ্চয়ই অবগত ছিল ৯০ দিন পর যে সরকার থাকবে তাকে কোনোক্রমেই কেয়ারটেকার সরকার হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তাহলে সে সরকারকে আমরা কি ধরণের সরকার বলে আখ্যায়িত করবো। তৃতীয় বিশ্বে শাসনতান্ত্রিক সরকার ও সামরিক সরকারের রূপরেখা সম্পর্কে আমাদের ধারনা আছে। কিন্তু ২৭ জানুয়ারির পর যে সরকার অধিষ্ঠিত থাকবে তাকে কোনোক্রমেই শাসনতান্ত্রিক বা সামরিক সরকার এর কোনোটাই বলা যাবে না।

ইতিমধ্যেই ড. ইয়াজউদ্দিন ও ড. ফখরুউদ্দিনের সরকার যে সব রাজনৈতিক এজেন্ডা উত্থাপন করেছে তার মধ্যে কেয়ারটেকার সরকারের কোনো বৈশিষ্ট্যই অবশিষ্ট থাকছে না। অবশ্য এ সরকারের কর্মকান্ডে দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

বিচার বিভাগকে প্রশাসনিক বিভাগ থেকে আলাদা করার মধ্য দিয়ে সরকার দেশবাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন শুরু করলেন। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় পরিপুষ্ঠ দুর্নীতি নির্মূল ও দলমত নির্বিশেষে সব গড-ফাদারকে গ্রেফতার এবং নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার উদ্যোগ গণতন্ত্রকে সাবলিল করার যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেশবাসী বিশ্বাস করতে শুরু করে। কিন্তু যে মৌলিক প্রশ্নগুলো থেকে যাচ্ছে, তা হলো রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনগণের এই আকাঙ্ক্ষাকে সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারলো না কেন? কেন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে সচেতন ছিল না? আমি বহুবার ভেবেও এর কোনো সদুত্তর পাইনি।

রাজনীতিই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাজনীতি শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল করার জন্য নয়? জনগণের সেবা করার জন্যও। দুঃখজনক হলেও সত্য রাজনীতি অতিমাত্রায় বাণিজ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। সে কারণেই জয়ের পাশাপাশি পরাজয় মেনে নেয়ার মনমানসিকতা কোনো বড় দলেরই নেই। নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দলীয় আনুগত্যশীল ব্যক্তিদের ঢুকানোর প্রতিযোগিতার মুখে দেখা দেয় চলমান এই রাজনৈতিক সঙ্কট।

আলেকজান্ডার দি গ্রেট, রোম থেকে মিসর জয় করে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত সিন্ধুনদের পাদদেশ পর্যন্ত জয় করেছিলেন। সেই থেকেই রাষ্ট্রজয়ের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৪ শতকের ইতিহাস বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। আলেকজান্ডার দি গ্রেট মাত্র ২৮ বছর বয়সে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ছিল দু'জন সেনাপতি। একজনের নাম ছিল লেনিহান। তিনি মিসর জয়ের পর মিসরের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। অন্যজন ছিলেন-সেলুকাস, তিনি আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সঙ্গে ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর দুই সেনাপতিই স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেদের রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। মিসরের ইতিহাস খ্যাত ক্লিওপেট্রা ছিলেন লেনিহান রাজবংশের শেষ রাণী।

অন্যদিকে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সেলুকাসের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য। সেই যুদ্ধে সেলুকাস পরাভূত হন এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সঙ্গে নিজকন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। শুরু হয় পশ্চিম ভারতে মৌর্য্য রাজপরিবারের শাসনব্যবস্থা। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের একজন উপদেষ্টা ছিল, তার নাম ছিল চানক্য। তিনি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন তার নাম 'অর্থশাস্ত্র'। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস বিশ্লেষকরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে চানক্যের রচিত অর্থশাস্ত্রই ইতিহাসের আদি শাসনতন্ত্র। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভাগ ভেদে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া আছে অর্থশাস্ত্রে।

www.pathagar.com

খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনকাল ছিল মূলত ইতিহাসের আরেক সোনালী যুগ। প্রজারকল্যাণে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার গ্যারান্টি ছিল সেই গৌরবোজ্জ্বল শাসনামলে। এমনকি সম্রাট আকবর কিংবা শেরশাহের শাসনকালও শুধুমাত্র রাষ্ট্রক্ষমতার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য ছিল না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রজাকূলের কল্যাণ ছিল তখনকার শাসন ব্যবস্থার মৌলিক লক্ষ্য।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে করমচাঁদ গান্ধীই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাজনীতির সঙ্গে সমাজসেবাকে যুক্ত করেন। তিনি সামাজিক ভিত্তিতে সমাজসেবার সংস্কারের রাজনীতিতে নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর দুঃস্থ-অনাথ আশ্রম ভারতের হিন্দু বর্ণবাদী দৃষ্টি ভঙ্গিতে মানবাধিকারের নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটায়।

পরিশেষে তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হন, রাজনীতির অর্থ শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল নয়। দেশবাসীর সেবা করাই রাজনীতিবিদদের প্রধান দায়িত্ব। তার পথ ধরে আধুনিক বিশ্বে অনেক নেতাই রাজনীতিতে সেবা ও শাসনের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাদের সবার নাম এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

কিন্তু নোবেল শান্তি বিজয়ী ড. মুহম্মদ ইউনুসের সম্প্রতি একটি বক্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি ঢালাওভাবে বলেছেন, রাজনীতিকরা রাজনীতি করে টাকার জন্য। আমি ড. মুহম্মদ ইউনুসের এ বক্তব্যের সঙ্গে কোনোক্রমেই একমত নই। আমি বিনয়ের সঙ্গে ড. মুহম্মদ ইউনুসের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই - মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সম্পর্কে তার বক্তব্য কতটুকু সঠিক। এখন তিনি যাদের রাজনীতিবিদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, তারা কি প্রকৃত অর্থেই রাজনীতিবিদের পর্যায়ে পড়ে? নাকি রাজনীতির নামে যারা বাণিজ্য করছে তাদের তিনি রাজনীতিবিদ বলতে চাচ্ছেন। এই ব্যবসায়ীও সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের প্রকৃত অর্থে রাজনীতিবিদ মনে করলে ড. ইউনুস মারাত্মক ভুল করবেন।

আমি ড. ইউনুসের জীবনের সাফল্যকে জাতীয় মর্যাদার অংশ হিসেবে বিবেচনা করেই বলতে চাই - তার সাফল্যের গোড়াপত্তনেও ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে রাজনীতিবিদরাই। যেমন- গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন - পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনিও একজন রাজনীতিবিদ। এ কথা ঠিক, আমাদের শাসনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষার যে নমনীয়তা প্রদর্শন করা অপরিহার্য ছিল, তা প্রদর্শনে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। সে কারণেই ২০০৭ সালে ১১ জানুয়ারির পর প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। #

www.pathagar.com

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি মৌলিক পরিবর্তন

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে ৪ দলীয় জোটের ২ দলীয় সরকার মেয়াদ পূর্তির পর ক্ষমতা ত্যাগ করে। জটিলতার কারণে রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এক আস্থাহীনতার মহাসংকট। আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় জোট এই কেয়ারটেকার সরকারকে বিএনপি'র Extended সরকার বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। তারা চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করে দেয়া, বঙ্গভবন ঘেরাও, হরতালের পর হরতাল ঘোষণা, সর্বগ্রাসী সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়াসহ নানামুখি আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। যার পরিণতিতে একের পর এক উপদেষ্টার পদত্যাগে দেশ এক জটিল পরিস্থিতির আবর্তে পতিত হয়।

এভাবেই ২২ জানুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে মুখোমুখি সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হয় দেশ। ১৪ দলীয় জোটকে রূপান্তরিত করা হয় মহাজোটে। দৃশ্যত জাতীয়তাবাদী ইসলামিক মূল্যবোধের রাজনীতির প্রতিনিধিত্বকারী সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, সাবেক রাষ্ট্রপতি এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও আল্লামা আজিজুল হক-এর নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশ যোগদান করে ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতীক আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোটে। দ্রুত পাল্টে যায় রাজনৈতিক শক্তির ভারসাম্য। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোট ও বিজেপি'র একাংশ ছাড়া সব বড় ধরণের শক্তিই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এক কাতারে শামিল হয়।

www.pathagar.com

যদিও রওশন এরশাদ, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ও রাজিয়া ফয়েজকে নিয়ে আমি বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। আসন ভাগাভাগি নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। মহাজোটের মধ্যে এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিকে ৫০টি আসন, বি চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এল ডি পিকে ৩০টি আসন, মাওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোটকে ৫টি আসন এবং ১৪ দলের অন্য শরিকদের ১৫-২০টি আসন ছেড়ে দেয়া হয়। ২০০টি আসনে আওয়ামী লীগকে ম্যানেজ করতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ দলীয় চাপে পড়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ। কিন্তু দেশবাসীসহ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন নির্বাচন হলে মহাজোট জয়লাভ করবে। কারণ আওয়ামী লীগের শক্তি আর ভোটের সঙ্গে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের রংপুর, সিলেট, পটুয়াখালী ও চৌদ্দগ্রাম ভিত্তিক আঞ্চলিক শক্তি এক হলে মহাজোটের জয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়।

যদিও বেগম খালেদা জিয়া মহাজোটের বিপক্ষে ৪ দলীয় জোটকে সম্প্রসারিত করার নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে অবিশ্বাস ও সন্দেহ সংশয়ের কারণে সেই উদ্যোগ সফল হয়নি। কারণ ১৯৯৬ সালের আওয়ামী বিরোধী আন্দোলনে ৭ দলীয় জোট বেগম খালেদা জিয়া বিলুপ্ত করেন। কোনপ্রকার রাজনৈতিক আলোচনা ছাড়াই গঠন করেন ৪ দলীয় জোট। নির্বাচনে জয়লাভের পরে ৪ দলীয় জোটকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করেন ২ দলীয় ভিত্তিতে। বেগম খালেদা জিয়ার হাতে থাকে শেষ ভরসা হিসেবে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন। তার উপর পুরোপুরি নির্ভর করছিল তখন ৪ দলীয় জোট ও খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যত। প্রকৃত অর্থে প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়েই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবকে নির্বাচনে অংশ নিতে বাঁধা দেয়া হয়। তিনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষিত হন। আর এরশাদ সাহেব নির্বাচনে অংশ নিতে না পারার কারণে জাতীয় পার্টি নির্বাচন বর্জনের ডাক দেয়। সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহোজোটের বাম শরিকরাও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নির্বাচন বর্জন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ঐক্য ও প্রভাব ধরে রাখার জন্য সময় উপযোগী বলে বিবেচনা করেন শেখ হাসিনা। তাই তিনিও নির্বাচন বর্জনের ডাক দেন। ২২ জানুয়ারির নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত মহাজোট। সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। এই পরিস্থিতির মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে গঠিত হয় ড. ফখরুদ্দিন আহম্মেদ-এর নেতৃত্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার। #

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ: বোমা হামলা ও আমাদের করণীয়

২০০৩-এর ১৭ আগস্ট সকাল ১১ টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে ২৮টিসহ দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা হামলা সংঘটিত হয়েছে। এর আগে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভা পর্যন্ত বোমা হামলা ও সন্ত্রাস সংঘটিত হয়েছে। আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতও রেহায় পাননি এই সন্ত্রাসী হামলা থেকে। আশির দশকে আফগানিস্তানে সোভিয়েতপন্থি সরকারকে রক্ষা করতে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে উপস্থিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেখানে তালেবান শক্তির উত্থান ঘটে। পাকিস্তানের তৎকালীন সরকার ও সউদী বংশোদ্ভূত ওসামা-বিন-লাদেনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনী পরাভূত হয় এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

www.pathagar.com

প্রায় ৮০ লাখ রিফুজি যারা যুদ্ধের সময় আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তারা আফগানিস্তানে ফিরে যায় এবং মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে গঠিত হয় আফগান তালেবান সরকারের কর্মকান্ড। ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের সময় সউদী আরবে মার্কিন বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হলে উসামা-বিন-লাদেন পবিত্র সউদী মাটি থেকে মার্কিন বাহিনী সরিয়ে নেয়ার দাবি জানান এবং রাজপরিবারের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে আফগানিস্তানের গভীর পর্বতমালার মধ্যে নিজের সংগঠন আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপন করেন। মোল্লা ওমরের তালেবানী শাসন পবিত্র কোরআন-হাদিস অনুসারে পরিচালিত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। আমাদের দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক গোলাম আজম, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব শ্রদ্ধেয় মাওলানা উবায়দুল হক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানসহ আলেম সমাজই তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা পরিচালিত হলে মার্কিন প্রশাসনের এক বিরাট অংশ এই সন্ত্রাসী হামলার জন্য ওসামা-বিন-লাদেনের আল কায়দা সংগঠনকেই দায়ী করেন। এ প্রেক্ষাপটে ইসলাম, সন্ত্রাস ও মুসলমানকে একসূত্রে গেঁথে ফেলার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে মুসলিম বিদ্বেষী একটি পশ্চিমা অপশক্তির মধ্যে। যদিও সউদী আরবের বাদশা, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা-নেত্রীরা পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন ইসলাম ও সন্ত্রাস কখনোই পাশাপাশি চলতে পারে না। ইসলাম হচ্ছে শান্তির মূলমন্ত্রে পরিচালিত বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ আর সন্ত্রাস হচ্ছে সভ্যতার কলঙ্ক। তারপরও জাতীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা বলে ১৫০ কোটি মুসলমানের সকলকেই সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করার হীন অপপ্রচার ও অপপ্রয়াস চলছে বিশ্বব্যাপী।

এই জটিল পরিস্থিতিতে মুসলিমবিদ্বেষী শক্তিগুলোর মূল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম দেশগুলোর জ্বালানি সম্পদের দিকে। পাশাপাশি পাকিস্তান-এবং ইরানের আণবিক শক্তির প্রতিও রয়েছে তাদের কূটিল দৃষ্টিভঙ্গি। এই দুটি শক্তির নিয়ন্ত্রণ নিতে তারা পশ্চিমা উদার জনগোষ্ঠীরও সমর্থন পেতে চায়। সেকারণেই বিভিন্নভাবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সউদী আরব, মিসর, তুরস্কসহ যে সব মুসলিম দেশের প্রতি পশ্চিমা জনগণের সহানুভূতি আছে তাদের মৌলবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র

www.pathagar.com

হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলেই মুসলিমবিদ্বেষী চক্রটি নিজের হীনস্বার্থ উদ্ধারে বেশ সফলতা লাভ করতে পারবে।

বাংলাদেশে এই মুসলিমবিদ্বেষী শক্তির ক্রীড়নকরাই ১৭ আগস্ট বোমা হামলাসহ সবসন্ত্রাসের হোতা কিনা দেশবাসীসহ সব রাজনৈতিক দলকে সেই দিকটি খতিয়ে দেখতে হবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। সরকারি দল বলেছে, আওয়ামী লীগ এই সন্ত্রাসী বোমাবাজি করেছে। আওয়ামী লীগ বলছে সরকারি দল এই বোমা হামলার জন্য দায়ী। সাবেক প্রেসিডেন্ট পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার হীন লক্ষ্য নিয়েই এই সন্ত্রাসী বোমা হামলার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রথমেই আসা যাক পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কথায়। অকার্যকর রাষ্ট্র বা ব্যর্থরাষ্ট্র মানে কি? ২০০৩ সালে নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন সাংবাদিক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেই প্রতিবেদনে তিনি বলেন - একটি দেশ সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়ে যদি জনগণের জানমাল ও তার প্রতিবেশি রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং শাসকশ্রেণী যদি দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে হুমকির মধ্যে নিপতিত করে তাহলে সেই রাষ্ট্রকে অবশ্যই ব্যর্থরাষ্ট্র আখ্যায়িত করা হবে। আর এই ব্যর্থরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ে টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই.।

আমাদের দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ ব্যর্থ, অযোগ্য সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে রাষ্ট্রকেই ব্যর্থ বলে আখ্যায়িত করেছে বার বার। এমনকি তখন জাতীয় পার্টির মধ্যেও এই প্রসঙ্গ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে অনেক। সে প্রসঙ্গে আমি যাব না। শুধু জাপা চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই আমার অভিমত প্রকাশ করবো।

তিনি পরিচ্ছন্নভাবেই বলেছেন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৭ আগস্ট সন্ত্রাসের বিভীষিকা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বেছে নেয়া হয়েছে স্পর্শকাতর মাদ্রাসাভিত্তিক আলেম সমাজকে। বোমার সঙ্গে লিফলেটও দেয়া হয়েছে। বাংলা এবং উর্দুতে অর্থাৎ উর্দুতে ব্যাখ্যা দেখলেই সাধারণ মানুষ যাতে মনে করতে পারে আলেম সমাজই এর সঙ্গে জড়িত। এই কূটকৌশলই দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছে এই সন্ত্রাসের সঙ্গে আলেম সমাজ

www.pathagar.com

কোনোক্রমেই জড়িত নয়। বরং যারা বাংলাদেশকে বিশ্বদরবারে বিশেষকরে পশ্চিমা বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর জনগণের কাছে মৌলবাদী সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করতে চায় তারাই এ ঘটনার পরিকল্পনাকারী, অর্থ ও বোমা সরবরাহকারী এবং লিফলেটের ভাষা নির্ধারণকারী।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে তাদের পরিকল্পনা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। সবধরণের শক্তি-সামর্থ্য ও কূটকৌশল দিয়েই তারা তাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করবে। এই পটভূমিতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির পরিণতি শুধু শত্রুকেই সাহায্য করতে পারে। সে কারণেই হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরী যখন সন্ত্রাসী বোমার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখন পশ্চিমা সংবাদপত্রে-এর বিশদ বিবরণ আসবে এটাই স্বাভাবিক। এর ফলে পশ্চিমা জনমনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা হবে এটাও স্বাভাবিক। যদিও প্রশ্ন থেকে যায়, রাষ্ট্রদূতের সফরসূচি সাধারণ মানুষ একঘন্টা পূর্বেও জানতে পারে না। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, যারা যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সফরসূচি বের করে আনতে পেরেছে তারাই বোমা হামলার মাধ্যমে হত্যা করতে চেয়েছে যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূতকে। কালো তালিকাভূক্ত করতে চেয়েছে বাংলাদেশকে। বিশ্বের দেশে দেশে জাতীয় পতাকাবাহী বাংলাদেশী পাসপোর্টকে করেছে সন্ত্রাসীর ছায়ায় প্রশ্নবিদ্ধ। তার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেছেন, বাংলাদেশ উদার গণতান্ত্রিক মুসলিম রাষ্ট্রের এক অনন্য উদাহরণ। তৎকালীন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নটবর সিং ৩ দিনের বাংলাদেশ সফর শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন - বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এরপরও আমি মনে করি - ১৭ আগস্টের দেশব্যাপী বোমা হামলার ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক চরিত্র প্রশ্নবানে বিদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমা দুনিয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বিদেশের মাটিতে বসবাসরত লক্ষ লক্ষ কর্মজীবী মানুষকে জটিল ও সংশয়মূলক পরিস্থিতি ঠেলে দেয়ার এক সুগভীর চক্রান্ত ও এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। আমার জানা মতে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের পত্রিকা ও গণমাধ্যমে ১৭ আগস্টের বোমা হামলার

www.pathagar.com

বিরূপ সম্প্রচার হয়। এর ফলে জনমনে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বিশেষকরে রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় দেখা যাবে একশ্রেণীর নেতা কি বলেন - তার অর্থ ও তাৎপর্য তারা নিজেরা বোঝেন কিনা আমার সংশয় হয়। অথবা এমনও হতে পারে জেনেশুনেই তারা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য বিশেষ মহলের এসাইনমেন্ট বাস্তবায়নের চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন। বিশেষকরে দেখতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বক্তব্যকে। তিনি বলেছেন - '১৪ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে সন্ত্রাসমূলক কোনো ঘটনা ঘটতে পারে বলে তাদের কাছে খবর ছিল। কোন্ সূত্র থেকে তাদের কাছে এই ধরণের সংবাদ ছিল তার বিস্তারিত তথ্য দেশবাসী ও কূটনৈতিক মহলকে অবহিত করলে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে বলে আমি মনে করি।

সরকার কিংবা অন্য যে কোনো রাজনৈতিক মহল যে কথাই বলুক না কেন একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বিভিন্ন সময় বোমা হামলায় নিহত হয়েছে বহু নিরপরাধ বাংলাদেশী নাগরিক। ২১ আগস্ট আইভি রহমানসহ নিহত হয়েছেন আওয়ামী লীগের বহু নেতাকর্মি। সাবেক অর্থমন্ত্রী এ এস এম এস কিবরিয়া সম্পর্কে বলতে চাই - তিনি কোনো দলের সম্পদ ছিলেন বলে আমি মনে করি না। আমি বিশ্বাস করি সাইফুর রহমান, সাইদুজ্জামান, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতো এ এস এম এস কিবরিয়াও ছিলেন আমাদের জাতীয় সম্পদ। জাতীয় নেতৃত্বকে মেধাশূন্য করে আগ্রাসীচক্রের নীলনকসা বাস্তবায়নের এটা সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত কিনা তা বিশেষভাবে তলিয়ে দেখা দরকার। সবকিছুর মধ্যে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি টেনে নেয়া কিছুতেই ঠিক নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে - সব ক্ষেত্রেই দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার ফলে জাতি হিসেবে খেসারতও আমাদের কম দিতে হচ্ছে না। আমরা যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, গণতন্ত্রের কথা বলি, তারা কিন্তু কারো কাছ থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করতে চাই না। জাতীয় সংকটের সময় যুক্তরাজ্য ও ভারতীয় নেতাদের আচরণ থেকেও শিক্ষা গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ আছে।

একটি কথা আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, ১৭ আগস্টের বোমা হামলাকারীদের ক্রিয়া-কর্ম বিশ্লেষণ করলে ৩টি লক্ষ্য বের হয়ে আসবে- (১) এই

www.pathagar.com

হামলায় ব্যবহৃত বোমাগুলো একইস্থান থেকে সরবরাহ করা হয়েছে (২) পরিকল্পনাকারীরা সন্ত্রাস ও ভীতি ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি যাতে সীমিত থাকে সেদিকে বিশষ দৃষ্টি রেখেছে। অথচ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত হেনেছে এবং (৩) অত্যন্ত কূটকৌশলে মাদ্রাসা ও ইসলামিক রাজনেতিক শক্তিকে আঙ্গুল দিয়ে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। পাশাপশি এই হামলার সঙ্গে উর্দুকেও ব্যবহার করা হয়েছে লিফলেট আকারে। কারণ মানুষ যাতে সহজেই অনুধাবণ করতে পারে এই হামলার সঙ্গে মুসলমানরাই বিশেষকরে যারা কোরান-হাদিসে বিশ্বাসী তারাই জড়িত। জাতীয় স্বার্থের দিকটিতে চরমভাবে উপেক্ষা করে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগের মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের সরকার চিহ্নিত করতে পারেনি। ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে, বাংলাদেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত সংস্থাগুলো মানুষ হয়রানির ব্যাপারে যতটা সফল, অপরাধী-সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করতে ততটা সফল নয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই হামলা বাংলাদেশকে ব্যর্থরাষ্ট্রে পরিণত করে বন্ধুহীন করার হীন ষড়যন্ত্রের অংশ। সেক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়েই এ সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসী হামলা ও অপপ্রচারের জবাব দিতে হবে। আর এই জাতীয় ঐক্যের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে সরকারকেই। আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতিতে যোগ্যতা হচ্ছে এক ধরনের অযোগ্যতা। কিন্তু তারপরও পশ্চিমা সরকার ও জনমতকে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা অবহিত করার লক্ষ্যে সর্বদলীয় জাতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

কালবিলম্ব না করে দেশের স্বার্থ ও ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করতে হবে। ব্যারিস্টার মওদুদ আহম্মেদ, ড. ওসমান ফারুক, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, তোফায়েল আহম্মেদ, শ্রী সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, জি এম কাদের ও মাহি বি চৌধুরীর মত ব্যক্তিদের এই প্রতিনিধি দলে প্রেরণ করলে দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। #

www.pathagar.com

ন্যাশনাল পিপল্স পার্টি গঠন

২০০৭ সালের ১৯ জুলাই ন্যাশনাল পিপল্স পার্টি (এনপিপি) আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। যদিও এনপিপি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই। আমরা তখনও জাতীয় পার্টির জাতীয়তাবাদী ধারার অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করি। সে সময় জাতীয় পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রচেষ্টা চলছিল বিভিন্ন মহল থেকে। যদিও আমি জাতীয় পার্টির সঙ্গে আওয়ামী লীগের ঐক্যের বিরোধী ছিলাম। কিন্তু এই প্রশ্নে দল থেকে বের হয়ে এসে নতুন কোনো দল গঠন করার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাতীয় পার্টির রাজনৈতিক ব্যানারটি ছিল বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোটের কাছে অপরিহার্য। তাদের কৌশল ছিল এরশাদকে না পেলে রওশন এরশাদের নেতৃত্বে আমাকে মহাসচিব করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো। যতবার বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, ততবারই আমার কাছে মনে হয়েছে বেগম রওশন এরশাদ সম্পর্কে তাঁর এক ধরণের সহানুভূতি ও আস্থা কাজ করে। কিন্তু বেগম রওশন এরশাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে

www.pathagar.com

এটা স্পষ্ট যে মুখে তিনি যাই বলুন না কেন অজান্তে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে তিনি অনেক বেশি ভালবাসেন ও তার উপর নির্ভরতা পরিহার করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা এ-ও ভেবেছিলাম, বেগম রওশন এরশাদকে না পাওয়া গেলে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টিকে সংগঠিত করার কথা। কিন্তু শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজ কেউই সে ধরণের ঝুঁকি নিতে রাজি হলেন না। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত: একবার তিনি ও কাজী জাফর আহম্মেদ জাতীয় পার্টি (জাফর-মোয়াজ্জেম) গঠন করে খুব ভাল করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত: ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিএনপি থেকে বের হয়ে যাওয়ায় তার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে মুন্সিগঞ্জে তিনি বিএনপি'র প্রধান নেতা হতে পারেন। এমনিতেই মুন্সিগঞ্জ আওয়ামী লীগ বিরোধী এবং বিএনপি'র দূর্গ বলে খ্যাত। এমতাবস্থায় সেখান থেকে বিএনপি'র টিকেটে তার নির্বাচনে জয়লাভ করা অত্যন্ত সহজ হবে।

এভাবেই ৩ জানুয়ারির পূর্বে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির একটি বিরাট অংশ বিএনপি'তে যোগদান করার ফলে সে পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। আমার সামনে পথ থাকে দু'টি; শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও সৈয়দা রাজিয়া ফয়েজের সঙ্গে বিএনপি'তে যোগ দেয়া অথবা জাতীয় পার্টিতেই থেকে যাওয়া। আমি শেষেরটাই বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু এরই মধ্যে দেশব্যাপী দলীয় বিভাজন চূড়ান্তরূপ লাভ করে এবং এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, আব্দুল হাই মন্ডল, শাহ সোলায়মান হোসেন ফকির এমপি, এডভোকেট শওকত হোসেন বাদল, আব্দুল হান্নান, জিল্লুর রহমান জিল্লু, আ হ ম জহির হোসেন হাকিম, মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা, মিসেস মনিরা বেগম, বাহারুল আলম বাহার, সেলিম তালুকদার, ফিরোজ মাহমুদ মঙ্গল, এম অহিদুর রহমান, এস এম আবুল বাশার, কামরুল হাসান, মোশাররফ হোসেন, এনামুল হক এনাম, শামসুল হুদা মামুন, দেলোয়ার হোসেন খোকন, হুমায়ুন কবির সুজন, সোলায়মান হোসেনসহ সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা আলাদা পথ ধরেন। জাতীয় কৃষক পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটি, যুব সংহতির একটি বিরাট অংশ, হকার্স পার্টিসহ অনেকেই ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। যার ফলে আমার উপর নির্ভরশীলদের বাদ দিয়ে আমি এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। বিশেষকরে এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, মরহুম আব্দুল হান্নান, বাহারুল আলম বাহার, মোঃ সেলিম তালুকদার, মিসেস মনিরা বেগম, এস এম আবুল

www.pathagar.com

বাশারসহ অনেকের ঝুঁকিপূর্ণ ভূমিকার কারণে আমার পক্ষে জাতীয় পার্টিতে তৎকালীন নেতৃত্বের সঙ্গে আপস করে অবস্থান করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আমার কিন্তু পূর্বেই পরিষ্কার ধারণা ছিল, আমরা জাতীয় পার্টির নামে টিকে থাকতে পারবো না। আমার রাজনৈতিক অবস্থান যাই হোক, অন্তত এটা বুঝে ওঠতে কষ্ট হয়নি যে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না। ইতিমধ্যেই আমি ও এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ গভীরভাবেই জড়িয়ে পড়েছিলাম তারেক রহমানের সঙ্গে। আমাদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আন্তরিক। তিনি আমাদের উপর গভীর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। সে কারণেই আমরা, বিশেষ করে এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ (তার ভাষায়) আওয়ামী পন্থি জাতীয় পার্টিতে থাকতে চাইলেন না। পরিশেষে ৫ জানুয়ারি ২০০৭-এ হোটেল পূর্বাণীতে সাংবাদিক সম্মেলন করে আমাদের নতুন জাতীয় পার্টির কার্যক্রম শুরু করলাম। ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনে আবেদন করলে আমাদের দলের নতুন প্রতীক বরাদ্দ হয় 'আম'। সারাদেশে আমাদের প্রার্থী দাঁড়ালো ৫৩ জন। কিন্তু ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনাপ্রধান মঈন ইউ আহমেদ ও বেগম খালেদা জিয়ার নিকটাত্মীয় ৯ম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিনের সহযোগিতায় আরেকটি রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেল বাংলাদেশে। কৌশলগত কারণে তারা পুতুল রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিনকেই স্বীয়পদে বহাল রাখলেন। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান রাষ্ট্রপতিকে নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী পুতুল হিসেবে ব্যবহার করেন। সেনাপ্রধানের ইচ্ছাও নির্দেশের বাইরে পুতুল রাষ্ট্রপতির পক্ষে কিছুই করার ক্ষমতা তখন ছিল না। প্রশাসন থেকে সরিয়ে দেয়া হলো রাষ্ট্রপতির প্রেসসচিব মোখলেছুর রহমান চৌধুরী এবং ডিজিএনএসআই-এর রাজ্জাকুল হায়দারকে। আগেই সুকৌশলে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল মেজর জেনারেল রুমিকে।

১২ জানুয়ারি বঙ্গভবনে শপথ অনুষ্ঠিত হলো ড. ফখরুদ্দিনের নামে পরিচালিত নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের। সে শপথ অনুষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী ধারার সকলকেই রাখা হলো অনুপস্থিত। সামনের সারিতে যারা আসন অলংকৃত করলেন, তারা হলেন- আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, বিকল্প ধারা (তৎকালীন এল ডি পি) সভাপতি ডাঃ বি চৌধুরী, খেলাফত মজলিশ আমীর মাওলানা আজিজুল হক, এল

www.pathagar.com

ডি পি সভাপতি কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমেদ বীরবিক্রম, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম, ইউপিআর সমন্বয়ক আ স ম আব্দুর রব, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলিপ বড়ুয়া, সিপিবি সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জাকের পার্টি চেয়ারম্যান মোস্তফা আমির ফয়সল, ন্যাপ-মোজাফ্ফর নেত্রী আমেনা আহমেদ, গণতন্ত্রী পার্টি সভাপতি নুরুল ইসলাম-সহ একটি বিশেষ ঘরানার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

দেশবাসী এদের সকলকেই একই রসুনের বিভিন্ন রূয়া বলেই মনে করেন। অন্যদিকে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, ডিএল সভাপতি ভাষাসৈনিক শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অলি আহাদ, জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, ইসলামী ঐক্যজোট চেয়ারম্যান মুফতী ফজলুল হক আমিনী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নির্বাহী সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, বালাদেশ মুসলিম লীগ সভাপতি এডভোকেট জি এ খান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা সভাপতি শফিউল আলম প্রধান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ চেয়ারম্যান শফিকুল গণি স্বপন, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এনডিপি চেয়ারম্যান খোন্দকার গোলাম মোর্তজা, ইসলামিক পার্টি সভাপতি এডভোকেট আবদুল মোবিন কিংবা আমার জাতীয় পার্টি-সহ সকল জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামি মূল্যবোধ সম্পন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্বকে সেই অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি।

আমরা যারা নির্বাচনী এলাকায় ব্যস্ত ছিলাম, তারা ঢাকাতে ফিরে আসতে শুরু করলাম। সব রাজনৈতিক কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করা হলো। এভাবে প্রায় ৬/৭ মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে সরকার দুর্নীতি বিরোধী অভিযান শুরু করল ব্যাপকভাবে। হোটেল শেরাটনে একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে বক্তব্য রাখলেন- সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ। আমি ও এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলাম। মইন ইউ আহমেদ তার বক্তৃতায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেন – গত ৫ বছরে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় থেকে লুণ্ঠন করা হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। অথচ এই ৫ বছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বরাদ্দই ছিল সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন ছিল ৯ হাজার কোটি টাকা।

www.pathagar.com

সেনাপ্রধানের এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি বিএনপি ও ৪ দলীয় জোটকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য মিথ্যা অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। নিরপেক্ষ সরকারের আবরণে এই আচরণ নিঃসন্দেহে পক্ষপাতদৃষ্ট যা ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্রীয় বেতনভোগী সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মকর্তা হিসেবে এ ধরণের রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলারও পরিপন্থি। এভাবে মইন ইউ আহমেদ বিশেষ মহলের ক্রীড়ণকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মতলববাজ রাজনীতিকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অতিরঞ্জিত রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে সেনাপ্রধানের পদকে কলঙ্কিত করেছেন।

পরে দলীয় সংস্কারের নামে প্রথমে মাইনাস 'থ্রি'-এর কাজ শুরু হয়। বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে বাদ দিয়ে দল সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। জাতীয় পার্টির সংস্কারের নামে হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করলে-বেগম রওশন এরশাদ-সহ একটি অংশ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তারা বেগম রওশন এরশাদকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও গোলাম মসিহ-কে মহাসচিব করে গঠন করে রওশন-মশিহ জাতীয় পার্টি।

পবিত্র জাতীয় সংসদ ভবনকে করা হলো সাবজেল ও বিশেষ আদালত। গ্রেফতার করে সাবজেলে বন্দি করা হলো-শহীদ জিয়ার স্ত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বঙ্গবন্ধু কণ্যা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান পরিণত হয় রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের ধ্বংস করার অভিযানে। ইতিমধ্যে এনজিও ব্যক্তিত্ব ড. মুহম্মদ ইউনূসকে রাজনীতিতে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো পেছন থেকে। তিনি ঢাকার পরিবর্তে দিল্লিতে বসে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দিলেন।

এই অবস্থায় একদিন আমাকে ও এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদকে দাওয়াত করল ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের ফাস্ট সেক্রেটারি রবার্ট ওয়ং। তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাউন্সিলর চার্লস উইটলিকেও দাওয়াত করেছিলেন। এই চার্লস উইটলি আমাকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া/কথাবার্তা হলো দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। এক পর্যায়ে রবার্ট ওয়ং- আমাদের বললেন, একই নামে ৭টি রাজনৈতিক দল করে তোমরা কোনো দিন প্রতিষ্ঠা পাবে না। জাতীয় পার্টি- এরশাদই হচ্ছে

www.pathagar.com

জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য জাতীয় পার্টি। রাজনীতি করতে হলে তোমাদের নতুন নামে, নতুন কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে। আর এটা আমি পূর্বেই চিন্তা করে রেখেছিলাম। প্রথমে বাংলাদেশ পিপল্স পাটি নামকরণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ফরহাদ ও আব্দুল হাই মন্ডল জাতীয় শব্দটি যুক্ত রাখতে চাইলে শেষে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম ন্যাশনাল পিপল্স পার্টি নামকরণের।

এরই মধ্যে বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান খান দুদুর সঙ্গে কথা হলো। কথা হলো মুসলিম লীগের যুগ্ম-মহাসচিব নবী চৌধুরীর সঙ্গে। আর যোগাযোগ করা হলো বিএনপি'র অঙ্গসংগঠন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এ বি এম শাহ্ আলমের সঙ্গে। একইভাবে ছাত্র দলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রথম সভাপতি নজরুল ইসলাম আকনের সঙ্গে। কথা হলো একসময়ের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোর ছাত্রনেতা ইদ্রিস চৌধুরী, কুমিল্লার এস এম জহিরুল হক ও এম অহিদুর রহমান, বাগেরহাটের- হারুন-অর-রশিদ, গাজীপুরের- মিসেস সালমা রহমান, আশরাফ হোসাইন সরকার, নরসিংদীর ডাঃ আলতাফ হোসেন, নারায়ণগঞ্জের ফিরোজ মাহমুদ মঙ্গল, ঝিনাইদহের কামরুল হাসান, বাগেরহাটের- এস.এম ফরিদ, ফকিরহাটের- কাজী সাহেব, পটুয়াখালীর- জিয়াউর রহমান হিরা, লক্ষ্মীপুরের- ফিরোজ মোহাম্মদ লিটন, রাজশাহীর কামরুন্নেছা শিখা, যশোরের মিসেস নাসিমা আক্তার প্রমুখের সঙ্গে। এদের সকলকেই রাজনৈতিকভাবে ধরে রেখেছিল আ হ ম জহির হোসেন হাকিম ও মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা। পার্টির পতাকা ও মনোগ্রাম তৈরি করেছিলেন আ হ ম জহির হোসেন হাকিম ও বাহারুল আলম বাহার।

বিশেষভাবে একটি গল্পের অবতারণা না করলেই নয়। ২০০৪ সালে জাতীয় কৃষক পার্টির জাতীয়-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আমাকে সভাপতি ও আব্দুল হাই মন্ডলকে সাধারণ সম্পাদক মনোনয়ন অনুমোদন দিয়ে পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রকৃত অর্থেই একজন উদার মনের মানুষ। তিনি আমাকে কাজ করার সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিজের মত করে সাজিয়ে গঠন করার অনুমতি প্রদান করেন। আমি সিনিয়র সকলকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করি। এ সময় মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদারও উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

এই জাতীয় কৃষক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয় ফিরোজ মোহাম্মদ লিটনকে। লিটন আমার কাছে এসেছিল সেই শিশু অবস্থায়। দলের কিছু নেতা গিয়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবকে বোঝালেন আমি আমার সাবেক দলের সকলকেই এই কমিটিতে রেখেছি এমন কি আমার অফিসের পিয়নকেও নেতা বানিয়ে দিয়েছি। এরশাদ সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন- এবং প্রশ্ন করলেন 'লিটন কে? তাকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কেন নেয়া হয়েছে?' আমি চেয়ারম্যান সাহেবকে বললাম- স্যার প্রত্যেকেরই কিছু বিশ্বস্ত লোক থাকে যেমন- কাজী জাফর আহমদ, আমি, রুহুল আমিন হাওলাদার এরা জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য। কিন্তু আমাদের চাইতে আপনার বেশি বিশ্বস্ত এই যে চা এনে দিচ্ছে সে। রেজা এবং সুনিল বাস্তবিকই অকৃত্রিম বিশ্বস্ত। আমারও তো দু'একজন বিশ্বস্ত লোক থাকা দরকার। আমি যখন আপনার সঙ্গে থাকব না তখন বড় নেতারা কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। এই লিটনরাই আমার সঙ্গে থাকবে। সে কারণেই লিটনকে আমি নেতা বানিয়েছি। এরশাদ সাহেব আমার কথা শুনে হেসে ফেললেন।

প্রথমে আমরা ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টির (এনপিপি) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করলাম। তার আহ্বায়ক হলেন এ বি এম শাহআলম। আমরা আমাদের জাতীয় পার্টি (নিলু-ফরহাদ) বিলুপ্ত করে ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টিতে যোগদান করলাম। এভাবে সবাইকে এনপিপিতে যোগদানের পর্ব শেষ করে ২০০৭ সালের ১৯ জুলাই তারিখে ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন ও ৯ দফা কর্মসূচি ঘোষাণা করা হলো।

৯ দফা কর্মসূচি

১. দেশের শাসনতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টি জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের দাবি করছে। এই কাউন্সিল হবে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। ৭ সদস্যের সমন্বয়ে এই কাউন্সিল গঠিত হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে এই কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন। বাকিরা সদস্য হবেন।

   নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে থাকবেন : (ক) প্রধানমন্ত্রী (খ) বিরোধী দলীয় নেতা (গ) সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি (ঘ) সেনাবাহিনী প্রধান (ঙ) নৌ-বাহিনী প্রধান (চ) বিমান বাহিনী প্রধান। প্রতিমাসে অন্তত একবার জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের বৈঠক হবে বাধ্যতামূলক।

www.pathagar.com

২। সরকার মূলত দু'টি স্তরে বিন্যস্ত হবে :

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার: যা পরিচালিত হবে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার নেতৃত্বে।

(খ) স্থানীয় সরকার: স্থানীয় উন্নয়নের সকল কার্যকলাপ উপজেলা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হবে। উপজেলা চেয়ারম্যান হবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত।

গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নই হবে জাতীয় সার্বিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি। সে কারণেই ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর ৫০ লক্ষ টাকা থোক বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৩। (ক) ইউনিয়ন পরিষদ নিজস্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ দিয়ে ইউনিয়নের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করবে।

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে ও তদারকিতে পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা পরিচালিত হবে।

(গ) সার, কীটনাশক ও বীজের চাহিদা নিরূপণসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(ঘ) প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের কৃষি উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের একটি কেন্দ্র ইউনিয়ন কর্তৃক পরিচালিত হবে।

(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদ যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলা ও তদারকিতে মূল দায়িত্ব পালন করবে।

৪। ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টি চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দরকে আধুনিকায়ন করার ব্যবস্থা করবে। প্রতিবেশি দেশ যাদের সমুদ্র বন্দর নেই, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সেসব অঞ্চলের বা রাষ্ট্রের সঙ্গে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান করবে। এভাবে জাতীয় স্বার্থ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করলে রাষ্ট্র অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ হবে।

৫। ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টি দেশের সুষম যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার লক্ষে অনতিবিলম্বে জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদ্মা সেতু নির্মাণের কর্মসূচি প্রণয়ন করবে।

www.pathagar.com

৬। প্রাথমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষাকে এককেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে চালুর কর্মসূচি প্রণয়ন করবে।

৭। দেশের গার্মেন্টস শিল্পের দ্রুত প্রসারে আগামীতে আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে সুষ্ঠু সমন্বয় বজায় রেখে গার্মেন্টস মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের উপর চাপ কমানোর জন্য রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের মধ্যবর্তীস্থানে আরেকটি গার্মেন্টস শিল্পপল্লী এবং ফরিদপুর-নড়াইল-খুলনা-বরিশালের মধ্যবর্তী স্থানে আরও দু'টি শিল্পপল্লী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৮। ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টি শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরী ৪৫০০/- (চার হাচার পাঁচশ) টাকা নির্ধারণ করবে।

৯। বিদ্যুৎ খাতে দ্রুত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টি বেসরকারি পর্যায়ে ৫০ থেকে ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রকল্প প্রদান করবে।

ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)'র কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি

(১) আহবায়ক : শেখ শওকত হোসেন নিলু, (২) সিনিয়র যুগ্ম-আহবায়ক : খালেকুজ্জামান খান দুদু (৩) সদস্য সচিব : এডভোকেট ফরিদুজ্জামান ফরহাদ (৪) যুগ্ম-আহবায়ক : শাহ সোলায়মান আলম ফকির (৫) এ বি এম শাহ আলম (৬) মোঃ আব্দুল হাই মন্ডল (৭) নবী চৌধুরী (৮) নজরুল ইসলাম আকন (৯) আ হ ম জহির হোসেন হাকিম (১০) এডভোকেট শওকত হোসেন বাদল (১১) মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা (১২) জিল্লুর রহমান জিল্লু (১৩) শামসুল হুদা মামুন (১৪) কর্ণেল (অব:) আতাউল হক (১৫) মেজর (অব:) লিয়াকত আলী চৌধুরী (১৬) এম এ হালিম (১৭) ইদ্রিস চৌধুরী (১৮) এম অহিদুর রহমান (১৯) মোস্তফা কামাল জাহাঙ্গীর (২০) মিসেস রাশিদা জামান (২১) শেখ আলতাফ মাহমুদ (২২) মোঃ হারুন-অর-রশিদ (২৩) প্রিন্সিপাল জাকির হোসেন (২৪) আলী আকবর বেগ (২৫) মোঃ মোশাররফ হোসেন (২৬) এস এম জহিরুল হক (২৭) এস এম ফরিদ আহমেদ।

www.pathagar.com

জেলা ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন

ঠাকুরগাঁও- মোঃ ইউনুস মিয়া, পঞ্চগড়- মোঃ শওকত আলী মিয়া, রাজশাহী- জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নাহ, নওগাঁ- আবু হেনা মোস্তফা কামাল চৌধুরী, বগুরা- আব্দুল জলিল (সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান), পাবনা- সোলায়মান হোসেন, চুয়াডাঙ্গা- মোঃ হাফিজুর রহমান, কুষ্টিয়া- আবু আহাদ আল মামুন (দীপু মীর) ও ইকবাল হাসান স্বপন, খুলনা- প্রিন্সিপাল জে বি চায়না, গোপালগঞ্জ- মোঃ মহসিন ও বাদশা তালুকদার, বাগেরহাট- কাজী সাহেব ও এস এম ফরিদ, পিরোজপুর- মাওলানা আব্দুস সাত্তার, ঝালকাঠি- আরিফুর রহমান আরিফ, বরিশাল- এ বি এম মাসুদ করিম, পটুয়াখালী- মোঃ সেলিম তালুকদার, বরগুনা- মিয়া মোঃ সেলিম ও মীর আজগর হায়াত, ভোলা- মিজানুর রহমান মিজান, কক্সবাজার- ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ শিবলী, খাগড়াছড়ি- অরুণ শান্তি চাকমা, চট্টগ্রাম- এনামুল হক এনাম ও ইয়াছির চৌধুরী, ফেনী- আবুল খায়ের বুলবুল, নোয়াখালী- মোশাররফ হোসেন, লক্ষ্মীপুর- মাস্টার আবু তাহের ও ওমর ফারুক, কুমিল্লা- বশির আহমেদ, নারায়ণগঞ্জ- ফিরোজ মাহমুদ মঙ্গল, মুন্সিগঞ্জ- হুমায়ুন কবির সুজন, নরসিংদী- ডা. আলতাফ হোসেন, গাজীপুর- মিসেস সালমা রহমান ও আশরাফ হোসাইন সরকার, ঢাকা- শামীমা মাসুদ নিপা, মিসেস রাজিয়া জামান, আয়শা বেগম লাভলী ও মোঃ নাসিরউদ্দিন, ময়মনসিংহ- শেখ হাসান ইমাম, মোখলেছুর রহমান মুনছুর ও খন্দকার রেজাউল করিম কমল, জামালপুর-মাওলানা হারুন-অর-রশিদ,শেরপুর- মোজাফ্ফর আহমেদ-সহ দেশব্যাপী আরো অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে ন্যাশনাল পিপল্স পার্টি (এনপিপি)'র নেতৃত্ব গড়ে উঠে। নির্বাচন কমিশনের নীতিমালা ও শর্তপূরণ করায় ২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশন এনপিপিকে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মর্যাদা প্রদান করে। #

www.pathagar.com

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
পিলখানায় সেনা অফিসারদের নির্মম হত্যাকান্ড

বড়াইবাড়ি ঘটনা থেকে পিলখানা হত্যাকান্ড

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অখন্ডতা ও সীমান্ত পাহারায় বিডিআরের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। দেশপ্রেমের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বিডিআরের সদস্যরা সেদিন বড়াইবাড়িতে জীবনবাজি রেখে ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিহত করে অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অবশ্য স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বিডিআর সীমান্তরক্ষায় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে আসছে। আর সেই বিডিআর-এর কিছু বিপথগামী সদস্য বিদেশী কুচক্রীমহলের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পিলখানায় নারকীয় হত্যাকান্ড চালিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর ৫৭ জন চৌকস অফিসারকে হত্যা করেছে। আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী যেকোন বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও বিদেশী আগ্রাসী অনুপ্রবেশ রোধ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তারই ফলশ্রুতিতে এই কুচক্রীমহল চেয়েছিল বিপথগামী এই বিডিআর জওয়ানদের প্রলোভনের মাধ্যমে ব্যবহার করে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে। তারা চেয়েছিল বিডিআর ও সেনাবাহিনীর মধ্যে আক্রোশ-দ্বন্দ্ব ও বিভেদ সৃষ্টি করে দেশে একটি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে এবং আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে একেবারে নির্মূল করে দিতে। কিন্তু তাতেও তারা সফল হয়নি।

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে সেনাবাহিনী ও বিড়িআর-এর মধ্যে আবার ঐক্য ফিরে আসছে এবং বিডিআর পুনর্গঠিত হয়ে আবার আগের অবস্থায় সংগঠিত হচ্ছে। ১৮ এপ্রিল বড়াইবাড়ি দিবস উপলক্ষে বিডিআর ও সেনাবাহিনীর জওয়ানরা নিজেদের ঐক্য ও সংহতি ফিরে পাবে এটাই দেশবাসীর কামনা।

www.pathagar.com

২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করে কথিত বিডিআর এর বিদ্রোহী জওয়ানরা। এতবড় হত্যাকান্ড এর আগে কখনও সংঘটিত হওয়ার দৃষ্টান্ত নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দু'টি পদাতিক বাহিনীর সামনাসামনি যুদ্ধকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এর একটি হল হিটলারের নাৎসীবাহিনী কর্তৃক ডানজিক সমুদ্রবন্দর দখলের যুদ্ধ। সেখান থেকে প্রায় ৭ লক্ষ ব্রিটিশ সেনা ও নাগরিককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়টি হল জার্মান বাহিনী কর্তৃক রাশিয়ার সেন্টপিটার্সবার্গ দখলের অভিযান (১৯৪৩)। এই দু'টি যুদ্ধেও একদিনে জেনারেলসহ ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যার নজির নেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ২৫ ফেব্রুয়ারির হত্যাকান্ড অবশ্যই সুপরিকল্পিত। এটা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সেনা অফিসার হত্যাকান্ড।

২৪ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিলখানায় বিডিআর-এর সালাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমত সেদিন কোনো অঘটন ঘটেনি। তবে ২৫ তারিখের হত্যাকান্ড যদি সরকারকে অপসারিত করার জন্যে পরিচালিত হত তাহলে ২৪ তারিখেই ষড়যন্ত্রকারী ও কুচক্রিরা তা করতে সক্ষম হতো। কিন্তু সে দিন তারা তা না করে করেছে ২৫ ফেব্রুয়ারি। যদি বিদ্রোহটি শুধুমাত্র তাদের দাবি দাওয়া আদায় করার বিষয় হতো তাহলে ২৪ তারিখে তারা সরকার প্রধানকে স্মারকলিপি দিয়ে অবহিত করতে পারতো। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে কোন্ অফিসার কোন্ স্থানে দায়িত্ব পালন করবেন, সেটা সেই অফিসারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর মোটেই নির্ভর করে না। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাকরির বিধান প্রতিপালনে আইনগতভাবে তারা বাধ্য।

আমাদের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনীর মধ্যে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌ-বাহিনী, সীমান্ত পাহাড়া দেয়ার জন্য বিডিআর, পুলিশ বাহিনী, আনসার বাহিনী, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী অন্যতম। তবে সেনাবাহিনী ও বিডিআর অপেক্ষাকৃত আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত করা হয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমেই।

মোটামুটি সেনাবাহিনীর লোকবল এক লক্ষ পাঁচ হাজারের কাছাকাছি। বিডিআর-এর লোকবল ৪২ হাজারেরও উপর। সশস্ত্রবাহিনীর অন্যসব অধিদপ্তরের ন্যায় বিডিআরের প্রধান হচ্ছেন ডিজি। তিনিই বিডিআর-এর কমান্ডিং অথরিটি।

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যদিয়েই আমাদের সেনাবাহিনী গড়ে উঠে। ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মেদ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে দু'দেশের সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গঠিত হয় যৌথকমান্ড। যৌথ কমান্ডের প্রধান করা হয় ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান লে জে জগজিৎ সিং অরোরাকে। প্রস্তাবিত যৌথ স্মারক রচনা করেন, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপদেষ্টা শ্রী ডি পি ধর। খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের আপত্তির কারণে সেই স্মারক এর কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। কিন্তু অলিখিত দু'টি বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহম্মেদ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমত বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও দ্বিতীয়ত পররাষ্ট্রনীতি।

অর্থাৎ বাংলাদেশের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য বেশি সহায়-সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যমে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে না তুলে ভারতের উপর নির্ভরশীল থাকা এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি একটি স্বাধীনসার্বভৌম রাষ্ট্রের মতো না করে কথিত বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের মতো করা বা ভারত কর্তৃক পরিচালিত হওয়া অর্থাৎ তখনকার সময়ের ভূটানের আঙ্গিকে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা।

কিন্তু ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে এসে উল্লেখিত দু'টি অলিখিত সিদ্ধান্তকে পরিহার করেন। এর মূল কারণ ছিল তৎকালীন বিশ্বব্যবস্থায় একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন-ভারত, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-জাপান বলয় এবং চীন-পাকিস্তান-সৌদি আরব বলয়। এই ত্রিমুখী বিশ্ববলয়ের প্রেক্ষাপটে শুধুমাত্র ভারত-সোভিয়েত বলয়ের মধ্য থেকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। সর্বোপরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশকে কারো করদ রাজ্যে পরিণত করতে চাননি। তিনি কাশ্মীরের শেখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ও হায়দরাবাদের নিজামের পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন বলে অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যার্বতনের প্রেক্ষাপটে প্রথম রাজনৈতিক আদর্শের প্রশ্নে বৈরি পরিস্থিতির শিকার হলো- প্রবাসী সরকার। বঙ্গবন্ধু নিজেই সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় কাজটি তিনি করেন, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে প্রধান ভূমিকা পালনকারী শক্তি ভারতীয় বাহিনীকে সহযোগি বাহিনী হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে। তাদের প্রতি বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে স্বসম্মানে স্বদেশে প্রত্যবর্তনের ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজস্ব সেনাবাহিনী ও বিডিআর বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর নিজের গড়া দল ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগ বিভক্ত হয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গড়ে উঠল। এর তাত্ত্বিকগুরু সিরাজুল আলম

www.pathagar.com

খান ও কাজী আরেফ আহমেদ। গণসংগঠনের নেতা মেজর জলিল, আসম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, হাসানুল হক ইনু আর সেনাবাহিনী থেকে আগত অবসর প্রাপ্ত কর্ণেল তাহের। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতির অবসান ঘটানো হয়।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল, বিচার বিভাগ, সিভিল প্রশাসন, ও গণমাধ্যম পুরোপুরি জবাবদিহিতার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ক্ষমতার অধিকারী। সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীও পরিচালিত হয় চেইন-অব-কমান্ডের মাধ্যমে। বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপমৃত্যু হলেও সিভিল প্রশাসন ও সেনাপ্রশাসনের চেইন-অব-কমান্ড ঠিকই ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর কর্ণেল তাহেরের নতুন তত্ত্ব সেনাবাহিনীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তার সেই সেনাবিদ্বেষী তত্ত্বটি ছিল - 'সিপাহী জনতা ভাই ভাই-জেসিওর উপরে অফিসার নাই'। এই তত্ত্ব বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ১৯৭৫ সালে আটজন সেনা অফিসারকে হত্যা করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীর শক্তি ও মর্যাদা নির্ভর করে বাহিনীর কমান্ডের উপর। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সামরিক শক্তি গড়ে উঠুক প্রথম থেকেই বন্ধু রাষ্ট্র ভারত তা চায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চীন, জার্মানি কেউই চায় না তাদের চেয়ে বেশি সামরিক শক্তিতে কেউ বলিয়ান হোক। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

আমি উল্লেখ করেছি সেনাবাহিনী ও বিডিআর আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। সেনাবাহিনী থাকে মূলত ক্যান্টনমেন্টে তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও নির্ধারিত কর্মসূচি নিয়ে। প্রেসিডেন্টের গার্ডরেজিমেন্ট ও এসএসএফ ছাড়া অন্য রেজিমেন্টগুলো রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করে। বিডিআর মূলত সীমান্তরক্ষা, চোরাচালান প্রতিহত করাসহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকে। বিডিআর-এর কমান্ড থাকে সেনাবাহিনীর অফিসারদের হাতে। সরকারের প্রশাসনিক নীতি- অনুসারেই এই কমান্ডিং অফিসাররা সেখানে ডেপুটেশনে থাকবে। এটা বিডিআর-এর জওয়ানরা নির্ধারণ করবেন না। এটা নির্ধারিত হবে সরকারের প্রশাসনিক নীতির আলোকে। কিন্তু মনে হয় যারা সেনাবাহিনীকে দুর্বল করাই মূল লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে কিংবা যারা মনে করেন বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই কিংবা যারা জাতীয় নিরাপত্তা অন্যের হাতে তুলে দিতে চায় তারাই অত্যন্ত কৌশলে সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে একটি মানসিক অসন্তোষ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলো।

গত অন্তর্বর্তী (তত্ত্বাবধায়ক) সরকারের আমলে বিডিআর-কে মুদির ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কাঁচা টাকা হাতা-হাতির ব্যবস্থা করা হয়। আইন প্রয়োগকারী

www.pathagar.com

সংস্থাকে লাভ লোকসানের ছল-চাতুরি করার সুযোগ দেয়া হয় অসৎ উদ্দেশ্যে। যা হওয়ার তাই হয়েছে- বিডিআরের অভ্যন্তরে বিশ্বাস অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল। অত্যন্ত কৌশলে এই মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের সৃষ্টি করা হয় অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে। এরমধ্যে হয়তোবা অফিসারদের অসতর্ক ব্যবহার শত্রুদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছে। সুতরাং যে প্রতিষ্ঠানের যে কাজ নয় - তাকে দিয়ে সেই কাজ করাতে চাইলে সঙ্কট হবেই, এটাই স্বাভাবিক।

বিডিআর-এর দায়িত্ব সীমান্ত পাহাড়া দেয়া। আটা আর চাল বিক্রি করা নয়। তাই ডাল-ভাত কর্মসূচি যারা প্রণয়ন করেছিল তাদের উদ্দেশ্য সৎ মানসিকতায় পরিচালিত হয়নি - এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

গোয়েন্দা ব্যর্থতা

পিলখানা হত্যাকান্ড তদন্তের ছোটখাট সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আর তা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপণীত হতে কোনো বাধা নেই যে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রকৃত অর্থেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির পর থেকে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও সিভিল আমলাদের কাউকে কাউকে হয়রানি করা ছাড়া গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আর কোনো দায়িত্ব পালন করেনি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা অন্যের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তারা বিবেকহীন দুষ্টচক্রে পরিণত হয়েছিল। জাতীয় সংসদের মত পবিত্র জায়গাতে তারা অন্ধবিচারালয় স্থাপন করে ক্যামেরা ট্রায়েলের আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে এভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহার করে অপমান করেছে বিশ্বদরবারে।

আবার যুক্তিযুক্ত কোনো কারণ ব্যতিরেকে এসএসএফ দিয়ে পাহাড়ার ব্যবস্থা করে প্রমাণ করেছে তাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা। সে কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর মধ্যে অসন্তোষ ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো গোয়েন্দা তথ্য সরকারের কাছে ছিল না। ২৪ ফেব্রুয়ারি বিডিআর জওয়ানদের পক্ষ থেকে তাদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত লিফলেট বিলি করা হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে। তারপরও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কোনো প্রকার সতর্ক সংবাদ দিতে পারেনি সরকারকে।

অন্যদিকে এতোবড় ষড়যন্ত্র হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাদের কর্মকর্তাদের আরো একটু বেশি চৌকস হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কি কারণে তা অনুপস্থিত

www.pathagar.com

ছিল তা শুধুমাত্র ভবিষ্যত ইতিহাসই বলতে পারবে। বিডিআর-এর কর্মসূচি ছিল তিন দিনের জন্য। ২৪ তারিখে প্যারেড, ২৫ তারিখে দরবার হলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও ২৬ তারিখে প্রীতিভোজের কর্মসূচি। তবে শেষদিনের কর্মসূচিতে যোগদানের আমন্ত্রন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেননি।

২৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী প্যারেড কর্মসূচি শেষ করে তার সরকারি বাসভবনে ফিরে আসেন। ২৫ তারিখ সকাল ৮টায় দরবার হলের কর্মসূচি ১ ঘন্টা পিছিয়ে দেয়া হয়। কর্মসূচি শুরু হয় সকাল ৯টায়। সকাল ৮টায় বিডিআর-এর ডিজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে বিডিআর বিদ্রোহের সংবাদ দেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনা অপারেশন চালানোর অনুরোধ জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনা সাহায্য প্রদানের জন্য আশ্বস্ত করেছিলেন বলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পেরেছি। তারপর বিডিআর-এর ডিজি যোগাযোগ স্থাপন করেন সেনা প্রধানের সঙ্গে। তিনিও বিদ্রোহ দমনে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মধ্যে কোনো সাহায্য বা উদ্ধার অভিযান পরিলক্ষিত হয়নি।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা ডিজি-বিডিআরসহ ১১ জন অফিসারকে হত্যা করে। তারপর ছুটে ডিজির বাংলোর দিকে। হত্যা করে ডিজির এক আমন্ত্রিত বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীকে। ডিজির স্ত্রীকে খুঁজে বের করে তাকে অমানবিকভাবে লাঞ্ছিত করার পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

এরইমধ্যে বিডিআর বিদ্রোহকে শান্ত করার জন্য যুব-পর্যায়ের সরকারি নেতৃত্বকে বিডিআর গেইটে প্রেরণ করা হয়। তারা অসীম সাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে বিদ্রোহের মূল নেতাদের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন বিদ্রোহীদের মূল নেতা ডিএডি তৌহিদকে সরকারের যুবনেতারা চিনল কেমন করে?

তাহলে কি বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাদের পূর্বযোগাযোগ ছিল? এরা কি তাহলে পূর্ব পরিচিত? পূর্বপরিচিত হতেই পারে। তবে এর মধ্যে আমি কোনো ষড়যন্ত্র দেখতে পাইনি। কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেকেই যায় - যে কোনো বিদ্রোহ শক্ত হাতে দমন করাই সঠিক ও স্বাভাবিক বিধান। কিন্তু ২৫ ফেব্রুয়ারির বিদ্রোহ দমনে সেই স্বাভাবিক বিধান মেনে কাজ করা হয়নি কেন? আমরা যদি প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো-মিজুরাম প্রদেশে স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ করলে ভারতীয় বিমানবাহিনী সেখানে কার্পেট বোম্বিং করে বিদ্রোহ দমন করে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সরকারে সময় শিখ সম্প্রদায়

www.pathagar.com

স্বর্ণমন্দিরকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ করলে ভারতীয় সেনাবাহিনী সেখানে নিষ্ঠুরতম হামলা চালিয়ে স্বর্ণমন্দির ধুলার সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু ২৫ ফেব্রুয়ারির সেনাহত্যাকান্ডের সময় ঘটেছে ঠিক তার উল্টোটা। কোনো কিছু না জেনেই বিদ্রোহীদের ক্ষমা ঘোষণা করার ফলে বিকাল থেকে সারারাত ধরে খুঁজে খুঁজে সেনাঅফিসারদের হত্যা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র এখানেই ঘটনার নৃশংসতা থেমে থাকেনি। বিদ্রোহীরা ৪০ ফুট গর্ত করে গণকবরের ব্যবস্থা করেছে। মাটিচাপা দিয়ে স্যুয়ারেজ লাইনের মধ্যে সেনাঅফিসারদের লাশ নিক্ষেপ করা হয়েছে। ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে পিলখানার চারপাশে তিন কিলোমিটার জায়গা খালি করার জন্য মাইকিং করা হয়েছিল - কি উদ্দেশ্যে ? কোন কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আজ পর্যন্ত তার কোনো পরিষ্কার ধারণা দেশবাসীকে দেয়া হয়নি। অনেকেই মনে করেন এর ফলে কামরাঙ্গির চর দিয়ে বহিরাগত হত্যাকারীরা নিরাপদে পিলখানা এলাকা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে ৩টি তদন্ত কমিটি

পিলখানা সেনা হত্যাকান্ডের পর বিডিআর বিদ্রোহের রহস্য উদঘাটনে সরকার ৩টি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। সমন্বয়কারি নিয়োগ করা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অবসর প্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ফারুক খানকে। এ পর্যন্ত তদন্ত কমিটির সমন্বিত রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। যদিও ইতিমধ্যে সরকারের সাবেক সচিবের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির আংশিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর নিজস্ব তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা দেয়া হলেও তা তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু পিলখানা সেনা হত্যা তদন্তের সমন্বয়কারী বাণিজ্যমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) ফারুক খান বলেছেন এর সঙ্গে জঙ্গি শক্তিগুলোর হাত থাকতে পারে। যদিও সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির যে আংশিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে তাতেও জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। দায়িত্বে বসে আম্‌তা আম্‌তা করে অস্পষ্ট কথা বললে দেশবাসী ধূম্রমজালের মধ্যে পড়তে পারে। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার সময় এটা নয়। প্রকৃত অপরাধীদেরকে ধরা ও এর পেছনের শক্তিকে খুঁজে বের করাই সততা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয়। আর প্রকৃত ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার লক্ষ্যে মহল বিশেষের আবোল-তাবোল মন্তব্য করা দেশবাসী কোনোক্রমেই গ্রহণ করবে না।

আমি মনে করি ২৫ ফেব্রুয়ারির পিলখানা সেনাকর্মকর্তা হত্যার ঘটনা সুপরিকল্পিত। তা না হলে অতিঅল্প সময়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে সেনাঅফিসারদের

www.pathagar.com

আইডেন্টিফাই করে হত্যা করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। কাউকে কোনো উপদেশ দেয়ার জন্য নয়। নিজের বিবেক পরিষ্কার করার জন্য একটা বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন দরকার।

প্রথমত আমরা ধরে নিচ্ছি - এই হত্যাকান্ড সুপরিকল্পিত, তা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে হবে। কোনো একটি গোষ্ঠী এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। অর্থাৎ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে তাদের স্বার্থ উদ্ধারে দরকার ছিল - এক. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মাস্টারমাইন্ড প্ল্যান। দুই. লজিস্টিক সার্পোট। তিন. বিশ্বস্ত ও দক্ষ বাস্তবায়নকারি শক্তি।

উপরোল্লেখিত বিষয়গুলো যদি আমরা নীতিগতভাবে গ্রহণ করি তাহলে প্রথমেই আমাদের একটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যে - বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে কে লাভবান হবে? চোরাকারবারিরা, মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা না-কি কোনো প্রতিবেশি রাষ্ট্র। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের প্রতিবেশি রাষ্ট্র কোনটি? প্রথমেই বলতে হয় ভারত ও বার্মা। পাকিস্তান কিংবা সিঙ্গাপুরকে কি আমরা প্রতিবেশি রাষ্ট্র বলতে পারি? না, বলা চলে না - এর উত্তর অত্যন্ত সহজ।

তিনটি তদন্ত সংস্থার সমন্বয়কারি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন - 'মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর এ ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র থাকতে পারে।'

অত্যন্ত সঙ্গত কারণে প্রশ্ন থেকে যায় এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কারা? বাংলাদেশকে একটি মুসলিম মৌলবাদী সন্ত্রাসী রাষ্ট্রে হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে, বাংলদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কাদের প্রতি এই অনুরোধ আসতে পারে শান্তি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য। সে কারণে আরো উল্লেখ করতে হয়, যে মৌলবাদী নামধারী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পিছনের মদদ দাতারাও তারাই হবে- যারা বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল ও ধ্বংস করে দিতে চায়। এখনও সমন্বিত তদন্তরির্পোট প্রকাশ হয়নি। তাই রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বে কোনো বক্তব্য দেয়া ঠিক হবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে আমাদের দেশপ্রেমিক নির্ভীক তরুণ সেনাসদস্যরা সাহসিকতার সঙ্গেই বলেছে - আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। আমি জনগণের পক্ষ থেকে বলতে চাই আপনি সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে যান। দেশবাসী ঐক্যবদ্ধ। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করার ক্ষমতা কারও নেই, ইনশাল্লাহ। #

www.pathagar.com

স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে দু'জন বুদ্ধিজীবীর মূল্যায়ন ও আমার বিশ্লেষণ

অতিসম্প্রতি শ্রদ্ধেয় নির্মল সেনের একটি চমৎকার লেখা প্রকাশিত হয়েছে 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায়। তিনি তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন তার এই লেখায়।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন - 'বঙ্গবন্ধু জয়-বাংলা, জয়-পাকিস্তান ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন।

লন্ডন প্রবাসী আব্দুল গাফফার চৌধুরী তার দীর্ঘ নিবন্ধের মধ্যে উল্লেখ করেছেন - 'নির্মল সেন'-এর এ বক্তব্য স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিকে দুর্বল করে দেবে।' অর্থাৎ তিনি ইতিহাসের সত্যঘটনাকে পাশ কাটিয়ে তার ভাষায় স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তিকে আক্রমনের কৌশল হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে শিখন্ডি হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

একজন রাজনীতিবিদের জীবন ও সময়কাল পর্যালোচনা করতে গেলে তার নিজেস্ব বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলকে বাদ দেয়া বা উপেক্ষা করা পুরোপুরি অযৌক্তিক। সে আলোকে শ্রদ্ধেয় নির্মল সেনের বক্তব্য মতলববাজির দুষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়নি। বরং আব্দুল গাফফার চৌধুরীর বক্তব্য ইতিহাস বিকৃতি করার এক নিন্দনীয় অপকৌশল। সে সম্পর্কে আমি পরে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

শ্রদ্ধেয় নির্মল সেন স্বাধীনতার ঘোষণার ক্ষেত্রে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকে নিছক একজন বেতার ঘোষকের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন এর চেয়ে বেশি কিছু এই ঘোষণাকে মুল্যায়ন করা চলে না। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে শ্রদ্ধেয় নির্মল সেনকে প্রশ্ন করতে চাই এই-নিষ্ঠুর একপেশে মূল্যায়ন কি ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা নয়?

১৯৭১ সালে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের কালোরাত পর্যন্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও নেতৃত্বের পর্যালোচনা করলেই এর উত্তর পাওয়া যাবে। সে সময় পূর্বপাকিস্তানের প্রধান এবং একমাত্র রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী লীগ। ১ মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে প্রথমেই ছাত্রলীগ প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলে ফেটে পড়ে। আমার পরিষ্কার মনে আছে ৩ মার্চ জগন্নাথ কলেজের সংসদ নির্বাচনের দিন নির্ধারিত ছিল। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে দুটি প্যানেল দেয়া হয়েছিল। একটিতে ছিল ছয়দফাপন্থিরা তার ভিপি ক্যান্ডিডেট ছিলেন - মরহুম আবেদ রেজা। এটি ছিল নূরে আলম ছিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন সমর্থিত। অন্যটি ছিল ভিপি- সাইফুর রহমান ও জি এস - আক্তারুজ্জামান আক্তার এর প্যানেল। এই প্যানেলটি ছিল আ স ম রব-শাহজাহান সিরাজ সমর্থিত। ছাত্র ইউনিয়নেরও একটি প্যানেল ছিল। ১ মার্চ ছাত্র ইউনিয়নের প্যানেল ও (রব-সিরাজ) সমর্থিত প্যানেলের পরিচিতি সভা ছিল। আমি গিয়েছিলাম ছাত্র ইউনিয়নের পরিচিতি সভায়। আ স ম আব্দুর রব গিয়েছিলেন সাইফুর-আক্তার পরিষদের পরিচিতি সভায়। বেলা ১১ টার সময় সংসদ অধিবেশন স্থগিতের সংবাদ এলে আ স ম আব্দুর রব-এর নেতৃত্বে প্রথম প্রতিবাদ মিছিল বের হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (বিলুপ্ত-সরকারি জগন্নাথ কলেজ) থেকে। সে মিছিলে আ ফ ম মাহবুবুল হক শ্লোগান তোলে - 'জিন্নাহ চাচার পাকিস্তান - আজিমপুরের গোরস্থান'।

www.pathagar.com

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আ স ম আব্দুর রব স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। ৩ মার্চ পল্টনময়দানে শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশ্‌তেহার পাঠ করেন।

আব্দুল গাফফার চৌধুরী ২০০৬ সালের ২৭ মার্চের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চের জনসভায় আজগর খানকে মঞ্চে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান তাহরিকে ইশতেকলাল পার্টির সভাপতি এয়ারমার্শাল আজগর খান ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় উপস্থিত থাকেনি।

নির্মলদা আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি ১৯৭১ সালে ৭ মার্চের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের এই নেতাকে কেন আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন তার একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রত্যাশা করি। কারণ এই ব্যাখ্যা দিতে পারলেই অজ্ঞ লোকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

আপনার মতো একজন গুণী লোকের কাছে আমাদের ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক। যখন প্রত্যাশিত স্বাধীনতার ঘোষণা কেউ দিতে পারলো না তখন একজন তরুণ সেনাঅফিসার জীবন উৎসর্গের ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। সে কারণেই কি ইতিহাসে তিনি গুরুত্বহীন? শুধুমাত্র কি রেডিও'র একজন ঘোষকের পর্যায়ে পড়ে? এ ঘোষণাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে উপস্থাপন করা কি তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতাকে আড়াল করার অপকৌশল নয়? আমি আরো পরিষ্কারভাবে বলতে চাই - ১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডাররা সকলেই ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে আসা বিদ্রোহী সেনাসদস্য। যার অগ্রনায়ক ছিলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তিনিই জীবনবাজি রেখে সেদিন রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রণাঙ্গণের এই যোদ্ধাদের সম্পর্কে তাচ্ছিল্য করা কি ইতিহাস বিকৃতি করা নয়?

আব্দুল গাফফার চৌধুরী সম্পর্কে বেশিকিছু বলার ইচ্ছা আমার নেই। তিনি থাকেন সাতসমুদ্র তের নদীর ওপারে সুদূর লন্ডনে। দেশত্যাগ করেছেন বহুকাল আগেই। ২০০১ সালের পর তিনি লিখেছেন - 'বাংলাদেশকে হিন্দু ছাড়া করার

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র হচ্ছে।' আমি লন্ডন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে তার সঙ্গে দেখা করে প্রশ্ন করেছিলাম - উপরোল্লেখিত প্রতিবেদনের সূত্র কি? তিনি আমাকে বললেন - 'কোলকাতা থেকে টেলিফোনে তার এক বন্ধু তাকে এই সংবাদ দিয়েছেন।' তার সম্পর্কে অকারণে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বলেই শেষ করতে চাই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'জয়-বাংলা, জয়-পাকিস্তান' বলেই তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছিলেন। এর অর্থ এই নয় - 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি।' বরং বলতে হবে এটাই হয়তোবা তাঁর রাজনৈতিক কৌশল ছিল।

পরিশেষে আব্দুল গাফফার চৌধুরীকে বলতে চাই - 'স্মৃতি বিভ্রাট শ্রী নির্মল সেন-এর হয়নি, স্মৃতি বিভ্রাট হয়েছে আপনার।' এখন হয়তোবা তিনি শহীদ মিনারও চিনতে পারবেন না। #

www.pathagar.com

ইয়াজউদ্দিন-ফখরুদ্দিন-মইনউদ্দিন সরকারের নিরপেক্ষতা

২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি'র নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোট বিপুল বিজয় অর্জন করে এবং দ্বিদলীয় সরকার গঠন করে। কিন্তু সরকার গঠনের শুরুতেই চরম অনিয়ম ও অনৈতিকতা প্রকট আকার ধারণ করে। ইসলামী ঐক্যজোট ও জাতীয় পার্টি (নাজিউর)কে মন্ত্রিসভার সম্পূর্ণ বাইরে রাখা হয়। এমনকি বিএনপি'র প্রবীণ গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের মধ্যে কে এম ওবায়দুর রহমান ও কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমেদের মত নেতাকে মন্ত্রিসভার বাইরে রেখে দলের মধ্যে অসন্তোষের বীজবপন করা হয়।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিক মিত্র বাড়াতে বিভিন্ন ধরণের কৌশল অবলম্বন করে নিরলসভাবে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চালাতে থাকে।

প্রথমেই আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের বহুল আলোচিত সরকার পতনের ট্রামকার্ড সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করা দরকার। শেখ হাসিনা বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ অসন্তোষকে কাজে লগিয়ে বিএনপি'র সিনিয়র নেতা কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মেদকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব করেন। তাতে উল্লেখ করা হয় ৬০ সদস্যের

www.pathagar.com

মন্ত্রিসভা গঠন ও ৩০ জন সংসদ সদস্যকে কিনে নিলেই অলি আহম্মেদ প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি বাইরে থেকে এ সংখ্যালঘু সরকারকে সমর্থন করবে এবং রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বেগম জিয়ার মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানাবে। বি চৌধুরী সে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারেনি। অলি আহম্মেদও ৬০ জন সংসদ সদস্য যোগাড় করে মন্ত্রিসভার তালিকা প্রণয়ন করতে পারেনি।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক - আবদুল জলিল-এর ট্রামকার্ডে সরকারেরও পতন হয়নি। কিন্তু শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কৌশল ও নিরলস চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়।

এর ফলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ বিএনপি ও ৪ দলীয় জোট রাষ্ট্রপতি বি চৌধুরী'র বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বিএনপি'র সংসদীয় দলের সভা থেকে বি চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের আহ্বান জানান। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে সংসদ অধিবেশন ডেকে ইমপিচমেন্ট করারও ঘোষণা দেয়া হয়। ফলে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে বি চৌধুরী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সে সময় রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হলে সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদের স্পীকার ব্যারিস্টার জমিরউদ্দীন সরকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। বি চৌধুরীর শূণ্যস্থান পূরণ করতে বিএনপি নতুন রাষ্ট্রপতি খুঁজতে শুরু করে। বড় দল হিসাবে বিএনপি'র খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতা এক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দান প্রক্রিয়ায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো। স্পীকার জমিরউদ্দীন সরকার কিংবা দলের মধ্যে থাকা সিনিয়র নেতৃবৃন্দ থেকে কিংবা দলের আদর্শে বিশ্বাসী অন্য কাউকে রাষ্ট্রপতি না করে সস্তা জনপ্রিয়তা ও বি চৌধুরীর এলাকাভিত্তিক প্রভাবকে প্রতিরোধ করতে মুন্সিগঞ্জ থেকেই মেরুদন্ডহীন ড. ইয়াজউদ্দিনের মত একজন লোককে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন করা হয়।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির মধ্যে অধ্যাপক ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, কর্ণেল (অব.) অলি আহম্মদ বীরবিক্রম, কে এম ওবায়দুর রহমান, এম সাইফুর রহমান, আব্দুল মান্নান ভূইয়া, চৌধুরী তানবীর আহম্মেদ সিদ্দিকী ও খন্দকার দেলোয়ার হোসেন নীতিগতভাবে একই ভাবাদর্শের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। মূলত আক্রমণ করা হয় বেগম খালেদা জিয়া ও রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে সামনে শিখন্ডি হিসেবে দাঁড় করিয়ে তারেক রহমানকে।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক চাল লক্ষ্য ভেদে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় কোম্পানি টাটার ১৪ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব প্রশ্নে খালেদা জিয়া জাতীয় স্বার্থের প্রতি দৃঢ়অবস্থান গ্রহণ করে। তিনি জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে টাটাকে বিশেষ ছাড় দিতে সম্মত হননি। এ প্রেক্ষাপটে দেশবিরোধী শক্তি দাতাগোষ্ঠীকে বিএনপি-জামায়াত সরকারের বিরুদ্ধে সহজেই দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। দেশে-বিদেশে এই সরকারকে চিহ্নিত করা হয় মৌলবাদী সরকার হিসেবে। অন্যদিকে সংবাদপত্র জগত ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া জোট সরকারবিরোধী শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে। সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই রাজপথের আন্দোলন, মিডিয়া ও প্রশাসনের মধ্যেও সমান্তরাল অবস্থার সৃষ্টি হতে থাকে। এ অবস্থায় ৪ দলীয় জোট ও বিএনপি'র মধ্যে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে চিড়ধরতে থাকে। এদিকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদও বিএনপি বিরোধী শিবিরে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করে। এভাবেই শুরু হয় ষড়যন্ত্রের জাল বিছানোর কাজ।

এর ফলে সারা দেশে শুরু হয় অরাজক পরিস্থিতি। এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অল্পসময়ের ব্যবধানে সে সরকারের ৫ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে সরকার অচল হয়ে পড়ে। ফলে ১১ জানুয়ারিতে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বাংলাদেশে শুরু হয় দু'বছরের জন্য ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, ড. ফখরুদ্দিন আহমেদ ও জেনারেল মইন-ইউ-আহমেদ-এর অসাংবিধানিক সরকার। ড. এ টি এম শামসুল হুদা'র তথাকথিত নিরপেক্ষতার নামে নির্বাচন কমিশনের ব্যানারে ষড়যন্ত্রের ডালপালা বিস্তার করে।

সেনাপ্রধান মইন-ইউ-আহমেদ-এর ভূমিকা

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচন অনুষ্ঠান ছিল সাংবিধানিক বাধ্য-বাধকতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু সেনাপ্রধান মইন-ইউ-আহমেদ সে শাসনতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ না করে দেশের নির্বাচন বন্ধ ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেন। ড. ইয়াজউদ্দিন ও ড. ফখরুদ্দিনকে ডামি সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রেখে – রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার শাসন শুরু করে। দুর্নীতিদমনের নামে বিরাজনীতিকরণ ও জাতীয় স্বাধীনতা নসাৎ করে বাংলাদেশকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্ত শুরু করে।

www.pathagar.com

প্রথমেই আমি মইন-ইউ-আহমেদের নিজের দেয়া বক্তব্য তুলে ধরলাম, যেখানে তিনি বলেছেন – '১০ জানুয়ারি ২০০৭ সালে সেনাবাহিনীকে নির্বাচনী কাজে সম্পৃক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। কিন্তু তিনি এতে স্বস্তিবোধ করেনি। এর অর্থ সরকারের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি।' তিনি পূর্ব থেকেই ভিন্নমত ও পরিকল্পনা ধারণ করে আসছিলেন। '১১ জানুয়ারি জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মি. জন মেরি গুই হিনো তার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। সব দল নির্বাচনে অংশ না নিলে সেনাবাহিনী সেই নির্বাচনে সম্পৃক্ত হলে বাংলাদেশের সেনাসদস্যদের জাতিসংঘ মিশন থেকে প্রত্যাহারের হুমকি প্রদান করেন।'

এখানেও প্রশ্ন থেকে যায় জাতিসংঘের একজন আন্ডার সেক্রেটারি সরকারকে অবহিত না করে সেনাবাহিনী প্রধানকে এভাবে প্রভাবিত করে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কিনা? সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারিকে সরকারের সঙ্গে কথা বলারও অনুরোধ করেনি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় তিনি একটি চক্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং ২২ জানুয়ারির নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হিসেবে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকেও তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেছিলেন।

জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি গুই হিনো বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধানকে যে হুমকি দিয়েছিল সেটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল, নাকি জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত ছিল তাও খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে জাতীয় সার্বভৌমত্বের স্বার্থেই। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়, বিরোধী দলের কিছু কিছু নেতা যে লাগামহীন বক্তব্য দিয়েছিল, যেমন - বঙ্গভবনের গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ও অক্সিজেন বন্ধ করে দেয়া হবে। এ রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য দেয়ার প্ররোচনা তারা আসলে কোথায় পেয়েছিল? সেনাপ্রধানের বিভিন্ন বক্তব্যে অনেকের কাছেই সেনাবাহিনীর মনোভাব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা জন্মেছিল।

সেনাপ্রধান নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেনি। কিন্তু তার যা যা প্রয়োজন ছিল তার সবকিছুই করিয়ে নিয়েছে নিজের ইচ্ছেমত। রাষ্ট্রীয় জীবনে ড. ইয়াজউদ্দিনদের মতো অপদার্থরা ছিল বলেই এই কাজগুলো করতে পেরেছিল মইন-ইউ-আহমদেরা। এখানে উল্লেখ্য যে, দুর্নীতিদমনের নামে ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক

www.pathagar.com

সরকারের পদত্যাগী উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরীকে দুর্নীতিদমন কমিশন-দুদক'-এর চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। সেই নিয়োগটি বৈধ ছিল কিনা আজ সচেতন মহলে প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে? সে সময় সেনাপ্রধানের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা নিয়েও আজ জনমনে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় জীবনে চরম নিয়মবহির্ভূত কাজ হয়েছে সে সময়।

লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের নামে সরকারি হেলিকপ্টার ও তেল ব্যবহার করে ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে। অথচ ছাত্ররা কোনো দুর্নীতি সৃষ্টিতে জড়িত থাকে না। দুর্নীতি করেন সরকারের মধ্যে থাকা কিছু ব্যক্তি, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত চাকরিজীবীরা।

সর্বোপরি জেনারেল মইন-ইউ-আহমেদ নিরাপদ নির্গমন পথ চেয়েছিলেন। আর সে কারণেই তিনি ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি পরিকল্পিত জাতীয় নির্বাচনের ছক তৈরী করেন। নির্বাচনের ফলাফল ছিল পূর্বপরিকল্পিত। প্রশাসনকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটকে জয়যুক্ত করার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেতে তিনি নেপথ্যে থেকে মূলভূমিকা পালন করেন।

জাতীয় নির্বাচনের পরপরই আওয়ামী লীগের কিছু কিছু নেতা যখন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলছিল, ঠিক তখনই এ ব্যাপারে জাতীয় নির্বাচনের পরপরই জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পরিষ্কারভাবে দেশবাসীকে অবহিত করেছেন যে, 'সেনাবাহিনীর সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে মহাজোট কখনোই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারতো না।' এ ব্যাপারে হোসেইন মুহম্মদ এরশাদ অবশ্যই ইতিহাসের নির্মম রাজস্বাক্ষী।

এই পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রের নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করেছিল সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন-ইউ-আহমেদ। এর ফলে দেশবাসীর মনে সেনাবহিনীর নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশন ড. এ টি এম শামসুল হুদা

২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির পর ড. ফকরুদ্দিন আহমদের সরকারের সময় বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা নিযুক্ত হন। তার সাথে নির্বাচন

www.pathagar.com

কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হন ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) সাখাওয়াত হোসেন ও ছহুল হোসেন। বিচারপতি আজিজকে জবরদস্তি ও বাধ্যতামূলকভাবে পদত্যাগ করানোর পর তাদের নিয়োগ দেয়া হয়।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্বগ্রহণের পরপরই তিনি পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমেই ১৬টি রাজনৈতিক দলকে সংলাপের জন্য তালিকাভূক্ত করা হলো আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য। এই ১৬টি দলের মধ্যে মহাজোটভূক্ত দলই হচ্ছে ১৩ টি। অন্যদিকে মূল বিএনপি বাদে সাইফুর-হাফিজ গ্রুপ অর্থাৎ মান্নান ভুঁইয়া গ্রুপ, জামায়াতে ইসলামি ও ইসলামি ঐক্যজোট এই তিনটি। বাকি গুরুত্বপূর্ন জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক ও ইসলামি দলগুলোকে কৌশলে বিশেষ মহলের সুবিধার জন্য বাদ দেয়া হয়।

আমরা ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টির পক্ষ থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিলাম তার সঙ্গে মতবিনিময় করার জন্য। তিনি সময় দিলেন, এনপিপি'র একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমাদের মূল প্রশ্ন ছিল নতুন পার্টি সম্পর্কে। তিনি বললেন – ২০০টি উপজেলায় অফিস, ৩৩টি জেলায় কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যকর অফিস এবং কেন্দ্রীয় অফিস থাকলে সেই দলকে নিবন্ধন দেয়ার যোগ্য দল হিসেবে বিবেচনা করা হবে। আমরা প্রশ্ন করলাম - সৎ রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্বের পক্ষে এসব শর্ত জরুরিআইন বলবৎ অবস্থায় কার্যকর করা সম্ভব কেমন করে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার কোনো যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে পারেনি। আমরা জানতে চাইলাম - যে ১৬টি রাজনৈতিক দলকে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের বিশেষ গুণগুলো কি কি? এরও কোনো সদোত্তর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে তারা দিতে পারেনি।

আমাদের কাছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ টি এম শামসুল হুদা জানতে চাইলেন, বিএনপি নামের দলটির সাইফুর ও হাফিজকে চিঠি দিয়ে তারা ঠিক করেছেন না বেঠিক করেছেন? আমরা বললাম - তারা অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন ইতিহাসের জঘন্যতম অন্যায় কাজ করেছে। বিএনপি'র নেতা ও সংসদের নেতা হচ্ছেন বেগম খালেদা জিয়া। আইনত ও নীতিগতভাবে দলীয় প্রধান হিসেবে বেগম খালেদা জিয়াকেই নির্বাচন কমিশন আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন - মান্নান ভূঁইয়াকে অন্যায়ভাবে দল থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। আমরা

www.pathagar.com

বললাম - বিএনপি'র গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে কি-না? বিএনপি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গত ১০ বছর মান্নান ভূঁইয়া যেভাবে মহাসচিব ছিলেন ঠিক সেভাবেই তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কেউ বিএনপি'র গঠনতন্ত্র নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। ঠিক একইভাবে চেয়ারপার্সন দলের গঠনতান্ত্রিক ক্ষমতাবলেই আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে বাদ দিয়ে মহাসচিব হিসেবে খন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে মনোনয়ন দিয়েছে। এ কারণে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তিনি পার্লামেন্টের সর্ববৃহৎ দলকে আমন্ত্রণ জানানো থেকে বিরত থাকতে পারেন না।

আলোচনা শেষে এনপিপি'র সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য খালেকুজ্জামান খান দুদু বললেন, আপনার অফিসের পিয়ন থেকে আরম্ভ করে ১৪ কোটি মানুষই জানেন বর্তমানে বিএনপি ও খালেদা জিয়া এবং আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা এক ও অভিন্ন নাম। যেমন-আমির হোসেন আমু কিংবা আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার মতো নেতারা দলের কোনো প্রতিনিধিত্ব করার দাবিদার হতে পারে না। আমরা নতুন দলের নিবন্ধনের শর্তাবলী শীতিল করার আবেদন জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এখানে উল্লেখ্য যে, দেশের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বিশেষকরে ভাষাআন্দোলনের অগ্রনায়ক, প্রবীণ জননেতা অলি আহাদের নেতৃত্বাধীণ ডেমোক্রেটিক লীগ, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, ন্যাপ-ভাসানী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনসহ জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ধারার রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে আহ্বান না জানিয়ে নির্বাচন কমিশন যে একটি বিশেষ মহলের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করেছে আজ তা দিবালোকের মত স্পষ্ট।

২০০৮ সালের জুন মাসে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে অন্যান্য শর্তাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল- ১০টি জেলায় কার্যকর অফিস ও জেলা কমিটি এবং ৫০টি উপজেলায় কার্যকর অফিস ও উপজেলা কমিটি অবশ্যই থাকতে হবে। সে শর্ত পালন করে প্রথমেই ৩৪টি জেলা, ৮৭ টি উপজেলা কমিটি ও অফিস, ব্যাংক একাউন্ট, গঠনতন্ত্রসহ আমরা নির্বাচন কমিশনের সম্পূর্ণ শর্তাবলী পূরণ করেই এনপিপি'র নিবন্ধনের জন্য কাগজপত্র জমা দিলাম। ঠিক সেসময়ই এনপিপি'র বিরুদ্ধে শুরু হলো ষড়যন্ত্র। একটি বিশেষ মহলের ইন্ধনে 'দৈনিক প্রথম আলো'সহ একটি বিশেষ ব্লকের সংবাদপত্রগুলোতে এনপিপি'র

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে শুরু হয় অপপ্রচার। আর নির্বাচন কমিশন এনপিপি'র নিবন্ধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে একের পর এক অনুসন্ধান কার্যক্রম চালাতে শুরু করে।

অন্যদিকে কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদের এলডিপি'কে তদন্তের নামে ক্ষুদ্র নাটকের প্রহসন সাজিয়ে দ্রুত ও নিরবে নিবন্ধন দেয়া হয়।

একইভাবে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে থাকে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে সে সময়ই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে জনমনে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল সে সন্দেহ ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে। একটি বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই যে ২২ জানুয়ারির নির্বাচন বাতিল, ড. ফখরুদ্দিন আহমদ-এর সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ড. শামসুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছিল তা সচেতন মহলের নিকট নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তত্ত্বাবধায় সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের কার্যক্রম

২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি ড. ফখরুদ্দিন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথগ্রহণের পর-পরই ১০ সদস্য বিশিষ্ট ড. পদবীধারী উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হলো। তার পর-পরই প্রথম গ্রেফতার করা হলো এদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি, এফবিসিসিআই'এর সাবেক সভাপতি সালমান এফ. রহমানকে। গ্রেফতার ও তার পরিবারের উপর নির্মমনির্যাতন চালানোর মাধ্যমে শুরু হলো তথাকথিত দুর্নীতিদমনের নামে প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের কাজ।

দুর্নীতি দমন করতে দুদককে ঢেলে সাজানোর নামে চেয়ারম্যান করা হলো ড. ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ২২ জানুয়ারির নির্বাচনকে ব্যর্থ করতে যে ৫ জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেছিলেন তাদেরই একজন সাবেক সেনাপ্রধান লে. জেনারেল (অব.) হাসান মসহুদ চৌধুরীকে। যদিও তার নিয়োগ নিয়েও বহু নাটকীয় ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি দুদক চেয়ারম্যান হয়েই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সহায়তায় সৃষ্টি করলেন গুরুতর অপরাধ দমন সমন্বয় কমিটি। যার চেয়ারম্যান ছিলেন সরকারের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) আবদুল মতিন চৌধুরী। সমন্বয়কারী ছিলেন ৯ম ডিভিশন ব্রিগেড কমান্ডার লে. জেনারেল মাসুদউদ্দিন

www.pathagar.com

চৌধুরী। শুরু হলো দুদকের অভিযান। একের পর এক গ্রেফতার করা শুরু হলো রাজনীতিবিদদের। গ্রেফতার ও দেশকে রাজনীতিক শূন্য করার কাজ চলতে থাকলো দুর্বার গতিতে। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, সাবেক মন্ত্রী ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীর, সাবেক মন্ত্রী শেখ সেলিম, সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক উপরাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, সাবেকমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান ও সাবেক মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সাবেকমন্ত্রী মির্জা আব্বাস, তারেক রহমান-সহ বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য রাজনীতিবিদকে।

অন্যদিকে শুরু করলো মাইনাস-টু থিউরী। দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কণ্যা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শহীদ জিয়ার সহধর্মীণি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। সংসদ ভবন সংলগ্ন স্পীকার ও ডিপুটি স্পীকারের বাসভনকে পরিণত করা হলো সাবজেল হিসাবে।

অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে শুরু হলো বাংলাদেশে নতুন ষড়যন্ত্র। দলের ভিতর সংস্কারের নামে শুরু হলো দল ভাঙ্গার খেলা ও সেনাপ্রধানের আর্শিবাদপুষ্ট দল গঠন। বিএনপিতে সংস্কারের নামে তৎকালীন দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া ও স্থায়ী কমিটির সিনিয়র সদস্য এম সাইফুর রহমানকে দিয়ে দলে শুরু করালেন সংস্কার নাটক। আওয়ামী লীগে আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সুরঞ্জিত সেন গুপ্তকে দিয়ে করানো সংস্কার নাটকও জমে উঠে। অন্যদিকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকেও রাজনীতি থেকে বাদ দেয়ার চেষ্টা চললে তিনি অত্যন্ত কৌশলে দলের সিনিয়র প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম রওশন এরশাদ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদকে সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে বিরত রাখেন। তবে তাদের অনেক জুনিয়র ও দীর্ঘদিন রাজনীতিতে নিক্রিয় থাকা এবং বিশেষ মহলের বিশ্বস্ত ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। যদিও তার এই মনোনয়নকে কেন্দ্র করে বেগম রওশন এরশাদের নেতৃত্বে একটি অংশ বিদ্রোহ করে আলাদা অবস্থান গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

আবার সেনাবাহিনীর আর্শিবাদের দোহাই দিয়ে কল্যাণ পার্টি ও পিডিপি'র জন্ম হয়। অন্যদিকে গ্রেফতারকৃত রাজনৈতিক নেতাদের উপর অমানবিক নির্যাতন চলতে থাকে। এই নির্যাতন থেকে তাদের পরিবার, স্ত্রী-সন্তানরাও রেহায় পায়নি। দুর্নীতির দায়ে বিচারের নামে গণতন্ত্রের প্রতীক মহান জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপিত বিশেষ আদালতে সকল অপরাধের প্রায় একই ধরণের শাস্তি প্রদান করা হয়। রায়গুলো দেখে মনে হয় একটি বিশেষ মহল থেকে এ রায়গুলো তৈরি করা। এক সময় তাদের এই অভিযান স্তিমিত হয়ে পড়ে।

এরইমধ্যে ভবিষ্যৎ করনীয় নির্ধারণে ড. ফখরুদ্দিন আহমদ রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের আয়োজন করে। যে নাটকের সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত ১৬টি দল ও একটি বিশেষ মহলের চিহ্নিত কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে সংলাপে আহ্বান করা হয়। অন্যদিকে এনপিপিকে সংলাপে প্রথম দিকের তালিকায় রাখা হয়। অপশক্তি নিয়ন্ত্রিত একটি বিশেষ ঘরানার মিডিয়ায় অপপ্রচারের পর-পরই ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এনপিপিকে সংলাপ থেকে বাদ দেয়।

এ সংলাপ নাটকের পর-পরই ড. ফখরুদ্দিন আহমদ, ড. শামসুল হুদা, নেপথ্যের নায়ক জেনারেল মইন-ইউ-আহমদ এবং তাদের সহযোগিরা তাদের পূর্বপরিকল্পিত নির্বাচনী রোডম্যাপ বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত করতে ২০০৮ সালে ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে। #

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন ও
’৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন

১৯৯০ সালে হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ পতন আন্দোলনের সময় থেকেই সরকারের মেয়াদ পূর্তির পর নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কেয়ারটেকার সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা একটি মহল থেকে বার বার বলা হচ্ছিল। এরই মধ্যে এরশাদ সরকারের পতন হলে বিরোধী দলগুলোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত হলো অর্ন্তবর্তীকালিন অস্থায়ী সরকার। এ সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে বিএনপি।

বিএনপি সরকারের আমলেই জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কেয়ারটেকার সরকার গঠনের প্রস্তাব করা হলে বিএনপি-আওয়ামী লীগসহ রাজনৈতিক দলগুলো তা প্রত্যাখ্যান করে। মূলত কেয়াটেকার সরকারের এই আহ্বান জামায়াতের পক্ষ থেকে ১৯৮০ সালেই উত্থাপিত হয়েছিল। সে সময় প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমির অধ্যাপক গোলাম আজম নির্বাচনে নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতির তত্ত্ব প্রদান করেন। সে সময় বিষয়টি রাজনৈতিক মহলে তেমন গুরুত্ব না পেলেও পরবর্তীতে মাগুরার একটি আসনে উপনির্বাচনের ঘোষিত ফলাফলকে সামনে রেখে বিষয়টি সামনে চলে আসে।

www.pathagar.com

১৯৯৩ সালে ২৬ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামানের ইন্তেকালে মাগুরার আসনটি শূন্য হলে সেখানে '২০ মার্চ'৯৪'-এ উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে কারচুপির ব্যাপক অভিযোগ উঠলে কেয়ারটেকার ইস্যুটি গুরুত্ব সহকারের সামনে চলে আসে। আবার মাগুরার উপ-নির্বাচনে তৎকালীন বিএনপি নেতা মেজর জেনারেল (অবঃ) মাজেদুল হক বিজয়ী হলে, বিরোধী দল থেকে ব্যাপক কারচুপি-ভোট ডাকাতির অভিযোগ তোলে আন্দোলনকে বেগবান করতে থাকে। অবশ্য এর পূর্বেই বিরোধীদলগুলো সংসদ বর্জনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে যুগপৎ আন্দোলন করছিল। সে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ইতিপূর্বে মিরপুরের উপনির্বাচন নিয়েও সরকারের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ উঠে।

'৯৪-এর দুটি উপ-নির্বাচনের পর-পরই বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, - বিএনপি সরকারের অধীনে আর কোন নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে না। এরই মধ্যে ৯৪-এর ২৭ জুন বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপ রেখা ঘোষণা করা হয়। একমাত্র সরকারি দল বিএনপি ছাড়া সব বিরোধী দলই এই ইস্যুর পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকারি দলের পক্ষ থেকে এই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই আন্দোলনকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে এরইমধ্যে আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টি-জামায়াতে ইসলামী'র সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্মিলিত বিরোধী দল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি আদায়ের জন্য বিরোধী দল একের পর এক কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা করতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে বলেন - 'পাগল ও শিশু ছাড়া আর কেউ নিরপেক্ষ নয়।'

অন্যদিকে সরকারের তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার দেয়ায় মন্ত্রিত্ব হারান। বিরোধীদলগুলোও আন্দোলন বেগবান করতে ৬ নভেম্বর একসঙ্গে সংসদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৮ নভেম্বর আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যরা দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার নিকট তাদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে দেয়। জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীও তাদের সংসদ সদস্যদের পদত্যাগপত্র নিজ নিজ সংসদীয় নেতার কাছে জমা রাখে। ২৮ ডিসেম্বর স্পীকারের কক্ষে সরকারিদল ও বিরোধীদলের মধ্যে আলোচনা শুরু হলেও তা ভেঙ্গে যায়। সে সময়ই পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে আওয়ামী লীগের ৯৩ জন, জাতীয় পার্টির ৩৪ জন ও জমায়াতের ১৯ জন নিয়ে মোট ১৪৬ জন পদত্যাগপত্র জমা দেন। এনডিপি'র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী নিজেই নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন। এর ফলে সরকার প্রচন্ড বেকায়দায় পড়ে যায়।

www.pathagar.com

১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন

ইতিমধ্যে বিরোধী দলগুলোর দাবি আদায়ের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। একপর্যায়ে সংসদের মেয়াদও প্রায় শেষপর্যায়ে চলে আসলে ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যও সংসদ নির্বাচন অতি জরুরি হয়ে উঠে। সরকার এ সুযোগে ৯৬-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীসহ সম্মিলিত বিরোধী দল নির্বাচনে অনুষ্ঠানের এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টি-জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে।

তবে আমার আজও বোধগম্য হচ্ছে না - যে দাবি আদায়ে সম্মিলিত বিরোধী দলের সেই আন্দোলন সে দাবি পূরণ করতে হলে সংসদের মাধ্যমে আইন পাস করা ছাড়া অন্যকোনো বিকল্প ছিল না। তাহলে সেদিন তারা নির্বাচন বয়কট করেছিলো কেন? কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য?

অন্যদিকে বিরোধী দলের সহযোগিতায় সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারিরাও নির্বাচনের দিন দায়িত্ব পালন না করার ঘোষণা দেন। সরকার পরিবর্তনে কিংবা বিরোধী দলের দাবি আদায়ে কেন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে বিদ্রোহ করানো হলো? আর তা কাদের স্বার্থে করানো হলো আজও সে বিষয়টি রহস্যের অন্ধকারেই নিমজ্জিত রয়ে গেছে।

১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে উঠলে এবং বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিলে সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরীকে দায়িত্ব দেয়া হয় নির্বাচন সমন্বয়ের। কারণ সরকারসহ সব মহলই অবগত ছিল যে এই নির্বাচনটি হবে একটি স্বল্পমেয়াদী পাতানো নির্বাচন। বিএনপি নেতা জয়পুরহাটের আব্দুল আলীম আমাকে আবদুল মতিন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। তার কথামত সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি আমাকে সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানালে আমি তার কাছে জানতে চাই কারা কারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। সে সময় তার আলোচনা থেকে আমি অনুমান করতে পারলাম, ড. কামাল হোসেন ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে বামধারার একটি ফ্রন্ট এবং কে.এম. ওবায়দুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকটি জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট হয়তো এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। যদিও আমার সেই ধারণা পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

৯৫-এর ২৫ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ১২ টায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী আমাকে আবারো তার বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাতের অনুরোধ করলে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আলমগীর হোসেন তখন আমার সঙ্গে সেই সাক্ষাত পর্বে উপস্থিত থাকলেন। বাসায় প্রবেশ করার মুখে দেখতে পাই সেখানে শত শত লোক দাঁড়িয়ে গল্পগুজবে ব্যস্ত। মন্ত্রীর পিএস আমাদের বাসার ভিতর নিয়ে গেলেন এবং দেখতে পেলাম মন্ত্রী সাহেব বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (জমির আলী) প্রার্থীদের সাক্ষাতকার নিচ্ছেন। সাক্ষাতকারে প্রার্থী হিসেবে উত্তীর্ণদের ১৫,০০০/- হাজার টাকা দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা শেষে পুনরায় যোগাযোগ করার কথা বললেন। আমি উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, মতিন ভাই এই সাক্ষাৎকার কি সরকরি দলের, নাকি বিরোধী দলের? তাৎক্ষণিক তিনি মুসলিম লীগ প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার বন্ধ করে আমার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন।

তিনি আমাকে বললেন, 'নিলু সাহেব, আমার হাতে সময় কম। বাইরে দেখেন বহু ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়াররা দাঁড়িয়ে আছে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য। আপনি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে প্রার্থী তালিকা দিন।' উত্তরে আমি বললাম, এই নির্বাচনে আমি ও আমার দল অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন লক্ষ্য করা গেল বিএনপি প্রার্থীরা একের পর এক বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হচ্ছেন। কিন্তু, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিল সরকারের দ্বিতীয় প্রভাবশালী নেতা অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের আসনে। সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কারণ যে প্রার্থী তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল, তার বাড়ি ছিল নোয়াখালী। আর ঠিকানা ছিল ঢাকার একটি হোটেলের। সে মূলত মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্যই ঢাকা এসেছিল। কিন্তু কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে এ রকম একজন লোক হলেন জাতীয় সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী। তাও সরকারের দ্বিতীয় প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে।

যাক অবশেষে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তায় সে লোকটিকে খুঁজে বের করা হলো। হেলিকপ্টারে করে সিলেট নিয়ে যাওয়া হলো এবং ডিসির সামনে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের আবেদনে স্বাক্ষর করানো হলো। সে সঙ্গে অর্থমন্ত্রীকেও বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হলো। নির্বাচন শেষে দেখা গেলো সরকারি দল ২৯৯ আসনে বিজয়ী হয়েছে এবং ১টি মাত্র আসন পেয়েছে বিরোধী দল। তিনি হলেন এনডিএ'র চেয়ারম্যান কর্ণেল (অব.) খন্দকার আবদুর রশিদ। যা হোক এভাবেই সমাপ্ত হলো মতিন চৌধুরীর ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনী নাটক।

বিরোধী দল ও ভোটারবিহীন নির্বাচনের পর গঠিত হলো ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ। ১৯ মার্চ নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। ২১ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল জাতীয়

www.pathagar.com

সংসদে বিএনপি'র পক্ষ থেকেই উত্থাপন করা হলো। ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে সংসদে পাস হলো বিরোধী দলের দীর্ঘদিনের আন্দোলন সংগ্রামের বহু আকাঙ্ক্ষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল।

আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আওয়ামী লীগের 'জনতার মঞ্চ', ও বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেইটে জামায়াতে ইসলামী'র 'কেয়ারটেকার মঞ্চ', দক্ষিণ গেইটে জাতীয় পার্টি'র উদ্যোগে ' 'গণতন্ত্র মঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করা হলো।

পরিস্থিতি ক্রমে জটিল আকার ধারণ করলে ৩০মার্চ বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করে সংবিধান অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করেন। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন

বিএনপি সরকারের পদত্যাগের পর সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে গঠিত হলো সংবিধানের আলোকে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সরকার গঠিত হওয়ার পর ২৭ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন ১২ জুন ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন :
ব্যর্থ অভ্যুত্থান ও লে. জেনারেল নাসিম

আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ সম্মিলিত বিরোধীদলের তত্ত্বাবধায়ক সকারের আন্দোলনের মুখে বিএনপি'র একদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদই নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রণয়নে বাধ্য হয়। সেই সংসদেই ২৬ মার্চ'০৬ বিরোধীদলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস হয়।

এই অবস্থার মধ্যেই পর্দার অন্তরালে চলতে থাকে ক্ষমতার পটপরিবর্তন ও ক্ষমতা গ্রহণের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র। বিরোধীদলের অব্যাহত চাপের মুখে ৩০ মার্চ বিকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এই দিনই সকালে তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মোহাম্মদ নাসিম বীরবিক্রম জরুরি বার্তা প্রেরণ করে দু'ঘন্টার মধ্যে (এনটিএম) সমগ্র সেনাবাহিনীর সভা আহ্বান করেন এবং একইসঙ্গে সেদিন তিনি স্থানীয় ডিভিশন ও ব্রিগেট কমান্ডারদের জরুরি কনফারেন্সের আহ্বান করেন। সেই কনফারেন্সে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত

www.pathagar.com

ছিলেন ৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ইমাম-উজ-জামান, ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেট কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার রোকন, ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেট কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার রহিম, ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার রফি, আর্মি সিগন্যাল ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার আজিজুল হক। সে সভায় সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মোহাম্মদ নাসিম দেশের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতাগ্রহণে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। সে সভায়ই সেনাপ্রধানের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মেজর জেনারেল ইমাম-উজ-জামান, ব্রিগেডিয়ার রহিম ও ব্রিগেডিয়ার রোকন বলেন - দেশ শাসন করা সেনাবাহিনীর কাজ নয়। সেনাবাহিনীর কাজ হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি গণতন্ত্র, সংবিধান এবং সাংবিধানিকভাবে বৈধ সরকারকে রক্ষা করা তথা নিরাপত্তা বিধান করা। তাদের চরম আপত্তির মুখে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নাসিম একরাশ হতাশার মধ্যে কনফারেন্স বাতিল করে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত করেন। তবে পরিকল্পনা স্থগিত করলেও বসে ছিলেন না সেনাপ্রধান। তিনি ভিন্নপথ ধরে অগ্রসর হওয়ার চক্রান্ত শুরু করেন।

সেসময় বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত মেজর (অবঃ) নাসিরউদ্দীন ও ক্যাপ্টেন (অবঃ) এ.বি. তাজুল ইসলাম (বর্তমানে সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী)-সহ অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা ও বিশেষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ মেজর নাসিরের বাসায় ঘন-ঘন বৈঠক করতে থাকেন লে. জেনারেল নাসিমের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য। সেই বৈঠকগুলোতে বগুড়ার জিওসি মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ বিভিন্ন সময় অংশগ্রহণ করেছেন এবং তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ করতেন। এ বিষয়ে আরো জড়িত হয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার মীরন হামিদুর রহমান, মেজর সৈয়দ মাহমুদ হাসান, লেঃ (অবঃ) কাজী কবির উদ্দিনসহ অনেকেই। তারা শুধু রাজনৈতিক নেতাদেরে সঙ্গেই আলোচনা করেনি সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ক্ষমতাদখলের জন্য সেনাকর্মকর্তাদের তৈরির কাজও করেছেন।

অন্যদিকে বাইরের রাজনীতিতেও চলছিল উত্তপ্ত অবস্থা। এরই মধ্যে ডিজি-ডিএফআই মেজর জেনারেল এম এ মতিন কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ডিএফআই'র রিপোর্ট মোতাবেক সে সময় সেনাশৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বগুড়ার জিওসি মেজর জেনারেল গোলাম হেলাল মোর্শেদ খান বীরবিক্রম ও বিডিআর-এর উপ-মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মীরন হামিদুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবদুর রহমান বিশ্বাস বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করেন। এ ঘটনায় সেনাপ্রধান ক্ষুব্ধ হয়ে সব চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে একের পর এক ডিজি, এরিয়া কমান্ডারসহ সব উর্ধ্বতন

www.pathagar.com

সেনাকর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে উসকানি দিতে থাকেন যা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার পরিপন্থি। এ বিষয়ে ১৮ মে সেনাপ্রধান ময়মনসিংহ-এর জিওসি মেজর জেনারেল আইনউদ্দীন ও ৯ পদাতিকের জিওসি মেজর জেনারেল ইমাম-উজ-জামানের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

১৯ মে সকালে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল মোহাম্মদ নাসিম বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দু'জন অফিসারকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি তাকে জানান এ বিষয়ে তিনি ভেবে-চিন্তে-সকল বিষয় নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে তা বিবেচনার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপ করার পর সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ ও সাহায্য কামনা করে দুপুরে প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতির আদেশ অমান্য করে মে. জেনারেল হেলাল মোর্শেদকে কাজে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করেন। তাদের অবসর দেয়ার রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য যশোরের জিওসি মে. জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিমও রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেছিলেন। এ বিষয়গুলো নিয়ে ক্যাপ্টেন (অব.) তাজ নিয়মিত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করছিলেন। সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাইরের ডিভিশনগুলো হতে ঢাকায় সৈন্য সমাবেশের মত আত্মঘাতী ও রাষ্ট্রদ্রোহী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে ক্ষমতাগ্রহণের পরিস্থিতি থেকে সরিয়ে এনে গণতন্ত্র রক্ষা করতে মেজর জেনারেল এম এ মতিন, মে. জেনারেল ইমাম-উজ-জামান, মে. জেনারেল সুবেদ আলী ভুইয়া, মে. জেনারেল রুহুল আলম, ব্রিগেডিয়ার আব্দুর রহিম ও কর্ণেল সালাম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

২০ মে সিজিএম মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান এ বিষয়টি রাষ্ট্রপতি ও সেনপ্রধান জেনারেল নাসিমের সঙ্গে আলোচনা করে উদ্ভূত সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু আপসের মাধ্যমে সংকট উত্তরণের সকল পথ তখন রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস লে. জেনারেল মোহাম্মদ নাসিমকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে অপসারণ করে মে. জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। এ প্রেক্ষাপটে জাতিকে বিষয়টি অবহিত করার লক্ষ্যে তিনি এক বেতার ভাষণ প্রদান করেন যা বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে ও গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

সাহসী ও সফল রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস

এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস সাহসী, ন্যায়পরায়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে একটি মহাদুর্যোগ হতে রক্ষা ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সেসময় ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন রাজনীতিবিদরা। ১৮ মে'৯৬ মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ও ব্রিগেডিয়ার মীরনকে চাকরিচ্যুতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) বিবৃতি প্রদান করে পুরো ঘটনার সঙ্গে তার দলের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করেছিলেন।

কিন্তু মহামান্য রাষ্টপ্রতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস দ্রুত ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তার পদক্ষেপ ছিল সঠিক ও সময়োচিত। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক যে, দেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিরোধিতার করণেই রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ ও বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে যা চরমভাবে দেশবাসীকে হতাশ করেছে।

তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিশ্লেষন করলে এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস তার দৃঢ়তা ও সাহস দিয়ে যে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিলেন তাতে প্রমাণিত হয় তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুরদর্শী ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ।

সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ১/১১-ঘটনায় চরম ব্যর্থতার প্রমাণ রেখেছেন মেরুদন্ডহীন রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দীন আহমদ। এখান থেকে শিক্ষা হতে পারে দেশপ্রেমিক, যোগ্য ও সাহসী রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোনো বিকল্প হতে পারে না। তিনি রাজনৈতিকভাবে যে দলেরই অনুসারী হোননা কেন, সেদিন আব্দুর রহমান বিশ্বাসের সাহসিকাতার জন্য যে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা পেয়েছিল, ১/১১ প্রেক্ষাপটে ড. ইয়াজউদ্দীনের ভীরুতার কারণেই ২০০৬ সালে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। এরফলে রাজনীতিকে কলসিত করা সম্ভব হয়েছে এবং সফল হয়েছে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের হেয়প্রতিপন্ন করার চক্রান্ত। #

www.pathagar.com

আগামী দিনের মুসলিম বিশ্ব

বিগত প্রায় ১৫শ' বছরের বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সমাজের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরই এসব রাষ্ট্র ও সমাজের বিকাশ। পশ্চিমা ঔনিবেশিক যুগের অবসান শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে বহুদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। আরব অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে বহু মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। এখন পর্যন্ত ৬৫টি দেশকে আমরা মুসলিম অধ্যুষিত দেশ বা রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। আবার বহু দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রধান সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য। তারমধ্যে ভারত, জার্মান, গ্রেটবৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য।

ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি। প্রায় ১৫০কোটি মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্ত। আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের প্রায় ৬৫ ভাগই মুসলিম দেশগুলোর ভৌগোলিক সীমায় অবস্থিত।

www.pathagar.com

বিশেষকরে তেল, গ্যাস, কয়লা ও সোনার আবিষ্কৃত খনিগুলোর অধিকাংশই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পড়েছে। আমেরিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিশাল ভূখন্ডে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র নেই। ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে একটি বিন্দুর মত দাঁড়িয়ে আছে বসনিয়া। মূলত এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান সীমাবদ্ধ। এর একদিকে মরক্কো থেকে পাকিস্তান, আর অন্যদিকে তুরস্ক থেকে লিবিয়া-সাহারা এই বিশাল ভূ-ভাগে মূলত মুসলিম রাষ্ট্রেগুলোর মূল জনপদ। এ ছাড়া চারদিক দিয়ে ভূ-বেষ্টিত বসনিয়ার মতই বাংলাদেশও মুসলিম বিশ্বের অভিন্ন অংশ। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বে আরও রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পাড় পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই-দারুস্‌সালাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর পৃথিবীর প্রধান পরাশক্তি হয়ে উঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আফগান যুদ্ধে পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সোভিয়েত সামাজিক সামাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। তারই ধারাবাহিকতায় শেষপর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রকাঠামো ধসে পড়ে। আর এ অবস্থায় বার্লিন প্রাচীর ওঠে গেলে পশ্চিমের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব অনেকটা ঘুচে যায়। পরিবর্তিত এই বিশ্বপ্রেক্ষাপটে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী ও নেতৃবৃন্দের মনের মধ্যে ইসলামী শক্তি ও সভ্যতা সম্পর্কে সংশয় ও সংঘাত দানা বেঁধে উঠে।

খ্রিস্টান ইহুদি বলয়কেই সাধারণত পশ্চিমা বলয় বলে মনে করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান দেশগুলোর অর্থনীতিতে ইহুদিদের বিশাল নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এই ইহুদিদের ঐতিহাসিক আবেগ জড়িত রয়েছে জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন ভূখন্ডের মধ্যে ব্রিটিশ-মার্কিন যৌথ উদ্যোগে ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়। মুসলিম জনগোষ্ঠী এই ইহুদি রাষ্ট্র সৃষ্টিকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ২০০১ সালে ৯/১১ এর পর ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বলেই ফেলেছেন নতুন করে ক্রুসেড শুরু হয়েছে। পরে তিনি নিজেকে সংযত করে বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এভাবেই বিশ্বে পশ্চিমা খ্রিস্টান ইহুদি শক্তির সঙ্গে বর্তমান মুসলিম বিশ্বের মানসিক সংঘাত প্রখর হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

১৯৭৭ সালে পাকিস্তানে ভুট্টোর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এ সময় আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী উপস্থিত হলে পাকিস্তানের নিরাপত্তা এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়। পাশাপাশি ভারত কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছে, তার কারণে দুই দিক থেকেই পাকিস্তানের নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে রয়েছে। সে সময় মার্কিন ও পশ্চিমাদের নীতি ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য ঠিক রেখে সোভিয়েত বাহিনীকে আফগানিস্তানে পর্যুদস্ত করা। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের সমর্থন নিয়ে আফগানিস্তানে তালেবান শক্তির উত্থান হয়।

১৯৭৮ সালের গোড়ার দিকে মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধকে প্রত্যক্ষভাবে সংগঠিত করতে এগিয়ে আসে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে ওসামাবিন লাদেন ও মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে চরমপন্থি মুসলিম মৌলবাদী ও গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির গোড়াপত্তন হয়। একসময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের পরিবারের সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের ছিল পারিবারিক বন্ধুত্ব। সোভিয়েত বিরোধী আফগান যুদ্ধের সময়ও ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে মার্কিন ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়ভাবে ছিল নিবিড় যোগাযোগ। ঠিক কখন এই সখ্যতার চিড় ধরেছিল তার সঠিক সময় বা দিনক্ষণ আমার জানা নেই। ১৯৮৮ সনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক নিহত হন। এর বহু আগেই ইরানের শাহ পাহলভীর পতন হয়। এর ফলে মার্কিনবিরোধী ইসলামিক বিপ্লব সংঘটিত হয়।

ইরাকের সাদ্দাম হোসেনও ইরানের ইসলামি বিপ্লবকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মার্কিন ও আরব দেশগুলোর সমর্থন নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে। এই ছিল তখনকার মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের টানা পোড়েন। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ দেশ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া। প্রায় ১৭ হাজার ছোট-বড় দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গঠিত। এ দেশের জনগণের ৯০ ভাগই মুসলমান। কিছু হিন্দু ও চাইনিজ-বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার জনগোষ্ঠী। প্রায় ১৭ হাজার দ্বীপ থাকলেও মানুষের বসবাসযোগ্য দ্বীপ রয়েছে মাত্র ৩৮৫টি। এর লোক সংখ্যা প্রায় ২৭ কোটি। অর্থাৎ লোকসংখ্যার দিক দিয়ে বিচার করলে চীন-ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান। এক সময় ইন্দোনেশিয়ার নৌ-বাহিনী পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ নৌশক্তির স্থান অধিকার করেছিল। এর আয়তন ভারতের

www.pathagar.com

চাইতেও বেশি। ১৯৬৫ সালে সুকর্নোর সরকারকে সরিয়ে দিয়ে মার্কিন ও পশ্চিমা শক্তির সমর্থন নিয়ে সেনাপ্রধান সুহার্তো ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে।

সুহার্তো প্রায় ৩০ বছর একনাগারে রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখেন মূলত মার্কিন সমর্থনের জোরেই। ইন্দোনেশিয়ার পাশের মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া। দেশটির ধনতান্ত্রিক শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে উঠে মূলত পাশে অবস্থিত ফ্রি-পোর্ট সিঙ্গাপুরের কারণেই। পশ্চিমা অর্থনীতির বিশ্বস্ত পার্টনার হচ্ছে মালয়েশিয়া। এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও গড়ে উঠেছে ধনতান্ত্রিক অবকাঠামোর মধ্যে এবং মূল্যবোধও গড়ে ওঠে সেভাবেই। সে কারণে স্বাভাবিক নিয়মেই মালয়েশিয়ার জনগণের পছন্দ হয়ে ওঠে মধ্যপন্থার রাজনীতি।

ব্রুনাই-দারুস্‌সালাম একটি রাজতান্ত্রিক তেলসমৃদ্ধ দেশ। এর বাদশার বিশাল বিনিয়োগ রয়েছে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদেশগুলোতে। সৌদি আরব, মিসর, তুরস্কসহ অনেক আরব দেশের সঙ্গেই পশ্চিমা বিশ্বের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। মূলত রাষ্ট্র হিসেবে একমাত্র বর্তমান ইরান আর রাষ্ট্রচ্যুত তালেবান আল-কায়েদা ও এর নেতা ওসামা বিন লাদেন মোল্লা ওমর ছাড়া মুসলিম জাহানের সব দেশ এবং জনগণের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা শক্তির সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তারপরও মুসলিম শক্তির সঙ্গে খ্রিস্টান ও ইহুদি শক্তির সংঘাত লেগেই আছে। পশ্চিমা দেশগুলোর এ রকম মানসিকতার বিষয়টি কারো কাছেই বোধগম্য নয়।

বড় ধরণের রাজনৈতিক ভুল

২০০১ সালের ৯/১১ এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারের হামলাকে ক্রুসেডের নতুনমাত্রা হিসেবে আখ্যায়িত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইতিহাসের গতিধারাকে ভিন্নখাতে প্রবাহের অপচেষ্টায় মেতে ওঠেন। আমরা যদি ধরেই নেই, এই হামলা ওসামাবিন লাদেনের আল কায়দা গোষ্ঠী করেছে তা হলেও ১৫০ কোটি মুসলমান এই জঘন্যতম মানবতাবিরোধী সন্ত্রাসকে সমর্থন করেনি বরং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করেছে। এ দিক বিবেচনায় রেখেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশের প্রেসিডেন্টের বক্তব্য দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার কান্ডজ্ঞানহীন বক্তৃতার ফলে মুসলমান দেখলেই খ্রিস্টান ইহুদিরা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়। এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন এমনকি একই এলাকার প্রতিবেশিরাও

www.pathagar.com

ধর্মীয়ভাবে মানসিক সংঘাতের দেয়ালে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সংঘাতমুক্ত বিশ্বব্যবস্থা নিশ্চিত করতে দ্রুতই এর অবসান দরকার।

পৃথিবীর দু'টি মুসলিম দেশে সন্ত্রাস দমন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহুজাতিক সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এর একটি হলো ইরাক, অন্যটি হলো আফগানিস্তান। ইরাক আক্রমণের সময় অজুহাত হিসেবে দেখানো হয়েছিল যে ইরাকের সাদ্দাম শাসকগোষ্ঠীর কাছে বিপজ্জনক রাসায়ণিক অস্ত্র আছে এবং ব্যাপকভাবে রাসায়ণিক (Camical wepeness) অস্ত্র বানানোর ক্ষমতা আছে। ইরাকের যুদ্ধ শেষে দেখা গেল ইরাকে রাসায়ণিক অস্ত্র ছিল না। প্রমাণিত হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ ভিত্তিহীন ও তাদের প্রদত্ত বক্তব্য অমূলক। অর্থাৎ মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে একটি মুসলিম সার্বভৌম দেশ দখল করাকে কোনোভাবেই মুসলমানরা সমর্থন করতে পারে না। এর মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিকতা থাকতে পারে বলেও আমি বিশ্বাস করি না। অনেকেই অভিযোগের সুরেই বলে - ইরাকের তেলসম্পদ লুণ্ঠনের জন্যই মূলত জর্জ বুশ ইরাক আক্রমন করেছিলো।

ওসামা বিন লাদেন সৌদি নাগরিক। এক সময়কার বুশ পরিবারের পারিবারিক ঘনিষ্ঠবন্ধু এই ওসামা বিন লাদেন। বিশ্ববাজারের জন্য ওপেক যে জ্বালানি তেল উৎপাদন করে তার ৩৪ ভাগ সৌদি আরব ও ১১ ভাগ ইরাক থেকে উত্তোলিত হয়। কি কারণে জর্জ বুশের পারিবারিক বন্ধু ধনকুবের ওসামাবিন লাদেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত বিশাল নিরাপত্তা বলয়কে ফাঁকি দিয়ে ২০০১ সালের ৯/১১ তারিখে টুইন টাওয়ারে হামলা সংঘটিত করতে পেরেছিল অনাগত ভবিষ্যতই হয়তো এর সদোত্তর দিতে পারবে।

এই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত করতে যে অর্থ, কারিগরি জ্ঞান ও সাপোর্টের প্রয়োজন হয়, একজন সাদামাটা রাষ্ট্রবিহীন সন্ত্রাসী কেমন করে এর জোগান দিয়েছিল সেটাও একটি জটিল প্রশ্ন হয়ে থাকবে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পাতায়। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে মার্কিন সামরিক ও গোয়েন্দা শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা। কিন্তু আফগানিস্তানে নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং পাশে পাকিস্তানকে পেয়েও কোন্ যাদুমন্ত্রের গুণে ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমর দিব্যি ওয়েবসাইটে বক্তব্য দিতে পারছেন তাও প্রশ্নবোধক হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

www.pathagar.com

ভুলপথে শক্তি ক্ষয়

ভুল মনস্তাত্ত্বিক ধারণার কারণেই বিশ্বের ১৫০ কোটি মুসলমানকে শত্রু মনে করছে পশ্চিমা বিশ্ব। মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদেশগুলোর সংঘাতের কোনো প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র নেই। মূলত পশ্চিমাশক্তির ঘাড়ে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা ইসরাইল-ভারতের ইন্ধন ও প্ররোচনায় তারা বিভ্রান্ত। প্রথমত ইসরাইলীদের সঙ্গে প্যালেস্টাইনিদের, দ্বিতীয়ত কাশ্মীরের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দু ভারতের সংঘাত। ভারত বিভাগের সময় থেকেই কাশ্মীরের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মতকে উপেক্ষা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ঐতিহাসিকভাবেই পাকিস্তান এই সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত।

ইসরাইলের দখলদারিত্বের কারণে প্যালেস্টাইন ভূখন্ড তিনটি খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। এর মূল অংশ দখল করে প্রতিষ্ঠা করা হয় ইসরাইল রাষ্ট্র। বাকি দু'টি অংশ পশ্চিম তীর ও গাজা নিয়ে প্যালেস্টাইন। প্যালেস্টাইনের মূল সমস্যা হচ্ছে পশ্চিম তীর ও গাজার মধ্যে কোন সংযোগস্থল নেই। শান্তি আলোচনায় এটাই হচ্ছে মূল প্রতিবন্ধকতা। আর ইসরাইল এই প্রতিবন্ধকতার অবসানতো চায়ই না বরং পশ্চিমা শক্তির সমর্থন নিয়ে বার বার আরব জাহানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় হায়দরাবাদ ও জুনাগড়ের নবাবরা পাকিস্তানে যোগদানের ইচ্ছা পোষণ করেছিল। কিন্তু ভারত তা মানেনি। অন্যদিকে কাশ্মীরের মহারাজা ভারতের সঙ্গে থাকতে চাইলে পাকিস্তান সে সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। আর এভাবেই শুরু হয় কাশ্মীর সঙ্কট যার সুরাহা আজও হয়নি।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি

আমরা জানি রাষ্ট্রের কোনো স্থায়ী বন্ধু নেই। রাষ্ট্রের আছে স্বার্থ। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে মার্কিন চোখ দিয়ে দেখলে এশিয়াতে ইসরাইল, ইউরোপে গ্রেটবৃটেন ও আফ্রিকাতে দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগি ও সামরিক বন্ধু। ইসরাইলের সঙ্গে আরব বিশ্বের সংঘাতের মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম মানসপটে স্বাভাবিক

www.pathagar.com

কারণেই বিদ্যমান থাকার কথা। পাকিস্তান আরব বিশ্বের বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়ায় ভারত ইসরাইলের পরম বন্ধু রাষ্ট্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিধর্মীয় সম্প্রদায় হচ্ছে সংখ্যার দিক দিয়ে তৃতীয় স্থানে। কিন্তু অর্থনীতি ও সংবাদ মাধ্যমে ইহুদিরা প্রধান শক্তি। অর্থাৎ ভেতর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা ইসরাইলের নিবিড় বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করেন। আবার ভারতের সঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় ইহুদিরা বলতে পারছে যে, তারা কোথাও বিচ্ছিন্ন নয়। ফলে এই সুবিধাকে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিরা গুরুত্বসহকারে কাজে লাগায়। ইঙ্গমার্কিন রাষ্ট্রও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইহুদীবাদও হিন্দুত্ব এখন প্রায় অভিন্ন সত্ত্বা হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে এই দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি যে কারণে অতিজরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অতিমাত্রায় মুসলিম বিদ্বেষী ক্রুসেডের মনোভাব জাগ্রত হওয়ার মূলেও রয়েছে ইহুদি-হিন্দুত্ববাদের কূটিল দৃষ্টিভঙ্গি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উদারনৈতিক হিসেবে অতিপরিচিত যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপের বিদেশনীতি পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বঅস্ত্র চোরাচালান সিন্ডিকেট ও আগ্রাসী পুঁজিব্যবস্থার অন্যতম রক্ষক, দুষ্ট এই অক্ষশক্তির নিয়ন্ত্রণে।

এরফলে ইউরোপ আর যুক্তরাষ্ট্র দিন দিন একটা যুদ্ধবাজ সাম্প্রদায়িকচক্রের রিমোটকন্ট্রোলের আওতায় চলে যাচ্ছে। এ প্রক্ষাপটে সেখানে উদারবাদী ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই যুদ্ধবাজ চক্রের সামাজিক দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়ে ঘণীভূত হচ্ছে এবং উদারবাদী মানুষকে অস্ত্র ও কালো অর্থের মাধ্যমে জিম্মি করে যুদ্ধবাজ চক্রটির অপতৎপরতা এখন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এ অবস্থায় বিশ্বজনীন মানবাধিকার ও উদারবাদিতার প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠীও হচ্ছে যুদ্ধবাজ এই চক্রটির চক্ষুশূল। সাম্প্রতিক বিশ্বরাজনীতিতে এটা নানভাবেই হচ্ছে প্রতিফলিত। আর সে কারণেই ইসরাইল প্যালেস্টাইনিদের ব্যাপারেও এই চক্রটি অত্যন্ত অমানবিক। সেই ইসরাইলের অমানবিক আচরণ ও তৎপরতা যাতে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে তার জন্য মুসলিম কোন দেশ আণবিক শক্তির অধিকারী হোক তা তারা চায় না। কিন্তু

www.pathagar.com

ইতিমধ্যেই পাকিস্তান আণবিক শক্তিধর দেশে পরিণত হয়েছে। আর সে কারণেই অজুহাত সৃষ্টির জন্য ঘুরে ফিরে বলা হচ্ছে পাকিস্তানের আণবিক শক্তি তালেবানদের হাতে কিংবা আল-কায়েদার হাতে চলে যেতে পারে। এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা। যে পথে পশ্চিমা শক্তি অগ্রসর হচ্ছে তাতে কোটি কোটি ডলার খরচ করেও ইরাক, আফগানিস্তান ও প্যালেস্টাইন নিয়ন্ত্রণ কিংবা শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই জন্য দরকার মুসলিম রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীকে অন্যায় জুলুম থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের অবস্থা অর্জন করা।

ভারত ও মুসলমান

১৯৪৭ সালে যেভাবে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন উপমহাদেশের বিভক্তি রেখা টেনেছেন তাতে প্রকৃত অর্থে মুসলমানরা লাভবান হয়নি। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যুক্তপ্রদেশ, পশ্চিবঙ্গ, আসাম ও মহারাষ্ট্রের মুসলমানরা। পাশাপাশি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুরা। কিন্তু তার পরও বর্তমান ভারতে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস। ইন্দোনেশিয়ার পরই ভারতের মুসলমান জনসংখ্যা। ভারত একটি বহুজাতপাত ও সম্প্রদায়ের দেশ। বিশ্বের অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশে মুসলিম সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিম বিশ্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তার গ্যারান্টি থাকলেও ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তার কোনো ধরণের গ্যারান্টি নেই। বাংলাদেশের প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের কারণে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় নিরাপত্তাবোধ করে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শুধুমাত্র নিরাপদই নয়, তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রক্ষমতায়ও প্রভাব বিস্তার করে। আর একারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন কারণ ছাড়াই কখনো কখনো প্রচন্ড মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে উঠে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে সংখ্যালঘু মুসলমান ও তফসিলি জাতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য করতে হবে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই। ভারতে মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু হলো লালু প্রসাদ যাদব, মুলায়েম সিং যাদব, মায়বতীর মতো নেতৃত্ব। অতীত ইতিহাসের আলোকে বহুবার তা প্রমাণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

নিরবে শক্তিধর হয়ে ওঠছে চীন

২০৫০ সালের মধ্যে গণচীন পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান বিনিয়োগকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। একটি প্রধান শক্তিশালী দেশ হতে হলে যা যা প্রয়োজন তার সব কিছুই রয়েছে বর্তমান চীনের। অর্থনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন খুবই নিকট ও প্রায় সমপর্যায়ের দেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রায় সব শক্তি নিয়োগ করেছিল সমর শিল্পে। নৌ-জাহাজ, আণবিক শক্তি ও যুদ্ধ বিমান নির্মাণে। এর বন্ধু দেশগুলোর মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলো হয়েছিল উপেক্ষিত। যার ফলে পশ্চিমা অর্থনীতির বিকাশের আঘাতে সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হয়েছিল। কিন্তু চীন বেছে নিয়েছে ঠিক তার উল্টোটা। তারা পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে বেছে নিয়েছে অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা বা নাক না গলানোর নীতি। মূলত তারা কৃষি ও শিল্প বিকাশকে গড়ে তুলেছে সমান্তরালভাবে। রপ্তানি বাণিজ্যের লক্ষ্যে শিল্প ও কৃষি পণ্য তারা উৎপাদন করেছে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের জন্য। যার গ্রাহক পৃথিবীব্যাপী বিশাল জনগোষ্ঠী। জাতীয় নিরাপত্তাকে তারা গুরুত্বের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলেছে। অভ্যন্তরীণ সমাজকে তারা বিভেদহীন সমাজে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে যা একটি দেশের জাতীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য। অন্যদিকে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারও চীনা উৎপাদিত দ্রব্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এভাবে চীন এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিজেকে তাদের বিশ্বস্ত বন্ধুরাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলেছে। সে কারণে আগামীদিনে চীনই হয়ে উঠবে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ।

এক সময় বিশ্ব ব্যাবস্থার বলয় দুভাগে বিভক্ত ছিল, যার একটি রাশিয়া ও অন্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু, সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপন্ন হওয়ার পর থেকে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হয়। এ অবস্থায় বিশ্ব মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। আর সে কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্রবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে একক মোড়ল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা চালাচ্ছে। এসময় যদি মুসলিমবিশ্ব ও চীনের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয় তাহলে মার্কিনীদের একক আধিপত্য বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য। কারণ মুসলিম বিশ্ব ও চীনের সঙ্গে তখন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোরও।

বর্তমান ব্যবস্থা থেকে ভবিষ্যত বিশ্বব্যবস্থায় উত্তরণ

আগামী দিনের বিশ্ব ব্যবস্থায় মুসলিম সভ্যতা ও শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা জানি ইতিহাসের প্রস্তুতির যুগে শক্তির প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য অশ্বারোহী শক্তি ছিল প্রধান হাতিয়ার। আলেকজান্ডার দি গ্রেট, চেঙ্গিস খাঁ, গজনীর সুলতান মাহমুদ বা তৈমুরলঙ্গের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান উপাদান ও কারণ ছিল অশ্ববাহিনী। ১৬ শতক থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত সেই জায়গাটা দখল করে ছিল নৌ-শক্তি। যার ফলে ইউরোপীয়ান, ডাস, গ্রীক, ব্রিটিশ, ফরাসী শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তখন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিমান শক্তি, নৌ-শক্তির জায়গা দখল করে। আর আজকের শান্তি ও শক্তির মূল উপাদান হচ্ছে আণবিক শক্তি। জাতিসংঘের যে ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র (ভেটো পাওয়ারের অধিকারী) আছে, তাদের করায়ত্তে রয়েছে আণবিক শক্তি। যদিও আণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের সংখ্যা এখন বৃদ্ধি পেয়েছে।

আগামীতে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন হবে তিনটি শক্তির। প্রথম জনসংখ্যার শক্তি, দ্বিতীয় প্রাকৃতিক শক্তি, তৃতীয়ত আণবিক শক্তি। তাহলে ১৫০ কোটি জনশক্তি, ৬৫ ভাগ আবিষ্কৃত খনিজশক্তি এবং পাকিস্তান ও ইরানের আণবিক শক্তি নিয়ে মুসলিম শক্তি অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হবে। এর ফলে শক্তি-সাম্যের ভারসাম্যতার নিরিখে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে মুসলিম শক্তির সংঘাতমুক্ত সহাবস্থান নিশ্চিত হবে। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় সম্প্রীতি ও শান্তির এটাই মূল রক্ষাকবচ।

পৃথিবীর যে জায়গাগুলোতে প্রকৃত মুসলিম চরমপন্থি সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাদের সম্পর্কে আমি একটু আলোকপাত করতে চাই। স্পর্শকাতর সেই স্পটগুলো হচ্ছে পাকিস্তানের আফগানিস্তান ঘেঁষা উত্তর-পশ্চিম এলাকা, ভারত শাসিত কাশ্মীর, আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, প্যালেস্টাইন, ইরান ও এর ইসলামিক বিপ্লব। পাকিস্তানের আণবিক বোমার জনক কাদের খানকে নিয়েও ভারত ইসরাইল আর পশ্চিমা বিশ্বেউৎকণ্ঠা কম নয়।

www.pathagar.com

কাদের খান

কাদের খানের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শক্তিগুলোর অভিযোগ - তিনি নাকি উত্তর কোরিয়া ও ইরানে আণবিক বোমার ফর্মুলা পাচার করেছেন। ঘটনা সত্য হলে এটা পাকিস্তানের জন্য একটি লজ্জাজনক ব্যাপার। যদিও ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে জার্মানি থেকে ইহুদি বৈজ্ঞানিকরা পাচার করেই আণবিক বোমার ফর্মূলা মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রে নিয়ে গিয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই পাচারকৃত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করে আণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই প্রযুক্তি পাচার অব্যাহত থাকলে একসময় এই অস্ত্র কোনো অসহিষ্ণু চরমপন্থি গ্রুপের কাছে চলে যেতে পারে। আর সেটা হবে বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ। সে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর। সে কারণেই পাকিস্তানকে কাদের খানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে কোনোক্রমেই হালকা করে বিবেচনায় নেয়া ঠিক হবে না।

ইরান

আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হলে তার রেশ সৌদি রাজতন্ত্রসহ রক্ষণশীল মুসলিম দেশগুলোর উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে এবং রক্ষণশীল দেশগুলোর শাসকরা মনস্তাত্ত্বিক চাপের মুখে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে শুরু হয় ইরাক-ইরান যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে কোনো পক্ষই লাভবান হয়নি। সাতটি বছর ধরে শাতিল আরবের দু'পাড়ে দুই মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে রক্তের হুলিখেলা চলতে থাকে। প্রাকৃতিক তেলসম্পদ বারুদের ধোঁয়া হয়ে শ্যামল আকাশকে বিষাক্ত করতে থাকে। একপর্যায়ে দু'পক্ষই নিস্তেজ হয়ে আসলে যুদ্ধ থেমে যায়।

বর্তমান ইরান অপেক্ষাকৃত শান্ত। কিন্তু তার সঙ্গে প্যালেস্টাইনের হামাস সংগঠনের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তারা উগ্র ইসরাইল বিরোধী। কিন্তু তাদের ক্ষমতা কতটুকু তার রহস্য উদঘাটনে আমরা যদি সম্প্রতি অনুমোদিত প্রতিরক্ষা বাজেট পর্যালোচনা করি তা হলে এর সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পরি। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০৮-০৯ সালের প্রতিরক্ষা বাজেট ৫৬ হাজার কোটি ডলারের উপরে। আর সেখানে ইরানের প্রতিরক্ষা বাজেট ৪৫০ কোটি ডলারের নিচে। এই প্রতিরক্ষা বাজেট দিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা অবাস্তব কল্পনা

www.pathagar.com

ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এ অবস্থায় ইরানি নেতৃত্বকে অবশ্যই নমনীয়ও গঠনমূলক হতে হবে। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থ ও বিশ্ব শান্তির কথা বিবে.নায় রেখেই তাদের অগ্রসর হতে হবে।

ইরাক

ইরাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন চলমান আগ্রাসন হচ্ছে সম্পূর্ণ নৈতিকতা বিরোধী। কোন্ মূল লক্ষ্য নিয়ে জর্জ ডাব্লিউ বুশ এই অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তিনি ও তার উপদেষ্টামন্ডলী ছাড়া আর কারো পক্ষে তা সঠিকভাবে বুঝা বেশ কঠিন। কিন্তু যে অভিযোগ ইরাকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। বাংলা কথায় - 'পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া করার শামিল'। পশ্চিমা শক্তিগুলো অর্থ ও শক্তিসামর্থের জোরে এক ধরণের ইগোতে ভোগতে থাকে।

এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতা নির্ণয় হবে তাদের নিজেদের সংস্কৃতির মানদন্ডে। অন্যের প্রভাবে বা হস্তক্ষেপে তার আমূল পরির্বতন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সে কারণে ইরাকে দখলদারিত্ব কায়েম করে দেশটির সমাজ সভ্যতার পরিবর্তনের যে কোনো চেষ্টাই হবে অনাকাঙ্ক্ষিত। সবাইকে মনে রাখতে হবে ইরাক হচ্ছে পৃথিবীর আদিসভ্যতার অন্যতম দেশ। মুসলিম সভ্যতার আগে ইরাক ছিল বাইজেন্টেনিয়ান সভ্যতা দ্বারা উদ্ভাসিত এবং এই সভ্যতার উত্তরসুরি। এই প্রাচীন সভ্যতাকে নতুন করে রি-মডেলিং করার তেমন কিছুই নেই। ভাস্কোডাগামার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় জাতিগুলো আসতে শুরু করে এবং ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনারীরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারাই ইংরেজিসহ আধুনিক ও ধর্ম শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়েছিল পৃথিবীর দেশে দেশে। বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে আফ্রিকা ও এশিয়ার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে। কিন্তু ইরাকে তার কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ ইরাক হচ্ছে - সুসভ্য জাতিগুলোর মধ্যে অন্যতম।

ইরাকের জনগণের একাংশের চরমপন্থা গ্রহণের জন্য মূলত মার্কিন নীতিই দায়ী। যদিও সাদ্দাম হোসেন কুর্দিদের উপর যে নির্যাতন করেছিল তার জন্য সাদ্দামের

www.pathagar.com

শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পৃথিবীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের অধিকারী একটি মর্যাদাবান জাতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে অসত্য তথ্য দিয়ে বিশ্বসমাজকে বিভ্রান্ত করেছে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা মিথ্যা তথ্য দেয়ার দায় স্বীকার করে জর্জ ডব্লিউ বুশ ক্ষমা চাইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেত। একজন সাবেক প্রেসিডেন্টের মর্যাদা রক্ষার চেয়ে এ ক্ষেত্রে গোটা জাতির মর্যাদা রক্ষার বিষয়টিই প্রাধান্য পাওয়া অতি জরুরি।

প্যালেস্টাইন

গত শতাব্দিতে প্যালেস্টাইন ছিল অটোম্যান তুর্কি সাম্রাজ্যের অধীন। অটোম্যান তুর্কি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় ১৩৬১ সালে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য টিকেছিল। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল অংশ নিয়ে এই সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল। বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও এর আয়তন ছিল অনেক বেশি। সম্পদ সামরিক শক্তিও ছিল তখনকার প্রেক্ষাপটে অতুলনীয়। ১৬শ শতকে ভারতবর্ষে যখন মোগল সাম্রাজ্যের পতাকা গৌরবোজ্জ্বলভাবে উদিত ছিল, তখন অটোম্যান তুর্কি সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল মুসলিম খেলাফত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরব অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা বিকশিত হয়। তখনই প্যালেস্টাইন জর্দানের নিয়ন্ত্রণে আসে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে প্যালেস্টাইনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় ইহুদি ধর্মীয়রাষ্ট্র ইসরাইল এবং মূল প্যালেস্টাইনকে দু'খন্ডে বিভক্ত করা হয় কোনো প্রকার করিডোর না রেখেই। এই দুটি অংশ হচ্ছে পশ্চিম তীর ও গাজা প্যালেস্টাইন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ-আমেরিকার তদারকিতে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রকে ধর্মীয় ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমনটা করা হয়েছিল ভারতবর্ষে। বর্তমান প্যালেস্টাইনের দুই অংশের মধ্যে কোনো সংযোগস্থল বা পথ নেই। সারা পৃথিবীর মুসলমানদের অনুভূতিতে ইসরাইলী আগ্রাসী ও সন্ত্রাসী আচরণের ফলে সংক্ষুব্ধতা দানাবেধে ওঠে। ১৯৭৩ সালে ইসরাইল লেবাননের একাংশ অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক দখল করে নেয়। এভাবেই প্যালেস্টাইন ও লেবাননে মুসলিম চরমপন্থি শক্তি গড়ে উঠে। এই আগ্রাসী অপশক্তির বিরুদ্ধে দুর্বার

www.pathagar.com

প্রতিরোধ গড়েই কেবল বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিবেককে অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিশ্ব মোড়লদের অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে।

আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল

বিশ শতাব্দির শেষ ও একুশ শতাব্দির শুরুতে দুই পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের কৌশলগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের জন্যই আজকের আফগানিস্তানের এ অবস্থা। আফগানিস্তানে ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহর আমন্ত্রণে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আগ্রাসন চালায়। আফগানিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধে তখন কয়েকটি রাজনৈতিক গ্রুপ বিদ্রোহ করে এবং সরকারের কাছ থেকে আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই গ্রুপগুলো ছিল জাতিগত, ধর্মগত ও গোষ্ঠীগত। সোভিয়েত বাহিনীর আফগানিস্তানে উপস্থিতির ফলে পাকিস্তানী নিরাপত্তা বিশেষভাবে হুমকির সম্মুখিন হয়। বিশেষকরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিরাপত্তা ও অখন্ডতা নিয়ে পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল।

নজিবুল্লাহর শাসনামলে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল চমৎকার। আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছিল কংগ্রেসের সীমান্ত গান্ধী গাফফার খান ও তার ভাই বাদশাহ্ খান সাহেবের পূর্ণনিয়ন্ত্রণে। অঞ্চলটি আগে থেকেই ছিল মুসলিম লীগ বিরোধী। সে কারণে নিজদেশের অখন্ডতা নিয়েও বিচলিত হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান সরকার। এ সব কারণেই পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নজিবুল্লাহ ও সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ভৌগোলিকভাবে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। একমাত্র স্থানীয় লোক ছাড়া সে পরিবেশে অন্যকোনো দেশের লোকজন আফগানিস্তানে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না। সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতির ফলে আফগান জনগণের মধ্যে সোভিয়েত বিরোধী ধর্মযুদ্ধে রূপ নিয়েছিল। যদিও এই উস্কানিমূলক প্রোপাগান্ডা জোরদার করেছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে। তাতে তারা সফলকামও হয়েছিল। ফলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর যুদ্ধজয়ের মনোবল ও স্পৃহা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল আফগানিস্তানে।

সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে ৭টি উপদল অংশ নিয়েছিল। এমনকি বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকেও স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধা এসেছিল আফগানিস্তানে তথাকথিত ধর্মযুদ্ধে

www.pathagar.com

শামিল হতে। সিআইএ ও আইএসআই নিয়ন্ত্রিত তথাকথিত এই ধর্মযুদ্ধের সূত্র ধরেই ওসামা বিন লাদেনের আফগানিস্তানে আগমন।

সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করলে কাবুলে একটি কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তারা সমস্ত দেশে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও পাকিস্তানসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মহল সেই সরকারকে খুববেশি সাহায্য-সহযোগিতাও করেনি। সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার জন্য যুদ্ধের সময় তারা অনেক কিছুই করেছিল। অথচ যুদ্ধ শেষে তারা আফগানদের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর এ সুযোগে ধীরে ধীরে তালেবান নেতা মোল্লা ওমর আফগানিস্তানে অপ্রতিদ্বন্দ্বি ও শক্তিশালী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আফগানিস্তান হয়ে ওঠে মৌলবাদী তালেবান শক্তির সন্ত্রাস পরিচালনার নিরাপদ ভূমি। ইতিমধ্যে তাদের হাতে মজুদ হয় হাজার হাজার স্ট্রিঙ্গার মিজাইল, যা দিয়ে বিমান পর্যন্ত ভূপাতিত করা যেত।

অবশেষে ১৯৯৮ সালে আফগানিস্তানের মাটি থেকেই ওসামা বিন লাদেন পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২০০১ সালের ৯/১১ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারের হামলার পর মার্কিন ও মিত্রবাহিনীর হামলার মধ্য দিয়ে লাদেন ও মোল্লা ওমরের পতন হয়। প্রতিষ্ঠা লাভ করে হামিদ কারজাই সরকার। আফগানিস্তানে মোতায়েন করা হয় পশ্চিমা বহুজাতিক বাহিনী। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ি এলাকার কারণে ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। তবে এ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ কোন সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। এ অবস্থায় শুরু করতে হবে ব্যাপক শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং তা করতে হবে আফগান জনগণের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে পুরোপুরি শ্রদ্ধা করে। অন্যথায় হিতে বিপরীত হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ভারত শাসিত কাশ্মীর

মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা দিয়ে ইস্টইন্ডিয়া কেম্পানির কাছ থেকে কাশ্মীর রাজ্যের জমিদারী ক্রয় করেন ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজা হরিস সিং এর পূর্বপুরুষরা। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি যখন ভারত ছাড়ার

www.pathagar.com

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় তখন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে কাশ্মীরের রাজা স্বাধীন থাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার কাশ্মীরের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বিবেচনা করে কাশ্মীরে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলনে বদ্ধপরিকর হয়। এ অবস্থায় ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দিয়ে কাশ্মীরের মহারাজার কাছ থেকে কাশ্মীর দখল করে নেয়ার উদ্যোগ নেয় পাকিস্তান।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান ও ভারত দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র হলেও এর সেনাবাহিনী ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা পাকিস্তান কিংবা ভারত সরকারের নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলতো না। সে কারণেই পাকিস্তান কাশ্মীরে সেনা অভিযান চালাতে পারেনি। তারা পাঠান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পাঠিয়ে কাশ্মীর দখল করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই পাঠান যোদ্ধাদল ছিল উশৃঙ্খল ও লোভী। কাশ্মীর মুক্ত করার চেয়ে তারা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে হিন্দুদের দোকানপাট লুট ও মেয়েদের ধর্ষণ করতে। শ্রীনগর থেকে ৩৫ মাইল দূরে একটি খ্রিস্টান মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সেবাআশ্রম ছিল। সে আশ্রমে প্রচুর মিশনারী নার্স ছিল। পাঠান স্বেচ্ছাসেবকরা শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর না হয়ে মিশনের নারী কর্মিদের ইজ্জত লুণ্ঠন শুরু করল। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছলে শ্রীনগরের ১২শ' ইউরোপিয়ান পরিবারের মহিলাদের সম্ভ্রম নিয়ে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনী উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। তারা কাশ্মীর উপত্যকায় আকাশ পথে ছত্রীসেনা নামিয়ে ব্রিটিশ পরিবারের নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ছিলেন নৈতিকতার প্রশ্নে খুবই কঠোর প্রকৃতির লোক। তিনি প্রশ্ন তুললেন এখন পর্যন্ত রাজা হরিস সিং ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করেনি। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঠানোর মানে হবে আগ্রাসনের শামিল।

অনেকদিক বিবেচনা করে ২৫ সেপ্টেম্বর জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রী পরিষদ কাশ্মীরে মহারাজা হরিস সিং-এর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের স্বাক্ষর আনতে পাঠায় শ্রী কৃষ্ণ মেননের নেতৃত্ব ৩ সদস্যের একটি দল। দিল্লী থেকে তারা স্বাক্ষরদান চুক্তিপত্রের দলিলাদি তৈরি করেই নিয়েছিল। এই দলে সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন জেনারেল মানেক সাহ্, যিনি ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের সেনাপ্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। রাজা হরিস সিং বাধ্য হয়ে সেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন মাত্র।

পর দিন ৩৮০ জন ভারতীয় শিখ সেনা নিয়ে প্রথম একটি বিমান অবতরণ করল শ্রীনগর বিমানবন্দরে। পরদিন ভারতের সব অভ্যন্তরীণ ও বর্হিগমন বিমান

www.pathagar.com

চলাচল বাতিল করে দিয়ে হাজার হাজার সৈন্য অবতরণ করানো হল কাশ্মীরে। আর এর মধ্যেই সময় শেষ হয়ে গেল পাকিস্তানের স্বেচ্ছাসেবকদের। ফলে কাশ্মীর দখল করে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগটি হাতছাড়া হওয়ায় দীর্ঘ মেয়াদী জাতিগত রাজনৈতিক সংঘাতে রূপ নিল। যদিও কাশ্মীরের এক অংশ দখল করে নিয়েছিল পাঠান বাহিনী। এভাবেই কাশ্মীর বিভক্ত হয়ে পড়ে।

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের উদ্যোগে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরি জনগণ তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাবে তারা পাকিস্তান না ভারতের সাথে থাকবে। কিন্তু নেহেরু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বার বার সেই নীতিগত সিদ্ধান্ত বাঞ্চাল করে দেয়। ফলে কাশ্মীরি নতুন প্রজন্মের মধ্যে চরমপন্থা দানাবেধে ওঠে। যার ফলে একসময়কার ভূস্বর্গ কাশ্মীর রক্তস্নাত জনপদে পরিণত হয়েছে। এর দায়ভার কার উপর বর্তাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এর সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত উত্তর না দিয়ে তাদের এ কথা বলার সুযোগ নেই যে কাশ্মীরের মুসলমানরা সন্ত্রাসী, তাদের শায়েস্তা করতে হবে।

পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাবাহিনী উপস্থিত হলে পাকিস্তান দু'দিক দিয়ে হুমকির মুখে পতিত হয়। পশ্চিম-উত্তর দিক দিয়ে সোভিয়েত বাহিনী। পূর্বদিক দিয়ে ভারত। এ সময় পাকিস্তান ছিল একটি দুর্বল সেনাবাহিনীর দেশ। ১৯৭৪ সালে ভারত আণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের যোগ্যতা অর্জন করে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তানের নজিবুল্লাহ সরকারের জন্য ভারত ছিল মিত্র দেশ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও ছিল ভারতীয় কংগ্রেসপন্থি খান আব্দুল গাফ্ফার খানের অনুসারিদের প্রাধান্য। এরই মধ্যে আফগানিস্তানের ভৌগোলিক গুরুত্বের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনও উদগ্রীব হয়ে উঠে। কারণ মার্কিন প্রশাসন নিশ্চিতভাবেই জানে আরব সাগর ও ভারতীয় মহাসাগরে মিঠা পানির বন্দরের উপরে সোভিয়েত ইউনিয়নের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। তাই তারা পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষা করা ও আফগানিস্তানকে সোভিয়েত বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাকিস্তানের জিয়াউল হক সরকারকে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সব ধরণের সাহায্য সহযোগিতা করে।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় আফগানিস্তানে ৭টি উপদল নিয়ে একটি দুর্বল কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় এবং পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মাদ্রাসাভিত্তিক তালেবান যোদ্ধাদের সংগঠিত করা হয়। এই উভয় শক্তির মূল নেতা হয়ে উঠে মোল্লা ওমর। বিভিন্ন সূত্র থেকে যতটুকু জানা যায় মোল্লা ওমর হচ্ছে একজন অর্ধশিক্ষিত এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস মতে কাউকে অতিথি হিসেবে আশ্রয় দিলে নিজের জীবন বিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত কারো দ্বারা অতিথির ক্ষতি হতে দেবে না। মোল্লা ওমর হচ্ছে এ বিশ্বাসে পরীক্ষিত এক ব্যক্তি।

পাকিস্তানের যে অঞ্চলটিতে আদিবাসীরা বাস করে তারাই মূলত নজিবুল্লাহ ও সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত করেছিল। এখানে প্রথম ওসামা বিন লাদেনসহ আল কায়েদার নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। এই এলাকাটি অত্যন্ত দুর্গম। এখানকার মানুষ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। কোনোপ্রকার লোভ ও কারো রক্তচক্ষু এরা বরদাস্ত করে না। জন্মগতভাবে এগুলো তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধ জয়ের পর এদের অনেকের মধ্যেই এ ধারণা জন্মায় যে তারা যুদ্ধে যে কোনো বড় শক্তিকেই পরাজিত করতে পারবে। এদের মধ্যে একটু শিক্ষিত লোকেরা তাদের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে ভীষণভাবে অহংকারী। তাদের বেশির ভাগ লোকই অশিক্ষিত। অর্থনৈতিকভাবে তারা অত্যন্ত দুর্বল ও দুর্দশাগ্রস্ত। স্বাস্থ্যসেবা নেই বললেই চলে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য এ অঞ্চলে শিক্ষা, চিকিৎসা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন না করলে এটা সন্ত্রাসী শক্তির প্রজননকেন্দ্রে পরিণত হতে বাধ্য এবং তা ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে সারাবিশ্বে। সন্ত্রাসী প্রবণতা হলো ক্যান্সার রোগের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার মতো মারাত্মক উপসর্গ। কিন্তু ১০/১২ লক্ষ উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য পাকিস্তানের ১৬ কোটি মানুষকে সন্ত্রাসী বা বিপজ্জনক আখ্যায়িত করা কোনোক্রমেই সঠিক হতে পারে না। অবশ্য আল-কায়েদার কোনো নিজস্ব রাষ্ট্র নেই। নিরাপদ অবস্থানের ভৌগোলিক জায়গাও তাদের নেই। তারপরও তাদের স্বয়ংক্রিয় শক্তির উৎস এখনও বিদ্যমান। এটাকে সামনে রেখেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে চিন্তা করতে হবে আগামী দিনের সমাজব্যবস্থার কথা। #

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ও আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পর থেকে প্রায় দু'শ বছর ধরে চলতে থাকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির সংগ্রাম। লড়াকু মানুষের তেজোদীপ্ত সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। যে প্রক্রিয়ায় উপমহাদেশ বিভক্ত হয় তাতে সার্বিকভাবে বঞ্চিত হয় বাংলা এবং আসাম প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা। ভারতের স্থপতি করমচাঁদ গান্ধী পাকিস্তান সৃষ্টির ঘোরবিরোধী ছিলেন। কিন্তু কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের পক্ষে অনড় থাকলে গান্ধীজীসহ কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা ভারত বিভাগ মেনে নিতে বাধ্য হয়। পাশাপাশি পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য চানক্যচক্রের কূটিলনীতি অনুসরণ করা হয়। এর ফলে বাংলা প্রদেশ বিভক্ত করে জটিল ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বোস প্রণীত বাংলা-আসাম প্রদেশ নিয়ে পৃথক দেশ গঠনের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

ঐতিহাসিকভাবে এ কথা সত্য পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ কোনোক্রমেই একটি অভিন্ন রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থাকতে পারতো না। এর ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উৎসগুলো সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। সর্বোপরি এর নৃতাত্ত্বিক ও

www.pathagar.com

মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানও সম্পূর্ণ বিপরিতমুখি। সে কারণে আজ প্রমাণিত হয়েছে সোহরাওয়াদী ও শরৎ বোস প্রণীত পরিকল্পনাটি ছিল বাস্তবসম্মত সমাধান। কিন্তু নেহেরু ডকট্রিন হচ্ছে আসমুদ্র-হিমাচল নিয়ে অখন্ড ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার মহাপরিকল্পনা। সেক্ষেত্রে তাদের বিবেচনায় সিন্ধুনদের পশ্চিম পাড় বাদ দিয়ে অর্থাৎ বর্তমান পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে পূর্ব সীমান্তে বার্মা পর্যন্ত তারা অখন্ড ভারত হিসেবে বিবেচনা করে। এ কারণেই ১৯৪৭ সালের পর '৯৫ শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, জুনাগড়, সিকিম এবং বেশকিছু ছিটমহল তারা দখল করে নেয়। প্রকৃত অর্থে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতই পৃথিবীতে একমাত্র রাষ্ট্র যে অন্যের সার্বভৌম অধিকার ও মর্যাদাকে পদদলিত করে দখল করে নেয় তাদের ভূখন্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর থেকে ভারত এভাবেই আগ্রাসী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এক্ষেত্রে বিশ্বজনমত কিংবা রাষ্ট্রীয় নীতিমালা কোনো কিছুর প্রতিই তাদের তোয়াক্কা নেই। অন্যদিকে ক্ষুদ্রপ্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি ভারত যে কতটা বেপরোয়া হয়ে ওঠেছে, তাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাপারে তারা কি করবে এটাই আজকে প্রধান এজেন্ডা হিসেবে সামনে চলে এসেছে। বাংলাদেশকে তাঁবেদার ও আশ্রিত রাষ্ট্র বানানোর ভারতীয় নীলনকশা দীর্ঘদিনের।

ভারতের অতীত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় তারা সীমান্তে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে প্রতিবেশী ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো দখল করে নেয়ার জন্য আগ্রাসী কূটকৌশল গ্রহণে করেছে। সেই কৌশলের অংশ হিসাবে প্রথমেই তারা সেই রাজ্যেগুলোর মধ্যে বন্ধুবেশে নিজস্ব অনুগত রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করেছে এবং তাদের দ্বারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রকে ব্যর্থ রাষ্ট্র করার পরিকল্পনা করেছে। তারপর বন্ধুত্বের নামে, শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নামে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে সে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিনাশ করেছে ও সম্প্রসারণ নীতি বাস্তবায়ন করেছে দেশ দখলের মাধ্যমে। কাশ্মীরের শেখ আব্দুল্লাহ, হায়দরাবাদে নরসীমা রাও ও সিকিমের লেন্দুপদর্জির মতো লোকেরা ভারতের এই সম্প্রসারণ নীতি ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের জন্মের পর থেকে ৬২ বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই সংশয় জাগে যে ভারতের অভিপ্রায় কখনো সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল না, আজও নেই।

প্রথমেই আমরা ধরে নিতে চাই, ভারত ও বাংলাদেশ দু'টি রাষ্ট্রই সার্বভৌম ও নিকট প্রতিবেশি। বাংলাদেশের মানুষের ঐতিহ্যগতভাবেই সুপ্রতিবেশীসূলভ মনোভাব সক্রিয় রয়েছে। কিন্তু, যদি ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সাথে ভারতের আচরণের নানাদিক চুলচেড়া বিশ্লেষণ করি তাহলে দিবালোকের

www.pathagar.com

মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রতিবেশী দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে ভারতের কূটিল আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই দিনদিন বাড়ছে সংঘাত। সার্বভৌম সমতার নীতিতে দেশটির কোনোরকমের বিশ্বস্ততার নজির পাওয়া যাবে না।

১৯৭১ সালে ৯ মাসের মহান মুক্তিযদ্ধের পর পরই বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতের মিত্রবাহিনী বাংলাদেশে পাকিস্তানের ফেলে যাওয়া কোটি- কোটি টাকার অস্ত্র নির্বিচারে লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। সে সময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত দৃঢ় সিদ্ধান্তের কারণে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ থেকে চলে গেলেও ছিটমহলসহ অন্যান্য ব্যাপারে তাদের ভূমিকা থাকে নেতিবাচক।

ভারত বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম বন্ধুরাষ্ট্র না ভেবে ভাবতে থাকে তাদের একটি করদ ও আশ্রিত রাজ্য হিসেবে। তাই বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা আদায় করে নিতে চায় ভারত। অথচ নেপাল ও ভূটানের সঙ্গে বাংলাদেশকে কোনো ট্রানজিট সুবিধা দিতে চায় না। এটা হচ্ছে ওয়ানসাইটেড ডিক্টেড করার মানসিকতারই অংশ। বাংলাদেশের দিক থেকে প্রতিটি সরকারই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে পানি সমস্যা, সীমান্ত সমস্যাসহ বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতার মত আরও নানাবিধ জটিল সমস্যা ভারত যুগের পর যুগ ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে। এ সবকিছুই ভারতের উগ্রআচরণের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে নিকট প্রতিবেশি দেশ দু'টোর মধ্যে আস্থার সঙ্কট ক্রমান্বয়ে ঘণীভূত হয়েছে।

ইতহাস বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই আমরা দেখব হায়দরাবাদ, কাশ্মীর ও জুনাগড়কে ভারত কিভাবে গ্রাস করেছে তার চাঞ্চল্যকর দৃষ্টান্ত। ১৯৪৭ সালে নিজামের শাসনামলে হায়দরাবাদের আয়তন ছিল ৮৭ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ। হায়দরাবাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীও ছিল। কোনো সমুদ্র বন্দর ছিল না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা (পরবর্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী) নরসীমা রাও-এর নেতৃত্বে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। সেই বিশৃঙ্খলা একপর্যায়ে এসে সহিংসরূপ ধারণ করে। সেই সহিংস বিশৃঙ্খলাকে ভারত তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করে তার সেনাবাহিনী হায়দরাবাদে প্রেরণ করে। ভারতীয় বাহিনী হায়দরাবাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলে হায়দরাবাদে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারি পক্ষই হায়দরাবাদকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষে শক্তিশালী ও দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এ ভাবে চানক্য আগ্রাসী কূটকৌশলে নেহেরু ডকট্রিন বাস্তবায়নের দূরভিসন্ধি থেকে ভারত হায়দরাবাদ গ্রাস করে নেয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের তিনদিকে ঘিরে থাকা আঞ্চলিক শক্তিধর প্রতিবেশি ভারতের সঙ্গে তার চিরায়ত ভুল বুঝাবুঝি সন্দেহ আর তিক্ততায় মেশানো পারস্পরিক সম্পর্কে মৃদু জোয়ার-ভাটা চললেও দুদেশের পারস্পরিক সম্পর্ক কোনোদিনই পরিপূর্ণ সুখকর ও শান্তিময় ছিল বলে কারও জানা নেই। দু'দেশই মুখে সবসময়ই "বন্ধু-রাষ্ট্র" "সৎ-প্রতিবেশি", "সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক" ইত্যাদি বুলি আওড়ালেও দেশ দু'টির জনগণ ও সরকারের আচরণে কখনও এর প্রতিফলন ঘটেনি। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাস্তব দৃষ্টিতে ভারত অপরিসীম ত্যাগ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করলেও মুক্তিযুদ্ধের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরই ভারত যখন এদেশে পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া শত শত কোটি টাকার অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, যানবাহন ইত্যাদি একতরফাভাবে নিয়ে যেতে থাকে তখন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সিপাহশালার ৯নং সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল ভারতীয় সেবানাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হন। পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশে এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের এই মহানায়ককে কারারন্তরালে যেতে হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম রাজবন্দী হিসাবে নাম লেখাতে হয় এমন একজনকে যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধে সশস্র লড়াইয়েরও নেতৃত্ব দিয়েছেন।

প্রখ্যাত লেখক এন্থনী ম্যাসকারেনহাস-এর 'এ লিগাসী অব ব্লাড' (A legacy of Blood)-এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। পরে অবশ্য মেজর জলিলসহ আরও অনেক মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ভারতীয়দের লুটপাটের বিষয়ে বহু প্রামাণ্য তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করেছেন। আর এখন তো এক সময়কার খোদ আওয়ামী লীগের অনেক সক্রিয় নেতাকর্মি পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতাকে ভারতের স্বীয় আধিপত্যবাদী ও ভূ-রাজনেতিক স্বার্থ হাসিলের কূটকৌশল হিসেবে বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা প্রদান করছেন। পক্ষান্তরে ভারতের বর্তমান ও বহু সাবেক স্বনামধন্য রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ বাংলাদেশীদের প্রচন্ড ভারতবিদ্বেষী আচরণকে স্থূল স্বার্থপরতা ও অকৃতজ্ঞতা হিসেবে চিহ্নিত করে চলেছেন। আর এসব থেকেই অনুধাবণ করা যায় ভারত বাংলাদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের সূচনাপর্ব ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতির যোগসূত্র।

সহজ সরল কথায় বলা যায়, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে অর্জিত স্বাধীন পূর্বপাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়েই ১৯৭১ সালে এক নজিরবিহীন সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যদিয়ে আজকের বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের

www.pathagar.com

লাখো শহীদ কিংবা অগণিত ভারতীয় সেনার জীবন বিসর্জনের পরও দ্বিজাতি তত্ত্বের সেই বিভাজন রেখা মুছে যায়নি। সববিচার বিশ্লেষণেই এখন প্রতিভাত হয় যে ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি তৎকালীন ভারতের যে মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অর্ধশতাব্দী পর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এসে আজকের দিনেও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, কৌশলগত কিংবা নিরাপত্তা সম্পর্কিত সব আচরণ একই রয়ে গেছে। অবশ্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের প্রায়োগিক কৌশলে সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে মাত্র।

অন্যদিকে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভারত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সেই আগের মত একই রয়ে গেছে। তথ্যপ্রবাহের এ যুগে বাংলাদেশের জনগণ ভারতের নীতি নির্ধারক ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর 'বাংলাদেশ সম্পর্কে নীতি' ও মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। বাংলাদেশের মানুষের নিজস্ব ভূমি ও সার্বভৌমত্বের প্রতি ভারতের আগ্রাসী নীতিই এদেশের মানুষের মনে ভারত বিদ্বেষকে আরও ঘণীভূত করেছে। ভারত-বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের সম্পর্ক যে কারণে এক চরম সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং অসহযোগিতার গন্ডিতে আবদ্ধ করেছে। ফলে দু'দেশের মধ্যকার নানাসমস্যার অধিকতর বিস্তৃতির কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা দেয় মারাত্মক জটিলতা। এ দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক কারণে হওয়া উচিত ছিল সুন্দর, সাবলীল, সৌহাদ্যপূর্ণ এবং বিশ্বস্ততায় ভরা সম্পূরক রূপের। তা না হয়ে দেশ দু'টোর মধ্যকার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ভারসাম্যহীনতার কারণেই তা রূপলাভ করেছে অবিশ্বাস, অশান্তি আর আক্রোশের মতো তিক্ত সম্পর্কের এক কালো অধ্যায়।

ঐতিহাসিক সমস্যাবলী

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার সমস্যাবলী ১৯০৬ সালের 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন' এবং তারও আগের 'বঙ্গভঙ্গ রদকরণ প্রতিআন্দোলনে'র সঙ্গে সম্পর্কিত। তখনকার প্রেক্ষাপটে আমরা গুপ্তরূপে সুপ্ত দ্বি-জাতিতাত্ত্বিক মনোভাব দেখতে পাই। তবে সে সামাজিক চেতনাবিকাশ ও আন্দোলনের সঙ্গে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এমনকি কৌশলগত স্বার্থ-সংঘাতেরও সাক্ষাৎ পাই। এ বিষয়ে বলা যায়, যদি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র 'টু'নেশন' থিওরি' বা দ্বি-জাতিতত্ত্ব বহুলাংশে বাস্তবমুখী না হতো তবে আমরা

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে শরৎবসু ও সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবিত বৃহৎ বাংলা-আসামের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্ত্বার গোড়াপত্তন হতো। একান্তভাবে তাও সম্ভব না হলে অন্তত একাত্তর পরবর্তীতে আসাম আর পশ্চিম বাংলার সঙ্গে মিলে স্বাধীন সার্বভৌম যুক্তবাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বাস্তবভিত্তি লাভ করতো। কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে আজ আমরা স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের সীমানা নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বসবাস করছি।

পক্ষান্তরে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবাংলা আজও চরম প্রবঞ্চনা আর বৈষম্যের শিকার হয়েও নেহেরু-গান্ধী-প্যাটেলের ভারতের সঙ্গে লীন হয়ে পরম স্বস্তিতে রয়েছে। অবশ্য তারা এখনও বৃহত্তর ভারতবর্ষের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা থেকে বিচ্যুত হয়নি। নেহেরু তার বক্তব্যে প্রকাশ্যে অদূর ভবিষ্যতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের অঙ্গীভূত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয় তার লেখা বই 'Discovery of India' -তে তিনি সুস্পষ্টভাবে Greater India বা বৃহত্তর ভারতবর্ষের রূপরেখা তুলে ধরেছেন। নেহেরুর এসব উচ্চারণ-উদ্বৃতির মধ্যেও লুকিয়ে আছে বাংলাদেশীদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার উপকরণ।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় মাউন্ট ব্যাটেনের পক্ষপাতিত্ব এবং পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের ভিত্তিভূমি পূর্বপাকিস্তান। সেই ঐতিহাসিক স্বার্থপরতা ও শঠতার মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, পারিপার্শিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত সমস্যাবলীর কারণ নিহিত। বাংলাদেশের জন্মলগ্নের একদশক আগ থেকেই ভূ-পরিবেশগত, ভূ-অর্থনৈতিক এবং ভূ-কৌশলগত সমস্যাবলীর সমূহ আশঙ্কা দেখা দেয়।

অবশ্য বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঠিক একদশক আগ থেকেই ভু-পরিবেশগতভাবে এ অঞ্চলকে বিরানজনপদে পরিণত করার সুদূর প্রসারী চাণক্য চক্রান্ত শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ারই প্রাথমিক অংশ হিসেবে ভারত আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গায় ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করে বাংলাদেশের মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলকে ধূসর মরুভূমিতে পরিণত করার চক্রান্ত পাকাপোক্ত করে। ঠিক তারই পাশাপাশি ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিজের কব্জায় নিয়ে নিতে বিশেষভাবে তৎপর হয়। এ লক্ষ্যে তারা নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক সেনাবাহিনীকে ঠুঁটো জগন্নাথ করার মানসে রক্ষীবাহিনীর মত একটি মিলিশিয়া পেটোয়াবাহিনী তৈরি করতে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারকে বাধ্য করে।

www.pathagar.com

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত টলটলায়মান শিশুরাষ্ট্র বাংলাদেশের উঠে দাঁড়ানোর ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করতে তারা সে সময় ভারত বান্ধব সরকারের সহযোগিতায় "ভারত-বাংলাদেশ পঁচিশ বছর মৈত্রীচুক্তি" নামে গোপন সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। সেই গোপন চুক্তির প্রতিটি ধারা, উপধারা জুড়ে সংযোজিত ছিল একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতামূলক অসম ব্যবস্থা। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শিশুরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৎকালীন সরকারের সাথে এমনি আরেক চুক্তির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের কৌশলগত ছিটমহল (Enclave) বেরুবাড়ী দখল করে নেয়। কিন্তু, চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশের প্রাপ্য তিনবিঘা করিডোরটি হস্তান্তর করতে ভারত অনীহা ও উদাসীনতা দেখায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় সীমান্তবর্তী হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় জেগে উঠা বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার অন্তর্ভূক্ত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটিও একতরফাভাবে অত্যন্ত কৌশলে দখল করে নেয় ভারত। দ্বীপটি আজও অবৈধভাবে ভারত দখল করে রেখেছে। আর এর মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জটিলতার ইতিহাস সৃষ্টি হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর থেকে ভারত-বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্যচট্টগ্রামের (CITT) বিচ্ছিন্নতাবাদী নৃ-জাতি গোষ্ঠীগুলোকে সংগঠিত করে তাদের কিছুসংখ্যক বিপথগামী সদস্যকে আশ্রয়-প্রশ্রয় ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথাকথিত "শান্তিবাহিনী" গঠন করে সশস্ত্র সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপতৎপরতায় মেতে ওঠে। এ বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত, প্রমাণ-পঁজি সবই দেশ-বিদেশে প্রকাশিত জার্নাল-পিরিয়ডিকেলস এবং বিশেষজ্ঞদের দৈনন্দিন রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে তিক্ততার নানা বিষয় যুক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

সাম্প্রতিক সম্পর্ক

এ কথা চূড়ান্ত সত্য যে, সাম্প্রতিক কালে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক নিতান্ত সন্দেহ, দোষারূপ আর তিক্ততায় ভরপুর। ভারতের দায়িত্বশীল মহল বাংলাদেশের জনগণ ও বিগত প্রতিটি সরকারকে তাদের দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদদদাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তারা বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের অভ্যন্তরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের অর্ধশতাধিক ট্রেনিং

www.pathagar.com

ক্যাম্পের অবস্থান, আকৃতি এবং তৎপরতা সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কাল্পনিক রিপোর্ট উপস্থাপন করছে। বাংলাদেশের বিগত সরকার কিছুটা নরম সুরে প্রতিবাদ করলেও বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার তাও করছে না। যদিও সরকার নানাভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট। আর এরই অংশ হিসাবে তারা বিগত সরকারের আমলে চট্টগ্রাম বন্দরে আটক দশ ট্রাক মালিকবিহীন অস্ত্রের চালান'কে পূর্ববর্তী সরকারের দায়িত্বশীলদের ওপর চাপানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের এ প্রচেষ্টা স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশ কর্তৃক ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদদদানের দাবিকে জোড়ালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। সাম্প্রতিককালে পরিবর্তিত ভারত বান্ধব 'এশিয়ান হাইওয়ে' প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগলাভের ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক এবং ভূ-কৌশলগত ইস্যুগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আর বর্তমান সরকার ভারতকে এ বিষয়ে নগ্নভাবে ছাড় দেবার যৌক্তিকতা খুঁজে বের করতেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত রয়েছে। যুগযুগ ধরে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সরকারের এ হীন জাতিবিনাশী কৌশলের ফলে দেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থি দলগুলোকে দ্রুত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের আর একটি বড় বাধা দু'দেশের মধ্যকার সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণ ইস্যুটিও সাম্প্রতিককালে দু'দেশের ক্রমাবনতিশীল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও অবনতির দিকে ধাবিত করছে। অতি সাম্প্রতিককালে ভারত কর্তৃক তাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বরাক নদীতে বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীব্যবস্থা সুরমা-কুশিয়ারা-মেঘনাকে মেরে ফেলার মতো অবস্থা দেখা দেয়ায় বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ পরিবেশগত নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় চরম উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের পরিবেশ বিনাশী এই উদ্যোগটি সারা বাংলাদেশকে চরমভাবে ভারতের প্রতি বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী করে তুলছে। এক্ষেত্রেও বর্তমান ভারতবান্ধব বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্বিকার। দু'দেশের মধ্যকার কূটনৈতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভারতীয় নগ্ন হস্তক্ষেপ দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে করে তুলেছে আরও সন্দেহপ্রবণ।

সাম্প্রতিককালে পিলখানায় সংঘঠিত সেনাবাহিনীর সদস্যদের হত্যাকান্ডের পরপর ভারতের পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিত্বের চরিত্র হনন করে মিথ্যা অপবাদ রটানোর এবং ভারতীয় নেতৃবর্গের উস্কানিমূলক বক্তব্য দু'দেশের মধ্যকার ক্রমাবনতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য, ভারতের এসব পত্র-পত্রিকা ও নীতি-নির্ধারকদের বক্তব্য সাম্প্রতিকালে প্রকাশিত বাংলাদেশের সরকার ও সেনাবাহিনী পরিচালিত তদন্ত প্রতিবেদনে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। একই সঙ্গে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পিলখানার ঘটনার সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভারত তার সমরশক্তির অংশবিশেষ (সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী) বাংলাদেশে দ্রুত হস্তক্ষেপ করার জন্য 'রেডএলার্ট' অবস্থায় রাখে। ভারতের এ উদ্যোগ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের অস্তিত্বের জন্য কত ভয়ঙ্কর ও উদ্বেগজনক তা বলারই অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যাপারে কোনো সময়ই ভারত সরকারি পর্যায় থেকে কোনোরকম ব্যাখ্যা কিংবা দুঃখ প্রকাশ করেনি। সীমান্তে প্রতিনিয়ত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের নিরীহ জনগণকে পাখির মতো গুলিকরে হত্যা করে চলেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, বিগত এক দশকে সহস্রাধিক বাংলাদেশী নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে। ভারত বাংলাদেশ স্থল-সীমান্তে কাটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে- যা একটা স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের আত্মসম্মানে আঘাতের শামিল। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা ক্ষতিকর বলে বিবেচিত। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় পশ্চিবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভারতীয়রা সীমান্ত অঞ্চলে তাদের ভূখন্ডে ফেনসিডিলের প্রায় ২৫০০ কারখানা গড়ে তুলেছে। এসব কারখানা থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার বোতল ফেনসিডিল বাংলাদেশে অবৈধভাবে পাঠানো হচ্ছে। অত্যন্ত কৌশলে ভারত সরকার বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম তথা তরুণ সমাজকে মাদকাসক্ত করে ধ্বংস করার নিরব অনুমোদন দিয়ে বাংলাদেশের প্রতি তার আসল মনোভাবের প্রকাশ ঘটাচ্ছে।

বাংলাদেশের বিডিআর এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব ও নির্বিকার। ভারতের বিভিন্ন তথ্য মাধ্যমে অবিরাম বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর লালিত আদর্শ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হলেও ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের সকল টিভি চ্যানেল ও বেতার প্রবাহকে সরকারি নির্দেশে নিষেধাজ্ঞার আওতায় বন্ধ করে দিয়েছে। এসব বিষয়েও দু'দেশের মধ্যকার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নেতিবাচক সম্পর্কের বাস্তবচিত্র পরিস্ফুট করে তুলেছে। এ ছাড়াও রয়েছে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার "৯৪:৬ শতাংশ" বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতার খড়গ।

www.pathagar.com

বর্তমান সমস্যাবলী

ভারত-বাংলাদেশের সমস্যাবলীর মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-পারিপার্শ্বিক জটিলতা সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। বিশাল আয়তনের শক্তিধর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তিনদিকে সেই দেশ কর্তৃক বেষ্টিত অবস্থায় বাংলাদেশের অবস্থান। বৃহত্তর ভারতবর্ষের পূর্ববঙ্গ ও আসামের খন্ডিত বৃহত্তর সিলেট জেলা নিয়ে গঠিত ১৯৪৭ সালের পাকিস্তানের পূর্বাংশ নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পরিবেশগত ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থা (Ecological Balance) সচল রাখতে এবং উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রে ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া চলমান রাখতে নদ-নদীর ভূমিকা অপরিসীম। তাছাড়া দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি ইত্যাদিতে বাংলাদেশের নদ-নদীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এসব নদ-নদী দিয়ে বাংলাদেশে প্রায় ২.৪ বিলিয়ন টন পলি পরিবাহিত হয়। আর এ পলি দিয়েই বাংলাদেশের অগভীর সমুদ্রে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১০০ বর্গমাইল করে নতুন ভূমি গড়ে উঠে বাংলাদেশের মানচিত্রে সংযোজত হচ্ছে। ভারত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি নদীর মধ্যে ৩০টিতে একতরফাভাবে বাঁধ, ব্যারেজ, গ্রোয়েন, লিংক ক্যানেল ইত্যাদি নির্মাণ করে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদীসমূহের আইন-সঙ্গত পানি ও পলিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এদেশকে পর্যুদস্ত ও বিপন্ন করে তুলছে। ভারতের এসব হস্তক্ষেপের মধ্যে গঙ্গার ফারাক্কা ব্যারেজ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চলকে পানিশূন্য করে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের আন্তর্জাতিক নদী তিস্তার উজানে ভারত তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ করে নদীর পানি আটকিয়ে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের পানিপ্রবাহকে করে তুলেছে বিপন্ন। একই সাথে ভারত একতরফাভাবে ব্রহ্মপুত্র নদীতে যোগীগোপা বাঁধ নির্মাণ করে ব্রহ্মপুত্র নদীকেও লিংক ক্যানেলের মাধ্যমে কুচবিহার, শিলিগুড়ি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর অতি সম্প্রতি মেঘনা নদী ব্যবস্থার মূল দুটি ধারা সুরমা-কুশিয়ারা'র উৎস বরাক নদীতে টিপাইমুখ বাঁধ ও ফুলেরতল ব্যারেজ-এর মাধ্যমে সুরমা-কুশিয়ারা নদীতে পানি ও পলি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পানি শূন্য করে এ অঞ্চলের ১৬টি জেলার প্রায় ৩ কোটি মানুষকে ধ্বংস করে দেয়ার আয়োজন সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও ভারত একতরফাভাবে খোয়াই, মনু, গোমতি, মুহুরী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর উপর প্রকৌশলগত নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে চলেছে।

www.pathagar.com

সীমান্তে আগ্রাসন

ভারত প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের সীমান্তে একতরফাভাবে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশের কোনো না কোনো সংবাদপত্রে এসব তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগেই ভারত তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের নানা স্থানে অসংখ্য বার হামলা চালিয়েছে এবং দখল করে নিয়েছে আমাদের ভূমি যা ভূ-কৌশলগত দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পর্শকাতর স্থান। এ সবের মধ্যে সিলেটের পাথরিয়ার পাহাড়ী সীমান্ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিঙ্গার বিল, ফেনীর বিলোনিয়া সীমান্তের মুহুরীরচর উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তান আমলেই ভারতীয় প্রশিক্ষিত গোয়েন্দাচক্র অত্যন্ত সুকৌশলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আঞ্চলিকতার বীজ ও ঘৃণার জাল ছড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের পর পরই ভারত তার বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে। সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভারত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভূমি বেষ্টিত "সাতবোন রাজ্যমালা"য় সমুদ্র সংযোগ লাভের একমাত্র উপায় বঙ্গোপসাগরের প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দর চিরতরে দখল করে নিতে উদ্যত হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় মিত্রবাহিনীর জেনারেল উবানের "ফ্যান্টমস অব চিটাগাং" নামক গ্রন্থে আমরা ভারতের সেই আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাই। জেনারেল উবানের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ছাড়াও ভারতীয়দের আগ্রাসী মনোভাবের আরো পরিচয় পাওয়া যায় সে দেশের প্রখ্যাত সমরকৌশলবিদ ও পন্ডিতগণের খোলামেলা লিখিত বক্তব্য থেকে।

১৯৭১ সনে ভারতের সহযোগিতায় তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি পাকিস্তানকে পরাভূত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী সংকীর্ণ চিকেন নেক শিলিগুঁড়ি করিডোরের পরিপূরক হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের ভূমির ভূকৌশলগত সুবিধালাভের দিকে ইঙ্গিত করে প্রখ্যাত ভারতীয় সমরকৌশলবিদ সুব্রামনিয়াম তাঁর বই "Bangladesh and India's Security"-তে লিখেন There is not the same risk of the Chinese cutting of Asam (i.e.N.E. States). As there was in 1962, since in the course of hostilitices, the northern Bangladesh is likely to be over run by Indian forces, and the communication lines with Assam or N.E. will be broadended rather than narrowed down or closed"...... . তিনি নিশ্চিত হয়ে আরও বলেন- "This country (India) needs no longer be afraid that in case of

www.pathagar.com

military pressure from china. Assam (N.E.) will be cut off from rest of India".

১৯৯৬ সনে আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর "পার্বত্য শান্তি চুক্তি" প্রকৃত অর্থে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কালো চুক্তি সম্পাদন উত্তরকালে ভারত-বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার সীমান্তবর্তী আচালং মৌজার প্রায় ১৭০০ একরের এক বিশাল পরিসরের ভূমি অবৈধভাবে জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। বাংলাদেশের দখলকৃত সেই অবৈধ জমির ওপর ভারতীয় সীমান্তরক্ষীবাহিনী বিএসএফ অবৈধভাবে অসংখ্য ব্যাঙ্কার, পাকা সড়ক ও কালভার্ট তৈরি করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে চলছে (আজকের কাগজ, ২৮ নভেম্বর ২০০০)।

১৯৭৪ সনের ইন্দিরা-মুজিব সীমান্তচুক্তি অনুসারে ও নদী সিকস্তি চরটির মালিকানা সম্পূর্ণ বাংলাদেশের বলে নির্দেশ করা হয়েছে। ১৯৭৪ এর পর এ পর্যন্ত ভারত মুহুরী নদীর উজানে কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণ করে এবং নদীটির ভারতীয় অংশে ১৯টি স্পার, গ্রোয়েন ইত্যাদি নদীশাসন কাঠামো নির্মাণ করে। এ সব নদী শাসন কাঠামো তৈরির মাধ্যমে নদীর মধ্য স্রোত জোরপূর্বক পশ্চিমে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়ে ভারত এ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় ২৪ একর ভূমি দখল করে নিয়েছে এবং ঐ চরটির আরো ৫৩ একর বিরোধপূর্ণ জমির উপর স্থায়ী মালিকানার অবৈধ দাবি বজায় রেখে চলেছে।

শুধু বাংলাদেশের ভূমি দখল করেই নয় ভারত বিগত বছরগুলোতে প্রায় ১,০০০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করেছে। বিডিআরসহ সেই হতভাগ্য বাংলাদেশী নাগরিকদের বেশিরভাগই বিএসএফ এর গুলিতে প্রাণ হারায়। শুধুমাত্র ২০০০ সনে বিএসএস-এর হাতে মোট ৩৫ জন বিডিআর সদস্য নিহত হয়েছে। ঢাকার ইংরেজি দৈনিক The Independent গত ২০০০ সনের ১২ ডিসেম্বর তারিখে সরকারি সুত্রের উদ্বৃতি দিয়ে- 35 BDR men killed in border skirmishes this year. শীর্ষক এক রিপোর্ট প্রকাশ করে।

বাংলাদেশের দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর নির্দেশে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর হত্যাকান্ড ও আক্রমণের খবর প্রায়শই প্রকাশ করে থাকে। গত ৩০ মার্চ ২০০১ তারিখে দৈনিক যুগান্তর ইউএনবি-এর বরাত দিয়ে এক খবরে উল্লেখ করা হয়, "ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চাঁদপুর গ্রাম থেকে এক বাংলাদেশী তরুণ জেলেকে (২৭) অপহরণ করে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করেছে।" ১৩ মার্চ ২০০১ তারিখের দৈনিক মানবজমিন-এর এক রিপোর্টে

www.pathagar.com

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর গুলিতে জকিগঞ্জের সীমান্তবর্তী কুশিয়ারা নদীতে খলিলুর রহমান নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর সম্পর্কে জানা যায়। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় বিএসএফ-এর অত্যাচার ও বাড়াবাড়ির বিষয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের মুখপাত্র বলে খ্যাত শেখ ফজলুল হক মনির প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক বাংলার বাণী'র ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এর একটি খবর খুবই প্রণিধানযোগ্য। কলকাতা থেকে দীলিপ চট্টোপাধ্যায় প্রেরিত ঐ খবর বলা হয় যে, "পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য" বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে নিরীহ জনসাধারণকে বিএসএফ সদস্যদের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য সেই সীমান্তে বাংলাভাষী বিএসএফ জওয়ান নিয়োগের জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের সত্যতা ধরা পড়ে ১৫ জানুয়ারি ২০০১ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে- যার শিরোনাম ছিল, "সাতক্ষীরা সীমান্তে বিএসএফ-এর উস্কানিমূলক তৎপরতায় এক মাসে ১৫ জনের মৃত্যু।" সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার খাজিরা সীমান্তের ইছামতি নদীর ঘায়কাঘাটে ভারতীয় বিএসএফ-এর একটি টহলদার গানবোট- বাংলাদেশের পানি সীমানায় প্রবেশ করে বাংলাদেশের একটি যাত্রীবাহী নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে দুদলি গ্রামের জিন্নাহ নামের ৩২ বছরের এক যুবককে হত্যা করে। একইভাবে সে সময়ের জানুয়ারি মাসের ৬ তারিখে বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলের কালিন্দী নদীতে আর একটি যাত্রীবাহী নৌকায় বিএসএফ গুলি চালিয়ে আরো দু'ব্যক্তিকে হত্যা করে। তাছাড়া ২০০০ সনের ১৪ ডিসেম্বর ইছামতি নদীতে বিএসএফ বাংলাদেশের আরো ৪ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে বলে ইত্তেফাকের সেই রিপোর্টে প্রকাশ।

২০ ডিসেম্বর ২০০১ এর দৈনিক মানবজমিনে প্রকাশিত এক খবরে দেখা যায়, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর গুলিতে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার চরখিদিরপুর সীমান্তে খুশবু নামের বাংলাদেশের একজন গরু ব্যবসায়ী আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন আছে। সে ঘটনায় বিএসএফ বাংলাদেশের গরু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ৪৭টি বৈধভাবে আমদানিকৃত গরু জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়।

১৯৯০ থেকে ২০০৯ সন পর্যন্ত ১৯ বছরে ভারতের সীমান্তরক্ষী বিএসএফ-এর গুলিতে বাংলাদেশের মোট ১০০০ জন নাগরিক নিহত হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর)-এর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী, উগ্রবাদী হিন্দু এবং ভারতীয় নাগরিকদের নগ্ন হামলা, ভূমি দখল, লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ, অপহরণ ও চোরাচালানসহ অন্যান্য আগ্রাসন বর্তমান শাসনামলেও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দক্ষিণ তালপট্টি সমস্যা

ভারত-বাংলাদেশের ক্রমাবনতিশীল সম্পর্কের মূলে রয়েছে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার সঙ্কট। দু'দেশের মধ্যকার সীমানা বিরোধ ও ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশের সীমারেখাকে ভারত তার নিজের এলাকা বলে দাবি করার মধ্যে এ বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। দক্ষিণ তালপট্টি, নিউমূর বিতর্ক, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দানা বেঁধে উঠতে থাকে - [Far Eastern Economic Review, May 2, 1980]। উপমহাদেশের গাঙ্গের ব-দ্বীপের বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমারেখার প্রায় মধ্যভাগে বঙ্গোপসাগরের অগভীর উপকূলীয় সমুদ্রাঞ্চলে জেগে ওঠা ক্ষুদ্রাকার এ দ্বীপটির মালিকানার সঙ্গে উভয় দেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার মালিকানা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে (Rahmen, 1987)। দ্বীপটির জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশই নানা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দ্বীপটিকে নিজ নিজ সীমান্তভূক্ত বলে দাবি করে আসছে। ক্রমে দু'দেশের এই মালিকানা সংক্রান্ত দাবি একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিতর্ক ও ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতে পরিণত হয়েছে (Mitra)।

আয়তনের দিক বিচারে দক্ষিণ তালপট্টি একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ হলেও ভূ-রাজনীতির নিরিখে দ্বীপটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই ক্ষুদ্রাকার উপকূলীয় দ্বীপটির মালিকানার সঙ্গে জড়িতে রয়েছে বাংলাদেশ এবং ভারত উভয় রাষ্ট্রের বঙ্গোপসাগরের এক বিশাল আঞ্চলিক সমুদ্রাঞ্চলের (Territorial Sea) উপর সার্বভৌমত্বের স্বার্থ। ভারত ও বাংলাদেশের সাধারণ আঞ্চলিক সমুদ্রের মালিকানার বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণী নিষ্পত্তি হয়নি। ১৯৮১ সালের প্রথমদিকে দ্বীপটির মালিকানার প্রশ্নে ভারত ও বাংলাদেশ প্রায় সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। সে বছরের মে মাসে ভারত দ্বীপটিতে "সন্ধ্যায়ক" নামের একখানা জাহাজ প্রেরণ করে। বাংলাদেশ ভারতের সেই একতরফা তৎপরতায় ক্ষুব্ধ হয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভারত স্বীয় তৎপরতাকে নিছক 'জরিপ কাজ' বলে দাবি করলেও বাংলাদেশ বিতর্কিত ভূ-খন্ডে ভারতের

www.pathagar.com

তৎপরতাকে অবৈধ সামরিক এবং উস্কানিমূলক' বলে অভিহিত করে (The States man, 1981)। বাংলাদেশ সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ঘটনাস্থলে তিনটি ক্ষুদ্রাকার যুদ্ধ জাহাজ (Gunboats) প্রেরণ করে এবং অবিলম্বে দক্ষিণ তালপট্টি থেকে সকল সৈন্য ও সরঞ্জামাদি প্রত্যাহার করে নেবার জন্য ভারতের প্রতি দাবি জানায়। ভারত বাংলাদেশের সকল দাবি-দাওয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবং বাংলাদেশের কথায় কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে দ্বীপটিকে ভারতীয় ভূখন্ডের অংশ হিসেবে শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটি স্থাপনে সচেষ্ট হয় এবং আজ পর্যন্ত দ্বীপটিতে পুরোপুরিভাবে নিজ দখলদারিত্ব কায়েম রেখেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ এখনো দ্বীপটির মালিকানার ব্যাপারে নিজ দাবি ত্যাগ করেনি। দক্ষিণ তালপট্টি চুক্তির ব্যাপারে এবং সেখানে দুদেশের যৌথ-জরিপের প্রশ্নে অটল থেকে বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করিয়ে বাংলাদেশ বিভিন্ন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু এই দক্ষিণ তালপট্টির মালিকানার উপর নির্ভর করছে ভারত বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের বিশাল এলাকার উপর বিশেষকরে ভারত এবং বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্র সীমানা, একান্ত অর্থনৈতিক বলয়-সহ (EEZ) নান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নির্ধারণের স্বার্থ, সেহেতু ক্ষুদ্র উপকূলীয় দ্বীপটির মালিকানা প্রশ্নে উভয় দেশই কোনোরূপ ছাড় দিতে নারাজ। একতরফাভাবে জোরপূর্বক দক্ষিণ তালপট্টি দখলে নিয়ে ভারত এক্ষেত্রে আগ্রাসী আচরণ করে চলেছে।

ভারত-বাংলাদেশ ট্রানজিট ইস্যু

ভারত তার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি প্রায় ভূ-পরিবেষ্টিত রাজ্যের সঙ্গে তার মূল ভূখন্ডে বিভিন্ন পণ্য এবং Man, Machines and Metarials চলাচলের জন্য বাংলাদেশের উপর দিয়ে 'ট্রানজিট ফ্যাসিলিটিজ' দাবি করে আসছে। বাংলাদেশ এ দাবির বিনিময়ে ভারতের কাছ থেকে নেপাল, ভূটান ও চীনে স্থল যোগাযোগের জন্য অনুরূপ ট্রানজিট চাচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য চীন-নেপাল ভূটানের যে সংযোগ ভারতের উপর দিয়ে যাবে তা ১০০ কিলোমিটারের চেয়েও কম এবং তা বাস্তবেই হবে 'ট্রানজিট' ব্যবস্থার আওতায়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতেব মুল ভূখন্ড থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে যাওয়ার যে সংযোগ রোড, তা ট্রানজিটের ছদ্মাবরণে করিডোর আদায়েরই কলাকৌশল। ভারত নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের মাত্র ২৫ কিলোমিটার স্থল সংযোগ দিতে নিরাপত্তা জনিত কারণ দেখিয়ে অপারগতা প্রকাশ করে। তার চেয়েও বেশি নাজুক অবস্থার উত্তর-পূর্বাঞ্চল 'সাত রাজ্য মালা' বাংলাদেশ ভারতকে কোনোক্রমেই

www.pathagar.com

দ্বিপাক্ষিকভাবে ট্রানজিট ব্যবস্থা দিতে পারে না। কিন্তু ভারত নানা ছল-বাহানা করে এবং কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে ট্রানজিটরূপী করিডোর আদায় করে নিতে চায়। এর ফলেও প্রায় এক যুগের বেশি সময় ধরে এ নিয়ে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়ন চলছে।

এশিয়ান হাইওয়ে, ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও চট্টগ্রাম বন্দর সম্পর্কিত সমস্যা

ভারত তার প্রায় স্থলপরিবেষ্টিত বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রবণ পার্বত্য দুর্গম সাতটি রাজ্যমালার সঙ্গে মূল ভূ-খন্ডে সংযোগ সাধনের জন্য বাংলাদেশের উপর দিয়ে নিজের সুবিধা মতো বাঁকানো পথে এশিয়ান হাইওয়ে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের সুবিধা আদায়ের প্রায় সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে ফেলেছে। ভারতের এই এশিয়ান হাইওয়ে ও ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের পথরেখাটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢুকে ঢাকা ও সিলেট হয়ে উত্তর-পূর্বরাজ্য মালায় প্রবেশ করবে। প্রস্তাবিত এ বাঁকানো পথের রেখাটি ভারতের জন্য অনুকূল হলেও পথটি বাংলাদেশের জন্য মোটেই লাভজনক হতে পারে না। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম, টেকনাফ-সিত্তোই, আকিয়াব ইয়াঙ্গুন-গামী পথটি বাংলাদেশ থেকে তার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের গন্তব্যসমূহে স্থল যোগাযোগের জন্য (সড়ক ও রেলপথ) কম দূরত্ব, কম দুর্গম অধিকতর নিরাপদ হওয়ার ফলে বাংলাদেশের জন্য তা সুবিধাজনক। কিন্তু ভারত তার অভ্যন্তরীণ স্বার্থ ও সুবিধার সঙ্গে অযৌক্তিকভাবে বাংলাদেশকে জড়িয়ে এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত করে একতরফাভাবে শুধুই নিজের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর। এ বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং দু'দেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বিরাট বাধা। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের বর্হিবাণিজ্যের প্রধানতম আগমন এবং নির্গমনের পথ চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহার সুবিধা আদায়ে ভারত উঠে পড়ে লেগেছে। জাহাজ ও কনটেনারজটে এই সমুদ্র বন্দরটি নিয়ে বাংলাদেশ এমনিতেই হিমসিম খাচ্ছে। আর সে অবস্থায় ভারতের বিপুল ট্রানজিট পণ্যের ভারবহনে বন্দরটি সম্পূর্ণ অক্ষম। তবুও ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অনুগত সুহৃদ শক্তি ও বহিরাগত বন্ধুদের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বন্দরে ট্রানজিট সুবিধা আদায় করে নিতে সদা তৎপর। বাংলাদেশের বন্দর সুবিধা আদায়ে ভারতের অতিমাত্রায় তৎপরতার মুখে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে।

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদদদানের অভিযোগ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে ভারতের এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোকে বাংলাদেশের মদদদান সংক্রান্ত অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ পারস্পরিক সংকটকে আরো বেশি ঘণীভূত করে তুলেছে। নানা গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট এবং ভারত-বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের তথ্য-উপাত্ত থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীকে নিশ্চিতভাবে ভারত প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র ও মদদ দিয়ে যাচ্ছে। এখনও ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি নিরাপদে অবস্থান করছে।

এভাবেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি উগ্র হিন্দুগোষ্ঠী "স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন"-এর নামে হিন্দু বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অপতৎপরতা ও আশ্রয়-প্রশ্রয় পেয়ে চলছে। তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সংলগ্ন অঞ্চল এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ২০টি জেলা নিয়ে "স্বাধীন-বঙ্গভূমি" নামের হিন্দু রাষ্ট্র স্থাপনের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আর কলকাতা থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংগঠিত হয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী এই চক্রটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে বাংলাদেশেরও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তদন্তে এদেশে উগ্র ইসলামী জঙ্গিদের তৎপরতার পেছনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার মদদের বিষয়টি উৎঘাটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য যে, এসব উগ্র ইসলামি জঙ্গিদের কাছে উদ্ধারকৃত শক্তিশালী RDX বিস্ফোরক জেল এবং অন্যান্য গোলাবারুদে ভারতের রাষ্ট্রীয় সমরাস্ত্র কারখানার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে ভারতের তরফ থেকেও বাংলাদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক ভারতের উলফাসহ নানা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোকে আশ্রয় প্রশ্রয় ও মদদের অভিযোগ রয়েছে। এসব জটিল বিষয় ও পারস্পরিক দোষারূপ দু'দেশের সম্পর্কে মারাত্মক চিড় ধরেছে।

উপসংহার

সাংস্কৃতিক, নৃ-তাত্ত্বিক, জাতিতাত্ত্বিক, ভাষাগত, পারিপার্শ্বিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি নানাদিক দিয়ে অত্যন্ত ঘণিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও ভূ-রাজনৈতিক এবং

www.pathagar.com

নিরাপত্তাজনিত কারণে উপ-মহাদেশের এ রাষ্ট্র দু'টির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার পরিবর্তে চরম তিক্ততায় পরিণত হয়েছে। দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়নের স্বার্থে ভারতকে তার আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী আগ্রাসী মনোভাব অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশকে ভারতের প্রতি বাস্তবমুখী ভারত-নীতি অনুসরণ করতে হবে। একই সঙ্গে নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশকে আরব ভূ-খন্ডে অস্তিত্ব রক্ষায় নিয়োজিত ক্ষুদ্র ইসরায়েলের মত দুর্ভেদ্য সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও অপরাজেয় গণসামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল বিজ্ঞান নির্ভর শিল্পায়ন, নগরায়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে।

একই সাথে বাংলাদেশকে চীন, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, জাপানসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব দেশ এবং দূর প্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের সাথে জোরালো সামরিক বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। এককথায়, বাংলাদেশকে দ্রুততার সঙ্গে "পূর্বমূখী নীতি" "Look East Policy" গ্রহণ করতে হবে দক্ষতার সঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের নৈকট্য সম্পর্কের নীতি আরও জোরদার করতে হবে।

বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে উপমহাদেশের ভবিষ্যত

আমরা স্বাভাকিভাবেই ধরে নিতে চাই নেহেরু ডকট্রিন পরিহার সাপেক্ষে ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল করবে না। তবে এটাও কিন্তু, দিবালোকের মত স্পষ্ট বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক সেটাও ভারতের কাম্য নয়। কারণ, স্বাধীন-সার্বভৌম ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে গেলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও স্বাধীনতা আন্দোলন মাথাচারা দিয়ে উঠতে পারে। বিশেষকরে দক্ষিণ-ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে উত্তাল আন্দোলন শুরু হয়ে যেতে পারে। এরই মধ্যে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের হৃদয়ে দিল্লীবিরোধী চেতনা জাগ্রত হয়েছে।

তাসত্ত্বেও যদি ভারত বাংলাদেশকে হায়দরাবাদ ও সিকিমের মত মনে করে অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা করে তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে তারা হয়তো সফল হতেও পারে। তার কারণ, এদেশে ইতিমধ্যে তাদের অনুগত রাজনৈতিক শক্তি

www.pathagar.com

তৈরী হয়েছে। পিলখানা হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমিক বিডিআরকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে একই ধাক্কায় দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। আবার জেনারেল (অবঃ) মঈন ইউ আহম্মদের মত নতুন নতুন বিশ্বাস ঘাতক সৃষ্টি করা যেতে পারে। তারই পাশাপাশি বাংলাদেশকে ব্যর্থরাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করার ভারতীয় চক্রান্ত অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ভারত বাংলাদেশকে ব্যার্থরাষ্ট্রে পরিণত করার পেছনে ইতিমধ্যে অনেকটা সফলকাম হয়েছে এবং এখনো তারা এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

তবে এটাও সত্য শেষপর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে সিকিম কিংবা হায়দরাবাদে পরিণত করতে পারবে না। কারণ, ১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে অবিরাম স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ি মুক্তিযুদ্ধ করেছে এ অঞ্চলের মানুষ। আবার তারাই ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। পৃথিবীতে এ ভূখন্ডের অধিবাসীরাই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

পক্ষান্তরে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুক্ত তাও ভাবার কোন অবকাশ নেই। জাত-পাত ও আঞ্চলিকতার প্রশ্নে যে বৈষম্য তা থেকে ভারত জুড়ে সর্বগ্রাসী সঙ্কট মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতবোন রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন একসময় মারাত্মক পরিণতির দিকে ধাবিত হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যায়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতীয় বাহিনীর অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসনের অপচেষ্টার মুখে এ অঞ্চলের ভূ-রাজনীতিতে নতুনমাত্রা সংযুক্ত হবে। ভারতবিরোধী প্রবল জনস্রোতের মুখে তাঁবেদারগোষ্ঠী ও তাদের সমর্থকদের পক্ষে টিকে থাকাটাই হবে তখন দুঃসাধ্য ব্যাপার।

জাগ্রত জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আগ্রসন কবলিত জনপদে সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যরা মাতৃভূমিকে হায়েনার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার যে নজীরবিহীন সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাতে ভারত ইউনিয়নের সংহতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হবে। পশ্চিমবঙ্গের ৩৮% ও আসামের ২৫% মুসলমান পরিবর্তিত

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হবে। সে অবস্থায় উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল রাজ্যের ৬০% এবং ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের ৩৫% মঙ্গোলীয় চায়নিজ বংশোদ্ভূত উপজাতি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বাধীনতা আন্দোলন আর বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার বা রক্ষার আন্দোলন অভিন্নখাতে প্রবাহিত হওয়ার বাস্তবপটভূমি তৈরি হবে। জাতিসত্তার নুতন মেরুকরণের প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর বাংলার ৬৮% মুসলমান ভারত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ হবে।

এ অবস্থায় ভারতের ফেডারেল কাঠামো দুর্বল হয়ে বহুধাবিভক্ত আঞ্চলিক জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তিতে দেশটির বিভক্তিকে তরান্বিত করবে। অন্যদিকে প্রতিবেশী ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোর সাথে ভারতের বিমাতা ও প্রভুসূলভ আচরণের কারণেই হিন্দুরাষ্ট্র হয়েও নেপাল, ভূটান ও সিকিমের জনগণও এই আন্দোলনের সাথে অঙ্গিভূত হয়ে পড়তে পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। আর ভারত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ও সংগ্রামের চালিকা শক্তিতে পরিণত হবে ঢাকা।

আবার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অর্থাৎ পশ্চিমা শক্তিও তখন এই আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে পশ্চিমাশক্তির আর্শিবাদে ভারতের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে জাতিভেদ প্রথাকে কাজে লাগিয়ে মেঘালয়ে খ্রীস্টান মিশনারিগুলো দ্রুততার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে এশিয়া ও দক্ষিণ-এশিয়ায় একমাত্র খ্রীস্টানরাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে মেঘালয়।

ফলে নেহেরু ডকট্রিনকে বাস্তবায়ন করতে যেয়ে ভারত তার আজকের অবস্থাকে ধ্বংস করবে কি-না তা ভারতের নেহেরু ডকট্রিনের অনুসারী ও শাসকগোষ্ঠীকে ভেবে দেখতে হবে। সার্বিক পরিস্থিতিকে অনুধাবন করাটাই হবে ভারতের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। ভারতের আজকের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতেই বাংলাদেশের ওপর থেকে তাদের আগ্রাসী কালোথাবা সরিয়ে নেয়া উচিত। অন্যথায় আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তির পরিবর্তন ঘটেছে তার পরিণতি ভারতকেও ভোগ করতে হতে পারে। #

www.pathagar.com

আমার বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর

১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশস্থ বৃটিশ হাই কমিশনের রাজনৈতিক সচিব মি. ডেভিড আমাকে তার বাসায় নৈশ্যভোজের আমন্ত্রণ জানালেন। উপস্থিত হয়ে দেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ রাজনৈতিক সচিব শিলা পিটার্স ও অন্য আরো কয়েকজন অতিথিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মি. ডেভিট আমার কাছে জানতে চাইলেন আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে আমি বৃটেনে যেতে পারব কিনা? তিনি আমার কাছে আরো জানতে চাইলেন, আমার অসুবিধা না হলে কমনওয়েলথ থেকেও আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। তিনি শিলা পিটার্সকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। এ ভাবেই আমার বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। মি. ডেভিডের কাছে শিলা পিটার্স আমার বৃটেন সফরের সময়সূচি এবং বৃটেনে কতদিন থাকার ইচ্ছা তাও জানতে চান।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় ১৯৯০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের যে কোনো সময় কমনওয়েলথ ও বৃটেনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমার কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে এবং মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরেরও ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু State department-এর বাংলাদেশ ডেস্কের প্রধান ছিলেন ছুটিতে। তিনি অফিসে

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করবেন ১০ মার্চ। সে কারণেই আমার যুক্তরাষ্ট্রের সফরসূচিতে কিছু পরিবর্তন আনার প্রয়োজন দেখা দেয়।

মি. ডেভিট লন্ডনের একটি হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, আমার স্ত্রীর বড়বোন লন্ডনে থাকে বলে আমি হোটেলে থাকা পরিহার করতে চেয়েছিলাম। সেদিন তার সঙ্গে আমার আলোচনা এ পর্যন্তই হয়েছিল।

এর একসপ্তাহের মধ্যে আমার বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরসূচি নির্ধারিত হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি লন্ডনে এবং ১২ ও ১৩ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের State department-সহ অন্যান্য স্থানে সফরের কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়।

ঢাকা থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি বৃটিশ এয়ারওয়েজের একটি বিমানে লন্ডনে এবং লন্ডন থেকে ১ মার্চ নিউইয়র্কের কেনেডী এয়ারপোর্ট হয়ে ওয়াশিংটন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে আমি লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করি। সেসময় এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্রভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল। লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যেও তার প্রভাব পড়েছিল ব্যাপকভাবে। লন্ডন হিথরো বিমান বন্দরে আমার দুলাভাই ও আপা এসেছিলেন আমাকে রিসিভ করতে। সেদিন খুব বেশি বৃষ্টি হয়েছিল। আট বছর পর লন্ডন শহর নতুন নতুন লাগছিল। দীর্ঘ বিমানযাত্রার ক্লান্তির ফলে খুববেশি ঘুম পাচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে বড় দুলাভাইয়ের সঙ্গে কাঁচাবাজার করতে গেলাম। দুপুরের দিকে কার্ডিফ থেকে আমার ছোট ভায়রাভাই শহিদ ও শ্যালিকা শারমিন আক্তার গিনিও এসেছে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শহিদকে নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান জায়গাগুলো দেখতে গেলাম। বিশেষ করে বুশ হাউজ ও ব্রিকলেন এরিয়া ঘুরেফিরে দেখলাম।

পরদিন সকার সাড়ে ৯টায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বিভাগ থেকে একজন কর্মকর্তা আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এবং তাদের সঙ্গে আমার নির্ধারিত কর্মসূচি অবহিত করতে। বড়আপা তাকে বিভিন্ন ধরণের নাস্তা খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি ঘরে তৈরি বাঙালির ঐতিহ্যবাহী নারকেলের বরফী ও এক কাপ কফি ছাড়া আর কিছুই খেলেন না। নারকেলের বরফী ভীষণ ভালো লেগেছে বলে জানান তিনি। তারপর তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমার অফিসিয়াল কর্মসূচি হলো ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে আমার বড় ভাই শেখ দেলোয়ার হোসেনের বন্ধু ডা. আলাউদ্দিন ও ঢাকার সাবেক মেয়র বিএনপি নেতা ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত এর সঙ্গে যোগাযোগ হলো। ডা. আলাউদ্দিন থাকেন ম্যাঞ্চেস্টার শহরে। তিনি বললেন, ১২ ফেব্রয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারে আসতে পারলে বাংলাদেশ কমিউনিটির পক্ষে এক ডিনারপার্টির ব্যবস্থা করতে পারেন। ম্যাঞ্চেস্টারের মেয়রসহ স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করতে চান তিনি। আমি ডা. আলাউদ্দিনকে জানালাম লন্ডনে আমার অফিসিয়াল কর্মসূচি ৬ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে যাবে। তারপর আমি ফ্রি থাকব।

অফিসিয়াল কর্মসূচি আরম্ভ হয় একটি লাঞ্চপার্টির মধ্য দিয়ে। আমার সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে থাকেন ব্রিটিশ ইনফরমেশন বিভাগের একজন কর্মকর্তা Mrs. Nora Doogan- লাঞ্জ পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন কমনওয়েলথ কর্মকর্তা সাউথ এশিয়ার পররাষ্ট্র বিভাগের ডেভিট ক্লকসহ ৫ জন কর্মকর্তা। প্রায় ২ ঘন্টা ধরে লাঞ্চের কর্মসূচি ও আলোচনা হয়। তারা আমার ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে খুটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও কমনওয়েলথের ব্যাপারে আমার মূল্যায়নও জানার চেষ্টা করেন। কমনওয়েলথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলি ১৯০ বছর ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত পরাধীন থাকার মধ্যেও আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। কারণ ইউরোপের উন্নতর শিক্ষাব্যবস্থা ও শিল্পবিপ্লবের ফলে আমাদের জাতীয় জীবনেও নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। বাংলাদেশের নাগরিকেরা যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। এর ফলে দুই জাতির সংস্কৃতির বিকাশ হচ্ছে কমনওয়েলথের আওতায়।

লাঞ্চ পার্টি শেষ হলে Mrs. Nora Doogan রওয়ানা হলেন হাউস-অব-কমন্স-এর উদ্দেশ্যে। সেখানে আমরা House of commons-এর কমনওয়েলথ গ্যালারিতে আমাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে আমরা প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর দেখার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করলাম। ব্রিটিশ House of commons তিনশ' বছরের পুরনো ভবন। পার্লামেন্ট সদস্যরা মুখোমুখি হয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। সে সময়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিসেস মার্গারেট থ্যাচার। আমি ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা বোঝার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের প্রশ্নের কৌশলগুলোকে অনুধাবণ করার চেষ্টা করছিলাম। ব্রিটেনে কোনো লিখিত শাসনতন্ত্র নেই। উপস্থিত সিদ্ধান্তগুলোই শাসনতন্ত্রের সংস্কার হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রচলিত প্রথাই শাসনব্যবস্থা। কমনহাউজের সভার স্পীকার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তার পরও এই কমনসভার রাইট প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ৩ জন স্পীকার হত্যার শিকার হন রাজতন্ত্রের প্রেরিত ঘাতকদের হাতে। ব্রিটেনের জনগণকে ৩০ বছর গৃহযুদ্ধ করতে হয়েছে তাদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

তরপরও বলতেই হবে ব্রিটিশ জাতি উৎকৃষ্টতর সাংস্কৃতিক মনোবৃত্তির অধিকারী। তারা এই যুদ্ধের নামকরণ করেছিলেন গোলাপের যুদ্ধ। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তরপর্ব শেষে আমার একান্ত বৈঠকের কর্মসূচি ছিল Mr. Roy Whitney এমপি-র সঙ্গে। তিনি কনজারভেটিভ পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান। ব্রিটিশ হাউস অব কমন্স ঐতিহ্যবাহী অতি পুরাতন ভবন। এর মূলকাঠামোর কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়নি। তবে ট্যাম্স নদীর বুকের উপর কমন্স সভার সদস্যদের জন্য চা-নাস্তা খাওয়া ও গল্পগুজব করার সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ভবনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটি ছোট খাসকামরা আছে এবং বিরোধী দলীয় নেতার জন্যও একটি কামরা আছে। আর এটাই হচ্ছে এর ঐতিহ্যমন্ডিত বৈশিষ্ট্য।

Mr. Roy Whitney ১৯৭১ সালের পর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ব্রিটিশ হাইকমিশনারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমার অন্য কারো সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা আছে কিনা। আমি সহজ সরল ভাবে বললাম ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। আমার কথা শুনে - Roy Whitney এবং Mrs. Nora Doogan দু'জনেই হেসে ফেললেন। মি. রায় বললেন - দেখি তোমার অভিপ্রায় পূরণ করা যায় কিনা। তিনি রওয়ানা হলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারের খাসকামরার দিকে। ৫ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, মি. হোসেন তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। প্রধানমন্ত্রী ৫ মিনিট সময় দিয়েছেন তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য।

তিনি আমাদেরকে তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। প্রধানমন্ত্রী ছোট্ট একটি রুমে বসা ছিলেন। আমরা ৩ জন প্রবেশ করলাম। মি. রায় আমাকে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন - A bright young leader of Bangladesh বলে। প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে আমি

www.pathagar.com

মাথা নিচু করে টেবিলের অন্যপ্রান্ত থেকে করমর্দন করলাম। তিনি আমাদের আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি প্রথমে জানতে চাইলেন- How I am filling about weather. আমি বললাম, এখানকার আবহাওয়া বাংলাদেশের তুলনায় একটু বেশি ঠান্ডা। Any how weather is more less comfortable. তিনি জানতে চাইলেন বাংলাদেশে ব্রিটেনের ব্রিটিশ টোবাকোসহ ২৮টি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত আছি কিনা জানতে চাইলেন। আমি উত্তর দিলাম- ব্রিটিশ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ আর ডুইং ওয়েল ইন ইকনোমিক্যাল এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি।

তখন বাংলাদেশে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনকাল। উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আমার কাছে জানতে চাইলেন- আমি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদকে চিনি কি-না? আমি বললাম- Well we have works together under the leadership of President Ziaur Rahman in BNP. তিনি বললেন - "ব্যারিস্টার মওদুদ একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক।" এর পর তিনি বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি স্বল্পপরিসরের সময়ের কথা বিবেচনা করে সংক্ষেপে উত্তর দিলাম। সবশষে তিনি তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নূরুদ্দিন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে কথা আমি সেনাপ্রধান নূরুদ্দিন খান ও তৎকালীন স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরীকে অবহিত করেছিলাম। আমি মিসেস নূরা ডোগানকে মার্গারেট থ্যাচারের সঙ্গে একটি ছবি তোলার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু হাউস অব কমন্সের মধ্যে ছবি তোলা নিষিদ্ধ বলে ছবি তোলা সম্ভব হলো না।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে মি. রায়কে উইথলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চললাম বুশ হাউজের দিকে। সেখানে বিবিসি ওয়াল্ড সার্ভিসের সঙ্গে আমার লাইফ ইন্টারভিউ হওয়ার কথা। সেখানে প্রখ্যাত সাংবাদিক Mark Reid আমার বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে ইন্টারভিউ নিবে। প্রথমেই কফি পানের ব্যবস্থা। তারপর রেকডিং রুমে ইন্টারভিউ। তিনি বিশেষভাবে বিচারপতি সাত্তার সরকারের উৎখাতের পটভূমি, বন্দুকের নলের মুখে এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণ ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করবেন বলে আমাকে অবহিত করলেন। তার প্রথম প্রশ্ন ছিল - 'নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ৮ মাসের মাথায় বন্দুকের নলের মুখে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এই সম্পর্কে তোমার মতামত কি?'

www.pathagar.com

আমি উত্তর দিলাম - প্রকৃত অর্থে ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যার মধ্যদিয়েই বিএনপি'কে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচন ছিল তীব্র জনরূষকে প্রশমিত করার কৌশলমাত্র।

তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছিলেন - 'দেশে বিদেশে অনেকেই জানতে পেরেছিলেন সেনাপ্রধান হোসেন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করতে চাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সাত্তার তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেনি কেন?'

প্রশ্নটি বেশ জটিল, আমি উত্তর দিলাম - রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেব সেনাপ্রধানকে চাকরিচ্যুত করেননি কেন? এর উত্তর একমাত্র সাত্তার সাহেবই দিতে পারেন। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে আমি জেনেছি-রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেব সেনাপ্রধান এরশাদ সাহেবকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের মিলেটারী সেক্রেটারী জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরী এ সংবাদ এরশাদ সাহেবকে সরবরাহ করেছিলেন এবং লে. জেনারেল এরশাদ বঙ্গভবনে এসে একটি কাপড়ে মোড়ানো গ্রন্থকে স্পর্শ করে রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের কাছে অঙ্গিকার করেছিলেন - তিনি কখনোই রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবকে ক্ষমতাচ্যুত বা তার কোনো ক্ষতি সাধন করবেন না। রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেব কাপড়ে মোড়ানো সেই গ্রন্থটিকে পবিত্র কোরআন মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কাপড়ে মোড়ানো কি গ্রন্থ হাতে নিয়ে অঙ্গিকার করেছিলেন তা কেউ বলতে পারেন না। পরে অনেকেই বলেছে সেটি ছিল আবুল মনসুর আহমদের 'আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর' গ্রন্থটি। উপরে বর্ণিত কথা যদি সত্যি হয় তবে এ এক অভিনব প্রতারণা।

তিনি শেষ প্রশ্ন করেছিলেন - 'পুরাতন গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী দল আওয়ামী লীগ এরশাদের শামরিক শাসনকে সমর্থন করেছিলেন কেন?'

আমি উত্তর দিয়েছিলাম - হয়তোবা এটা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ। বিএনপিসহ দক্ষিণপন্থি দলগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এই কৌশল। অবশ্য ১৯৫৮ সালের পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেছিলো আওয়ামী লীগের ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে হত্যা করে।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি মিলিতভাবে। অবশ্য ২০০৭ সালের

www.pathagar.com

১১ জানুয়ারি কথাটা সে সময় বলা সম্ভব হয়নি। কারণ তা তখনও সংঘটিত হয়নি। তবে রাজনৈতিক চরিত্র নীতিভ্রষ্টতা ও অভিন্নভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে।

মি. মার্ক রেইড ইন্দিরা গান্ধী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর লাইফ ইন্টারভিউ করেছিলেন বলে তিনি আমাকে জানালেন এবং বিবিসি বাংলায় একটি ইন্টারভিউ দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। তিনি বিবিসি বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রধান ছিলেন। পিটার ম্যাঙ্গেলের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং পিটার ম্যাঙ্গেল ৭ই ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩ টায় পুনরায় আমাকে বুশ হাউসে আসার আমন্ত্রণ জানালেন।

রাত ৮ টায় দুলাভাইয়ের বাসায় ফিরলাম। মিসেস নূরা আমাকে গাড়িতে করে পৌঁছে দিলেন। বাসায় ঢুকতেই আমার স্ত্রীর বড় বোন মিসেস মর্জিনা সাহাবুদ্দিন বললেন বিবিসি চ্যানেল ফোরে তোমার ইন্টারভিউ দেখলাম।

পরদিন ব্যারিস্টার আবুল হাসনাতের সঙ্গে দেখা হলো। বিকেল তিনটায় আমরা বুশ হাউসে প্রবেশ করলাম। পিটার ম্যাঙ্গেল বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক সিরাজুর রহমানকে আমার আসার কথা অবহিত করে রেখেছিলেন। তিনি সমকালীন বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে আমার একটা চমৎকার ইন্টারভিউ প্রচার করেছিলেন বিবিসি বাংলা বিভাগ থেকে।

৭ ফেব্রুয়ারির পর সিদ্ধান্ত নিলাম ১১ ফেব্রুয়ারি ম্যাঞ্চেস্টারে যাব। ড. আলাউদ্দিন থাকে ম্যাঞ্চেস্টারে ২২ নং স্যানিব্যাংক রোডে। ১১ তারিখে ২ টার বাসে করে আমার রওয়ানা হওয়ার কথা। লন্ডনের প্রধান বাসস্ট্যান্ড ভিক্টোরিয়াতে অবস্থিত। বড় দুলাভাইয়ের বাসা পিসার রোডে। ভিক্টোরিয়া বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছতে আমার ১০ মিনিট বিলম্ব হয়। স্বাভাবিকভাবেই আমি ২টার নির্ধারিত বাস ধরতে পারিনি। আমাকে আসতে হয়েছিল ৪ টার বাসে। অর্থাৎ রাত ৮টায় আমি ম্যাঞ্চেস্টার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছবো। সে সংবাদ আমি আলাউদ্দিন সাহেবকে দিতে পারিনি। তিনি ৬ টার সময় বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখতে পেলেন আমি আসিনি। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে জেনেছিলেন পরবর্তী গাড়িতে আমি ম্যাঞ্চেস্টারে আসছি। আমি খুবই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে চিন্তা করেছিলাম একটা ট্যাক্সি নিয়ে ২২ নং স্যানি ব্যাংক রোডে ডা. আলাউদ্দিনের বাসায় যাব। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয়নি। বাস থামতেই দেখি আলাউদ্দিন সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। আমি লাগেজটি নিয়ে নামতেই তিনি আমাকে স্বস্নেহে

www.pathagar.com

জড়িয়ে ধরলেন। বললেন- পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো। আমরা দু'জনে গাড়িতে পিছনের সিটে বসেছিলাম। ১০ মিনিটের মধ্যেই আমরা তার বাসায় উপস্থিত হলাম। এ বাসায় তার পরিবার থাকে না। তারা থাকে অন্যত্র। এখানে নিচতলায় তার চেম্বার ও একটি রুম। দুতলায় তিনটি রুম ভাড়া দেয়া আছে। আমাকে থাকতে হবে একতলার বেডরুমে। অবশ্য প্রথম দিনে ড. আলাউদ্দিন তার পরিবার যেখানে থাকে সেখানে গেলেন না। আমরা একই সঙ্গে থেকে গল্পগুজব করে রাত কাটিয়েছিলাম।

১২ ফেব্রুয়ারি ম্যাঞ্চেস্টারের মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি ছিলেন ইথেনিক মাইনরেটি কমিউনিটির লোক। ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি গিয়েছিলাম লিভারপুল সমুদ্র সৈকত দেখতে। এই লিভারপুল সমুদ্র বন্দরেই একসময় আফ্রিকানদের ধরে এনে বিক্রি করে দেয়া হতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ মালিকানাধীন কোম্পানিসহ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর কৃষিকাজ বিশেষকরে তুলা চাষ, গৃহ ও রাস্তা নির্মাণের মতো কঠোর কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের কাজগুলো আফ্রিকান শ্রমিকদের দিয়ে করানো হতো। যুগ যুগ ধরে তাদের কোনো নাগরিক অধিকার ছিল না। তাদের একটি মাত্র পরিচয় ছিল তারা কৃতদাস। আমি ডা. আলাউদ্দিন সাহেবকে বলেছিলাম-ইমিগ্রেশন ইজ পার্ট অফ সিভিলাইজেসন এন্ড নেসেসিটি ইজ দ্যা মাদার অফ ইনভেনশন। তিনি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েছিলেন। লিভারপুলে বহু আবাসিক ও খাবার হোটেল আছে। বর্তমানে লিভারপুল সমুদ্র সৈকত ইউরোপের মধ্যে তো বটেই বিশ্বের মধ্যেও একটি বড় সমুদ্র সৈকত।

গ্রীষ্মকালে ইউরোপের যুবক-যুবতিরা সমুদ্রস্নানের জন্য এই সমুদ্র সৈকতে আসে। এই সমুদ্র সৈকতের একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে শুধুমাত্র এডাল্ডদের জন্য। জোড়ায় জোড়ায় লক্ষ লক্ষ যুগল সেখানে দিন কাটায়। এদের থাকা খাওয়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পর্যটন শিল্প। হাজার হাজার বাংলাদেশী ব্রিটিশ নাগরিক নানাভাবে এই পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছে। তাদের একজনের কাছে গিয়ে উঠেছিলাম আমি ও ড. আলাউদ্দিন সাহেব। দু'দিন থেকে ১৪ তারিখ রাতে ফিরে আসি ম্যাঞ্চেস্টারে।

১৬ তারিখে বাংলাদেশী কমিউনিটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য ড. আলাউদ্দিন সাহেব এক ডিনার পার্টির আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশী ছাড়াও

www.pathagar.com

ভারত ও পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৬ তারিখে জানতে পারলাম মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ৫০-এর দশকে লন্ডনে এসে ২১ নং স্যানি ব্যাংক রোডের বাড়িতে ছিলেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লন্ডনে ফিরে এলাম। ম্যাঞ্চেস্টার বহুদিন ধরে মূলত শিল্প ও শিক্ষা নগরী। বস্ত্রশিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জায়গাটি বিশেষভাবে পরিচিত। লন্ডনে ফিরে এসে ব্যারিস্টার আবুল হাসনাতের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করলাম। দু'দিন ভরে আমরা লন্ডন যাদুঘর, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানসহ পুরো লন্ডন ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ১ মার্চ ১৯৯০ লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক যাওয়ার জন্য টিকিট কনফার্ম করলাম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর

সকাল ১১টার মধ্যে হিথরো বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। লন্ডন থেকে নিউইর্য়ক ৫ ঘন্টার জার্নি। সময়ের পার্থক্যের কারণে বিকেল ৪টার দিকে আমরা কেনেডি বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। ওয়াশিংটনে আমার অফিসিয়াল কর্মসূচি ১২ ও ১৩ মার্চ। অর্থাৎ ১১ তারিখের মধ্যে পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু আমার বন্ধু আনিসুজ্জামান খোকন বললো-প্রথমে নিউইয়র্কে আসেন তার পর ওয়াশিংটনে যাব। তার কথামত ১ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে রওয়ানা হলাম। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস্ এর ফরমালেটি শেষ করে বের হতে ৫টা বেজে গেল। আনিসুজ্জামান খোকনের আমাকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বের হয়ে তাকে পেলাম না। একমাত্র ফোন নম্বর ছাড়া তার বাসার ঠিকানা আমার জানা ছিল না। আমি তার বাসায় টেলিফোন করলে তার স্ত্রী বললেন তিনি ঘুমাচ্ছেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমরা এখনই বিমানবন্দরে আসছি। আধাঘন্টার মধ্যে আনিসুজ্জামান খোকন গাড়ি নিয়ে বিমানবন্দরে এলো ও আমাকে তার বাসায় নিয়ে গেল। রাতে তার বাসায় খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিলাম। সে চলে গেল তার কাছে।

পরদিন সকাল বেলা কথা বললাম স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ডেস্কের প্রধানের সঙ্গে। তিনি আমাকে জানালেন - ১২ ও ১৩ মার্চ আমার অফিসিয়াল প্রোগ্রাম। ১১ তারিখ থেকে হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনালে আমার থাকা-

www.pathagar.com

খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং ১১ মার্চ আমাকে ওয়াশিংটনে পৌঁছতে পারলেই হবে। আনিসুজ্জামান খোকনকে বললাম - ১১ মার্চ আমাকে ওয়াশিংটনে যেতে হবে। তিনি বললেন - বাস ও ট্রেন উভয় পথেই যাওয়া যাবে। তবে ট্রেনে গেলে ভাল হয়। রেলস্টেশন ম্যারাটনে আনিসুজ্জামান খোকনের বাসা এস্টোরিয়ান এলাকায়। এই ১০ দিন নিউইর্য়কে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ঘুরাফেরা করে অনেকের সঙ্গে পরিচিত হলাম ও সময় কাটালাম। নিউইয়র্কস্থ বহু বাংলাদেশী পরিবারের সাথে নিজেকে পরিচিত করলাম। ১১ তারিখ সকালে রওয়ানা হলাম ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে। বিকেল ৪টায় ওয়াশিংটনে পৌছেছিলাম। আমার কাছে ছোট্ট একটা ব্যাগ ছাড়া অন্যকোনো বড় লাগেজ ছিল না। আমি আমার ব্যাগটি হাতে নিয়ে স্টেশন থেকে বের হতে উদ্যত হলাম। কিন্তু স্টেশনের নিয়ম হলো কোনো প্যাসেঞ্জার তার নিজের ব্যাগ নিজে নিতে পারবে না। স্টেশনের কুলিরা সে ব্যাগ বহন করে দেবে। আমি আমার ব্যাগ বহনকারী ব্যক্তিকে ৫ ডলার দিয়েছিলাম। তিনি ৫টি ডলার ফেরত দিয়ে আমাকে বললো- It not me you more then me. রেলস্টেশনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি এককালের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা তনু ভাই আমাকে রিসিভ করতে এসেছিলেন। তিনি নিজেই তার গাড়িতে করে হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনালে আমাকে পৌছে দেন।

হোটেলে পৌছা মাত্রই স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ডেস্ক প্রধান - David Donahue আমার খোঁজ খবর নেন। হোটেল হিলটনে তিনি টেলিফোন করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আমার কোনো অসুবিধা আছে কিনা জানতে চান। তিনি ১২ তারিখ সকাল সাড়ে ১১টার মধ্যে তৈরি হয়ে থাকার অনুরোধ করেন।

পরদিন ১২ মার্চ গাড়ি আসে। আমি সেই গাড়িতে করে স্টেট ডিপার্টমেন্টে উপস্থিত হই। ১২ তারিখে নিম্নের ব্যক্তিবর্গের সাথে আমার প্রোগাম হয় :

1. Time: Morning- 9.00 am:
   David Donahue, U.S. Department of State Country Desk officer for Bangladesh
   Room No. 527, Phone: 647-9552

www.pathagar.com

2. Morning- 10.00 am:
Tony Gambino
Office of Congresman Tony Hall
House Annex No. 2, Room. 505 2nd & D St.,
Phone: 226-5470

3. 11.00 am
Eric Schwartz
Office of Congresman Stephen Solarz
House Annex 1, Room 707, Phone: 226-7801

4. 1:30 pm
Elaine Papzian
Room 4915
2:30 pm
Salman Holmy
ASIA Director
Voice of America
3rd Independence (C Street entrance)
Room 1448, Phone : 485-8268

5. March 13
10.00 am
Kurt Silvers
Bannerman & Associates
888-16th st., 5th Floor.
2.00 pm

6. Mrs. Teresita Schaffer
Deputy Assistant Secretary of State Bureau of Near Eastern & South Asian Affairs
Room 6242 Phone : 647-7177

www.pathagar.com

7. 4:00 pm
George Haddow
Deputy Political Director of the Democratic Senatorial Campaign Committee
430 South Capitol St., S.E. Phone : 224-2448.
March

উপরোক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার আলোচনার মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশের রাজনীতি, কালচার এবং আমার রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি ও আদর্শ উদ্দেশ্য নিয়ে।

মিসেস শেফার আশির দশকে বাংলদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তার স্বামী ছিলেন নেপালের রাষ্ট্রদূত। তারা পূর্ব থেকেই আমার এবং আমার পরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিল। ১৩ তারিখ দুপুর আড়াইটায় তাদের সাথে আমার প্রোগাম শেষ হয়। বিকেল ৫ টার ট্রেনে নিউইয়র্কে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমাকে হোটেল থেকে রেলস্টেশনে পৌছে দিয়েছিলেন-কর্ণেল (অব.) বফ। তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাউথ এশিয়ার সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেমন করে নেতৃত্ব ডেভেলপমেন্ট করা হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমি ২৬ মার্চ পর্যন্ত নিউইর্য়কে ছিলাম। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশ কমিউনিটির পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয় সে বছর। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন-ম্যারাটন সিটি কর্পোরেশনের চত্বরে। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন- আনিসুজ্জামান খোকন।

আমি ২৭ তারিখ সন্ধ্যায় নিউইর্য়ক থেকে লন্ডন আসি। লন্ডনে একদিন থাকার পর ২৮ তারিখে বাংলাদেশে ফিরে আসি। #

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদ বিরোধী নিরব বিপ্লব

যে সমস্ত ঘটনা রাষ্ট্রীয় জীবনে বিভিন্ন ধারার পরিবর্তন সাধন করে আমরা তাকে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করি। বিশ্বের অতীত ইতিহাস নিয়ে খুব বেশি পর্যালোচনা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করতে চাই না। তবে ঘটনাপ্রবাহের একপর্যায়ে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভুত আকাঙ্ক্ষার বিস্ফো-রণকে কালের পরিবর্তন বলে আমরা অভিহিত করি। ঠিক তেমনিভাবে ইতিহাসের গতিধারা ও সভ্যতার উত্থান-পতনের কথা উল্লেখ করতে হলে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ফরাসি বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদবিরোধী নিরব বিপ্লবকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে আখ্যায়িত করতে হয়। ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তনে যুদ্ধ একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করছে। যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ও যুদ্ধযান অপরিহার্য। ইতিহাসের প্রথম যুগে ঘোড়া ছিল যুদ্ধ জয়ের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান।

ইউরোপে নৌ-শক্তির উত্থান ঘোড়ার প্রাধান্যকে গুরুত্বহীন করে দেয়। নৌ-শক্তির পরে আসে আকাশ শক্তি অর্থাৎ বিমানশক্তি। ১৯৪৫ সালে যে শক্তির উন্মেষ ঘটে তার নাম আণবিকশক্তি। কিন্তু তার পরও দেশের অভ্যন্তরীণ সমাজব্যবস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমঝোতা সমান্তরালভাবে কাজ করে। যিশুখ্রীস্টের ধর্মমত, তিনি নিজে খুববেশি প্রচার করতে পারেননি। কিন্তু তার তিরোধানের পর সমগ্র ইউরোপে ক্যাথলিক খ্রীস্টধর্ম সমাজব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছিলো। ক্যাথলিক খ্রীস্টীয় ধর্মশালাগুলোকে কেন্দ্র করে একধরণের সুবিধাভোগীশ্রেণী সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। রাজারা রষ্ট্রে ও প্রজাদের শাসন করতো প্রত্যক্ষ শক্তির

www.pathagar.com

মাধ্যমে। আর ধর্মশালাগুলো সমাজ তথা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতো নৈতিকতা দিয়ে। সমগ্র ইউরোপ যখন এই দু'য়ের সমন্বয়ের ভিত্তিতে রোম সাম্রাজ্যের কাঠামোতে পরিচালিত হচ্ছিল তখন ৯৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে গ্রেটবৃটেনে একটি নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এভাবেই বৃটেনে জাতিরাষ্ট্র ও প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টধর্ম সমাজজীবনে প্রসারিত হয়। মূলত রোমভিত্তিক একচেটিয়া সুবিধাভোগিদের বিরুদ্ধেই এই চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। এরফলে খ্রীস্টধর্মের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং ইউরোপে ধর্মরাষ্ট্রের পরিবর্তে জাতিরাষ্ট্রের সূচনা হয়। এর ফলে দীর্ঘদিন ইউরোপে ধর্মযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। ফলে বহু মানুষ যুদ্ধবিগ্রহের বিভীষিকার বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে উদগ্রীব হয়।

ইতিমধ্যে ইউরোপীয় শক্তিগুলো সমুদ্রপথ আবিষ্কারের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এর পূর্বে বাগদাদভিত্তিক একমাত্র খলিফা হারুন-অর-রশিদই নৌ-শক্তির বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নৌ-শক্তিতে জাহাজের সংখ্যা ছিল ৫৪০টি। কিন্তু তিনি বিশ্বব্যাপী নৌপথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। গ্রীক সম্রাজ্ঞী রাণী ইছাবেলা নৌ-শক্তি ও নৌ-পথ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। কলম্বাস, বাস্কোডাগামা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নির্ভীক উদ্যোগের ফলে আবিষ্কৃত হয় - এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের নৌপথসমূহ।

এ প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় নৌশক্তির আবির্ভাব ঘটে। আর এভাবেই ইউরোপীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়। পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই গ্রীক ও ডাচশক্তি প্রথম আধিপত্য বিস্তার করে। এর পিছু পিছু আসে ব্রিটিশ ও ফরাসি শক্তি। ১৬ শতাব্দি থেকে ১৭ শতাব্দির শেষভাগে এসে সমগ্রবিশ্বেই তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইতিমধ্যে আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয় ঔপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্প ও কৃষিতে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। শাসকশ্রেণী শুধুমাত্র প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত লোকদের গুরুত্ব অনুধাবণ করতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল উন্নয়নের প্রয়োজনে বাইরের শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে আমেরিকাকে একটি অভিবাসী দেশ হিসেবে পরিণত করা হয়।

ফরাসি বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে রোমনগর সভ্যতার কথা কিঞ্চিৎ আলোচন করা দরকার। রোমের নগরসভ্যতা ছিল মাত্র ১২/১৩টি ছোট শহরকে কেন্দ্র করে। যার লোকসংখ্যা ছিল অর্ধ কোটিরও কম। কিন্তু তারপরও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে যে এই নগরগুলো থেকেই মহাবীর আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট-এর মত দিগ্বিজয়ী

বীরের উত্থান হয়েছিল। তিনি রোম থেকে মিসর হয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলতেন - পৃথিবীতে যুদ্ধজয়ের অবশিষ্ট আর কোনো জায়গাই নেই। কিন্তু চীন, রাশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না। তারপরও রোম নগরসভ্যতা, মানবসভ্যতা আর রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করেছিল - যা পরবর্তী পর্যায়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রলম্বিত হয়েছে।

১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে পঞ্চদশ জর্জ ৫৯ বছর রাজত্বকাল শেষ করে বলেছিলেন আমিই হয়তোবা ফরাসি রাজতন্ত্রের শেষ সম্রাট। কিন্তু তারপরও একজন ফরাসি সম্রাটের আবির্ভাব ঘটেছিল তিনি ছিলেন - ষষ্ঠদশ লুই। অবশ্য তিনি ছিলেন একজন অপদার্থ স্বেচ্ছাচারি শাসক। সে সময় ভেতরে ভেতরে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হতে শুরু করে।

১৭৮৯ সালে ফরাসিদের যখন খাদ্যসমস্যা, অর্থসমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছিল রাজা ও রাণী রাজকোষের অর্থ অপচয় করছিল বিবেকহীনভাবে। এরই প্রতিবাদে ও সীমাহীন নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের জনতার পক্ষে রাষ্ট্রসমিতি গড়ে উঠে। এই রাষ্ট্রসমিতির নেতৃত্বেই ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফ্রান্সে আন্দোলনরত জনতা বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটিয়েছিল। আর এই বিপ্লব পরবর্তিতে বিশ্বকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দেয়। ফরাসি জনগণের বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নতুন ব্যবস্থাগুলোর প্রতিক্রিয়া সমগ্র ইউরোপেই প্রভাব ফেলেছিল এবং রাজা-রাণীর চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীন স্বৈরাচারি মনোবৃত্তি সকোচিত হয়েছিল দুনিয়াব্যাপী। এরই প্রভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল সারা দুনিয়ায়। এই বিপ্লবের ফলে গণতান্ত্রিক ও ন্যায়বিচারের বাণী প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল সারা বিশ্বে। যে বিপ্লবকে আজকের দিনের যন্ত্রসভ্যতার চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত করা যায়।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা যখন সারাবিশ্বকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল, তখন সোভিয়েত রাশিয়ায় মহামতি লেলিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মার্কস এবং এঙ্গেল্সের আদর্শ ধারণ করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে এই বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় গণচীন, কিউবা ও ভিয়েতনামে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আঁলোচনা বিভিন্ন সময়ে অনেক হয়েছে সে সম্পর্কে আর বেশিকিছু উল্লেখ করতে চাই না। তবে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটাই বলা দরকার - এই বিপ্লবের ফলে পৃথিবীর অর্থনীতি ও

www.pathagar.com

সমাজব্যবস্থা স্পষ্টতই দুই মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি পৃথিবীর দেশে দেশে প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের আদর্শিক প্রেরণা হিসেবে এখনো কাজ করে চলছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদবিরোধী নিরব বিপ্লব

ইউরোপীয় শক্তি কর্তৃক বিশ্বনৌপথ আবিষ্কৃত হওয়ার পর ইউরোপীয়রা আমেরিকাতে যেতে থাকে নিরাপদ আশ্রয় ও সম্পদের লোভে। সে সময় আমেরিকার আদিবাসীদের কি অবস্থা ছিল সেসম্পর্কে আমার ধারণা খুবই কম। তবে রেডইন্ডিয়ান নামে একটি জনগোষ্ঠী আমেরিকাতে আদিকাল থেকেই বসবাস করতো। এখন তাদের অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন। ইউরোপীয়ানরা সেখানে তাদের ঔপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাতে আদিবাসীদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে। অন্য জায়গায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে কূট-কৌশল ও বিভেদনীতির মাধ্যমে শাসন ও শোষণ করেছে তারা।

১৭৭৫ সালে ১৩টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে প্রথম ইউনাইটেড আমেকিার যাত্রা শুরু হয়। মূলত ইংল্যান্ডবিরোধী এবং ফরাসি সমর্থনপুষ্ট হয়েই আমেরিকার স্বাধীন সত্তার উদ্ভব ঘটে। ধীরে ধীরে আমেরিকায় পরিশ্রমী শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে শ্রমশক্তির যোগান দিতেই শুরু হয় আফ্রিকা থেকে লোক ধরে এনে আমেরিকাতে দাস হিসেবে ব্যবহার করার নিয়ম। আমেরিকা প্রথম থেকেই একটি অভিবাসী দেশ হিসেবে গড়ে উঠে। এর মূলমন্ত্র হচ্ছে ইউনিটি অন ডাইভারসিটি। স্বল্পমূল্যে কঠোর পরিশ্রমী আফ্রিকান শ্রমিকের সহজলভ্যতা ও স্বল্প বিনিয়োগে অধিক লাভ এই নীতির ভিত্তিতেই মার্কিন ধণিক ও বণিক শ্রেণী শ্রমের বাজারে আফ্রিকান শ্রমিকদের বেছে নিয়েছিল।

এই আফ্রিকান শ্রমিক সংগ্রহের পদ্ধতিটি ছিল কৌতূকপ্রদ, অভিনব ও নিষ্ঠুরতম। জাল পেতে যেমন মাছ, পাখি বা বন্যপশু ধরা হয় ঠিক তেমনি অভিনব কায়দায় আফ্রিকার যুবক/যুবতীদের ধরে বৃটেনের লিভারপুল সমুদ্রবন্দরে নিয়ে আসা হতো। সেখান থেকে আমেরিকার বণিকেরা হাটে-বাজারে যেমন গরু-ছাগল বা বন্যপশুপাখি কেনাবেচা হয় তেমনি এই শ্রমিকদের মার্কিন ধণিকশ্রেণীর কাছে কেনাবেচা করে তাদের কৃতদাসে পরিণত করতে বাধ্য করতো। এভাবেই কেনাবেচার মাধ্যমে শ্রমিকদের মালিকানার পরিবর্তন হতো।

আফ্রিকানরা এভাবেই বংশানুক্রমে আমেরিকান ধণিকশ্রেণীর দাস হিসেবে কাজ করতো। এভাবেই আফ্রিকান জনগোষ্ঠীর জনবসতি গড়ে উঠে আমেরিকান সমাজে।

www.pathagar.com

যাদের আমরা আফ্রিকান-আমেরিকান নাগরিক বলে আখ্যায়িত করি। আমেরিকায় দু'ধরণের নাগরিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথমত জন্মসূত্রে আমেরিকান এবং আইন মেনে আমেরিকান নাগরিক হওয়ার বিধান রয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মেই দাসদের সন্তান যারা আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করেছে তারা জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক হয়েছে।

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আফ্রিকান আমেরিকানসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু নাগরিকেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমঅধিকার ভোগ করতে পারতো না। যেমন একই বাসে দুই ধরণের বসার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল আলাদা আলাদা। ইচ্ছে করলেই আফ্রিকান আমেরিকান নাগরিকরা কোনো বড় ব্যবসার সুযোগ পেতো না। আর সিনেটর কিংবা কংগ্রেসম্যান হওয়া তো অনেক দূরের কথা। একই দেশের নাগরিক হয়েও বহুধরণের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো সংখ্যালঘু এই জনগোষ্ঠী।

১৯৫৫ সালে রোজাপার্ক নামে এক মহিয়সী নারী এই বর্ণবৈষম্যমূলক রাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। বার বার তিনি নানাভাবে নিগৃহীত হওয়ার পরও তিনি তার এ আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। একসময় এ আন্দোলনের গতিসঞ্চারিত হয়। এভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় কিং মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে এই আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৫ সালে শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন এনে নাগরিক সমঅধিকার বাস্তবায়িত হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে। নিপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শিক্ষা-ব্যবসা-চাকরিসহ বিভিন্ন পদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। পর্যায়ক্রমে শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে তারা অগ্রগতি লাভে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে।

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে বৃটিশরাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রেও ছিল একচেটিয়া প্রাধান্য। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপিয়ানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণেই নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান ও প্রথম পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় শক্তিগুলো দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। এমনকি ঔপনিবেশগুলোতে সৈন্য সরবরাহের ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলে। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় তিন কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ফলে ইউরোপে গড়ে উঠে যুদ্ধবিরোধী ও ঔপনিবেশবিরোধী চেতনা। ফলে গণতান্ত্রিক শক্তির সামাজিক পরিবর্তন ঘটে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থায়। বাধ্য হয়ে নারিসমাজ রক্ষণশীল ব্যবস্থার খোলস থেকে বেড়িয়ে এসে পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। জার্মান-বৃটেন ও ফ্রান্স প্রায় পুরুষ শূন্য সমাজে পরিণত হয়। ফলে শক্তি দিয়ে ঔপনিবেশগুলো রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের সময় শেষ হয়ে গেছে এটা তাদের বুদ্ধিজীবীরা অনুধাবণ করতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

আণবিক শক্তিধর ও অধিক সম্পদশালী হওয়ার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রধান শক্তিতে পরিণত হয় এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অবসান হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মনেপ্রাণেই চাইত ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অবসান হোক। এভাবেই ভারত, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার দেশগুলো ঔপনিবেশিক আধিপত্যের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বলয় গড়ে উঠে। শেষপর্যন্ত কোরিয়া ও ভিয়েতনাম যুদ্ধে শক্তিপরীক্ষার এক নতুন মহড়া প্রদর্শিত হয়।

এ সব বিভাজনকে পাল্টে দেয় ৯০-এর দশকের আফগানযুদ্ধ। এই যুদ্ধে সোভিয়েত বনাম ইসলামিক শক্তির যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের উপর ভর করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তালেবান ও আল-কায়েদা শক্তির উত্থান ঘটে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে এক ভয়াবহতম ও ইতিহাসের জঘন্যতম নারকীয় ঘটনা। কয়েকজন বিমান হাইজাকার কয়েকটি পেসেঞ্জার বিমান হাইজাক করে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ভবন টু-ইন টাওয়ারে হামলা চালায়। এমনকি তারা হোয়াইট হাউজেও হামলা চালাতে চেয়েছিল। ওয়াশিংটনের পেন্টাগণ ভবনেও তারা হামলা চালাতে সক্ষম হয়েছিল। এখানে একটি প্রশ্ন বিশ্বের কৌতূহলী মানুষের মনে থেকেই যাচ্ছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে নিখুঁত, নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থার অধিকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সেই মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে সম্ভব হলো এ হামলা পরিচালনা করা?

অন্যদিকে হামলার পরপরই একমুহূর্ত দেরি না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এ হামলার জন্য ওসামা-বিন-লাদেন ও আল-কায়েদাকে দায়ী করেন এবং সারা দুনিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে ক্রুসেড শুরু করার ঘোষণা দিলেন। যার ফলে মনস্তাত্ত্বিক দেয়াল গড়ে ওঠে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিমা শক্তির। ওসামা-বিন-লাদেন সৌদি বংশোদ্ভূত এবং বড় ব্যবসায়ী পরিবারের সদস্য। পাশাপাশি বুশ ও লাদেন পরিবার দীর্ঘদিনের পারিবারিক বন্ধু। দ্বিতীয়ত: ইরাকে সাদ্দাম হোসেন রাসায়ণিক অস্ত্র বানিয়েছে বলে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেন জর্জ ডব্লিউ বুশ। এসব মিথ্যা অভিযোগের অজুহাতেই ইরাক ও আফগানিস্তান দখল করে নেয় মার্কিন ও তার মিত্রবাহিনী উন্নততর অস্ত্রের বলে। শক্তি দিয়ে শুধু একটি দেশ জয় করলেই জয় শেষ হয়ে যায় না। যে দেশটি দখল করা হয় তার অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ মোকাবেলা করতে হলে

www.pathagar.com

প্রচুর সৈন্যসমাবেশ করতে হয়। পাশাপাশি যুদ্ধের ফলে জনগণের ওপর করের বোঝা বেড়ে যায় অস্বাভাবিকভাবে।

আবার বিদেশের মাটিতে কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই দিনের পর দিন মৃত্যুর পরোয়ানা সঙ্গে নিয়ে মার্কিন সেনাসদস্যরা থাকতে চায় না। অন্যদিকে ইরাক ও সৌদি আরবের তেলসম্পদ লুণ্ঠন করার অভিপ্রায়ও তাদের সফল হয়নি। সে কারণেই মার্কিন মুল্লুকে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক মন্দা। বিদেশের মাটিতে জাতীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণকারী মার্কিন সৈন্যদের আত্মীয়রাও প্রশাসনের প্রতি হয়ে উঠেছিল বিরূপভাবাপন্ন। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ হয়ে উঠেছিল সর্বক্ষেত্রে একজন নিন্দনীয় ব্যক্তি। তারই পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল রিপাবলিকান পার্টির ওপর।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৩% আফ্রিকান-আমেরিকন নাগরিক, ১৪% স্প্যানিস, ৭% এশিয়ান। ২০০৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় প্রাথমিক নির্বাচনে এই সংখ্যালঘুরাই ঐক্যবদ্ধভাবে দলের মধ্যে বারাক হুসাইন ওবামার পক্ষাবলম্বন করে হিলারী ক্লিন্টনকে পরাজিত করেছিল। আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই সংখ্যালঘুরাই ঐক্যবদ্ধভাবে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী বারাক হুসাইন ওবামাকে ভোট এবং অর্থ দিয়ে নির্বাচিত করেছে নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য। এভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যালঘু জনগনের মনে লুকিয়ে থাকা পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তারা ভোটের মাধ্যমে বর্ণবাদবিরোধী একটি সফল নিরব বিপ্লব সম্পন্ন করে। যার প্রেরণার উৎস ছিল মহিয়সী নারী রোজাপার্ক ও কিংবদন্তির নায়ক কিংমার্টিন লুথার। জনগণের এই নিরব বিপ্লবের স্বপ্ন পুরুষ হচ্ছেন বারাক হুসাইন ওবামা।

বিশ শতকের শেষপ্রান্তে ও একুশ শতকের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের আচরণে প্রতীয়মান হয়েছে মুসলিম বিশ্বই হচ্ছে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ। তবে এতে উভয় পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ মানবিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়ে সৌহার্দ্য গড়ে তোলার ঐতিহাসিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বারাক হুসাইন ওবামার ওপর। বিশ্ববাসী অধির আগ্রহে সে দিকেই তাকিয়ে আছে। #

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

আওয়ামী লীগের ১১-দফা

১৯৬৪ সালের ৫ জুন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ১১-দফা দাবিনামা উত্থাপন করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর এই দাবিনামা গৃহীত হয়। ১১-দফা নিম্নরূপ :

১. 'ফেডারেশন অফ পাকিস্তান' নামে সত্যিকার অর্থে ফেডারেল পদ্ধতি প্রণয়ন।

২. বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র কায়েম ও যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীসহ সকল সরকারি উচ্চপদে মেধা অনুসারে বাঙালিদের নিয়োগ

৪. পাকিস্তানের উভয় অংশে বৃহৎ শিল্পকারখানা জাতীয়করণ

৫. মোহাজেরদের জন্য সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ন

৬. ফেডারেশনে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ সাধনে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি প্রণয়ন

৭. পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কায়েমের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক মুদ্রার ব্যবস্থাসহ পৃথক অর্থনীতি প্রণয়ন

৮. পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্য পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন

৯. বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব-নিকাশ ও আয়-ব্যয়ের পূর্ণ অধিকার প্রদেশের হাতে ন্যস্তকরণ

১০. পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠাসহ দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন

১১. ছাত্রদের দাবি-দাওয়াসহ শ্রমিক-কৃষকদের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ।

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ৬-দফা

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ৬-দফা নিম্নরূপ:

১. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি : ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান একটি যুক্তরাষ্ট্র হইবে। সেখানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অঞ্চলগুলোকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন সভার সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা : কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল দুইটি বিষয়, যথা- দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৩. মুদ্রা ও অর্থসম্বন্ধীয় ক্ষমতা : (ক) দুইটি প্রদেশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকিবে। অথবা (খ) সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রাই রাখা যাইতে পারে। তবে সেইক্ষেত্রে পূর্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য কার্যকর সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভ এবং পৃথক অর্থ ও মুদ্রা বিষয়ক নীতি থাকিবে।

৪. রাজস্ব, কর ও শুল্ক সমন্বন্ধীয় ক্ষমতা : কর ধার্যের কোনো ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিবে না। এই ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে ন্যাস্ত থাকিবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ লাভ করিবে।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয় ক্ষমতা : পাকিস্তান ফেডারেশনভুক্ত দুইটি অঙ্গরাজ্যের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দুইটি পৃথক খাত হিসেবে রাখা হইবে। বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত পূর্ব পাকিস্তানের আয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাজ্যগুলিই মিটাইবে। অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে দেশক দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা নিষেধ থাকিবে না। সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বিদেশের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

৬. আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা : আঞ্চলিক সংহতি ও সংবিধান রক্ষার জন্য সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তান ইহার নিজস্ব আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও পোষণ করার অধিকারী হইবে।

www.pathagar.com

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK

REFERENCE:

14 December 1993

Dear Mr. Nilu,

Thank you very much for your letter of 23 June 1993 addressed to the Secretary-General concerning the question of water-sharing between Bangladesh and India.

We have carefully noted the concerns that you raised in your letter, which are of importance to the international community as well. We have forwarded your letter to the United Nations Development Programme (UNDP)'s Regional Bureau for Asia and the Pacific for its information and consideration. I believe that it is the most directly concerned with questions of such a nature.

With best wishes.

Yours sincerely,

Francesc Vendrell
Director
East Asia/Pacific Division
Department of Political Affairs

Shaikh Shawkat Hossain Nilu
Chairman
Parakka Action Committee and
Progressive Nationalist Party
24/A Ibrahimpur
Dhaka Cantonment
Dhaka
Bangladesh

www.pathagar.com

Sheikh Shawkat Hossain Nilu

www.pathagar.com

OV3/2334 (0-0-1)

Programme of arrangements made by the
Central Office of Information for the
Foreign and Commonwealth Office

Sheikh Shawkat Hosain NILU

Chairman, Progressive Nationalist Party

Dhaka

BANGLADESH

6 February 1990

Accompanied by a representative of the Central Office of Information

Programme Organiser:

Mrs M Cleaver
Overseas Visitors and Information Studies
Central Office of Information
Hercules Road, London SE1 7DU

Direct Line: 01-217 2349
Switchboard: 01-217 3000, Ext 2349

www.pathagar.com

Sheikh Niku is staying privately at <u>13 Gayfere Road, Clayhall, Essex.</u>
(Tel: 01-551 0996).

1300	Met at the Royal Horseguards Hotel, Whitehall Place, SW1, by Miss Nora Doogan, Overseas Visitors and Information Studies, Central Office of Information, who will accompany Sheikh Niku to his appointments.
	Joined for lunch in Granby's Restaurant by Mr David Clegg, South Asian Department, Foreign and Commonwealth Office.
1400	Leave Whitehall Place.
1420	Arrive at the House of Commons, SW1. (St Stephen's Entrance).
1425	Witness the Speaker's Procession.
1430	Attend the proceedings in the House of Commons from a seat in the Commonwealth Gallery.
1515	The Prime Minister answers questions.
1600	Met in the Central Lobby by Mr Ray Whitney MP, Conservative Member of Parliament for Wycombe.
	Tea with Mr Whitney.
1630	Leave the House of Commons.
1700	Arrive at the British Broadcasting Corporation, Bush House, Strand, London, WC2.
	Interview with Mr Mark Reid, BBC World Service.
Later	Leave Strand.

END OF CENTRAL OFFICE OF INFORMATION ARRANGEMENTS

31 January 1990

www.pathagar.com

United States Department of State

Washington, D.C. 20520

Visit of Sheikh Shawkat Hossian NILU
Chairman, Progressive Nationalist Party
March 12 - 13, 1990

March 12

9:00	David Donahue U.S. Department of State Country Desk Officer for Bangladesh Room 5247 Phone 647-9552
10:00	Tony Gambino Office of Congressman Tony Hall House Annex No. 2, Room 505 2nd & D St. Phone 226-5470
11:00	Eric Schwartz Office of Congressman Stephen Solarz House Annex 1, Room 707 Phone 226-7801
1:30	Elaine Papzian Room 4915
2:30	Salman Holmy ASIA Director Voice of America 3rd & Independence (C Street entrance) Room 1448 Phone 485-8268

March 13

10:00	Kurt Silvers Bannerman & Associates 888-16th St. 5th Floor
2:00	Mrs. Teresita Schaffer Deputy Assistant Secretary of State Bureau of Near Eastern & South Asian Affairs Room 6242 Phone 647-7177
4:00	George Haddow Deputy Political Director of the Democratic Senatorial Campaign Committee 430 South Capitol St., S.E. Phone 224-2448

www.pathagar.com

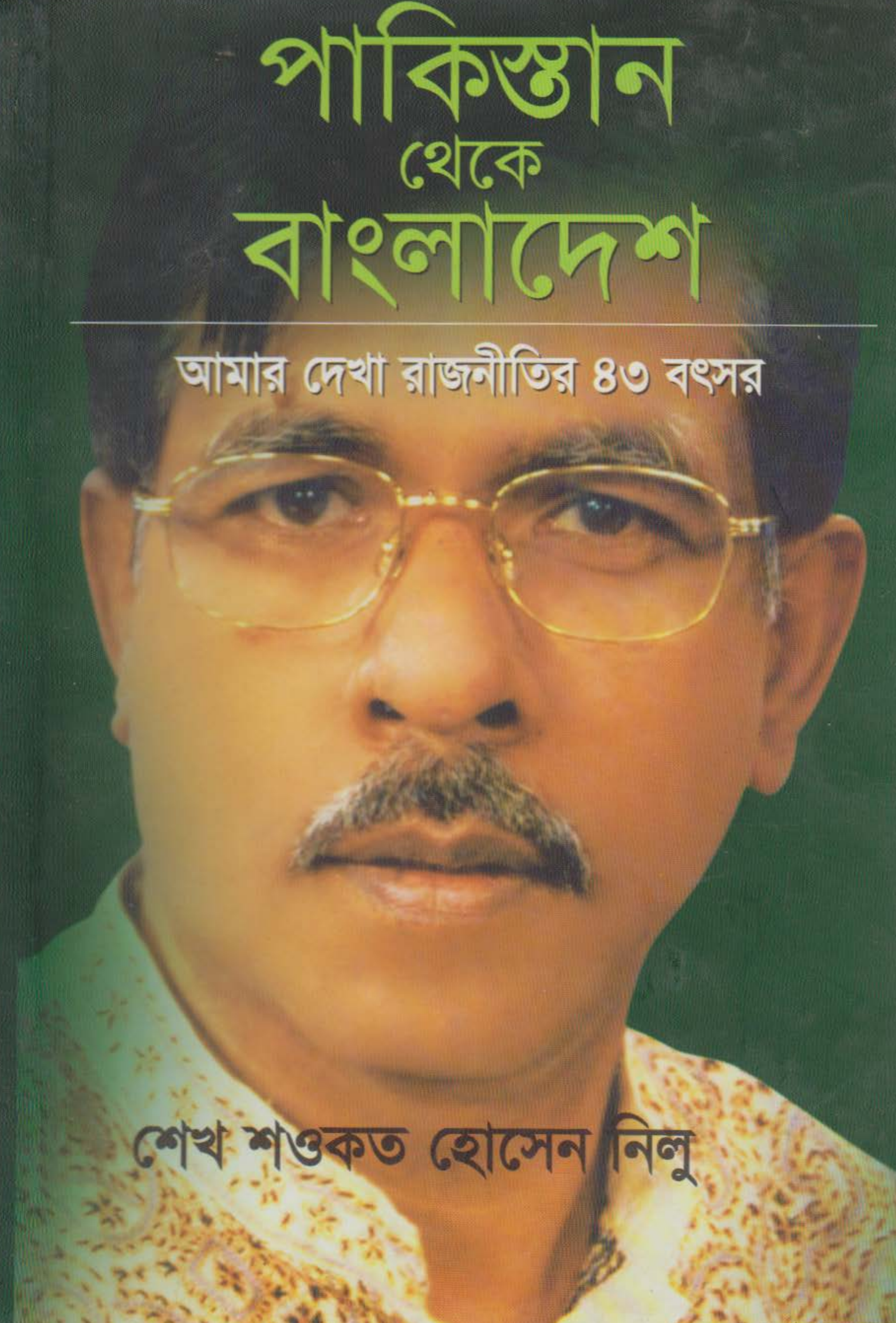
পাকিস্তান
থেকে
বাংলাদেশ
আমার দেখা রাজনীতির ৪৩ বৎসর
শেখ শওকত হোসেন নিলু